আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম



আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-৫

অনুবাদ

মাওলানা আবু সাকী মাহবুব
মুহাদ্দিস, সম্পাদক ও সাহিত্যিক ফাযেলে হাটহাজারী

বই ঘর **বইঘর**
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১৭৫৫৪৭২৭; ০১৭১১৭১১৪০৯
e-mail: boighorbd@gmail.com; boighor2008@gmail.com
web: www.boighorbd.com

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-৫
কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

তৃতীয় মুদ্রণ
জানুয়ারী ২০১৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মার্চ ২০১৬

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩৬০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0058-0

KHOTOBAT-E-HAKIMUL ISLAM : Translate by Abu Saki Mahbub
Published by : S M Aminul Islam, BhoiGhor : Islami Tower Ground floor
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 First Edition : February 2013 © by the pablisher

Price : 360 Taka only

প্রকাশকের নিবেদন

ইদানীং ভিন্ন ভাষার মনীষীদের অনূদিত বক্তৃতা প্রকাশের প্রবল জোয়ার বইছে। বাংলা ভাষাভাষীরা এতে উপকৃতও হচ্ছেন যথেষ্ট। সেই তুলনায় উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদীন বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের অর্ধশতকেরও অধিক সময়ের মুহতামিম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. অনেকটা উপেক্ষিতই রয়েছেন বলা চলে। অথচ উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা এ মনীষীর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে হকের পয়গাম মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে রয়েছে লেখনি ও বক্তৃতামালার অসামান্য অবদান। সেসব আকর গ্রন্থগুলি আরবি উর্দুসহ নানা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে মুসলমানদের আল্লাহমুখী জীবন গঠনে অবদান রেখে চললেও বাংলা ভাষায় তা যথেষ্ট পরিমাণে অনুপস্থিত। উল্লেখ্য, কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.-এর ব্যক্তিগত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্মরণশক্তি ও মেধা এবং বংশীয় পরিচিতির সুবাদে তিনি শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেই দারুল উলুমে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। তেমন যোগ্যতা ছিল বলেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মতো একটি বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুহতামিমের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সফল শিক্ষকতা এবং সুদক্ষ পরিচালনা ছাড়াও তিনি ওয়াজ নসীহত এবং বক্তৃতার ক্ষেত্রে অসামান্য যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সুললিত বক্তৃতা ও আলোচনা শ্রোতাসাধারণকে মুগ্ধ করত। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তিনি একটানা কয়েক ঘণ্টা বক্তৃতা করতে পারতেন। শরীয়তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গভীর রহস্য আলোচনা এবং বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে বোধগম্য করিয়ে দিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীও তাঁর বিজ্ঞচিত আলোচনায় উপকার লাভ করতেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আলীগড়

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মুদ্রিত করে প্রকাশও করা হয়। তাঁর সেসব মূল্যবান বয়ানগুলোই 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' নামে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, যা একাধারে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার এবং ইসলামী সাহিত্যের সুবিশাল আকর। তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে বলা যায়– নিখিল ভারতের এমন কোন প্রদেশ নেই, যেখানে তাঁর বক্তৃতার ধ্বনি পৌঁছায়নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জ্ঞানতাপস আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মনীষীর বিখ্যাত সেই বক্তৃতাগুলো এখনো বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে অনুপস্থিত। আমরা সীমিত সাধ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও স্বপ্ন দেখার তাওফিক যিনি দিয়েছেন তাঁর ভাণ্ডারে তো কমতি নেই। সেই ভরসা আর দীন প্রসারের অদম্য বাসনাকে পুঁজি করে এই মনীষীর সেরা সংকলন হিসেবে বিবেচিত 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' বাংলায় প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাদিও বাংলায় প্রকাশের ইচ্ছে আমাদের রয়েছে। প্রাজ্ঞ আলেম আবু সাকী মাহবুব অনূদিত প্রথম খণ্ডটি বাজারে দেয়ার পর থেকে পরবর্তী খণ্ডগুলোর জন্য আমরা পাঠকদের অনবরত তাকিদ পাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে এ নিয়ে পাঁচটি খণ্ড পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারলাম। আশা করি পরবর্তী খণ্ডগুলোও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পাঠকদের সামনে হাজির করতে পারবো। আমাদের এ কাজ নিতান্ত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়– পাঠক মাত্রই তা বুঝবেন। তাই আমাদের অগ্রযাত্রায় আপনাদের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। কষ্টসাধ্য এ কাজের বদলা মহান আল্লাহ তাআলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দান করুন।

তারিখ : দুআর মুহ্তাজ

৩১ ডিসেম্বর ২০১২ ঈ. এস এম আমিনুল ইসলাম

অনুবাদকের আরয

হযরত হাকীমুল ইসলাম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.কে আল্লাহ তায়ালা অশেষ ও অদ্বিতীয় দীনি খেদমতের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যশালী করেছেন। লেখা ও বয়ানের মাধ্যমে তিনি কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ও কার্যকর তালিম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার শতাধিক দেশের কোটি মানুষ দীনের সঠিক বুঝ গ্রহণ ও তাতে অটল থাকার ব্যাপারে তাঁর ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

হাকীমুল ইসলাম রহ. যেমনিভাবে আকাবিরগণের রূহানী ফয়েযের ধারক ছিলেন তেমনিভাবে আল্লাহ তাঁকে ইলমী ফয়েযও দান করেছিলেন। বিশেষ করে পিতামহ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.-এর ইলমের সাথে পূর্ণ মুনাসাবাত দান করেছিলেন। এই বিশেষত্বের কারণেই তাঁর বয়ান ও খুতবাসমূহের ফয়েয জাতির কোন বিশেষ স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সবার জন্য ব্যাপক বিস্তৃত।

ইসলামী জীবন-যাপনের নানা বিষয়কে তিনি কুরআন-হাদীস, পূর্ববর্তী মনীষীদের ইলমের নির্যাস এবং স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে সুচিন্তিত মতামতের সমন্বয়ে অপূর্ব দক্ষতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি বক্তৃতায় তিনি এক-একটি স্বতন্ত্র বিষয়কে তুলে এনেছেন। তাঁর উপস্থাপনার ধরন, জ্ঞানের গভীরতা, উদাহরণ-উপমা, বুঝানোর পদ্ধতি, বিষয়ের গভীর থেকে গভীরে সন্তরণ– যত দেখি ততই মুগ্ধ, বিস্মিত হই।

আলোচ্য গ্রন্থে হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.-এর বয়ানসমূহ সংকলিত হয়েছে। প্রথম যুগে হযরতের বয়ানগুলো হাতে লিখে সংরক্ষণ করা হতো। এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য আলেমদের একটি দল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। হযরত বয়ান করার সময় তারা দ্রুততার সাথে প্রতিটি শব্দ লিখে নিতেন। টেপ রেকর্ডারের যুগ আসার পর তাঁর বয়ানগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ক্যাসেটে ধারণ হতে থাকে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সে বয়ানগুলো সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনা ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার দুরূহ কাজটি দেওবন্দের 'হাকীমুল ইসলাম একাডেমি' আঞ্জাম দিয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি দশ খণ্ডে সমাপ্ত সংকলনের পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ।

এই দুর্লভ বয়ানগুলো আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে শুকরিয়া আদায় করছি হাকীমুল ইসলাম একাডেমির পরিচালক এবং হযরতের সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মদ সালেম কাসেমী সাহেবকে, যাঁর

সরাসরি তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনায় বয়ানগুলো গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে। আরো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস হুশিয়ারপুরী সাহেবের, যিনি দিন-রাত খেটে ক্যাসেট থেকে শুনে বয়ানগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। বয়ানের শিরোনাম ও উপ-শিরোনামগুলো মাওলানা ইদরিস সাহেব ও অন্যান্যদের দেওয়া। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পূর্ববর্তী খণ্ডগুলো অনেক আগেই সম্মানিত পাঠকবর্গের হাতে পৌঁছে গিয়েছে। পঞ্চম খণ্ডটি তাদের খেদমতে হাজির করতে অনেকটা ব্যক্তিগত কারণে আমাকে দীর্ঘ বিরতি নিতে হয়েছে, যা রীতিমতো পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। এ সময়ে তারা সরাসরি ও টেলিফোনে প্রকাশক এস এম আমিনুল ইসলামকে বর্ণনাতীতভাবে তাগাদা দিয়েছেন। অসীম ধৈর্যের সাথে তিনি উভয় দিক সামলেছেন। তার আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। চাহিদামতো সময়ে পাঠকদের হাতে বইটি তুলে দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমার সহকর্মী, পরিবারের সদস্যবর্গ, হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুমহল আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। বিশেষত লেখক ও সুরকার মুফতি কবির আহমদ খান, মুফতি আবু তলহা, মুহাম্মাদ ইলিয়াছ হুসাইন ও মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের কথা উল্লেখ করতেই হয়। আমার বন্ধু ও সুহৃদ মাওলানা ইয়াছিন মোল্লা সুদূর রংপুর থেকে আমাকে অবিরাম তাগাদা ও উৎসাহ প্রদান করে চলেছেন। এদের সবার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার লেখালেখি ও যাবতীয় প্রকাশনায় সবচেয়ে বেশি যার অবদান, তিনি হলেন আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, সুসাহিত্যিক, সাংবাদিক সমর ইসলাম। দীনের প্রতি তার অসীম দরদ ও সাধ্যের সবটুকু ব্যয়ের মানসিকতাকে আল্লাহ কবুল করে নিন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষাকে যথাসম্ভব সহজ ও সাবলীল রাখতে চেষ্টা করেছি। বয়ানের আমেজ যেন বজায় থাকে সে দিকটিও বিবেচনায় ছিল। চেষ্টা করেছি যেন সম্মানিত পাঠকবর্গ মূল কিতাবের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন। সার্বিক সুন্দর ও নির্ভুল করার প্রাণান্তর চেষ্টা আমরা করেছি, তথাপি ভুল-ত্রুটি থাকা বিচিত্র নয়। এক্ষেত্রে আমরা সম্মানিত পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন।

তারিখ : মা'আস্‌সালাম

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আবু সাকী মাহবুব

কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে তিনটি ঐতিহাসিক মন্তব্য

এক.

তাসাউফ ও সুলুকের ইতিহাসে যে স্বাতন্ত্র্য মহা সৌভাগ্য কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব রহ.-কে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন তা এই যে, তাঁর মুরশিদ শায়খুল আলম হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. যখন মৃত্যুপীড়ায় আক্রান্ত, তখন তাঁকে দেখার জন্য হযরত কারী সাহেব তাঁর কাছে উপস্থিত হলে হযরত থানভী রহ. তাঁর হাতকে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুমু খেলেন এবং স্বীয় বক্ষ মোবারকের উপর রেখে বললেন, এ হাত দ্বারা আমি আমার অন্তরে আশ্চর্যজনক এক প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করছি। তারপর হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর ইলমী, আমলী ও রূহানী ফয়েজ এবং স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও জীবনে বরকতের জন্য মাকবুল দুআ করে বিদায় দিলেন।

দুই.

আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসগর হুসাইন মিয়া সাহেব রহ. হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে বলেন, মাওলানা মুহাম্মাদ তৈয়ব আমার স্নেহভাজন, স্বীয় বুযর্গগণের ইলমী বৈশিষ্ট্যাবলী এবং রূহানী নেসবতসমূহ আল্লাহ তাআলা তাঁর মধ্যে একত্র করে দিয়ে তাঁকে আপাদমস্তক ফয়েয ও বরকতময় করে তুলেছেন।

তিন.

খতীবে আযম, আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. ভারত বিভাগের পূর্বে মুলতানের খায়রুল মাদারিস-এর বার্ষিক সভায় হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ সাহেবের আন্তরিক দাওয়াতে গুরুত্বসহকারে অংশগ্রহণ করতেন। হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর এ সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় বিষয়াদির উপর অদ্বিতীয় ও নজিরবিহীন বয়ান এ জলসার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে আমীরে শরীয়ত হযরত শাহ সাহেব রহ. হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে নিজের গভীর সম্পর্ক ও ভালবাসা এবং তাঁর ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলতেন, আমি এ জলসায় শুধু তাঁর ওয়াজ শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকি। তিনি আরো বলতেন, তাঁর এক তাকরিরে আমার সারা বছরের অসংখ্য তাকরিরের বিষয়াদি তৈরি হয়ে যায়।

رحمهم الله رحمة واسعة

সূ চি প ত্র

বয়ান : ১

আবির্ভাবের শান / ২৩
সূচনা বক্তব্য / ২৪
ভূমিকা / ২৫
শাহী সিংহাসন / ২৬
রহমতের প্রমাণপত্র / ২৬
আরশের অবস্থানস্থল / ২৭
কেয়ামতে রহমতের প্রাধান্য / ২৯
শানে রহমতের প্রভাব / ২৯
সর্বোত্তম দোয়া / ৩০
দোয়ার নির্যাস / ৩২
সর্ব-প্রধান নিয়ামত / ৩৩
নবীগণের নবী [সা.] / ৩৪
পরিপূর্ণ হেদায়াতের আধার / ৩৫
সর্বোত্তম শান / ৩৬
শানে নবুওয়াতের মধ্যে রহমতের প্রাধান্য / ৩৬
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শানে রহমত / ৩৮
উম্মতের দয়াশীলতা / ৩৮
শ্রেণীগতভাবে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা / ৪০
স্থায়ী সন্তুষ্টির ঘোষণা / ৪১
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার উল্লেখ / ৪২
শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের পবিত্রতা ঘোষণা / ৪২
সাহাবীগণের মর্যাদার পবিত্রতা ঘোষণা / ৪৩
সাহাবায়ে কেরামের আমলের পবিত্রতা ঘোষণা / ৪৪
চিন্তাজনিত ত্রুটি / ৪৫
কলবের পবিত্রতা / ৪৫
সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা / ৪৬
ইশকে সাহাবা / ৪৭
ঈমান ও আমলের মানদণ্ড / ৪৯
ইলম ও আমলের আদর্শ / ৫০
রাসূলের আদর্শের আবশ্যকতা / ৫১
ইলম ও আমলের সাদৃশ্যতা / ৫৩
যথার্থ আনুগত্য / ৫৩

রেসালাতের দায়িত্ব / ৫৪
আত্মশুদ্ধি / ৫৫
আমলের নেগরানি / ৫৬
মুজাহাদার উদ্দেশ্য / ৫৭
আমলের পার্থক্য / ৫৮
আমলের ইখলাস / ৫৮
অলিত্বের হাকিকত / ৫৯
হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহর ঘটনা / ৬০
আত্মশুদ্ধিহীন আমল / ৬৩
পরিপূর্ণ অবিচলতা / ৬৪
পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ / ৬৫
পরিপূর্ণ লীন হয়ে যাওয়া / ৬৬
আল্লাহর মর্জি / ৬৭

বয়ান : ২
সীরাতের উপাদান / ৬৯
ভূমিকা / ৭০
পথ-প্রাপ্তির শর্তসমূহ / ৭২
রূহানী সফরের শর্তাবলি / ৭৩
রূহানী নূরের আবশ্যকতা / ৭৫
ইহুদী-নাসারাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস / ৭৫
নাসারাদের বিশ্বাস খণ্ডন / ৭৬
ইহুদীদের বিশ্বাস খণ্ডন / ৭৯
মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন / ৭৯
বুদ্ধি বিলোপ / ৮০
তাওহীদের সংক্ষিপ্তসার / ৮১
অজ্ঞতার আঁধার / ৮২
মানব-নবী প্রসঙ্গ / ৮২
নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব / ৮৩
মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করার ক্ষতি / ৮৪
আবদিয়াত প্রকাশ করার নির্দেশ / ৮৫
আবির্ভাবকালের সংক্ষিপ্ত চিত্র / ৮৬
আবির্ভাবের শান / ৮৭
শরীয়তের ভারসাম্যতা / ৮৭
সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী নূর / ৮৮
সত্যের পথ-প্রদর্শক / ৯০

আমলের আদর্শ / ৯১
মুরব্বীর আবশ্যকতা / ৯২
ধারাবাহিকভাবে আমলের নমুনা উপস্থাপন / ৯৩
আমলী কুরআন / ৯৬
আল্লাহর তালিম পদ্ধতি / ৯৭
নবী প্রেরণের আবশ্যকতা / ৯৮
অর্থ নির্ধারণে পরিভাষার প্রভাব / ১০০
কুরআনের উদ্দেশ্য নির্ধারণে সুন্নাতে রাসূলের অবস্থান / ১০৩
কুরআনের গবেষণা / ১০৬
হাদিস সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা / ১০৭
বর্তমান যুগে হাদিস রেওয়ায়াত পদ্ধতি / ১০৯
ইজতেহাদী যোগ্যতা হারিয়ে যাওয়া / ১১০
আত্মার পরিশুদ্ধি / ১১২
আমলের তত্ত্বাবধান / ১১৪
কলবের চিকিৎসা / ১১৫
নূরান্বিত আত্মার প্রভাব / ১১৮
আত্মার শুদ্ধি ছাড়া কুরআনের বুঝ / ১১৮
খেদমতে কালামুল্লাহ / ১২০
হাদিসের খেদমত / ১২১
হাদিস রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা / ১২২
তালিমের আদব / ১২৪
ইলমের যথার্থ অন্বেষণ / ১২৫
শিক্ষকের মর্যাদা / ১২৭
আহলে ইলমের অমুখাপেক্ষিতা / ১২৭
গোমরাহী হতে মুক্তির জিম্মাদারী গ্রহণ / ১২৮
দীনের সংস্কার / ১২৯
মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় / ১৩১
সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি / ১৩১
আহলে হকের পরিচয় / ১৩৩
নবুওয়াতের ওয়ারিশ / ১৩৫
পথের আলোকবর্তিকা ও পথ-প্রদর্শক / ১৩৬
সরল ও সুদৃঢ় পথ / ১৩৭
লক্ষ্য অর্জনের শর্তাবলি / ১৪০
সাহিত্য ও প্রকাশনা আধিক্যের ক্ষতিকর দিক / ১৪০
ইলমের কেন্দ্র হলো ব্যক্তিসত্তা : কিতাব হলো আলামত / ১৪১
পথের আদব / ১৪২

ইলমের মাধ্যম ও উপায়-উপকরণের প্রতি আদব প্রদর্শন / ১৪৩
যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন / ১৪৬
মহা ফাসাদ / ১৪৮
আলেমের সৌন্দর্য / ১৪৯
ইবাদতের তাৎপর্য / ১৫০
ফিতরাত ও শরীয়ত / ১৫৪
'দীনে ফিতরাত'-এর অপূর্ব ব্যাখ্যা / ১৫৬
অনুগ্রহ প্রদর্শন ও সহজকরণ / ১৫৭
অনুগ্রহ প্রদর্শন ও সহজকরণ / ১৫৮
সুন্নাতের নূর / ১৫৯
ভালবাসার প্রভাব / ১৬১
উত্তম আদর্শ / ১৬৩
নিদ্রার সুন্নাত পদ্ধতি / ১৬৪
রুসুম-প্রথা, চিন্তাভাবনা এবং শরীয়তের বিধান / ১৬৬
সুন্নাত ত্যাগ করার পরিণতি / ১৬৭
নূর এবং কিতাব / ১৬৮
ইসলাম আইন নয়, দীন / ১৭০
ইলম ও আখলাকের নূর / ১৭০
ব্যক্তি সত্তার আনুগত্যহীন ইলম / ১৭২
ইলমহীন আনুগত্য / ১৭৩
শরীয়ত ও তরিকতের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য / ১৭৫
মাদরাসা ও খানকা / ১৭৬
রূহের চিকিৎসা / ১৭৭
সীরাতে নববীর চার উপাদান / ১৭৮

বয়ান : ৩
ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা / ১৮১
প্রাজ্ঞ শুকরিয়া / ১৮২
দারুল উলুমের একজন তালিবে ইলম / ১৮৩
কর্তব্য পালন / ১৮৪
ভূমিকা / ১৮৪
মতাদর্শের একাত্মতা / ১৮৫
ধর্মীয় একাত্মতা / ১৮৬
বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা / ১৮৭
ইসলামের সূচনা / ১৮৯
শরীয়তের পূর্ণতা / ১৯০

দীনের একাত্মতা / ১৯০
তাওহীদ বর্জনের অভিশাপ / ১৯২
তাওহীদের প্রভাব / ১৯৪
ইবাদত ও তাজিমের পার্থক্য / ১৯৫
সম্মানপ্রদর্শনমূলক সিজদা / ১৯৭
তাজিমের মাপকাঠি / ১৯৭
প্রভুত্বের গুণাবলি / ১৯৯
তাওহীদের পূর্ণতা / ২০০
মাবুদ হওয়ার যোগ্যতা / ২০২
মাজহাবের ভিন্নতার কারণ / ২০৫
জ্ঞান-বুদ্ধির সীমা / ২০৬
বিবেক-বুদ্ধি ও গায়েবী বিষয়াবলি / ২০৮
অনুভূতির সীমা / ২০৯
আকিদার উৎস / ২১০
সমতাবিধানের আবশ্যকতা / ২১০
ঈমানের পূর্ণতা / ২১১
অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা / ২১২
আবদিয়াতের শান / ২১৩
তাওহীদের প্রকার / ২১৫
ইসলামের গঠন-প্রকৃতি / ২১৮
সঠিক আকিদার পরিচয় / ২১৯
বিশ্বজনীন দীনের আলামত / ২২০
এক ইহুদীর সাথে কথোপকথন / ২২১
বিশ্বজনীন দীনের দ্বিতীয় আলামত / ২২৩
বিশ্বজনীন দীনের তৃতীয় আলামত / ২২৪
শ্রেষ্ঠত্বের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি / ২২৫
বিশ্বজনীন দীনের চতুর্থ আলামত / ২২৬
দীন আন্তর্জাতিক হওয়ার মাপকাঠি / ২২৭
পরকাল চিন্তা / ২৩০
সম্মুখের মঞ্জিল / ২৩২
সত্যধর্মের সহজ পরিচয় / ২৩২
হযরত হাতিম আসাম্মার ঘটনা / ২৩৩
প্রেমাস্পদ নির্বাচন / ২৩৪
শত্রু নির্ধারণ / ২৩৪
এক সত্তার উপর নির্ভরতা / ২৩৫

সমসাময়িক পয়গম্বরের আনুগত্যই নাজাতের ভিত্তি / ২৩৬
কুরআনকে অস্বীকার করা সকল কিতাবকে অস্বীকার করার নামান্তর / ২৩৮
কুরআনুল কারীম সমগ্র আসমানী কিতাবের সংরক্ষক / ২৩৮

বয়ান : ৪
মানব শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য / ২৪০
আলোচ্য বয়ানটি সম্পর্কে কিছু কথা / ২৪১
দোয়া ও অভিনন্দন / ২৪৫
দারুল উলুমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য / ২৪৮
ভূমিকা / ২৪৮
বিশ্বজগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য / ২৫০
অনুভূতিসম্পন্ন মাখলুকের চারটি প্রকার / ২৫১
প্রত্যেক প্রকারের স্বতন্ত্র অধিকার এবং ইসলামে তার হেফাযত / ২৫১
রাসূলের দরবার থেকে উক্ত বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ / ২৫২
প্রাণীদের অধিকার / ২৫৩
জিনদের অধিকার / ২৫৪
জিনদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম / ২৫৪
জিনদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক / ২৫৬
জিনদেরকে ওয়াজ ও তাবলিগ / ২৫৭
ফেরেশতাদের হক / ২৫৮
ফেরেশতাগণ দুর্গন্ধ ও মিথ্যাকে ঘৃণা করেন / ২৫৯
মানুষের অধিকার / ২৫৯
প্রাণী সৃষ্টি সংক্রান্ত উদ্দেশ্য / ২৬০
প্রাণীদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি হতে বঞ্চিত রাখার হিকমত / ২৬১
নির্বুদ্ধিতাও নিয়ামত / ২৬২
ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ পদ্ধতি / ২৬২
জিনদেরকে যৌথ নির্দেশের আওতায় রাখা হয়েছে / ২৬৩
জিনদের মধ্যে নবুওয়াত না রাখার কারণ / ২৬৪
মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে শরয়ী সম্বোধনভুক্ত করা হয়েছে / ২৬৪
ইলমে এলাহির জন্য মানব জাতিকে নির্বাচন / ২৬৫
মনুষ্যত্বের জাওহার হলো ইলমে ওহী / ২৬৬
সর্বপ্রকারের ইলম মানুষের বৈশিষ্ট্য নয় / ২৬৭
ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা মানুষের সাথে নির্দিষ্ট নয় / ২৬৭
মানুষ ও ডাক্তারি বিদ্যা / ২৬৯
প্রাণীদের মধ্যে শাসনব্যবস্থাও রয়েছে / ২৭১
মৌমাছিদের মধ্যে কিসাসের বিধান ও অপরাধের শাস্তি / ২৭২

হাঁসদের মধ্যে শাসন ও শৃঙ্খলাব্যবস্থা / ২৭৩
মাকড়সার কারিগরি / ২৭৪
জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান / ২৭৫
মনুষ্যত্বের ভিত্তিই হলো ইলমে এলাহি / ২৭৭
স্বভাব-চাহিদার বিরুদ্ধাচরণেই স্বার্থকতা / ২৭৯
হযরত নানুতুবী রহ.-এর একটি ঘটনা / ২৮০
আল্লাহওয়ালাগণের জীবনধারণের মাধ্যম / ২৮২
কেবল পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমেই ইলমে নববী লাভ হয় / ২৮৪
ফেরেশতাদের ইবাদত অপেক্ষা মানুষের ইবাদত বহুগুণ শ্রেষ্ঠ / ২৮৫
মানুষের ইবাদত নফসের পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তিতে / ২৮৬
মানুষ ও ফেরেশতার ইলমের পার্থক্য / ২৮৭
মানব-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব / ২৮৮
গবেষণা ও উন্নতিসাধন কেবল মানব জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য / ২৮৮
ইলমী যোগ্যতার উন্নতি / ২৮৯
ইলমের পূর্ণতা ও খেলাফত / ২৯০
খেলাফতের বিশেষত্ব / ২৯১
মৌল-উপাদানের পারস্পরিক সংঘাতের ফলে মৌলিক উন্নতি সাধিত হয় / ২৯১
জ্ঞান ও অজ্ঞতা এবং হক ও বাতিলের সংঘাতের হিকমত / ২৯৩
জাতিগত বিরোধ হতে শিক্ষা লাভ / ২৯৪
বিপরীতমুখী গুণাবলি দ্বারা উন্নতি / ২৯৫
উৎকর্ষতার প্রকাশ এবং বস্তুগত ও রূহানী উন্নতি / ২৯৬
বিবেকশক্তির উপর দুষ্টশক্তির বিজয়ের ফলাফল / ২৯৭
শরীয়তের শাসন / ২৯৮
ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম হওয়ার অর্থ / ২৯৮
স্বভাবজাত দুষ্প্রবৃত্তিকে শরীয়ত কল্যাণকর পথে পরিচালিত করেছে / ২৯৯
ইবাদতের হাকিকত হলো আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি / ৩০০
সৎকর্ম ও তাকওয়া / ৩০২
খেলাফতের ভিত্তি / ৩০৫
মানুষের খেলাফত প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের আপত্তি / ৩০৫
আল্লাহর দরবার হতে কথা ও কর্ম দ্বারা জবাব / ৩০৬
মানুষের আমলের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সাক্ষ্যর হিকমত / ৩০৭
আত্মিক উৎকর্ষতায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব / ৩০৯
খেলাফতের পূর্ণতাপ্রাপ্তি পরকালে ঘটবে / ৩০৯
নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব / ৩১৩
নবুওয়াতের উত্তরাধিকার / ৩১৪
মানবীয় উন্নতি / ৩১৫

কলবের নূর / ৩১৬
আমলের বরকত / ৩১৮
ইনসানিয়াতের ফ্যাক্টরি / ৩১৮
সুন্নাত ও সীরাতের মধ্যে পার্থক্য / ৩১৯
উৎকর্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি হলো সীরাত / ৩২০
দীনি মাদরাসাগুলো সীরাত গঠনের মানসে প্রতিষ্ঠিত / ৩২১
নির্মোহতা ও স্বল্পতুষ্টিতা / ৩২২
মহান ইহসান / ৩২৩
পরিশিষ্ট / ৩২৪

বয়ান : ৫
নিয়ামত ও মসিবতের উদ্দেশ্য / ৩২৫
পরীক্ষাকেন্দ্র / ৩২৭
পরীক্ষার উদ্দেশ্য / ৩২৭
নিয়ামতের পদ্ধতিতে পরীক্ষা / ৩২৮
মসিবতের পদ্ধতিতে পরীক্ষা / ৩২৯
মনুষ্যত্বের উচ্চস্তর / ৩২৯
পরীক্ষার পরিমাপ / ৩৩০
পরীক্ষার সাধারণ পদ্ধতি / ৩৩০
নিয়ামত ও মসিবতের উদ্দেশ্য / ৩৩১
জীবন ও মৃত্যুর লড়াই / ৩৩২
পরীক্ষার মাধ্যমসমূহ / ৩৩৩
পরীক্ষার প্রথম মাধ্যম ভয় / ৩৩৩
পরীক্ষার দ্বিতীয় মাধ্যম অনাহার / ৩৩৪
সমর্পিত ও সন্তুষ্ট বান্দা / ৩৩৫
কলবের পরীক্ষা / ৩৩৬
রূহের পবিত্রতা / ৩৩৭
মসিবত হলো গুনাহের কাফফারা / ৩৩৯
একজন সার্জনের কাজ / ৩৪২
মসিবতের মাধ্যমে চরিত্র সংশোধন / ৩৪৩
মৃত্যুর উদ্দেশ্য / ৩৪৪
সান্ত্বনা লাভের দোয়া / ৩৪৫
বিবেকজাত সান্ত্বনা / ৩৪৫
স্বভাবজাত সান্ত্বনা / ৩৪৬
সান্ত্বনার দোয়াটির প্রভাব: হযরত জাবের রা.-এর ঘটনা / ৩৪৭

সবরের প্রতিদান / ৩৪৯
কবর জগতে নিয়ামতের প্রভাব / ৩৪৯
মৃতব্যক্তি ও স্বজনদের পারস্পরিক উপকার / ৩৫০
সবরের সময় / ৩৫০
সম্মিলিত শোক / ৩৫১
উত্তম মানুষ / ৩৫২
কান্নার হাকিকত / ৩৫৩
হঠাৎ মৃত্যু / ৩৫৪
কবর যিয়ারতের আদব / ৩৫৪

বয়ান : ৬
ইফাদাতে বুখারী– এক / ৩৫৭
বাবসমূহের মধ্যে সংযোগ-সম্পর্ক / ৩৫৮
ওহী দ্বারা সূচনা করার কারণ / ৩৫৯
আমলের ভিত্তি হলো ঈমান / ৩৬০
ইলমের প্রয়োজনীয়তা / ৩৬০
মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য / ৩৬০
ইবাদতের পর মুয়ামালাত / ৩৬১
জিহাদের আবশ্যকতা / ৩৬১
আমলের পদ্ধতি / ৩৬১
উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব / ৩৬১
সনদের শ্রেষ্ঠত্ব / ৩৬২
সংশ্লিষ্ট হাদিসের বৈশিষ্ট্য / ৩৬২
অনুভবযোগ্য প্রথম বৈশিষ্ট্য / ৩৬২
আরবী ভাষার ফযিলত / ৩৬৩
বরযখবাসীর ভাষা / ৩৬৩
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ভাষা / ৩৬৪
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: আমলের পরিমাপ / ৩৬৫
আমল পরিমাপের স্বরূপ / ৩৬৫
রূহানী ওজন / ৩৬৬
দুরুদ শরীফের বরকত / ৩৬৭
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য / ৩৬৯
মাকামে উলুহিয়্যাত / ৩৬৯
তাওহীদের পূর্ণতা / ৩৭৪
উলুহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য / ৩৭৬
আলোচ্য হাদিস / ৩৭৬

হাদিসে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যত্রয় ও ইলমের প্রাধান্য / ৩৭৮
বুখারী শরীফের বিশুদ্ধতা / ৩৮০
অন্যান্য আসমানী কিতাবের স্বরূপ / ৩৮১
একমাত্র কুরআনই হলো আল্লাহর কালাম / ৩৮২
কুরআন ও হদীসের স্বতন্ত্র্যতা / ৩৮৪
কুরআনের মাহাত্ম্য এবং পয়গম্বরের মহিমান্বিত শান / ৩৮৫

বয়ান : ৭
ইফাদাতে বুখারী– দুই / ৩৮৯
প্রসঙ্গ কথা / ৩৯০
প্রশংসাপত্রের প্রতিউত্তর / ৩৯২
ইমাম বুখারী রহ. ও তাঁর কিতাবের উচ্চ মর্যাদা / ৩৯৪
আমলী জগতের দুটি বিষয় / ৩৯৪
আমলের ভিত্তি হলো নিয়ত / ৩৯৫
বাবসমূহের মধ্যে সম্পর্ক / ৩৯৬
আমলের প্রতিদান ব্যবস্থা / ৩৯৭
কালিমা দুটি ওজনে ভারী হওয়ার কারণ / ৩৯৭
পবিত্রতার মাকাম / ৩৯৭
মাকামে তামহিদ / ৩৯৯
একটি সন্দেহের নিরসন / ৪০০
তাওহীদের হাকিকত / ৪০১
নিয়তের শুদ্ধতা ও হাকিকত / ৪০৩
আমল কিভাবে ওজন হবে / ৪০৪
ইখলাসের শক্তি / ৪০৫
জান্নাত ও আমলের হাকিকত / ৪০৬
আমলের আকৃতির পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত / ৪০৭
কুরআনের আয়াত নিয়ামতের আকৃতিতে প্রকাশ পাওয়ার দৃষ্টান্ত / ৪০৭
হাকিকতে আমলের দৃষ্টান্ত / ৪০৮
আমল কখন আকৃতিপ্রাপ্ত হবে / ৪০৯
আমলের স্বরূপ উপস্থাপনের বৈজ্ঞানিক সত্যায়ন / ৪১০
সহি বুখারীর সূচনা ও সমাপ্তির সংযোগ / ৪১২
দোয়া / ৪১৪

বয়ান : ১

আবির্ভাবের শান

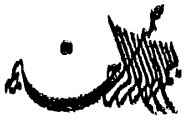
আল্লাহ তায়ালার রহমত আরশময় বিস্তৃত রয়েছে। আর রহমতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন এই যে, বান্দার জন্য হেদায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সে হেদায়াত নিয়ে আগমন করেছেন। তাঁরা প্রেরিত হওয়াও স্বতন্ত্র একটি নিয়ামত। এর চেয়ে বড় কোনো নিয়ামত বিশ্বজগতে নেই। এ জন্য যে, পৃথিবীতে তাঁদের আগমন না ঘটলে মানুষের পক্ষে 'মানুষ' হওয়া সম্ভব হতো না।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً وَلَمْ اُبْعَثْ لَعَّانًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ.

সূচনা বক্তব্য

বুযুর্গানে মুহতারাম,

এখন আমি আপনাদের সম্মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিনটি হাদিস তিলাওয়াত করলাম। এ হাদিস তিনটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের তিনটি মৌলিক উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথম হাদিসটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শান সম্পর্কে

আলোকপাত করা হয়েছে যে, কী অবস্থায় তিনি প্রেরিত হয়েছেন; কেমন শান নিয়ে তিনি পৃথিবীতে তাশরিফ নিয়েছেন। তো একটি হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের শান ও তার গুণাবলি আলোচিত হয়েছে, আর দ্বিতীয় হাদিস দু'টিতে তাঁকে প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কেন তিনি প্রেরিত হয়েছেন এবং কী সেই উদ্দেশ্য যা নিয়ে তিনি পৃথিবীতে তাশরিফ নিয়ে এসেছেন?

আমার আজকের আলোচ্য বিষয় দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ শানে বাআস অর্থাৎ কেমন ছিল তাঁর শান? আর দ্বিতীয় অংশ হলো এই যে, তাঁকে প্রেরণের নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলি কী ছিল? এগুলো তখনই সঠিকভাবে স্পষ্ট হবে যখন তার মূল ও বুনিয়াদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হবে। এ জন্যই প্রথমে আমি ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি কথা আরজ করব, এতে ইনশাআল্লাহ হাদিসসমূহের তাফসির, উদ্দেশ্য ও অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তায়ালা হলেন সকল পূর্ণতার আধার। সকল বরকত ও সকল নিয়ামত তাঁরই সত্তায় নিহিত রয়েছে। তিনিই পৃথিবীতে নিয়ামতরাজি প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালার সিফাত বা গুণাবলি দুই ধরনের। একটি হলো 'জালালী' সিফাত, অপরটি হলো 'জামালী' সিফাত। জালালী সিফাত যথা তাঁর কঠোরতা, ক্রোধ ও প্রতিশোধের শান। এগুলোকে জালালী সিফাত বলা হয়। আর জামালী সিফাত যথা রিজিক প্রদান, পুরস্কার প্রদান, সম্মান প্রদান, তারবিয়াত করণ প্রভৃতি। এগুলোকে শানে জামালী বলা হয়। মোটকথা আল্লাহর গুণাবলি দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো শানে জালালী, আরেকটি হলো শানে জামালী।

জামালী শানের উৎস হলো রহমত, আর জালালী শানের উৎস হলো গজব। সুতরাং তাঁর সকল সিফাত দু'টি প্রকরণের আওতাধীন। একটি রহমতের, একটি গজবের। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ 'আমার রহমত আমার গজবের উপর অধিক প্রবল।'

হাদিস শরীফে এসেছে, আরশে আজিমের উপরে আল্লাহ তায়ালা একটি লাওহ (ফলক) স্থাপন করেছেন, যার বিশালতা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সমান। তাতে লিখে রেখেছেনঃ

إِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ

আমার রহমত আমার গজবের উপর অধিক প্রবল, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর বিজয়ী।

যখন রহমত ও গজবের সাথে সংঘাতের সৃষ্টি হয় তখন রহমত অগ্রগামী হয়ে যায় এবং গজব পেছনে পড়ে থাকে। তো আরশে আজিমের উপর দলিল স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা এ কথাটি লিখে রেখে দিয়েছেন।

শাহী সিংহাসন

আরশে আজিম হলো শাহী সিংহাসন। আল্লাহর বিধানাবলি আরশ হতে জারি হয়। যে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ.

সকল কর্মকাণ্ড আরশ হতে পরিচালিত হয়। [ইউনুস ১০ : ৩]

এ কারণেই আরশ হলো শাহী সিংহাসন এবং সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তার নীচে। এই যে সৃষ্টিজগৎ– পৃথিবী, আসমান, জান্নাত এসবকিছুর উর্ধ্বে গিয়ে আরশের জগৎ। আরশ পর্যন্ত গিয়ে সৃষ্টিজগতের সমাপ্তি ঘটে। আরশের উর্ধ্বে কোনো মাখলুকের অস্তিত্ব নেই। ব্যতিক্রম শুধু ঐ ফলকটি যাকে উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে এবং তাতে লিখে রাখা হয়েছে:

إِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ

আমার রহমত আমার গজবের উপর অধিক প্রবল

রহমতের প্রমাণপত্র

উপরোক্ত ফলকটি ছাড়া আরশে আজিমের উর্ধ্বে অন্য কোনো মাখলুকের অস্তিত্ব নেই। সেখানে শুধুই আল্লাহর তাজাল্লি বিরাজমান এবং তা হলো আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির কেন্দ্র। সুতরাং আরশে আজিম যেন মহান আল্লাহর সিংহাসনের পায়া। যেখন থেকে পৃথিবীতে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এবং বিধানাবলি কার্যকর হয়। উক্ত আরশের উপর রহমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর অর্থ হলো এই যে, সমগ্র হুকুম আহকামের মধ্যে রহমতের প্রাধান্য রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদের সাথে যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তা শানে

রহমাত দ্বারা করেছেন। যদি 'শানে গজব' বা ক্রোধের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করতেন তবে মাখলুকের অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকতো না, মাখলুক ধ্বংস হয়ে যেত। ক্রোধ ও কহরের সামনে টিকে থাকার সাধ্য কার আছে? সুতরাং বান্দার সাথে যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তা হলো রহমাতের সম্পর্ক; গজবের সম্পর্ক নয়।

আল্লাহ তায়ালার গজব বা ক্রোধ সিফাতটি হলো সতর্ককরণ ও শাস্তি প্রদানের জন্য একটি সমায়িক বিষয়, কিন্তু যে স্থায়ী বিষয়টি সর্বত্র বিস্তৃত রয়েছে তা হলো রহমাত। এ কারণেই বর্ণিত হয়েছে:

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

রহমান আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর বিস্তার লাভ করেছেন।
[ত্বহা ২০ : ৫]

সমগ্র সৃষ্টিজগতের উর্ধ্বে বিস্তৃত রয়েছে আরশ, আর আরশের উপর সমাসীন রয়েছেন রহমান আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং ফলাফল দাঁড়ায় এই– সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর রহমান তাঁর রহমাতের শান নিয়ে ব্যাপৃত রয়েছেন। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর রহমাত প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। এ কথা বলেননি যে–

اَلْجَبَّارُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

প্রতাপান্বিত আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন।

অথবা

اَلْقَهَّارُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন।

তা যদি বলা হতো তবে অর্থ দাঁড়াত এই যে, বিশ্বজগতের উপর তাঁর ক্রোধ বিস্তৃত রয়েছে। যদি তাই হতো তবে বিশ্বজগতের অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকতো না। বরং الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى. রহমান আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর বিস্তার লাভ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর রহমত গুণ আরশের উপর বিস্তৃত রয়েছে। আর সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর আরশ বিস্তৃত রয়েছে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর আরশ হলো ছাদের ন্যায়। খাবারের ট্রেকে যেমনিভাবে আপনি আস্তরণ বানিয়ে ঢেকে রাখেন এবং তা সম্পূর্ণ ট্রেটিকে আচ্ছাদিত করে নেয়, তেমনিভাবে সৃষ্টিজগতের উপর ছাদের ন্যায় আরশ বিস্তৃত রয়েছে এবং তার উপর রহমত ছড়িয়ে রয়েছে। সুতরাং

ফলাফল দাঁড়াল এই যে, পুরো সৃষ্টিজগতকে রহমত আচ্ছাদিত করে রেখেছে। রহমান আরশকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে এবং আরশের উপর প্রমাণপত্র লিখে রেখেছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল।

আরশের অবস্থানস্থল

এ পর্যায়ে প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, আরশকে কিসের উপর স্থাপন করেছেন?

হাদিস শরীফেও উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে যে,

وَ كَانَ عَرْشُه عَلَى الْمَاءِ

আরশকে পানির উপর স্থাপন করেছেন।

হাদিস শরীফে রয়েছে, সেটি একটি সুবিশাল সমুদ্র; যার এক একটি ঢেউ আসমান ও জমিনের সমান। এ সমুদ্রের উপর আরশ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যদি রহমতকে দৈহিক আকৃতি প্রদান করা হয় তবে তা পানির আকৃতি ধারণ করবে। যেমনিভাবে ক্রোধকে আকৃতি প্রদান করা হলে তা আগুনের আকৃতি ধারণ করবে।

কেউ যখন দয়াশীল হয়ে যায় এবং মহানুভবতা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তখন বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি একেবারে পানির মতো হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ দয়াশীলতা ও ভালবাসা প্রাধান্য লাভ করেছে। আবার কেউ যদি রুষ্ট আচরণ করে এবং ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে তখন বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছে। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, ক্রোধের সাথে আগুনের সামাঞ্জস্যতা রয়েছে এবং রহমত বা দয়াশীলতার সাথে পানির সম্পর্ক রয়েছে। যাই হোক, আরশকে আল্লাহ তায়ালা পানির উপর স্থাপন করেছেন। যদি আগুনের উপর স্থাপন করতেন তাহলে বোঝা যেত যে ক্রোধের আরশ স্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আরশকে পানির উপর স্থাপন করেছেন এবং পানি হলো রহমতের স্বরূপ দৃষ্টান্ত। সুতরাং আরশের নীচেও যেন রহমত এবং উপরেও রহমত। আরশ পানির উপর স্থাপিত হয়েছে এবং পানি হলো রহমতের স্বরূপ। সুতরাং আরশ স্থাপিত হয়েছে রহমতের উপর। আরশের উপর রহমান আল্লাহ সমাসীন হয়েছেন। অর্থাৎ রহমত গুণ বিস্তৃত হয়েছে। আরশের উপরে ফলক (লাওহে মাহফুজ) লিখে রেখেছেন যে, আমার রহমত ক্রোধের উপর অধিক প্রবল। সুতরাং প্রমাণপত্রও রহমতের। যেন আরশের উপরেও রহমত, নীচেও রহমত।

কেয়ামতে রহমতের প্রাধান্য

হাদিস শরীফে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় দয়া হতে বিশ্বজগতের জন্য একশত দয়া সৃষ্টি করেছেন। যা থেকে একটি দয়া তিনি এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। সেই একটি দয়ার প্রভাবেই মা-বাবা তাদের সন্তানদের প্রতি দয়াশীল হয়ে থাকে, জীবজন্তু নিজেদের বাচ্চাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, বন্ধু বন্ধুর প্রতি মায়াশীল হয়, প্রিয়জন প্রিয়জনদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়। এগুলো কেবল একটি মাত্র রহমতের প্রভাব। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালাও স্বীয় সৃষ্টির প্রতি দয়া ও মায়া প্রদর্শন করছেন, তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন, বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, সৃষ্টিজগতের জন্য অসংখ্য নেয়ামতরাজি মিলছে– এগুলোর সবকিছুই ঐ একটি রহমতেরই প্রভাব। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় আরশের নীচে লুকিয়ে রেখেছেন। কেয়ামতের দিন ঈমানদারদের উপর ঐ রহমতসমূহ করা হবে। অনুমান করুন কেয়ামতের দিন কী পরিমাণ রহমত থাকবে। যখন একটিমাত্র রহমতের প্রভাব এই– যা সমগ্র পৃথিবীতে প্রদর্শিত হচ্ছে, তখন ঐ নিরানব্বইটি রহমতের প্রভাব কেমন হবে যা কেয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে? হিলা-বাহানা অবলম্বন করে মাগফিরাত করা হবে। সামান্য সমান্য বাহানা খুঁজে খুঁজে মুক্তি দেওয়া হবে। গুনাহগারদের উপর দয়া প্রদর্শন করা হবে। ঐ নিরানব্বইটি রহমত সেখানে কার্যকর হবে। যা হোক, সার-সংক্ষেপ হলো এই যে, আরশের উপরেও রহমত, নীচেও রহমত। পানি হলো রহমতের বাহ্যিক দৃষ্টান্ত, আর আরশের নীচে নিরানব্বইটি রহমত লুকায়িত রয়েছে। সুতরাং আরশ যেন রহমত দ্বারা নিমজ্জিত। উপর হতে নিচ পর্যন্ত রহমত আর রহমত দ্বারা আবৃত। আর الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى. আল্লাহ তায়ালা রহমতের শান নিয়ে আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন।

সুতরাং সমগ্র সৃষ্টির উপর রহমত প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে।

শানে রহমতের প্রভাব

আল্লাহ তায়ালার শানে রহমতের নিদর্শন হলো শানে হেদায়াত। আল্লাহর রহমত বান্দার প্রতি আবিষ্ট হয়েছে বিধায় বান্দার হেদায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বান্দাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন যে, ন্যায় ও কল্যাণের পথে চলবে এবং অন্যায় হতে বেঁচে থাকবে, কল্যাণের দিকে আসবে এবং অকল্যাণ হতে নিজকে নিজে রক্ষা করবে। এ তাঁর ঐ শানে রহমতের প্রভাব। যদি বান্দার প্রতি রহমত

ও দয়া না থাকবে তবে কল্যাণের দিকে কেন পথ প্রদর্শন করবেন? যদি কারো সাথে শত্রুতার সম্পর্ক থাকে তবে শত্রুকে কে ভাল পথ দেখায়? মন চায় যে, সে আরো বেশি জাহান্নামের দিকে ধাবিত হোক, দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাক– সে তো শত্রুতেই পরিণত হয়েছে। বন্ধুকে পথ প্রদর্শন করা হয় যে সে কোনো অনিষ্টের মুখোমুখি না হয়। মা-বাবা স্বীয় সন্তানদের বন্ধু হয়ে থাকেন বলে পথ প্রদর্শন করেন– দেখ বাবা, এ কাজ করো, এটা করো না; এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, এটা হবে অকল্যাণের। এগুলো দয়া ও ভালবাসারই প্রভাব। শিক্ষক যখন ছাত্রদেরকে পড়ান তখন তা ভালবাসারই নিদর্শন হয়ে থাকে। শিক্ষকের যদি ছাত্রদের সাথে দুশমনি থাকে তবে কেন সে তাদের জন্য মেহনত করবে? না কিতাব পড়াবে, না পথ প্রদর্শন করবে আর না মাসয়ালাহ বর্ণনা করবে। সুতরাং প্রথ প্রদর্শন করণ ভালবাসা ও দয়ারই নিদর্শন। রহমত বা দয়ার সবচেয়ে বড় প্রকাশ হলো হেদায়াত। অর্থাৎ সরল ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করা হোক।

সর্বোত্তম দোয়া

শানে হেদায়াতের পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা নবী আ.গণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা হলেন মাধ্যমরূপে প্রকাশমান আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত। আম্বিয়া আ.গণের হেদায়াত করণ হলো আল্লাহ কর্তৃক হেদায়াত করণ। এ হলো তাঁর রহমতের প্রকাশ। সুতরাং হেদায়াত হলো সবচেয়ে বড় বিষয়।

সূরায়ে ফাতিহা, যাকে 'কুরআনুন আজিমুন' বা মহান কুরআন বলা হয়েছে এবং নামাজের প্রত্যেক রাকাতে তা তিলাওয়াত করা হয়। এ সূরার سُوْرَةُ الْمَسْئَلَةِ নামও রয়েছে। অর্থাৎ প্রার্থনা করার সূরা। এ সূরায় কী প্রার্থনা করা হয়েছে?

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

আমাদেরকে সরলপথ প্রদর্শন করুন।

এটাই হলো সবচেয়ে বড় দোয়া যা সূরায়ে ফাতেহার মাধ্যমে প্রার্থনা করানো হয়েছে।

সূরায়ে ফাতেহার প্রথম দিকে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির কথা আলোচিত হয়েছে যে, তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, তিনি রহমান ও রহীম, প্রতিফল দিবসের মালিক, তিনি হলেন এমন মাবুদ যার ইবাদত করা হয়। আর সূরায়ে ফাতেহার

শেষের দিকে বান্দার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, বান্দার কাজ হলো মাবুদের সামনে নত হওয়া, ভিক্ষা প্রার্থনা করা। (আর মধ্যখানে) প্রার্থনার দোয়া এই বর্ণিত হয়েছে যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (আমাদেরকে সরলপথ প্রদর্শন করুন)। বান্দাকে যেন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে যেন এই দোয়া করা হয়। যখন সূরায়ে ফাতেহা পড়বে তখন এ দোয়া চলে আসবে। ফরজ নামাজ শেষে যখন সুন্নাত নামাজ পড়বে তখনও ফাতেহার মাধ্যমে এ প্রার্থনা জানাবে। নফল পড়ুক বা তাহাজ্জুদ পড়ুক– এ প্রার্থনাই করবে। মোটকথা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল– যত নামাজ রয়েছে এ দোয়া সকল নামাজে আবশ্যক হবে। বোঝা যাচ্ছে, এ দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো দোয়, হেদায়াত প্রার্থনা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কোনো একটি বিষয়।

বাহ্যিকভাবে একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, যেই সূরায়ে ফাতেহাকে প্রার্থনার সূরা বলা হয়েছে, তাতে যদি এরেকটু উন্নত কোনো দোয়া প্রার্থনা করানো হতো, যথা– হে আল্লাহ! আমাদেরকে জান্নাত দান করুন, হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি আপনি রাজি হয়ে যান, আপনার সন্তুষ্টি আমাদেরকে দান করুন, আমাদেরকে আপনার আরশের ছায়ায় স্থান দিন (তাহলে কতই না ভাল হতো!)। এসব বড় বড় প্রার্থনা তো করা হয়নি। এই দোয়া করানো হয়েছে যে আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন। এটা তো অতি সাধারণ একটি দোয়া। কিন্তু যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, এ দোয়াই হলো সকল দোয়ার মৌলিক বুনিয়াদ। কারণ এর অর্থ হলো এই যে, সরলপথ প্রদর্শন করুন। সুতরাং যখন সরলপথ মিলে যাবে এবং মানুষ সে পথে চলতে থাকবে তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি আপনিতেই এসে যাবে। পথহারাদের সন্তুষ্টি অর্জন হয় না। সরলপথে পরিচালিত হলে এমনিতেই জান্নাত অর্জিত হবে, বেপথে চললে জান্নাত মিলবে না। সরলপথে পরিচালিত হলে আরশের ছায়ায়ও আপনা আপনি আশ্রয় জুটে যাবে, কোনো ব্যক্তি পথহারা হয়ে গেলে আরশের ছায়া তার জুটবে না। সুতরাং যত বড় দোয়া হওয়া সম্ভব ছিল এবং যত মহান উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব ছিল তার সবকিছুই ঐ দোয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে যায়। মূল হলো হেদায়াত। এই হেদায়াত যখন অর্জিত হবে তখন সন্তুষ্টিও মিলে যাবে, জান্নাতও মিলে যাবে, আরশের ছায়াও মিলে যাবে এবং আম্বিয়া আ.-এর হৃদ্যতাও মিলে যাবে। মোটকথা সকল নিয়ামত হস্তগত হয়ে যাবে। আল্লাহ না করুন; আর যদি কারো হেদায়াতই না জোটে তাহলে না জান্নাত, না আরশ– কোনোটাই জুটবে না। মানুষ যদি গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে কোথাও হতে কোনো নিয়ামত প্রাপ্তি হতে পারে না। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, সবচেয়ে বড় নিয়ামত

হলো হেদায়াত। একারণেই সূরা ফাতিহার মধ্যে প্রার্থনা করানো হয়েছে যে, হেদায়াতের দোয়া প্রার্থনা কর। এ মর্মে যে, আমাদেরকে সরলপথ প্রদর্শন করুন। অন্তরের গতি যদি শুদ্ধ হয়ে যায়, অন্তরের পথ যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল নিয়ামত অর্জিত হবে।

দোয়ার নির্যাস

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّه وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّه، اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ.

মানবদেহে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে। যখন তা ঠিক থাকে তখন পূর্ণ মানুষটি ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন পূর্ণ মানুষটিই নষ্ট হয়ে যায়। আর সে মাংসপিণ্ডটি হলো কলব।

যদি কলব বা আত্মা শুদ্ধ থাকে তবে মানুষটি শুদ্ধ থাকে, আর যদি কলব নষ্ট হয়ে যায় তবে মানুষটি নষ্ট হয়ে যায়। আত্মা কখন শুদ্ধ হয়? যখন অন্তরের গতি সঠিক হয়, অন্তরের পথ সঠিক হয়, অন্তরে হেদায়াত বিদ্যমান থাকে এবং অন্তরে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা না থাকে তখন আত্মা শুদ্ধ হয়। সুতরাং পূর্ণ মানুষটির শুদ্ধতা অন্তরের শুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল বলে সাব্যস্ত হল। এতে বোঝা গেল যে, হেদায়াত অত্যন্ত মহান এক নিয়ামত। এজন্যই এখানে প্রার্থনা করানো হয়েছে:

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○

আমাদেরকে সরলপথ প্রদর্শন করুন।

আর সে সরলপথ কোনটি?

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○

সেই ব্যক্তিবর্গের পথ, যাঁদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন।

আর নিয়ামত প্রাপ্ত সেই ব্যক্তিবর্গ কারা? তাঁরা হলেন আম্বিয়া আ., সিদ্দিকীন, শুহাদা এবং সালিহীন। সুতরাং এঁদের পথই হলো উদ্দিষ্ট পথ।

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ○

তাদের পথ নয়, যাদের উপর আপনার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট। তাঁদের পথ আমরা প্রার্থনা করি যাঁদেরকে আপনি নিয়ামত দান করেছেন। তাঁরা আপনার রহমতের ছায়ায় রয়েছে।

সুতরাং সূরা ফাতিহার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে দোয়া প্রার্থনা করানো হয়েছে তা হলো হেদায়াতের দোয়া। এর দ্বারা বোঝা গেল, হেদায়াত হলো এমনই এক মহান নিয়ামত যে, সকল নিয়ামত তার অনুগামী। আর পথভ্রষ্টতা হলো সবচেয়ে বড় গোমরাহী, সর্বপ্রকার মসিবত তার অনুগামী।

এজন্যই সূরা ফাতিহা যা কুরআনুল কারিমের সারসংক্ষেপ তার মধ্যে হেদায়াতের দোয়া রাখা হয়েছে, যা এ সূরার সারসংক্ষেপ। সুতরাং সমস্ত কুরআনের সারসংক্ষেপ সাব্যস্ত হলো হেদায়াত।

সর্ব-প্রধান নিয়ামত

পবিত্র কুরআনুল কারিমের নির্যাস হলো হেদায়াত। এ কারণেই সূরা বাকারা দ্বারা যখন কুরআনের সূচনা করা হলো এবং বলা হলো ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ 'এ হলো সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই।' অতঃপর এ কুরআনের শান সম্পর্কে বর্ণিত হলো– هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ 'এ কিতাব মুত্তাকিনদের জন্য হেদায়াত (পথ প্রদর্শনকারী)।' সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো কিতাবুল্লাহ। কিতাবুল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত– যা তার বুনিয়াদ, তা হলো হেদায়াত। সূরা ফাতিহর মধ্যে এ হেদায়াতই প্রার্থনা করা হয়েছে।

যাই হোক, আল্লাহ তায়ালার রহমত আরশময় বিস্তৃত রয়েছে। আর রহমতের সবচেয়ে বড় নিদর্শন এই যে, বান্দার জন্য হেদায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সে হেদায়াত নিয়ে আগমন করেছেন। তাঁরা প্রেরিত হওয়াও স্বতন্ত্র একটি নিয়ামত। এর চেয়ে বড় কোনো নিয়ামত বিশ্বজগতে নেই। এ জন্য যে, পৃথিবীতে তাঁদের আগমন না ঘটলে মানুষের পক্ষে 'মানুষ' হওয়া সম্ভব হতো না। আম্বিয়া আ.গণই মানুষকে 'মানুষ' করেছেন। অন্যথায় মানুষ তো হিংস্র পশু ছাড়া কিছু নয়; যারা পরস্পরকে ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খাওয়ার জন্য ছুটোছুটি করে। একে অপরের জন্য দুঃখ-যাতনার কারণ হয়ে থাকে। কোনো জানোয়ারও অপর কোনো জানোয়ারের সাথে সেইসব জঘন্য আচরণ করে না যা মানুষ মানুষের সাথে করে থাকে। সুতরাং মানুষের যদি মনুষ্যত্ব না থাকে তাহলে সে-ই

সবচেয়ে বড় হিংস্র প্রাণী, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু। এই মানুষকে জানোয়ারের সীমা থেকে বের করে এনে মানুষের কাতারভুক্ত যাঁরা করেছেন তাঁরা হলেন আম্বিয় আ.। তাঁদের তালিমের প্রভাবেই মানুষ 'মানুষ' হয়ে ওঠে। কোথাও যখন তাদের তালিমের বিলুপ্তি ঘটে তখন সেখানকার মানুষ জীব-জানোয়ারের অনুরূপ হয়ে যায়। যেখানে তালিমের আগমন ঘটে সেখানে মনুষ্যত্বের আবির্ভাব হয়। যাই হোক, মানুষের মানুষ হওয়া হেদায়াতের উপর নির্ভরশীল, আর হেদায়াত আম্বিয়া আ.গণের আগমনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং নবী আ.গণের আগমন এক মহান নিয়ামত, আর সকল নবী আ.-এর মধ্যে জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন সবচেয়ে বড় নিয়ামত। এ মর্মে যে, তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন, শ্রেষ্ঠতম নবী এবং শ্রেষ্ঠতম মানুষ।

নবীগণের নবী [সা.]

এমন কি অন্যান্য আম্বিয়া আ.-এর নবুওয়াতের ফায়েজও প্রকৃতপক্ষে নবুওয়াতে মুহাম্মাদী থেকে আহরিত। হাদিস শরীফে জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

اَنَا نَبِيُّ الْاَنْبِيَاءِ.

আমি হলাম নবীগণের নবী।

অন্যান্যা আম্বিয়া আ. ছিলেন তাদের উম্মতগণের নবী। এ কারণেই আম্বিয়া আ.-এর উপর আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান গ্রহণ করেন। তাঁদের থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে:

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ.

স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ তায়ালা পয়গম্বরগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, 'আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোনো রাসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে

সত্য বলে দেবার জন্য, তখন সে রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে।' [আলে ইমরান ৩ : ৮১]

তোমাদের কেউ যদি তাঁর যুগের সন্ধান পাও তবে নিজে তাঁর সাহায্য করবে, অন্যথায় নিজ কওমকে হেদায়াত করে যেও যে, তারা যেন খাতামুন নাবিয়্যিনের সাহায্য করে। সে নবীর শান কেমন হবে?

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ

সেই মাহান রাসূল তোমাদেরকে প্রদত্ত ইলমের সত্যায়নকারী হবেন। [মায়েদাহ ৫ : ৪৬]

পরিপূর্ণ হেদায়াতের আধার

কোনো কিছু সত্যায়ন করা এ কথা প্রমাণ করে যে, যে বিষয়টি তিনি সত্যায়ন করছেন তা তার নিজের ভেতরে বিদ্যমান রয়েছে। কোনো ইলমের সত্যায়ন যিনি করবেন তার ভেতরে সে ইলম থাকা আবশ্যক। মূর্খ ব্যক্তি সত্যায়ন করতে পারে না, জ্ঞানী ব্যক্তি সত্যায়ন করবে। সুতরাং সকল আম্বিয়া আ.কে সত্যায়ন করার অর্থ এই যে, যে ইলম সকল আম্বিয়া আ.কে দান করা হয়েছিল সে ইলম ঐ মহান রাসূলের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই তিনি সকল আম্বিয়া আ.-এর ইলমের ধারক বলেই তাঁদেরকে তিনি সত্যায়ন করবেন। 'তিনি যা প্রাপ্ত হয়েছেন, আমি তাকে হক ও সত্য বলে স্বীকৃতি দিচ্ছি'– এ কথা কেবল তিনিই বলতে পারেন যার কাছে হক বিদ্যমান রয়েছে, ঐ ইলম বিদ্যমান রয়েছে। যাই হোক, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাতামুন নাবিয়্যিন ও সকল ইলমের ধারক করা হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীতে নবীগণের আগমন যদি রহমত হয়ে থাকে তাহলে খাতামুন নাবিয়্যিন-এর আগমন সর্বোচ্চ রহমত; যিনি সর্বোত্তম পূর্ণাঙ্গ নিয়ামত নিয়ে আগমন করেছেন। অন্যান্য আম্বিয়া আ. যদি ভিন্ন ভিন্ন ধারার হেদায়াত নিয়ে আগমন করে থাকেন তবে জনাব রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মিলিত সকল হেদায়াত নিয়ে আগমন করেছেন। খাতামুন নাবিয়্যিনের অর্থ এই যে, তিনি পরিপূর্ণ হেদায়াতের আধার, পরিপূর্ণ ইলমের আধার এবং পরিপূর্ণ কামালাতের আধার। সুতরাং এক একটি কামালাতের আগমন যদি নিয়ামত ও রহমত হয়ে থাকে তবে পূর্ণাঙ্গ কামালাতের আগমন সবচেয়ে বড় রহমত। তাই জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন একটি নিয়ামত এবং মহান নিয়ামত।

সর্বোত্তম শান

উপরোক্ত কারণে জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শান বা মর্যাদা রয়েছে তা সকল শান হতে উত্তম। যেহেতু তিনি নবুওয়াতের পরিসমাপ্তিকারী সেহেতু তিনি শানেরও পরিসমাপ্তিকারী। সকল শান, সকল মর্যাদা তাঁর মাধ্যমে পরিসমাপ্তিতে পৌঁছেছে। সুতরাং তাঁর শান সর্বোত্তম পূর্ণাঙ্গ হওয়াই আবশ্যক।

আম্বিয়া আ. আল্লাহ তায়ালার কামালাতের প্রকাশরূপে আগমন করেছেন। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পূর্ণাঙ্গ কামালাতের আধার। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালার কামালাতের পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁর মাধ্যমে ঘটেছে। সুতরাং মহান আল্লাহ তায়ালার শান যে শক্তি ও পূর্ণতার সাথে তাঁর মধ্যে আগমন করেছে, অন্যদের মধ্যে সেভাবে আসে নি।

শানে নবুওয়াতের মধ্যে রহমতের প্রাধান্য

কিছুক্ষণ পূর্ব আপনারা শুনেছেন, আল্লাহ তায়ালার শান হলো এই যে, তাঁর সকল সিফাত বা গুণাবলি দুইভাগে বিভক্ত। সিফাতে জামাল ও সিফাতে জালাল। সিফাতে জামালের উৎস হলো রহমত, আর সিফাতে জালালের উৎস হলো গজব। আর আল্লাহর রহমত তাঁর গজবের উপর অধিক প্রবল। সুতরাং যিনি আল্লাহ তায়ালার কামালাতের পরিপূর্ণ প্রকাশক তাঁর মধ্যে রহমতই প্রবল হওয়া আবশ্যক। এ কারণেই জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে বলা হয়েছেঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ.

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। [আম্বিয়া ২১ : ১০৭]

আল্লাহর ক্ষেত্রে যেমনিভাবে রহমতের শান প্রবল তেমনিভাবে খাতামুন নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে সকল শানই বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু সবকিছুর উর্ধ্বে যে শানটি অধিক প্রবল তা হলো শানে রহমত। তাঁকে রহমতের মূর্তপ্রতীকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বলেনঃ

انا رحمة مهداة

আমি হলাম আল্লাহর এমন এক রহমত যা মাখলুককে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে।

অর্থাৎ আমি মাখলুককে প্রদত্ত আল্লাহর একটি উপহার। বনি আদমের জন্য আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত একটি তোহফা। সেই তোহফা হলাম আমি। আর আমি কে? رحمة مهداة অর্থাৎ এক সশরীরি রহমত, যা হাদিয়া স্বরূপ দান করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাখলুকের জন্য এক মহান উপহার প্রেরণ করেছেন। সে হাদিয়া হলো রহমত।

যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, আমার শানসমূহের মধ্যে রহমতের শান অধিক প্রবল; এই একই বিষয় জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যেও বিদ্যমান। তাঁর মধ্যে শানে রহমতের প্রাধান্য রয়েছে, শানে গজবের প্রাধান্য নয়। যেহেতু তিনি আল্লাহর গুণাবলির নমুনা প্রদর্শনকারী, সেহেতু তাঁর মধ্যে গজবের শানও বিদ্যমান রয়েছে। তার এ গজবের প্রভাব এই যে, তাঁর শরীয়তের মধ্যে হদ, কিসাস, কাফফারা, শাস্তি, জিহাদ প্রভৃতির বিধান রয়েছে। এগুলো তাঁর 'শানে গজব'-এর প্রকাশ। কিন্তু এসবের মধ্যেও কোনো কিছুর প্রাধান্য থেকে থাকলে তা শানে রহমতেরই প্রাধান্য। গজবও যদি হয় তবে তা রহমতের মাধ্যমেই হয়।

পিতা যদি সন্তানকে প্রহারও করে তবে তা শত্রুতামূলক মানসিকতা নিয়ে করে না, ভালবাসার মানসিকতা নিয়ে করে। ভালবাসার কারণেই সন্তানকে শাসন করে, যেন তার কল্যাণ হয়। আল্লাহ তায়ালাও যদি কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি গজব (ক্রোধ) বর্ষণ করেন তাতেও রহমতের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। সুতরাং জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যদি কারো উপর গজব বা ক্রোধ প্রদর্শন করেছেন তবে তারও উদ্দেশ্য রহমতই ছিল। হেদায়াত ও সতর্ককরণই তার উদ্দেশ্য হতো। দেখা যাচ্ছে গজবের ক্ষেত্রেও প্রকৃত উদ্দেশ্য রহমত। সুতরাং রহমতই প্রাধান্য পেল। কখনো কখনো কোনো মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি রহমতের প্রকাশ, কখনো গজবের আশ্রয়ে রহমতের প্রকাশ। গজবের মধ্যেও শত রহমত লুকায়িত রয়েছে। শত্রু যদি ক্রোধান্বিত হয় তবেই সেটা ক্রোধ কিন্তু পিতা যদি ক্রোধান্বিত হয় তবে তার মধ্যে রহমত ও ভালবাসা লুকায়িত থাকে, শত্রুতা থাকে না। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সৃষ্টিজগৎ ও মাখলুকের প্রতি পিতামাতা অপেক্ষা অধিকতর দয়ার্দ্র। সুতরাং তাঁর ক্রোধের মধ্যেও হাজারো রহতম লুকায়িত রয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্বীয় উম্মতের প্রতি পিতামাতা অপেক্ষা অধিক দয়াশীল। কাজেই তিনি যদি

ক্রুদ্ধও হন তাহলেও তার উদ্দেশ্য রহমত ও ভালবাসাই হবে। সুতরাং তিনি শানে রহমত ও রহমতের মূর্তপ্রতীক হয়ে আগমন করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শানে রহমত

উপরোক্ত কারণেই জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত শরীয়তের মধ্যে রহমতের প্রাধান্য রয়েছে। এক একটি হুকুম এক একটি রহমতের ভাণ্ডার। প্রত্যেকটি হুকুম থেকে মনে হয় যেন দয়া ও ভালবাসা ঝরে পড়ছে। বান্দাদেরকে হেদায়াত দিচ্ছেন তাতেও রহমতের শান প্রাধান্য পাচ্ছে।

তিনি নিজে রহমতের মূর্তপ্রতীক ছিলেন বলে সাহাবায়ে কেরামদেরকেও শানে রহমত দ্বারা তারবিয়াত করেছেন। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামদের শান এই বর্ণিত হয়েছে যেঃ

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। [ফাতাহ ৪৮ : ২৯]

তাদের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে রহমত ও দয়া। তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে রহমত ও অনুগ্রহ। কাফেরদের প্রতি তারা কঠোর হলেও তা তাদের সত্তার প্রতি নয়; এ কঠোরতা তাদের কুফরের প্রতি। এখানেও দয়া লুকায়িত ছিল। তারা কামনা করত যে, যে কোনোভাবে হোক তারা যেন ঈমান কবুল করে নেয়, যে কোনোভাবে তারা যেন হেদায়াতের ছায়াতলে এসে যায়।

উম্মতের দয়াশীলতা

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে কামেল ও উত্তম সাহাবী হলেন সিদ্দিকে আকবার হযরত আবু বকর রা.। এ জন্যই হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবীগণের পর সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন সিদ্দিকে আকবার রা.। আর হাদিসে সিদ্দিকে আকবার রা.-এর শান বর্ণিত হয়েছেঃ

اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْبَكْر.

আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক দয়াশীল হলেন আবু বকর (রা.)।

সিদ্দিকে আকবার রা.-এর মধ্যে রহমত বা দয়ার্দ্রতার প্রাধান্য ছিল। হাদিস শরীফে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, সিদ্দিকে আকবার রা. যখন স্বীয় ঘর থেকে মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতেন অর্থাৎ খেলাফতের কেন্দ্রস্থলের দিকে যেতেন তখন লোকজন এমনভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো যে, ছোট ছোট অসংখ্য শিশুরা তাঁর পিছু নিত। কেউ বাবা বলে কেউ চাচা বলে তাঁর কাছে ছুটে আসত। সিদ্দিকে আকবার রা.ও এমন দয়ার্দ্র ছিলেন যে, দেখা যেত কাউকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন, কাউকে কোলে তুলে আছেন, কারো মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। অসংখ্য শিশু পেছনে পেছনে যাচ্ছে আর খেলাফতের দরবারের দিকে আমিরুল মুমিনীন এগিয়ে যাচ্ছেন। এমনই প্রবল দয়ার্দ্র ছিলেন তিনি। এ ছিল রহমতেরই প্রাধান্য।

ফারুকে আজম রা. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে নববীর উদ্দেশ্য এগিয়ে যেতেন তখন নিজ নিজ বাড়ির সামনের বৈঠকখানায় বসে থাকা ব্যক্তিবর্গ ভিতির কারণে আসন ছেড়ে উঠে বাড়ির ভেতরে চলে যেত। আর সিদ্দিকে আকবার রা. যখন পথধরে যেতেন তখন বড় ছোট সবাই তাঁর সঙ্গী হতেন। শিশুদের কাউকে কোলে, কাউকে কাধে উঠিয়ে নিয়েছেন। কারো মাথায় তাঁর হাত, কারো আঙ্গুল ধরে আছেন আর আমিরুল মুমিনীন খেলাফতের দরবারে যাচ্ছেন।

اَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْبَكْرٍ.

আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক দয়াশীল হলেন আবু বকর (রা.)।

সবচেয়ে দয়াশীল কলব ও সর্বাধিক ভালবাসার অধিকারী সিদ্দিকে আকবার রা.কে বলা হয়েছে। যাই হোক, মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট শানে রহমত অধিক প্রবল। তাঁর প্রধান প্রতিনিধি ও উজিরে আজম হলেন জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে বলা হয়েছে রহমতের মূর্তপ্রতীক। আর জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তারবিয়াত প্রাপ্তদের মধ্যে যিনি অধিক কামিল তাঁকে اَرْحَمُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বাধিক দয়ার্দ্র। সুতারাং উপর থেকে নিয়ে নিচ পর্যন্ত রহমত বিস্তৃত রয়েছে। রহমতের একটি ধারাবাহিক সিলসিলা নাযিল হয়েছে। যা প্রথমে নবী আ.গণের উপর এসেছে। সর্বোচ্চ পরিপূর্ণরূপে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর। এই ধারাবাহিকতায় সাহাবায়ে কেরামের উপর এসেছে। বলা হয়েছেঃ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ তারা পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র। (এঁদের জন্য প্রযোজ্য পর্যায়ের রহমত হতে) সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতার সাথে এসেছে সিদ্দিকে আকবার রা.-এর উপর।

মোটকথা রহমত প্রবল রয়েছে এবং রহমতের নির্যাস মূলত হেদায়াত। সুতরাং সকল সাহাবা রা.ই পথ প্রদর্শক।

শ্রেণীগতভাবে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

উপরোক্ত কারণেই হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ، بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ.

> আমার সাহাবীগণ নক্ষত্র সমতুল্য। এঁদের মধ্য হতে যার আলোতে পথ চলবে হেদায়াত পেয়ে যাবে। প্রত্যেকেই পথ প্রাপ্ত ও পথ প্রদর্শক।

সাহাবায়ে কেরামের শান এমন যে, শ্রেণীগতভাবে কুরআন ও হাদিস যদি কোনো শ্রেণীকে মর্যাদাশীল ও পবিত্র সাব্যস্ত করে থাকে তবে তা একমাত্র সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর শ্রেণী। অন্যদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের প্রশংসা করা হয়েছে কিন্তু একেবারে শ্রেণীবদ্ধভাবে পবিত্র সাব্যস্ত করা কেবল সাহাবাদের বেলাতেই হয়েছে।

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ لا رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

> আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। [তাওবাহ ৯ : ১০০]

ঈমান গ্রহণের দিক দিয়ে যারা অগ্রগামী হয়েছেন– মুহাজির হোক বা আনসার; এবং পরবর্তীতে যারা তাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, সম্মিলিতভাবে তাদের সকলের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। সুতারাং আল্লাহ তায়ালা শ্রেণীগতভাবে পুরো সাহাবায়ে কেরামের জামাতের প্রতি সন্তুষ্ট। কোনো ব্যক্তির বিশেষের নাম উল্লেখ করেননি যে, সিদ্দিকে আকবারের প্রতি রাজি কিংবা ফারুকে আযমের প্রতি রাজি।

مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ

প্রথম দিকের মুহাযির হোক, প্রথম যুগের আনসার হোক কিংবা পরবর্তীতে যারা তাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে– সবার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। শ্রেণী বিচারে কোনো শ্রেণীর মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে তবে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন না। সন্তুষ্টির ঘোষণা প্রমাণ করে যে, এ স্তর বা শ্রেণীর মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই, অত্যন্ত পবিত্র এক শ্রেণী।

স্থায়ী সন্তুষ্টির ঘোষণা

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির যে ঘোষণা দিয়েছেন তা সাময়িক কোনো বিষয় নয়। এ সন্তুষ্টির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনে। আর কুরআন কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর নির্যাস হলো এই যে, মধ্যবর্তীতে এমন কোনো সময় অতিবাহিত হবে না যাতে আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। শুরুতে যে সন্তুষ্টি ছিল, মধ্যবর্তীতেও তাই রয়েছে, শেষেও তা থাকবে। এ সন্তুষ্টি কেয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে এবং কেয়ামতের পরেও থাকবে। কেয়ামতের পরেও এভাবেই কুরআন বিদ্যমান থাকবে।

হাদিসে রয়েছে, জান্নাতে হাফেজদেরকে বলা হবে, رَتِّلْ وَارْتَقِ 'কুরআন পড়তে থাক এবং তোমার সাধ্যানুযায়ী উন্নতি করতে থাক।' সুতরাং সেখানেও তিলাওয়াত উন্নতির মাধ্যম হবে। কেয়ামত পর্যন্ত কুরআন শেষ হয়ে যাবে না, কেয়ামতের পরেও কুরআনেরই রাজত্বকাল। জান্নাতেও কুরআন উন্নতির মাধ্যম হবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট)-এর ঘোষণা বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং উদ্দেশ্য দাঁড়াচ্ছে এই যে, বর্তমান সময়ে (কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে) যখন সাহাবায়ে কেরাম রা. উপস্থিত রয়েছেন– এখনও আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি, তাদের মৃত্যুর পরেও আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকব, কেয়ামতেও আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকব, এর পর জান্নাতেও আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকব। অর্থাৎ স্থায়ীভাবে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং শ্রেণীবদ্ধভাবে যাদের ব্যাপারে ঘোষণা করা হয় যে, সাধারণভাবে আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও সাধারণভাবে আমার প্রতি সন্তুষ্ট, তবে নিঃসন্দেহে তারা শ্রেণীবদ্ধরূপে অত্যন্ত পবিত্র। এমন নয় যে দু'একজন ব্যক্তি

সম্মানিত, বাকিদের মধ্যে (নাউজুবিল্লাহ) কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। পূর্ণ স্তরই পবিত্র।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার উল্লেখ

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের শান বর্ণিত হয়েছে। হাদিস শরীফে এসেছে, তাওরাতে বর্ণিত সাহাবায়ে কেরামের শান ও গুণাবলি দেখে হযরত মুসা আ. আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে বললেন, হে পরোয়ারদেগার! এই উম্মত আমাকে দান করুন। তাঁকে বলা হলো, এঁরা হলেন উম্মতে মুহাম্মাদী। তখন মুসা আ. আরজ করলেন, তাহলে এই উম্মতের মধ্যেই আমাকে অন্তর্ভূক্ত করে নিন।

দেখা যাচ্ছে, এমনই শান বর্ণিত হয়েছে যে, আম্বিয়া আ. আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন যেন তাদেরকে সে উম্মতের অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া হয়। যাই হোক, এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত স্তর হলো সাহাবায়ে কেরামের স্তর। বুঝা গেল, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও এই শ্রেণীকে পবিত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং কুরআনেও সাক্ষ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং অনাদি কাল হতে তাদের পবিত্রতা বর্ণিত হয়ে আসছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত উম্মতের এ স্তরটি পবিত্র ও সম্মানিত। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে হয়তো ব্যক্তি বিশেষের নাম নিয়ে তাকে সম্মানিত সাব্যস্ত করা হয়েছে কিংবা নাম উল্লেখহীনভাবে করা হয়েছে, পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরামের বেলায় পুরো জামাতকে পবিত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে।

শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের পবিত্রতা ঘোষণা

সম্মিলিতভাবে সাহাবাকে কেরামের জামাতকে যেমন পবিত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে, তেমনিভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেও পৃথক পৃথকভাবে কুরআনুল কারিমে তাদের প্রতি সন্তুষ্টি ঘোষণা করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছেঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

আল্লাহ তায়ালা ঐ মুমিনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যাদেরকে আপনি গাছের নীচে বসে বাইয়াত করিয়েছে। [ফাতাহ : ১৮]

এ আয়াতে হুদায়বিয়া প্রান্তরে বসে 'বাইয়াতে রিদওয়ান'-এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির ঘোষণা করেছেন। এ জামাতে দেড় হাজারের মতো সাহাবী ছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের একটি শ্রেণীকে পৃথক করে তাদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা করা হয়েছে। সম্মিলিতভাবেও তাদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা করা হয়েছে আবার পৃথক পৃথকভাবে তাদের এক একটি শ্রেণীর প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা করা হয়েছে। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা, উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা, অতঃপর পুরো জামাতের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা। সাহাবায়ে কেরামের পুরো জামাতের প্রতি কুরআনুল কারিম পবিত্রতার সাক্ষ দিচ্ছে। এটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষ, যা সর্বোচ্চ পর্যায়ের অটল ও মজবুত সাক্ষ। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণ জামাতকে পবিত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সাহাবীগণের মর্যাদার পবিত্রতা ঘোষণা

অতঃপর তাদের আমলসমূহের পৃথকভাবে পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের আখলাকের পৃথকভাবে পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে। আবার তাদের মর্যাদার পৃথকভাবে পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে। এক স্থানে বলা হয়েছে:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ.

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথীগণের শান এই যে, তারা কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর এবং ঈমান ও মুমিনদের ব্যাপারে দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল। [ফাতাহ ৪৮ : ২৯]

এখানে তাদের উচ্চমর্যাদার কথা প্রকাশ করা হচ্ছে যে, তাদের আত্মিক উচ্চমর্যদার দুটি স্তর হলো এই যে, ঈমানের ব্যাপারে তারা অতি অটল ও দৃঢ় এবং কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। কুফরের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র অংশের মুখোমুখি হলেও তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। কুফরের প্রতিটি বিষয়কে তারা প্রত্যাখ্যান করবে। কুফরের প্রতি তাদের সন্তুষ্টির ঘোষণা থাকতে পারে না।

এ ছিল তাদের আত্মিক উচ্চমর্যাদার প্রকাশ।

সাহাবায়ে কেরামের আমলের পবিত্রতা ঘোষণা

পূর্বোক্ত আয়াতে প্রথমে ছিল তাদের আত্মিক অবস্থার বর্ণনা। অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমল কেমন ছিল? আয়াতের পরবর্তী অংশে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا.

আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। যখনই দেখবেন, তখনই দেখতে পাবেন তারা ইবাদত ও আনুগত্যে নিয়োজিত রয়েছে। [ফাতাহ ৪৮ : ২৯]

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ.

তাদের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। [ফাতাহ ৪৮ : ২৯]

কোনো পাত্র পূর্ণ হয়ে গেলে তা উছলে পড়ে। পাত্র পূর্ণ হয়ে ঐ বস্তু বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে। সাহাবীদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, তাদের অন্তর ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ। সে ঈমানের ঝলক তাদের মুখমণ্ডলে দৃশ্যমান হয়েছে। তাদের ললাটে ভাস্বর হয়েছিল সেজদার চিহ্ন*। তাদেরকে দেখে যে কেউ বুঝতে পারত যে, তাদের ললাট সর্বদা আল্লাহর সম্মুখে অবনত থাকে। সর্বদা এরা আল্লাহর সামনে কপাল ঝুকায়। এভাবেই তাদের আমলের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ.

তাওরাত ও ইঞ্জিলে তাদের শান বর্ণিত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, প্রথম হতেই আম্বিয়া আ. তাদের প্রশংসা করে আসছেন। সুতরাং আম্বিয়া আ. তাদেরকে পৃথকভাবে প্রশংসা করেছেন, খাতামুন্নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পৃথক প্রশংসা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা পৃথকভাবে

---

* এখানে 'সেজদার চিহ্ন' বলতে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব এবং বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক ইবাদতকারীর মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করা হয়। কপালে সেজদার কালো দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাজের ফলে উপরোক্ত চিহ্ন খুব বেশি ফুটে ওঠে। ইবনে মাজাহ শরীফের এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি রাতে বেশি নামাজ পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর ও আলোকোজ্জ্বল হয়। –তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন সূত্রে অনুবাদক।

কুরআনে তাদের প্রশংসা করেছেন এবং স্থায়ী সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন যে, এ স্তরটি নিঃসন্দেহে ত্রুটিমুক্ত, নিয়তের ত্রুটি হতে পবিত্র।

চিন্তাজনিত ত্রুটি

সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর ইজতেহাদজনিত কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি বা ভুলভ্রান্তি হলেও হতে পারে। ইজতেহাদজনিত ভুলত্রুটি তো আম্বিয়া আ. দ্বারাও হওয়া সম্ভব। এগুলো হলো চিন্তাধারাজনিত ত্রুটি, এগুলোকে গুনাহ বলা হয় না। পার্থক্য এতটুকু যে, নবীগণ থেকে যদি ইজতেহাদজনিত ত্রুটি প্রকাশ পায় তবে আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে তা শুধরে দেন। নবীগণভিন্ন অন্য কারো থেকে যদি ইজতেহাদজনিত ত্রুটি প্রকাশ পায় তবে সে এ ত্রুটিতে অটলও থাকতে পারে, সঠিক পথ প্রাপ্তি তার জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু এ ত্রুটির জন্যও তাকে প্রতিদান দেওয়া হয়। কারণ এ ত্রুটি হলো চিন্তাভাবনাজনিত ত্রুটি, নিয়ত ও ইচ্ছাপ্রসূত ত্রুটি নয়। আমলের পদ্ধতিগত ত্রুটি মাত্র।

যাই হোক, আম্বিয়া আ.-এর নিয়ত পাক-পবিত্র হয়ে থাকে। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারেও বলা হয়েছে যে, তাদের আমলও পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাও পবিত্র, তাতে কোনো প্রকারের ত্রুটি নেই। তাদের নিয়তও পবিত্র, ইচ্ছাও পবিত্র। চিন্তাভাবনাজনিত বা ইজতেহাদজনিত কোনো ত্রুটি যদি প্রকাশও পায় তবে তা কোনো অপরাধ নয়, কোনো গুনাহ নয়। এর দ্বারা বেশির বেশি মাখলুকিয়াত প্রমাণিত হয়। আল্লাহর ইলম-ই কেবল সর্বপ্রকার ভুলত্রুটি মুক্ত। মাখলুকের ইলমে ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং মাখলুক হওয়া তো খারাপ কিছু নয়। আম্বিয়াগণও মাখলুক, ফেরেশতাগণও মাখলুক, আউলিয়াগণও মাখলুক। মাখলুক হওয়া তো দোষের কিছু নয়। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম রা. নিঃসন্দেহে মাখলুক, কিন্তু মাখলুক হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভেতর ও বাহির, তাদের অন্তর ও দেহ অত্যন্ত পবিত্র।

কলবের পবিত্রতা

সাহাবায়ে কেরামের বাহ্যিক অবস্থা তো সুস্পষ্ট। কারো মনে হয়তো এ সংশয়ের অবকাশ ছিল যে, তাদের অন্তরে হয়তো কলুষ ছিল। কুরআনুল কারীম এ সংশয়কেও নাকচ করে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى.

আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য শোধিত করে নিয়েছেন। [হুজুরাত ৪৯ : ৩]

প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা তাকওয়ার মানদণ্ডে তাদের অন্তরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়েছেন, তারা খাঁটি প্রমাণিত হয়েছেন।

أُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.

তারা সকলেই সৎপথ অবলম্বনকারী। [হুজুরাত ৪৯ : ৭]

এরা সকলেই বুযুর্গ ও পবিত্র, সৎপথ ও হেদায়াতের জন্য নির্বাচিত।

فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَ نِعْمَةً.

এটা আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর অতিবড় কৃপা ও নিয়ামত। [হুজুরাত ৪৯ : ৮]

সুতরাং কলবের ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে প্রশংসা করা হয়েছে, বাহ্যিকতার ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে প্রশংসা করা হয়েছে, আত্মিক উচ্চ স্তরসমূহ ও বাহ্যিক কর্মকাণ্ডসমূহের স্বতন্ত্র প্রশংসা করা হয়েছে এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে স্বতন্ত্র প্রশংসা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

উপরোক্ত কারণেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো এই যে, اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ সাহাবায়ে কেরামের সকলেই নির্ভরযোগ্য, মুত্তাকিন ও পবিত্র।

উম্মতের মধ্য হতে যত বড় কুতুব, শায়খ, অলি, কামেল বুযুর্গ হোন না কেন, সাহাবিয়াতের সীমানায় পৌঁছতে পারবেন না। সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর যে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে উম্মতের সর্বোচ্চ কুতুব ও গাউসেরও সে মর্যাদা নসিব হয়নি। এ কারণে যে, সাহাবী হলেন তারা যারা নিজ চোখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীদার লাভ করেছেন, কোনো মাধ্যম অবলম্বন করা ব্যতীত নিজ কানে তাঁর পবিত্র কালাম শুনেছেন। এ মর্যাদা ও সৌভাগ্য সাহাবী-ভিন্ন অন্য কারো নসিব হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যে জামাত কোনো মাধ্যম অবলম্বন ব্যতীত নবুওয়াত সূর্যের রশ্মি লাভ করেছেন তাদের মধ্যে যে দীপ্তি থাকবে, মাধ্যম অবলম্বনেপ্রাপ্ত রশ্মিতে সে দীপ্তি থাকতে পারে না। মাধ্যমের কারণে কিছুটা মলিনতা অবশ্যই তাতে থাকবে। সর্বপ্রথম ঈমানের যে ছাপ ও

প্রভাব পড়েছে তা সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর কলবে পড়েছে। তারা কোনো মাধ্যম ব্যতীত ফায়েজ অর্জন করেছেন। সান্নিধ্যের ফায়েজ লাভ করেছেন। সুতরাং পবিত্রতম তত্ত্বাবধায়নের কারণে তাদের কান, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তিও পবিত্র হয়ে গিয়েছে এবং তাদের আত্মার উন্নতি সাধিত হয়েছে।

তাদের অবস্থা এমন হয়েগিয়েছিল যে, তারা তাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি ব্যয়ের ক্ষেত্র এই স্থির করে নিয়েছিল যে, এর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের সাথে সন্তুষ্টির প্রকাশ করতে থাকবে। এই-ই তাদের দীন, এই-ই তাদের ঈমান।

ইশকে সাহাবা

হাদিস শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একজন সাধারণ সাহাবীর ঘটনা। তিনি কোনো বিশেষ সাহাবী অর্থাৎ কোনো আলেম বা ফকীহ ছিলেন না। পেশায় ছিলেন কৃষক এবং গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করতেন। তিনি হালচাষ করা অবস্থায় সংবাদ পেলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকাল হয়েছে। হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি দোয়া করার জন্য হাত তুললেন। বললেন, হে আল্লাহ! আমার এ চোখ ছিল আপনার রাসূলকে দেখার জন্য, আমার কান ছিল আপনার নবীর কথা শোনার জন্য। যখন আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে নেই তখন এ চোখ-কান দিয়ে কী করব! আমার চোখ অন্ধ করে দিন, আমার কান বধির করে দিন। এখন আমি না কারো চেহারা দেখতে চাচ্ছি আর না কারো আওয়াজ শুনতে চাচ্ছি।

মুসতাজাবুদ দাওয়াত (যাদের দোয়া সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়) ছিলেন বলে তখনই দোয়া বকুল হয়ে গেল এবং সাথে সাথে তিনি অন্ধ ও বধির হয়ে গেলেন।

এ ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভালবাসা। তারা দীদারে রাসূলকে স্বীয় চোখের লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়েছিল। কানের উদ্দেশ্য শুধু এই ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আওয়াজ শুনবে, অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

এ হলো সর্বোচ্চ পূর্ণতা, বেলায়াত, নৈকট্যশীলতা ও রাসূলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন। এ মর্মে যে, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রেয়শক্তির চরম উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। কান হলে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে যায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা শোনা, চোখ হলে তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহর রাসূলের দীদার, হাত এ জন্য যে এর দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের নিদর্শনাবলিকে স্পর্শ করবে, কুরআনে হাত বুলাবে, হাদিসে হাত বুলাবে, দীনি কিতাব ও দীনি স্থাপনাসূহে হাত বুলাবে, বাইতুল্লাহর পর্দার উপর হাত ছোঁয়াবে– মোটকথা

হাতের লক্ষ্যই থাকবে ঐ সমস্ত জিনিসকে স্পর্শ করা যার সাথে আল্লাহ ও রাসূলের নাম সংযুক্ত।

কোন এক আরিফবিল্লাহ বলেছেন–

نازم بچشم خود کہ جمال تو دیدہ است

افتم بپائے خود کہ بکوئے تو رسیدہ است

ہر دم ہزار بوسہ زنم دستِ خویش را

او دامنت گرفتہ بسوئے ام کشیدہ است

আরিফ বলেন, আমার চোখ নিয়ে আমি গর্বিত, কিন্তু এ জন্য গর্ব করছি না যে এ চোখ আমার, বরং এ জন্য গর্ব করছি যে, এ চোখ তোমার অপার সৌন্দর্য অবলোকনকারী; আমার চোখ বলে আমি গর্ববোধ করছি না, বরং এ জন্য গর্ব হচ্ছে যে, এ চোখ দিয়ে আমি তোমার সাক্ষাৎ লাভ করব। আমার মন চাচ্ছে যে, আমি আমার নিজের পায়ের উপর মাথা ছোঁয়াই, নিজের পায়ের সম্মান করি। এটা এ কারণে নয় যে, এ পা আমার, বরং এ কারণে যে, এ পা আমাকে তোমার কুঠুরীর দিকে টেনে নিয়ে গেছে, তোমার মসজিদ ও বাইতুল্লার দিকে নিয়ে গেছে, দীনের আহকাম, দীনি বিষয়াবলির দিকে এ পা আমাকে নেটে নিয়ে গেছে। সুতরাং আমার মন চাচ্ছে স্বীয় পায়ের উপর অবনত হই। পায়ের প্রতি আমার মুহাব্বাত তৈরি হয়ে গেছে, এ পা তোমার পর্যন্ত পৌছার মাধ্যম হয়েছে। তেমনিভাবে আমার মন চাচ্ছে আমার হস্তদ্বয়কে সর্বদা চুম্বন করতে। আমার হাত বলে নয়, বরং এ জন্য যে, তোমার আস্তিন ধরে এ হাত তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসে, আমাদের নৈকট্যের মাধ্যম হয়ে থাকে।

সুতরাং মানুষ তখনই কেবল আল্লাহর কামেল অলি হবেন যখন সে তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে, সর্বপ্রকার সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পর্যন্ত পৌছার মাধ্যম সাব্যস্ত করবে। সাহাবায়ে কেরাম রা.দের মধ্যে অতি সাধারণ সাহাবীদেরও এ মর্তবা নসিব হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামের যুগের পর এক-একজন মানুষের পঞ্চাশ বছরাধিক কালের মেহনত ও সাধনার পর এ কথা বুঝে আসে যে, আমার দেহ ও রূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। আরো বিশ বছর-কালের পার্থিব স্বাদ-আহ্লাদ ত্যাগ ও সাধনার পর মানুষ উক্ত মাকামে পৌছে থাকে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপার ছিল এমন যে, সাধারণ

সাহাবীগণ প্রথম কদমেই এ স্তরে পৌছে যেতেন যে, দুনিয়া তো দূরের কথা, আমার নিজ সত্তাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য নিবেদিত। এ ছাড়া জীবনের আর কোনো লক্ষ্য নেই। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে পবিত্র জামাত ও মুকাদ্দাস তবকা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ঈমান ও আমলের মানদণ্ড

উপরোক্ত কারণ বিবেচনায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাজহাব দাঁড়িয়েছে এই–

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ

সাহাবীগণের প্রত্যেকেই ন্যায়পরায়ন ও বিশ্বস্ত।

সাহাবীগণের কলেই মুত্তাকীন, ন্যায় পরায়ন ও পবিত্র সত্তার অধিকারী এবং আমাদের সর্বপ্রকার সমালোচনার উর্ধ্বে। আমাদের সকল অবস্থা হতে তাঁদের অবস্থা উর্ধ্বে। আমাদের জন্য কর্তব্য হল তাঁদেরকে মানদণ্ড সাব্যস্ত করে নিজেদের ঈমানকে যাচাই করে নেওয়া। আমাদের ঈমান যদি তাঁদের ঈমানের অনুরূপ হয় তাহলে ঠিক আছে, অন্যথায় আমরা ভুল পথে রয়েছি। তাঁদের আমলকে কষ্টিপাথরের মতো করে সামনে রাখতে হবে। আমাদের আমল তাঁদের আমলের সাথে সমতাপূর্ণ হলে ঠিক আছে, অন্যথায় বুঝতে হবে আমাদের আমলে ত্রুটি রয়েছে। তাঁরা আমাদের আমলের হক ও বাতিল যাচাইয়ের মানদণ্ড ও কষ্টিপাথর। তেমনিভাবে আমাদের ঈমান যাচাইয়েরও মানদণ্ড তাঁরা। কেননা তাঁরাই হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে থেকে দীনের প্রথম ভাষ্যকার। আল্লাহ মাফ করুন; তাঁদের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি হয়ে যায় তাহলে দীন রক্ষা পাওয়ার কোনো পদ্ধতি থাকে না। বুনিয়াদে ত্রুটি থাকলে সঠিক দীন লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের ঈমান তো তাঁদের অনুগ্রহের দান। তাঁরা যদি সঠিক ঈমান লাভ করে থাকেন তাহলে আমাদের কাছেও সঠিক ঈমান পৌছেছে আর তাঁদের যদি কোনো ত্রুটি হয়ে যায়; আল্লাহ মাফ করুন, তাহলে পরবর্তীদের ঈমান শুদ্ধ হওয়ার কোনোই অবকাশ নেই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তারা হলেন আমাদের ঈমানকে যাচাই করার এক কষ্টিপাথর, আমাদের ইলম ও আমল সহি হওয়ার মানদণ্ড। কেননা ইলমের রেওয়ায়াতগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁরাই বর্ণনা করেছেন এবং আমলের রেওয়ায়াতগুলোও তাঁরাই বর্ণনা করেছেন।

ইলম ও আমলের আদর্শ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমনিভাবে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহর পক্ষ হতে ইলম নিয়ে আগমন করেছেন; সঠিক ও অকাট্য ইলম এনে উম্মতের সামনে উপস্থাপন করেছেন, তেমনিভাবে আমলের নমুনাও তিনিই আল্লাহর পক্ষ হতে নিয়ে এসেছেন। সেই নমুনা দেখে উম্মতগণ আমল করা শিখেছে। যদি শুধু ইলম দেওয়া হতো, আমলের নমুনা সামনে না থাকত, তাহলে যে যার ইচ্ছামতো আমলের নমুনা গ্রহণ করত। যদি শুধু নামাজের নির্দেশ দেওয়া হতো এবং পদ্ধতি দেখিয়ে না দেওয়া হতো তাহলে আমি আমার মতো করে নামাজ পড়তাম, আপনারা আপনাদের মতো পড়তেন। এক নামাজের লক্ষ রূপ দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। আল্লাহর রাসূল যখন নামাজের ইলম উপস্থাপন করলেন, নামাজের আদেশ করলেন তখন নামাজের নমুনাও উপস্থাপন করলেন। সে কারণেই তিনি এ কথা বলেননি যে, صَلُّوْا – 'তোমরা নামাজ পড়'; বরং বলেছেন– صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ – 'তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ সেভাবে নামাজ পড়।' অর্থাৎ নামাজ শুদ্ধ হওয়ার নমুনা হলাম আমি। এভাবেই পড়বে।

তদ্রূপ অজুর ক্ষেত্রেও তিনি বলেননি যে, تَوَضَّعُوْا 'হে লোক সকল! যেভাবে তোমাদের মন চায় তোমরা সেভাবে অজু করে নাও।' বরং অজুর নির্দেশও দিয়েছেন এবং অজু করেও দেখিয়েছেন। একবার তিনি অজু করে দেখালেন, প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধুলেন এবং বললেন–

هٰذَا وُضُوْءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلٰوةً إِلاَّ بِهِ.

এই হলো অজু, যা ব্যতীত আল্লাহ নামাজ কবুল করেন না।

অঙ্গসমূহ যদি একবার করেও ধোয়া না হয় তাহলে অজু হবে না। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার অজু করলেন। এবার প্রতিটি অঙ্গ দুইবার করে ধুলেন এবং বললেন, এই হলো অজু, যা نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ তথা উত্তম পদ্ধতির অজু। এরপর তিনি তৃতীয়বার অজু করে দেখালেন। এবার অঙ্গসমূহকে তিনবার করে ধুলেন এবং বললেন–

هٰذَا وُضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ

এই হলো আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অজু। তাঁরা এভাবেই অজু করতেন।

সুতরাং তিনি নির্দেশ দেননি যে, অজু কর। (অর্থাৎ শুধু নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, নমুনাও উপস্থাপন করেছেন)। অর্থাৎ ইলমের ক্ষেত্রে তোমাদের যেমন ইচ্ছেমতো মতামত উপস্থাপনের স্বাধীনতা নেই, আমলের ক্ষেত্রেও তোমাদের তেমন স্বাধীনতা নেই যে, যেমন ইচ্ছা নমুনা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

রাসূলের আদর্শের আবশ্যকতা

হাদিস শরীফে হযরত আদি ইবনে হাতেম রা.-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র রমজানে রোজার ব্যাপারে আয়াত নাযিল হল–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ.

তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কালো সুতা থেকে ভোরের সাদা সুতা স্পষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর রোজা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। [বাকারা ২ : ১৮৭]

আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, রাত যখন শেষ হবার উপক্রম হয়, পূর্ব দিগন্তে শুভ্র রেখা ফুটে ওঠে এবং সুবহে সাদিক হয়ে যায় তখন পানাহার বন্ধ করে দাও এবং রোজার নিয়ত করে নাও। রাতের বেলায় খাবার খাওয়ার অনুমতি রয়েছে, সুবহে সাদিকের শুভ্ররেখা দিগন্তে ফুটে ওঠার পর পানাহার নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

তো এখানে 'কালো সুতা' দ্বারা রাতের অন্ধকার এবং 'সাদা সুতা' দ্বারা সুবহে সাদিকে শুভ্রতা বোঝানো হয়েছে।

হযরত আদি ইবনে হাতেম রা. বালিশের নিচে একটি কালো সুতা ও একটি সাদা সুতা রেখে দিলেন এবং পানাহার করতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর পর বালিশ উঠিয়ে দেখতে লাগলেন– যখন এ সুতা দুটিকে আলাদা করে চেনা যাবে তখন পানাহার বন্ধ করব। ইতোমধ্যে সুবহে সাদিক হয়ে গেছে, চারদিক ফর্সাও হয়ে গেছে, কিন্তু এতো ফর্সা হয়নি যে, সুতা দুটোকে আলাদা করে চেনা যায়। এভাবে সুবহে সাদিকের বিশ মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি পানাহার করতে থাকলেন, যতক্ষণ না সুতা দুটো পৃথক করা গেল। এ কথা জনাব রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌছলে তিনি হযরত আদি রা.-এর কাছে কারণ জানতে চাইলেন। তিনি কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে বললেন, এখানে তো কালো সুতা থেকে সাদা সুতাকে পার্থক্য করতে না পারা পর্যন্ত পানাহার করার কথা বলা হয়েছে। তাই আমি বালিশের নিচে দুই রঙের দুটি সুতা রেখে তা দেখে সাহরী খাওয়া শেষ করি। প্রতি উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيْضٌ

তোমার বালিশ তো বড়ই প্রশস্ত!

দিগন্তের কালো রেখা ও সাদা রেখা উভয়েরই তো দেখা যাচ্ছে তোমার বালিশের নীচে সংকুলান হচ্ছে! অর্থাৎ দিন ও রাত দুটোই তোমার বালিশের নীচে আত্মগোপন করে আছে। তোমার বালিশ কত বড়? আরে আল্লাহর বান্দা! এখানে خيط الابيض (সাদা সুতা) দ্বারা উদ্দেশ্য সুবহে সাদিকের শুভ্রতা এবং خيط الاسود (কালো সুতা) দ্বারা উদ্দেশ্য রাতের অন্ধকার। তুলা দিয়ে বানানো সুতা উদ্দেশ্য নয়।

আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে হযরত আদি রা. কিন্তু ভুল বুঝেননি। আভিধানিক অর্থ বিচারে সঠিক অর্থই বুঝেছেন এবং সঠিক আমলই করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য তা ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাত ও দিন। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দেওয়ার দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল যদি আয়াতের উদ্দেশ্য বলে না দিতেন তাহলে সারা জীবন তিনি এ ভুলের মধ্যে রত থাকতেন। একটি রোজাও তাঁর শুদ্ধ হতো না। এর দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, কুরআন ও হাদিসের বাক্যাবলির একটি থাকে শাব্দিক অর্থ, আরেকটি থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দিষ্ট অর্থ। একটি হল অর্থ, আরেকটি হল তার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইলমের ক্ষেত্রে তোমাদের যেমন নিজস্ব মতামত উপস্থাপনের অধিকার নেই, আমলের ক্ষেত্রেও তোমরা তদ্রূপ স্বাধীন নও যে, যে-যার মতো করে নমুনা তৈরি করে নেবে। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

ইলম ও আমলের সাদৃশ্যতা

উপরোক্ত কারণে কুরআন মাজিদে যেমনিভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, কুরআন হলো تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ – সকল বিষয় ও বস্তুর জন্য তিবিয়ান। তিবিয়ান বলা হয় দাবির সাথে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করাকে। অর্থাৎ তার মধ্যে আহকামও রয়েছে এবং আহকামের দলিল-প্রমাণও রয়েছে। প্রমাণসমৃদ্ধ দাবি ও প্রামাণিক মাসায়েলের সমন্বিত রূপ হলো কুরআন। ঠিক তেমনিভাবে বর্ণিত হয়েছে–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ
[আহযাব ৩৩ : ২১]

তো কুরআন যতগুলো ইলমের নমুনা পেশ করেছে আল্লাহর রাসূল ততগুলো আমলের নমুনা উপস্থাপন করেছেন। কুরআনে যা বাণীরূপে রয়েছে, আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তা বাস্তব-আকৃতিতে রয়েছে। ওখানে বাণীরূপে, এখানে আমলরূপে। সুতরাং বাণী ও বাস্তবরূপ– উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যতা রয়েছে। তাঁর আমলই কুরআনের ভাষ্য, কুরআনের ভাষ্যই তাঁর আমল। এভাবেই ইলম ও আমল সাদৃশ্যপূর্ণ।

যথার্থ আনুগত্য

ইলমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আমল সামনে থাকার কারণে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইখতেলাফ ও মতবিরোধ খুব কম। কেননা যখনই কোনো আয়াতের অর্থ অনুধাবনে প্রশ্ন জাগতো তখন তাঁরা আল্লাহর রাসূরের আমল দেখে নিতেন, বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যেত। তাঁরা বুঝে নিতেন যে, উক্ত ইলমের স্বরূপ হলোপ এই, যা আল্লাহর রাসূল এভাবে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। সুতরাং কুরআনে যা কিছু ইলমরূপে বিদ্যমান রয়েছে তার সবকিছুই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে আমলরূপে বিদ্যমান রয়েছে। যেখানে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে– 'এটা করো এবং এটা করো না', সেখানে তিনি বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন যে, করণীয়গুলো এভাবে করতে হয় আর বর্জনীয়গুলোর বর্জন করার পদ্ধতি হলো এই। এভাবে তিনি অজু করে দেখিয়েছেন, নামাজ পড়ে দেখিয়েছেন, জিহাদ করে দেখিয়েছেন, রোজা পালন করে দেখিয়েছেন, আনন্দ উদাযাপনের নমুনা উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন, দুঃখ-শোকের নমুনা উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন, বন্ধুর সাথে করণীয় আচরণের দৃষ্টান্ত

উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন, শত্রুর সাথে আচরণ কেমন হবে তা দেখিয়েছেন, সন্ধি করার পদ্ধতি দেখিয়েছেন, লড়াই করার পদ্ধতি দেখিয়েছেন। উসুল বর্ণনা করে সে অনুযায়ী নিজে তার আমলের নমুনা উপস্থাপন করেছেন। মোটকথা, নির্জনে হোক বা সামাজিক জীবনে হোক, একাকী হোক বা সম্মিলিতভাবে হোক– সর্বাবস্থার আমলী নমুনা তিনি উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন। এ কারণে উম্মতের দায়িত্ব হল শুধুই আনুগত্য করে যাওয়া, নিজস্ব মতামত বা ধারণা উপস্থাপনের অবকাশ নেই। মতামত উপস্থাপনের অবকাশ তো কেবল তখন থাকে যখন কোনো নমুনা উপস্থাপন করা না হয়। সকল নমুনাই বিদ্যমান, বাকি থাকে শুধু আনুগত্য। নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ বা রহিতকরণ– কোনোটারই আর অবকাশ নেই। না ইলমের দিক দিয়ে, না আমলের দিক দিয়ে। ইলমও পরিপূর্ণরূপে উপস্থাপন করেছেন, তার আমলী রূপ বা শরীয়তও পূর্ণাঙ্গ। এই শরীয়তের উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করে দেখিয়েছেন। সুতরাং বাকি থাকলো শুধুই আনুগত্য। উম্মতের মতামত উপস্থাপন ও বিবেচনার কোনোই অবকাশ অবশিষ্ট নেই।

সুতরাং হযরত সাহাবায়ে কেরাম সর্বাগ্রে আনুগত্য করেছেন। সুন্নাতে রাসূলের সর্বোচ্চ অনুগত হলেন তাঁরা। তাঁরাই হলেন শরীয়তের সর্বাধিক অনুগত। তাঁরাই আমলের সকল নমুনাকে আল্লাহর রাসূল হতে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং কুরআন মাজিদের ইলমী রেওয়ায়াতও সাহাবায়ে কেরাম হতে উৎসারিত এবং তার আমলী নমুনার রেওয়ায়াতও সাহাবায়ে কেরাম হতে উৎসারিত। প্রথমে সাহাবায়ে কেরাম, তারপর তাবেয়িনগণ, তারপর তাবে-তাবেয়িনগণ।

রেসালাতের দায়িত্ব

কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর চারটি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল:

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيّٖنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ○

আল্লাহ হলেন তিনি যিনি নিরক্ষরগণের মাঝে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের আত্মাকে

পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। ইতোপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। [জুমুয়া ৬২ : ২]

আল্লাহর রাসূল চারটি দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রথমত আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাঁর কলবে যে ওহী নাযিল করেছেন তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়া হুবহু ঐ শব্দাবলি পাঠ করে শুনিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত কুরআনের তালিম দিয়েছেন। তালিম ও তিলাওয়াত ভিন্ন জিনিস। তিলাওয়াতের সম্পর্ক শব্দের সাথে আর তালিমের সম্পর্ক অর্থের সাথে। অর্থাৎ প্রথমে শব্দাবলি পাঠ করে শুনিয়েছেন, অতঃপর তা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এই আয়াতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য হল এই। তৃতীয়ত হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন। এখানে হিকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হল উত্তম আদর্শ উপস্থাপন। অর্থাৎ আয়াতের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। কেননা হিকমত দুই ধরনের। একটি হল হিকমতে নজরী বা চিন্তাধারামূলক হিকমত, আরেকটি হল হিকমতে আমলী বা বাস্তব প্রয়োগমূলক হিকমত। হিকমতে নজরী তো তালিমের মধ্যে এসে গেছে। চিন্তাভাবনার বিষয় ছিল, তিনি তা ইলমীভাবে বলে দিয়েছেন। বাকি থাকল প্রয়োগিক রূপ। একেই হিকমত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমলের নমুনা পেশ করেছেন। সুতরাং তিনি ইলমও শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমলের নমুনাও উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন।

আত্মশুদ্ধি

উক্ত আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অর্পিত চতুর্থ দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَيُزَكِّيهِمْ 'তিনি তাদের আত্মশুদ্ধি করেন।' উম্মতের অন্তরের পরিশুদ্ধিকরণ ছিল তাঁর উপর অর্পিত একটি দায়িত্ব। কলবের শুদ্ধিকরণ, দৃঢ়তা আনয়ন ও বক্রতা দূরীভূতকরণের মাধ্যমে ব্যক্তির বুঝের মধ্যে এমন নির্মলতা তৈরি করে দেওয়া যে, আল্লাহর কালাম পাঠ করার সাথে সাথে আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এভাবে অন্তর সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে।

এর কারণ হল এই, অন্তরে যদি বক্রতা থেকে যায় তাহলে একেবারে সুস্পষ্ট বাক্যেরও উল্টো অর্থটি বুঝবে। মানুষের বুঝ হল অন্তরনির্ভর। অন্তর ভুল পথে থাকলে সকল কিতাব তার কাছে ভুলভাবে ধরা দেবে। মনে করুন– আল্লাহ না

করুন, কারো অন্তর ইহুদী বিশ্বাসে পূর্ণ। এ ব্যক্তি যদি কুরআন পড়ে তাহলে সকল আয়াত হতে সে ইহুদী মতাদর্শ বের করতে শুরু করবে। তার কাছে মনে হবে পুরো কুরআন ইহুদীবাদ শিক্ষা দেওয়া জন্য নাযিল হয়েছে। এভাবে খ্রিস্টানীয় মানসিকতা থাকলে প্রত্যেক আয়াত হতে সেই মতবাদ নির্গত হয় বলে মনে হবে। কাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি তার মতো করে আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেয় তাহলে তার কাছে মনে হবে প্রত্যেক আয়াত হতে কাদরিয়া মতবাদই নির্গত হচ্ছে। এভাবে যে-কোনো মতবাদ ও মানসিকতা নিয়ে দৃষ্টিপাত করলে প্রত্যেক আয়াত ও রেওয়ায়াত হতে ঐ মতবাদের স্বপক্ষীয় জ্ঞান লাভ করবে। সুতরাং বুঝ হল অন্তরের উপর নির্ভরশীল। অন্তরে যদি শুদ্ধতা সৃষ্টি করা যায় তাহলে সঠিক অর্থ বুঝবে, আর যদি অন্তর বক্র হয় তাহলে সবকিছুই তার কাছে বক্র মনে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তালিমই দেননি, শুধু অর্থই বুঝিয়ে দেননি; বরং অন্তরের গতিকেও শুদ্ধ করে দিয়েছেন। যেন শুদ্ধ অন্তরে সরল-শুদ্ধ অর্থ প্রবেশ করে। অন্তরে যদি বক্রতা থেকে যায় তাহলে নিশ্চিতভাবেই বক্র অর্থটাই তার কাছে ধরা দেবে।

আমলের নেগরানি

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাজকিয়াও (আত্মশুদ্ধি) করিয়েছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের তত্ত্বাবধায়নও করেছেন। একদিকে যেমন মাসয়ালা শিক্ষা দিয়েছেন, অপরদিকে তেমন আমলেরও পার্যবেক্ষণ করেছেন। দেখেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের আমল তদনুযায়ী হচ্ছে কি না। রাত্রি বেলায় তিনি আমলের নেগরানি করতেন।

হাদিসে এসেছে, একবার তিনি রাতের বেলায় সিদ্দিকে আকবার রা.-এর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন; কিন্তু এত আস্তে তিলাওয়াত করছেন যে, একেবারে কান লাগিয়ে শুনলে তবেই কেবল আওয়াজ শোনা যায়। অন্যথায় নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হলেন। হযরত ওমর ফারুক রা.-এর ঘরের কাছে গিয়ে দেখলেন তিনিও কুরআন তিলাওয়াত করছেন; কিন্তু তিনি এতই উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করছেন যে, পুরো মহল্লায় সে আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে। ফজরের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে দুজনই যখন উপস্থিত ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি এত আস্তে কেন পড়ছিলে যে, একেবারে কান না

লাগিয়ে শুনলে শোনাই যাচ্ছিল না? হযরত আবু বকর রা. আরজ করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি যাকে শুনাচ্ছিলাম, না তিনি বধির, না আমার থেকে দূরে। অর্থাৎ আল্লাহকে শুনাচ্ছিলাম। সুতরাং উচ্চস্বরে পড়ার কী প্রয়োজন? তিনি তো আমার অন্তরের স্পন্দন সম্পর্কেও অবগত।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

আল্লাহ তোমাদের অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন।

সুতরাং উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করা আমার জন্য আবশ্যক ছিল না।

لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا

তোমরা যাঁকে ডাকছ, না তিনি বধির আর না তিনি অনুপস্থিত।

তিনি তো সর্বদা হাজির-নাজির রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। এ জন্যই আমি আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করছিলাম।

অতঃপর তিনি হযরত ওমর ফারুক রা.-এর কাছে জানতে চাইলেন– তুমি কেন এত জোরে জোরে পড়ছিলে? ওমর ফারুক রা. আরজ করলেন–

اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَ اُطْرِدُ الشَّيْطَانَ

ঘুমন্তদেরকে জাগাচ্ছিলাম এবং শয়তানকে ভাগাচ্ছিলাম। এ কারণেই আমি জোরে জোরে পড়ছিলাম।

শয়তান যেন আমার ঘরের কাছে আসতে না পারে, কুরআনের আওয়াজ শুনে ভেগে যায়। তো উভয়ের কাছেই দলিল ছিল, যুক্তি ছিল। উভয়ের কলবের অবস্থাও ভিন্ন ছিল। যে-যার কলবের অবস্থা অনুযায়ী সঠিক ছিলেন। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– হে আবু বকর! তুমি তোমার আওয়াজকে আরেকটু জোরালো করো। ওমর! তুমি আরেকটু নিচু স্বরে তিলাওয়াত করো। এতে উভয়ের তিলাওয়াতে সমতা আসবে। এ ছিল আমলের নেগরানি, কলবের গতিপথ শুদ্ধকরণ।

মুজাহাদার উদ্দেশ্য

এটা কোনো জায়েজ-নাজায়েজের মাসয়ালা ছিল না। আস্তে পড়াও জায়েজ আছে আবার উচ্চস্বরে পড়াও জায়েজ আছে। এখানে উদ্দেশ্য ছিল কলবের গতিপথের সমতাবিধান। এগুলো মাসয়ালার সাথে সম্পর্কিত নয়, কলবের

মাকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তো আল্লাহর রাসূল যেমনিভাবে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন, মাসয়ালা শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনিভাবে অন্তরকেও পরিশুদ্ধ করিয়েছেন, সাফ করিয়েছেন। মুজাহাদা ও সাধনা করিয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ভালবাসা অন্তরে প্রবেশ করিয়েছেন। যাতে কলব হতে দুনিয়ার ভালবাসা বের হয়ে যায়। এ লক্ষ্যেই কখনো জিহাদ, কখনো মুজাহাদ, কখনো রাত্রে জেগে তাহাজ্জুদের আমল করিয়েছেন।

রাত্রিকালীন তাহাজ্জুদের আমলে সাহাবায়ে কেরাম এতই মগ্ন হয়ে যেতেন যে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ফুলে উঠত। এইসব মেহনত ও মুজাহাদা কিসের জন্য ছিল? এ জন্য যে, যাতে নফসের সন্তুষ্টি দূর হয়ে রূহের সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, কলবের মধ্যে আল্লাহর ভালবাসা স্থিতি পায় এবং কলব শুদ্ধ ও সুদৃঢ় হয়ে যায়। অন্তরের এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পর যদি দুনিয়াবী কাজও করে তাও আল্লাহর জন্যই করবে, নফসের জন্য করবে না। আল্লাহর রাসূল এভাবে নফসের পথ রুদ্ধ করে দিয়ে কলব ও রূহের পথ উন্মুক্ত করেছেন। কোনো আমলই বন্ধ করে দেননি, আমলের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

আমলের পার্থক্য

একজন সাধারণ মানুষ যে আমল করে, একজন অলিও সেই একই আমল করেন। পার্থক্য থাকে শুধু কলবের দিক দিয়ে। আমল উভয়েরই এক, কিন্তু একজন করে আল্লাহর জন্য আরেকজন করে নফসের জন্য। সাধারণ ব্যক্তিও আহার করে, আল্লাহর অলিও আহার করেন; ইনিও বাজারে যায় আর কামেল অলিও বাজারে যান। কর্মকাণ্ডের ধরনের মধ্যে পার্থক্য নেই, কিন্তু নিয়ত ও আমলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ বাহ্যিক কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য হল অভ্যন্তরীণ। তো আল্লাহর রাসূল কলবকে পরিশুদ্ধ করেছেন, আত্মাকে নির্মল করেছেন, যেন তাঁদের সকল কর্মকাণ্ড নফসের সন্তুষ্টির পরিবর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত হয়ে যায়। বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা, ভালবাসা কিংবা ঘৃণা– সবকিছুই একান্ত আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

আমলের ইখলাস

সীরাত গ্রন্থসমূহে হযরত আলী রা.-এর ঘটনা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। বদর যুদ্ধে তিনি আবু জাহেলকে ভূপাতিত করে ছুরি দিয়ে জবাই করতে উদ্ধত হলেন। আবু জাহেল রাগান্বিত হয়ে হযরত আলী রা.-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল।

ব্যাস, আলী রা. হত্যা করা হতে বিরত হয়ে গেলেন। ছুরি ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, হত্যা করবেন না।

নিষ্কৃতি পেয়ে আবু জাহেল বললো– 'হে আলী! আমি তো তোমাকে জ্ঞানী বলেই জানতাম। আমি তোমারও শত্রু, তোমার রাসূলেরও শত্রু এবং তোমার দীনেরও শত্রু। এক মিনিটের জন্যও আমি চাইনি যে, তোমাদের দীন এই পৃথিবীতে টিকে থাকুক, তুমি ও তোমার রাসূল টিকে থাকো। এতবড় দুশমনকে কাবু করে ফেলার পরও তাকে ছেড়ে দেওয়াটা কেমন বিচক্ষণতা? তুমি কেন আমাকে হত্যা করলে না?'

হযরত আলী রা. বললেন– 'আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমি তোমাকে হত্যা করতে উদ্ধত হয়েছিলাম। ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থে তোমার সাথে আমার লড়াই নয়। কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতাও নেই। আল্লাহর কারণেই শত্রুতা। এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহ তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে। তুমি যখন আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলে তখন আমার মধ্যে রাগের সৃষ্টি হল। এ অবস্থায় আমি যদি তোমাকে হত্যা করতাম তবে তা হতো নফসের আবেগতাড়িত হত্যা। সে ক্ষেত্রে আমার ইবাদত শিরকে রূপান্তরিত হয়ে যেত। এ কারণেই আমি হত্যা করা হতে বিরত থেকেছি। কেননা এ যুদ্ধ নফসানি জযবা দ্বারা নয়, রহমানী জযবা দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। নফসের মধ্যে যখন ক্রোধ তৈরি হল তখন হত্যা করা হলে তা হতো নফসের নির্দেশ, আল্লাহ নির্দেশ হতো না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতো না। নফসের সন্তুষ্টির জন্য হতো।'

জানা গেল, সাহাবায়ে কেরামের যত আমল, সব ছিল আল্লাহর জন্য, নফসের জন্য ছিল না।

অলিত্বের হাকিকত

এই যে দৌলত সাহাবায়ে কেরামের অর্জিত হয়েছিল, তা জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাজকিয়ার বদৌলতেই হয়েছিল। রিয়াজাত ও মুজাহাদার মাধ্যমে তিনি তাঁদের অন্তরকে শোধিত করেছেন এবং অন্তরের গতিপথ ঠিক করে দিয়েছেন। নিয়তকে পরিশুদ্ধ করেছেন, মঞ্জিল স্পষ্ট করেছেন এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেও ঠিক করে দিয়েছেন। এভাবে তাঁদের পানাহার, নিদ্রা-জাগরণসহ সকল আমল আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে গেছে। তাঁদেরই জুতার বরকতে হযরত আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যেও এ বিষয়গুলো এসে গেছে। কলবের গতিপথ শুদ্ধ হয়ে যাওয়ারই নাম হল বেলায়াত বা অলিত্ব। বেলায়াতের

অর্থ এই নয় যে মানুষ পানাহার ছেড়ে দেবে, পোশাক পরিধান করা ছেড়ে দেবে, বাড়িঘর ভেঙ্গে ফেলবে কিংবা গৃহে বসবাস করা ত্যাগ করবে। অলির অর্থ হল এই– বাড়িঘরে বসবাস করবে কিন্তু তা নফসের চাহিদা পূরণের জন্য নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। নফসের সন্তুষ্টির জন্য আহার করবে না, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করবে। একজন অলি ও একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে পার্থক্য এতটুকুই। উভয়ের আমল ও কর্মকাণ্ডই এক, পার্থক্য কেবল কলবের দিক দিয়ে। উভয়ের নিয়তের মধ্যে ভিন্নতা থাকে। মোটকথা আউলিয়াদের মধ্যে এ বিষয়টি থাকে যে, তারা সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে থাকেন।

হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহর ঘটনা

হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ তাসতারী রহ. ছিলেন একজন কামেল অলি। অত্যন্ত উঁচু মর্তবার অলিগণের মধ্যে তিনিও একজন। এমনকি তিনি সেই উঁচু স্তরের ব্যক্তিবর্গের একজন, যাঁদের 'আইয়ামে আলাসতু'-র কথা স্মরণ ছিল। আলমে আজলে (রূহের জগতে) থাকাকালীন আল্লাহ তায়ালা আদম আ.-এর পিঠ হতে তাঁর সকল নেককার ও বদকার সন্তানকে (পুরো মানব জাতিকে) বের করে এনে তাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন– أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ – 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' সকলেই সেদিন স্বীকৃতি দিয়েছিল– 'নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের প্রতিপালক'। সাহাল বিন আব্দুল্লাহ এমনই উঁচু স্তরের ব্যক্তি যে, তিনি বলেন– 'এখনও আমার সেই ওয়াদার কথা স্মরণ আছে। যে স্থানে বসে ওয়াদা নেওয়া হয়েছিল সেই স্থানের কথাও মনে আছে।'

কেমন পরিশুদ্ধ রূহ ছিল তাঁর! সেই আলমে আজলের কথা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পরও স্মৃতিতে রয়ে গেছে। তাঁর জীবনীতে একটি ঘটনা উল্লেখ আছে। একবার মুজাহিদদের একটি জামাত জিহাদে যাচ্ছিল। তাঁরও ইচ্ছা হল জিহাদে শরিক হওয়ার। এতবড় একটি ইবাদত হতে বঞ্চিত হতে মন চাচ্ছিল না। তিনি তার নফসের মধ্যেও জিহাদে যাওয়ার প্রেরণা অনুভব করলেন। নফসের মধ্যে যখন জিহাদে যাওয়ার আগ্রহ তৈরি হল তখন তিনি থমকে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, নফস কেন জিহাদের অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছে? নফসের তো জিহাদ হতে বিরত থাকতে চাওয়া উচিত। নফস কেন চাচ্ছে আমি জিহাদের মতো এতবড় ইবাদত করি? নফস তো এমন জিনিস নয়, নফস তো ইবাদত হতে বিরত রাখতে চায়।

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

নফস মানুষকে খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

নফস তো এমন নির্দেশ দেয় না যে, তুমি নামাজ পড়, জিহাদ কর এবং আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ কর। তিনি ভাবতে লাগলেন, নফসের মধ্যে জিহাদে যাওয়ার প্রেরণা কেন তৈরি হল? নিশ্চয় এর মধ্যে গোপন কোনো ধোঁকা রয়েছে, কোনো রহস্য রয়েছে। নফস কেন জিহাদে যেতে চাচ্ছে সে রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তিনি ভাবতে বসলেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হল– আমি চল্লিশ বছর যাবত রোজা রাখছি। নিষিদ্ধ দিনগুলো ছাড়া একদিনও রোজা বাদ যায়নি। রোজা রেখে জিহাদে অংশগ্রহণ করা মাকরুহ। রমজান মাস হলেও রোজা না রাখা মুস্তাহাব, যাতে শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি জিহাদ করতে পারবে না। তো তাঁর কাছে নফসের এই ধোঁকা প্রকাশ পেল যে, চল্লিশ বছর যাতব আমাকে ক্ষুধায় কষ্ট দিচ্ছে, জিহাদে গেলে দিনের বেলায় খাদ্য তো জুটবে। এই হল রহস্য।

হযরত সাহাল রহ. নফসকে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন– হে নফস! আমি জিহাদে যাব এবং রোজা রেখেই যাব। আজ (রোজা না রাখার) মুস্তাহাব আমল ত্যাগ করব। মাকরুহ হলেও তোকে কষ্ট দেব, তোর বিরুদ্ধাচরণ করবই। জিহাদেও যাব, রোজাও রাখব। তোর খাদ্য খাওয়ার সুযোগ মিলবে না।

তিনি দেখলেন, নফস এতেও রাজি। সে বলছে তুমি জিহাদে চলো, আমি তৈরি। তিনি আবার ভাবনায় পড়ে গেলেন। হায় আল্লাহ! নফসের মধ্যে জিহাদে যাওয়ার কেন এত উৎসাহ? এ উৎসাহ তো কলব ও রূহের থাকা উচিত। নফসের এ উৎসাহ কেন? তার তো বিরত থাকতে চাওয়া উচিত। আবার ভাবতে বসলেন। রহস্য উদ্ঘাটনে চিন্তাভাবনা ও মোরাকাবা করতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে যে বিষয়টি উদয় হল তা হল এই– চল্লিশ বছর যাবত আমি নির্জন স্থানে বসবাস করছি। মানুষের নফসের চাহিদা হল লোকজনের সাথে মেশা, সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা এবং অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। সামাজিকতা মানুষের জন্মগত স্বভাব। এরা জীবজন্তুর মতো গুহার মধ্যে নির্জনতায় বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। এরা জনপদ তৈরি করে মিলেমিশে বসবাস করে। যাতে হৃদ্যতা, ভালবাসা ও বন্ধন তৈরি হয়। মানুষ হল হৃদ্যতা প্রিয়। এ জন্যই 'ইনসান' (মানুষের আরবী প্রতিশব্দ) নামকরণ করা হয়েছে। যার মূল শব্দ হল 'উনুস' (انس)। যার অর্থ হৃদ্যতা, বন্ধন ও বন্ধুত্ব। হৃদ্যতা না

থাকলে সে মানুষ মানুষই নয়। মানুষের জন্মগত চাহিদাই হল ভদ্রতা ও সামাজিকতা। কোনো এক আরব কবি বলেন–

وما سمّى الإنسان إلا لأنسه :: وما القلب إلا أنه يتقلّب

বন্ধুত্ব ও ভালবাসার বন্ধন থাকার কারণে মানুষের নাম 'ইনসান' রাখা হয়েছে এবং সদা পরিবর্তনশীল বলে অন্তরের নাম 'কলব' রাখা হয়েছে।

তো মানুষের জন্য সামাজিকতা তার স্বভাবজাত বিষয়। সে লোকজনের সাথে মিশতে চায়, কথাবার্তা বলতে চায়। নির্জনে একাকী থাকা তার জন্য বিরক্তিকর, অস্বস্তিকর।

চল্লিশ বছর পর্যন্ত সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. নির্জনবাসে রয়েছেন। নফস চাচ্ছিল লোকজনের সাথে মিশতে। তিনি নফসের এ চাহিদা পূরণ হতে দেননি। তাঁর মনে হল, আজ নফস এজন্যই জিহাদে যেতে চাচ্ছে যাতে লোকজনের সাথে স্বাক্ষাৎ হয়। নির্জনে থেকে থেকে আমার যে বিরক্তি ধরে গেছে, জিহাদে গেলে তার কিছুটা লাঘব হবে। কোনো তাঁবুতে যখন অবস্থান করব তখন সেখানে আরো দশজন থাকবে, লোকজনের সাথে কথা বলার কিছুটা সুযোগ হবে। কোনো ময়দানে জড় হলে পরস্পরের সাথে আলাপচারিতার সুযোগ আসবে। এই যে চল্লিশ বছর পর্যন্ত একাকীত্বের যাতনায় আমি পুড়ছি, এ জ্বলনের তো সমাপ্তি ঘটবে। এ জন্যই জিহাদের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এটাই হল সেই গোপন রহস্য।

সাহাল বিন আব্দুল্লাহ নফসের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে নফসকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন– হে নফস! আমি জিহাদে গেলে কারো দিকে তাকাব না, কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করব না এবং কারো সাথে কথাও বলব না। তোকে একাকীত্বের যাতনা দিয়েই যাব, এভাবেই তোকে শায়েস্তা করতে হবে।

নফস বলল, আমি এটাও মঞ্জুর করলাম, তুমি জিহাদে চলো। তিনি বিস্মিত হয়ে আবারও ভাবনায় পড়ে গেলেন। হে আল্লাহ! এ কেমন ধোঁকায় পড়লাম! নফস কেন জিহাদে যেতে চাচ্ছে? কী এর রহস্য? এবার তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন– হে আল্লাহ! আমি নফসের এক সূক্ষ্ম ধোঁকায় পতিত হয়েছি। আমি রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারছি না। আপনি রহস্য উদ্ঘাটন করে দিলে আমি তার প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে পারব। শরীয়তের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য নফস আমাকে উদ্বুদ্ধ করছে, এর রহস্য কী?

আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম হওয়ার পর রহস্য উন্মুক্ত হল– সাধনা ও মুজাহাদার মধ্যে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। নফসকে যেন মেরে ফেলেছিল। مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا মৃত্যুর পূর্বেই যেন তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তার কামনাকে নিষ্পেষিত করেছিল, তার চাহিদাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। যেন আল্লাহর মর্জি হাসিল হয়। এসব বিষয় নফসের জন্য ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। সুতরাং নফসের মধ্যে জিহাদের আগ্রহ এই জন্য ছিল যে, জিহাদে গিয়ে একবার যদি গুলি লেগে যায় তাহলে প্রতিদিনের এই ধুঁকেধুঁকে মরা হতে নিষ্কৃতি মিলবে। একবারেই সব যাতনা শেষ হয়ে যাবে। প্রতিদিনের এই যে মৃত্যু-যাতনা, তার তো অবসান হবে। যা হবার একবারেই হবে। একবার তলোয়ারের আঘাত লাগলেই সব শেষ হয়ে যাবে। এই ছিল গোপন রহস্য।

সাহাল ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. তওবা করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমার নিয়তকে শুদ্ধ করে দিন। নিয়ত যখন শুদ্ধ হয়ে গেল, মুজাহিদদের সাথে শরিক হয়ে জিহাদে চলে গেলেন।

আত্মশুদ্ধিহীন আমল

সাহাল বিন আব্দুল্লাহ রহ.-এর এই যে আত্মিক অবস্থা বর্ণিত হল, এটা কিভাবে হল? এটা সম্ভব হয়েছিল আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে। চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে নফসকে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন করে নিয়েছিলেন। নফস যতক্ষণ পর্যন্ত পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন না হবে প্রকৃতপক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কখনো এমন হয়, অভ্যস্ত কর্মকাণ্ডকে বাহ্যিকভাবে ইবাদত মনে হয়। ব্যক্তি মনে করে আমি ইবাদত করছি, কিন্তু বাস্তবে তা নফসের আনুগত্য। পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী ব্যক্তিই কেবল ত্রুটি ধরতে পারেন। বুঝতে পারেন যে, এ ইবাদত সহি হচ্ছে না, এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে না। পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী ব্যক্তিই কেবল বুঝতে পারেন কোনোটা নফসের চাহিদা আর কোনোটা আল্লাহর সন্তুষ্টি। কোন পথে আমাকে যেতে হবে আর কোন পথ বর্জন করতে হবে। মোটকথা, নফস সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কামনা চরিতার্থ করে এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রতারণার আশ্রয় নেয়। এগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত স্পষ্ট হবে না যতক্ষণ না নফস পরিশুদ্ধ হবে, পরিচ্ছন্ন হবে এবং তাতে নূর তৈরি হবে। আর এই নূর মুজাহাদা, রিয়াজাত বা চেষ্টা-সাধনা ব্যতীত আসা সম্ভব নয়। এ কারণেই মুজাহাদা ও রিয়াজাত করানো হয়। যাতে নফসের মধ্যে স্থিরতা আসে, সরলতা আসে এবং কলবের নিরাপত্তা অর্জিত হয়। সুতরাং হযরত সাহাবায়ে কেরামকে মুজাহাদা

করানো হয়েছে, রিয়াজাত করানো হয়েছ। এর দ্বারা তাঁদের কলবে যে শিরকের মালিন্য ছিল তা দূরীভূত হয়েছে; যে বিপথগামীতা ছিল তার অবসান হয়েছে; গাইরুল্লাহর প্রতি যে ভালবাসা ছিল তা খতম হয়ে গিয়েছে।

পরিপূর্ণ অবিচলতা

মুজাহাদা ও রিয়াজাতের ফলে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাঁদের সর্বপ্রকার ভালবাসা ছিল একমাত্র আল্লাহরই জন্য, শত্রুতাও ছিল একমাত্র আল্লাহরই জন্য। তাঁদের দুনিয়াও ছিল আল্লাহরই জন্য, লেনদেনও ছিল শুধু তাঁরই জন্য। পরিপূর্ণ অবিচলতার মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা আসে। যাকে হাদিসের এক স্থানে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

مَنْ أَحَبَّ فِى اللهِ وَأَبْغَضَ للهِ، وَأَعْطٰى للهِ وَمَنَعَ للهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ.

> যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যই ভালবাসে এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করে, কাউকে কিছু দান করলে আল্লাহর জন্যই করে, দান করা থেকে বিরত থাকলে আল্লাহর জন্যই বিরত থাকে। সে তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল।

পৃথিবীর মানুষ যা কিছু আমল করে কিংবা যা থেকে বিরত থাকে তা হয়তো ভালবাসার কারণে হয়, নয়তো শত্রুতার কারণে হয়। আপনি যে কাজ করেন, তার প্রতি ভালবাসা থাকলেই তো কেবল করবেন। ঘৃণা থাকলে কিভাবে করবেন? তো কোনো কাজ করা তার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ থাকার প্রমাণ বহন করে। যা আপনার অপছন্দ, অপ্রিয় এবং যার সাথে আপনার বিরোধ ও শত্রুতা, আপনি তা হতে দূরে সরে থাকবেন। সুতরাং কোনো জিনিস না করা ঐ জিনিসের প্রতি ঘৃণার প্রমাণ বহন করে। সুতরাং বর্ণিত হয়েছে– ভালবাসলে তা আল্লাহর জন্যই বাসে, ঘৃণা করলেও আল্লাহর জন্যই করে। ভালবাসা ও ঘৃণার সম্পর্ক নফসের আবেগের সাথে আর সম্পৃক্ত থাকলো না। কাউকে কিছু দিলে তা আল্লাহরই জন্য দেয়, বিরত থাকলে আল্লাহরই জন্য থাকে। যখন প্রতিটি পদক্ষেপ আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার জন্য নিবেদিত হয়ে যাবে তখন বলা হবে যে, নফস কামেল হয়েছে, পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তার ঈমান কামেল হয়ে গেছে।

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ

আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ সমর্পিত হওয়ার নামই হল ইসলাম। এটাই হল ইসলামের হাকিকত। যা কিছু হবে, একমাত্র আল্লাহরই জন্য হবে। হযরত ইবরাহিম আ.কে বলা হয়েছিল–

اِذْ قَالَ لَه رَبُّهُ اَسْلِمْ

হে ইবরাহিম! তুমি মুসলিম হয়ে যাও।

আল্লাহ মাফ করুন; মুসলিম হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ইতোপূর্বে তিনি অমুসলিম ছিলেন, এখন ইসলাম কবুল করতে বলা হচ্ছে। তিনি তো পয়গম্বর ছিলেন। তাহলে মুসলিম হওয়ার অর্থ কী? অর্থ হল এই, মস্তক অবনত কর। যা কিছু করবে, আমার জন্য করবে। নিজের নফসের জন্য কিছুই করবে না। মুসলমান হওয়ার অর্থ ছিল এটাই। অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা। নিজেকে সমর্পন করে দেওয়া, আল্লাহর হাতে সঁপে দেওয়া। এভাবে যে– তাঁর শরীয়ত যেভাবে তোমাকে ওলট-পালট করবে তুমি সেভাবেই নিজেকে পাল্টাও। তোমার নিজের কোনো মর্জি বা পদক্ষেপ যেন না থাকে। তুমি এমন হয়ে যাও– كَالْمَيِّتِ فِى يَدِ الْغَسَّال 'গোসলদাতার হাতে মৃতব্যক্তি যেমন থাকে।' যেদিকেই পাশ ফেরায় সেদিকেই ফেরে। মাইয়েত বলে না যে, আমাকে কেন এদিকে কাত করলে? মাইয়েত গোসলদাতার হাতে সমর্পিত থাকে। যেভাবে ইচ্ছা বসায়, শোয়ায়, পাশ ফেরায়। ঠিক এভাবেই মানুষকে স্বেচ্ছায় শরীয়তের হাতে সমর্পিত হতে হয়। অনিচ্ছায় তো মানুষ সর্বদাই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু নিজেকে নিজে এভাবে সঁপে দেওয়া যে আপনি যেভাবে চাইবেন আমি সেভাবেই আপনাতে সমর্পিত– এর নাম হল ইসলাম। আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে।

اِذْ قَالَ لَه رَبُّهُ اَسْلِمْ

হে ইবরাহিম! তুমি মুসলিম হয়ে যাও।

অর্থাৎ নিজেকে আমার হাওয়ালা করে দাও। যেভাবে আমি তোমাকে উল্টাবো, পাল্টাবো, তুমি তেমন হতে তৈরি হয়ে যাও।

قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আমি মুসলিম হয়ে গেলাম– বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের অনুগত হলাম। [বাকারা ২ : ১৩১]

বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।' অর্থাৎ আমি নিজেকে সমর্পণ করে দিলাম। যেভাবে আপনার ইচ্ছা আমাকে ব্যবহার করুন। কারো প্রতি আমার ভালবাসা হলে আপনার জন্যই হবে, নফসের জন্য কিছুই হবে না।

মেনে নেয়া ও মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর কী করণীয়? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, এবার তুমি ইসলাম সম্পর্কে ঘোষণা কর, এলান কর। কী সেই ইসলাম?

আল্লাহ তখন ইরশাদ করলেন, ঘোষণা কর যে,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ○
لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ○

আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার নামাজ, আমার ইবাদত– সবকিছুই আল্লাহরই জন্য নিবেদিত (আমার নফসের সন্তুষ্টির জন্য নয়), যাঁর কোনো শরিক নেই। এ বিষয়ে আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং মুসলিমগণের মধ্যে আমি প্রথম। [আনআম ৬ : ১৬২]

সুতরাং ইসলামের অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই– নামাজ হলে তাও হবে আল্লাহর জন্য, হজ হলে তাও হবে আল্লাহর জন্য, মরতে হলে আল্লাহরই জন্য মরবো, বাঁচতে হলে তাঁরই জন্য বাঁচবো। অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেওয়া। ইসলামের অর্থ হল এটাই যে, ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করে দেবে। না তার নিজের কোনো মর্জি থাকবে, না তার নিজস্ব কোনো চাহিদা থাকবে, না কোনো ইচ্ছা থাকবে। মর্জি থাকলে আল্লাহরই থাকবে, ইচ্ছা থাকলে আল্লাহরই থাকবে।

পরিপূর্ণ লীন হয়ে যাওয়া

কোনো এক গোলামকে একজন বলেছিল, তুমি কী খাবে? গোলাম উত্তর করেছিল, 'মনিব যা খাওয়াবেন তাই খাব', কী পরিধান করবে? 'মনিব যা পরিধান করাবেন তাই পরবো'। কী কাজ করবে? 'মনিব যে কাজ করাবেন তাই করব'। উক্ত ব্যক্তি বললো, সবই তো মনিবের কথা বললে, তোমার নিজের কোনো মর্জি কি নেই? গোলাম বললো, 'আমার নিজের কোনো মর্জি যদি থাকত তাহলে তো আমি গোলাম হতাম না। আমি গোলাম হবার অর্থ এই যে, আমার মর্জি বা ইচ্ছাশক্তিও গোলাম, আমার স্বাদ-আহ্লাদও গোলাম। আমার আশা-

স্বপ্নও গোলাম। যা কিছু হবে, মনিবের মর্জিমাফিক হবে। তিনি খাওয়ালে খাব, না খাওয়ালে খাব না। তিনি কাজ করালে করব, কাজ না করিয়ে বসিয়ে রাখলে বসে থাকব। আমি আমার মনিবের সম্পূর্ণ অনুগত।'

একজন মানুষ যখন কৃতদাস হয়ে নিজেকে অন্যের কাছে এভাবে সমর্পণ করে দেয়, অথচ সে তার সৃষ্টিকর্তা নয়, তার মালিক নয়। তথাপি সামান্য অনুগ্রহের কারণে সমর্পিত হয়ে গেল। তো প্রকৃত ইহসানকারী আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত, যাঁর গোলাম ও বান্দা হওয়ার দাবিদার আমরা, তাঁর বান্দাও হব আবার নিজস্ব মতামতও পেশ করব? এটা বন্দেগি নয়, বন্দেগির দাবি মাত্র এবং এটা ভুল। বন্দেগি হল এই– كَالْمَيِّتِ فِي يَدِ الْغَسَّالِ 'গোসলদাতার হাতে মৃতব্যক্তি যেমন।' ঠিক অদ্রূপ আল্লাহর মর্জির অনুগত হয়ে যাওয়া।

আল্লাহর মর্জি

পৃথিবীর লোকজন আজকাল আল্লাহকে নিজের অনুগত করতে চাচ্ছে, নিজে তাঁর অনুগত হতে চাচ্ছে না। সবকিছু নিজ মর্জিমাফিক হওয়া কামনা করে। মাসয়ালা জানতে চাইলেও কামনা করে যে আমার মর্জি মতো ফতোয়া হোক। কোনো রায় জানতে চাইলেও এই নিয়ত থাকে যে আমার চাওয়া যেন ঠিক থাকে। দোয়াও নিজের চাহিদামতো করা আবার ফতোয়াও নিজ মর্জিমাফিক হওয়ার কামনা করা– এতো আল্লাহকে নিজ অনুগত বানানো। তো মানুষ নিজেকে আল্লাহর অনুগত দাবি করছে আবার আল্লাহকে অনুগত বানিয়ে রাখার প্রত্যাশা করছে। এটা কোনো গ্রহণযোগ্য কথা নয়। এটা সমর্পিত হওয়ারও পরিপন্থী এবং ইসলামেরও পরিপন্থী। মুসলিম হওয়ার অর্থ হল আমি আল্লাহর মর্জির অনুগত, আমার কোনো মর্জি নেই। নিজস্ব মর্জিকে বিলীন করে দেওয়ার নাম হল ইসলাম, নিজস্ব কামনা বাসনাকে বিলীন করে দেওয়ার নাম হল ইসলাম। আমাদের মধ্যে যদি আমাদের নিজস্ব মর্জি বজায় থাকে তাহলে আমরা কী করে মুসলিম হলাম? যদি নিজস্ব কামনা-বাসনাই বজায় থাকলো তাহলে প্রকৃত অর্থের মুসলিম কেমন করে হলাম? এজন্যই ইরশাদ হয়েছে– নিজেকে সঁপে দাও, হাওয়ালা করে দাও। এমন সমর্পিত জীবনের যথার্থ স্বরূপ হযরত সাহাবায়ে কেরামের জীবনে দেখা গেছে। তাঁদের চোখ যদি কোনো জিনিস দেখতো আর আল্লাহর রাসূল তাকে অন্য জিনিস বলতে চাইতেন তাহলে তারা নির্দ্বিধায় নিজের চোখকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু আল্লাহর মর্জিকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

হাদিস শরীফে এসেছে, বিদায় হজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞেস করলেন– اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ 'এটা কোন দিবস?'

সবারই জানা ছিল, ৯ জিলহজ, আরাফার দিন, সবাই হজ উপলক্ষে সমবেত হয়েছে। সুতরাং সরল জবাব ছিল এই– আজ আরাফার দিন। কিন্তু তাঁরা কী জবাব দিলেন? বললেন– اَللّٰهُ وَرَسُوْلُه اَعْلَمُ – আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন যে আজ কোন দিন। আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞেস করলেন– اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا؟ মক্কা মুকাররমার দিকে ইশারা করে বললেন, 'এটা কোন শহর?' সবাই জানতেন, মক্কা নগরী। জবাব হওয়া উচিত ছিল 'মক্কা'। কিন্তু জবাব কী দিলেন? اَللّٰهُ وَرَسُوْلُه اَعْلَمُ– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন যে এটা কোন শহর। আল্লাহর রাসূল বললেন– اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا؟ 'এটা কোন মাস?' সকলেরই জানা ছিল, জিলহজ মাস। জবাব দিয়ে দিলে হতো– জিলহজ মাস। কিন্তু তাঁরা কী জবাব দিলেন? اَللّٰهُ وَرَسُوْلُه اَعْلَمُ– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন যে এটা কোন মাস।

তাবেয়ীদের মধ্য হতে এক শাগরিদ জনৈক সাহাবীর কাছে জানতে চাইলেন– আপনারা কেন এমন জবাব দিয়েছিলেন? আপনারা তো নিশ্চিত জানতেন যে এটা মক্কা নগরী, জিলহজ মাস, নবম তারিখ। সুতরাং নির্দিষ্ট করে না বলে কেন এমন উত্তর দিলেন যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন? বিষয়টা তো আমার বুঝে আসছে না!

[এ বয়ানটি এ পর্যন্তই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। পূর্ণ না হওয়ার জন্য আফসোস রয়ে গেল। তবে সম্ভবত খুব অল্পই বাকি রয়েছে। সাধারণত বয়ানগুলো যত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয় এখানে তত পৃষ্ঠা হয়ে গেছে। সম্মানিত পাঠকদের কাছে অপারগতা প্রকাশ করছি। বাকি আলোচনা যদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাহলে পরবর্তীতে তা সংযুক্ত করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। –সংকলক]

বয়ান : ২

সীরাতের উপাদান

জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডান হাতে ছিল আল্লাহর দেদীপ্যমান কিতাব আর বাম হাতে ছিল নবুওয়াতের কলব, যা ছিল আখলাকের দ্যুতিতে পূর্ণ। আল্লাহর কিতাবের মধ্যে ছিল উলুহিয়্যাতের প্রখর দীপ্তি। যদি শুধু কিতাব অবতীর্ণ হতো, পয়গম্বর না আসতেন, তাহলে আল্লাহর কিতাবের তাজাল্লি মানুষকে ভস্ম করে দিত। সে কিতাব বোঝার সামর্থ্য কারো হতো না। এই প্রখর রৌশনীকে নবীর কলবে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতঃপর নবীর আবদিয়াতের সাথে যখন উলুহিয়্যাতের নূরের সংযোগ ঘটেছে তখন তার মধ্যে শীতলতার সৃষ্টি হয়েছে, যা মানুষের জন্য সহনশীল।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَاۤفَّـةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـيْرًا. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِه وَصَحْبِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّـابَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِينٌ○ يَهْدِىْ بِه اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِه وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ○ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

ভূমিকা

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। অত্র আয়াতের মধ্যে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা, তাঁর কিছু মৌলিক সিফাত এবং কিছু মৌলিক উদ্দেশ্য ও

কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই আয়াতের সংক্ষিপ্ত কিছু ব্যাখ্যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। আয়াতের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা বুঝে নিন, এতে আয়াতের উদ্দেশ্য বোঝা সহজতর হবে। তা হলো এই– মানুষ যখন নির্দিষ্ট কোনো মঞ্জিলে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তখন তার জন্য চারটি বিষয় আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়। এই চারটি বিষয় ছাড়া মানুষ তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

এক. সর্বাগ্রে প্রয়োজন হলো আলোকিত পথ। রাস্তায় এমন আলো থাকতে হবে যাতে মানুষ রাস্তা দেখে দেখে চলতে পারে। আর সে আলোও হওয়া চাই সহনশীল। না অত্যধিক তেজদীপ্ত, না অতিশয় ম্রিয়মান। যদি তেজদীপ্ত আলো হয় তাহলে চোখ জ্বালাপালা করবে, ব্যথা করবে, পথচলা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে সে আলো এমন ম্রিয়মান হওয়াও চলবে না যে, রাস্তার দিক ও প্রশস্ততা, খানাখন্দর প্রভৃতি চোখে পড়ে না। বরং আলো হতে হবে মধ্যম পর্যায়ের, যাতে মানুষ স্বাচ্ছন্দে পথ চলতে পারে। মোটকথা, প্রথম বিষয় হলো রাস্তায় আলো থাকা।

দুই. দ্বিতীয় পর্যায়ে হলো রাস্তা সরল হওয়া। রাস্তা আঁকাবাঁকা ও এলোমেলো না হওয়া। মানুষ যেন বিনা কষ্টে পথ চলতে পারে এমন রাস্তা হওয়া। রাস্তা যদি উঁচুনিচু হয় এবং তাতে গর্ত ও খানাখন্দর থাকে তাহলে আলো থাকা সত্ত্বেও পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ কারণে পথ আলোকিত হওয়া সত্ত্বেও সরল-সহজ হওয়া আবশ্যক। উঁচুনিচু ও আঁকাবাঁকা না হওয়া কাম্য।

তিন. এতদুভয় সত্ত্বেও তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের আবশ্যকতা রয়েছে। তা হলো পথ-প্রদর্শক থাকা। যদি পথ-প্রদর্শক না থাকে তাহলে শুধু আলো ও রাস্তা দ্বারা লক্ষ্য অর্জিত হবে না। সুতরাং পথ-প্রদর্শকেরও আবশ্যকতা রয়েছে, যিনি হাত ধরে গন্তব্যে পৌঁছে দেবেন।

চার. চতুর্থ যে বিষয়টি আবশ্যক তা হলো পথিক। আলো আছে, সরল রাস্তা আছে, পথ-প্রদর্শক আছে কিন্তু পথিক নেই। অর্থাৎ পথিকই যদি না থাকে, পথে চলার লোকই যদি না থাকে তাহলে মঞ্জিলে মকসুদে যাবেন কে? সে জন্যই লক্ষ্যে পৌঁছার মতো লোক থাকতে হবে।

মোটকথা, এই চারটি বিষয় ছাড়া উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। আলো না থাকলে অন্ধকারে চলা কঠিন, আলো থেকেও রাস্তা না থাকলে মানুষ চলবে কিসের উপর? আলো, রাস্তা উভয় আছে কিন্তু পথ-প্রদর্শক নেই– এমন হলে বা

মানুষ কিভাবে যাবে? আবার এই তিনটি বিষয়ই যদি থাকে কিন্তু চলার মতো লোক যদি না থাকে তাহলে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবে কে?

পথ-প্রাপ্তির শর্তসমূহ

দুনিয়াতেও আপনি যখন কোনো গন্তব্যে পৌঁছতে চাইবেন তখন উপরোক্ত বিষয়গুলো আপনার জন্য আবশ্যক হবে।

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে আপনার জন্য আলোর ব্যবস্থা করেছেন। ইরশাদ করেছেন:

تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا○

> কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে কক্ষপথ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন প্রখর সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। [ফুরকান ২৫ : ৬১]

দিনের বেলায় আপনি সূর্যের আলোয় এবং রাতের বেলা চাঁদের আলোয় পথ অতিক্রম করেন। আসমানে আল্লাহ তায়ালা বিশাল দুটি জ্যোতিষ্ক তৈরি করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন:

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ

> নক্ষত্র দ্বারা তারা পথ চিনে নেয়। [মুমিনুন ২৩ : ৪]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য লক্ষ-কোটি নক্ষত্র নির্ধারিত করেছেন। যার দ্বারা আমরা দিক ও পথ চিনতে পারি এবং সহজভাবে পথ অতিক্রম করতে পারি। কিন্তু পৃথিবীতে যদি রাস্তা না থাকত তাহলে শুধু চাঁদ-সূর্য দ্বারা কাজ হতো না। যদি রাস্তা না থাকত; পাহাড়পর্বত, খানাখন্দর, বড় বড় গর্ত কিংবা বনজঙ্গল থাকত তাহলে পথচলা সম্ভব হতো না। জীবন হারাবার আশঙ্কা থাকত। এ অবস্থায় উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে কিভাবে পৌঁছত?

দ্বিতীয়ত পৃথিবীতে চলার জন্য আল্লাহ তায়ালা সরল পথেরও ব্যবস্থা রেখেছেন। এক স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا

আল্লাহ হলেন সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে অনুগত করে দিয়েছেন, সহজ করে দিয়েছেন। যাতে তোমরা এর পথসমূহে চলাচল করতে পার। [মুলক ৬৭ : ১৫]

অর্থাৎ গন্তব্যে পৌঁছতে পৃথিবীতে চলাচল করার জন্য আল্লাহ এতে রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন। রাস্তা থাকা সত্ত্বেও পথ-প্রদর্শকের অভাবে রাস্তায় চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়ে, সে কারণে পথ-প্রদর্শনের আবশ্যকতা রয়েছে। যেমন হযরত মুসা আ. এক স্থানে বলেছিলেন, যা আল্লাহ বর্ণনা করেছেন:

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيلِ

মুসা আ. যখন মাদায়েন যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার প্রতিপালক সত্বর আমাকে সরলপথ প্রদর্শন করবেন। [কাসাস ২৮ : ২২]

পথ প্রদর্শন আল্লাহর পক্ষ হতে হবে এবং আমি পথপ্রাপ্ত হব। দেখা যাচ্ছে রাস্তার জন্য পথ-প্রদর্শকের আবশ্যকতা রয়েছে। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে বলেন:

اُطْلُبُوا الرَّفِيْقَ قَبْلَ الطَّرِيْقِ

সফর শুরুর পূর্বে সফরসঙ্গী নির্ধারণ করে নাও– যে তোমাকে পথ প্রদর্শন করবে।

এ কথা স্পষ্ট যে, এই তিনটি বিষয়ের আবশ্যকতা তখনই দেখা দেবে যখন পথচলার কেউ থাকবে। যদি কেউ না থাকে তাহলে চলবে কে? মোটকথা কোনো মঞ্জিলে পৌঁছতে হলে এই চারটি বিষয়ের আবশ্যকতা দেখা দেবে।

রূহানী সফরের শর্তাবলি

পার্থিব জীবনের পথ অতিক্রম করতে যখন এই বিষয় চারটি আবশ্যক হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌঁছার যে সুবিশাল দীর্ঘপথ তার জন্য এ বিষয়গুলো কেন আবশ্যক হবে না? আপনি যখন সাধারণ এক সফরে বের হবেন তখনও আপনার এ বিষয় চারটি আবশ্যক হবে। আর রূহানী জগতের সফর হলো অতিশয় দীর্ঘ, অতিশয় মহান। কেননা এ হলো বান্দা কর্তৃক স্বীয় প্রভু

পর্যন্ত পৌছার পথ; যেখানে আল্লাহর সত্তা হলো وَرَاءُ الْوَرٰى (আড়াল হতে আড়াল) আর বান্দা হলো ظُلْمَةٌ فِى الظُّلُمَاتِ (আঁধার আর আঁধার)।

ع-چہ نسبت خاک را با عالم پاک

বিশ্ব অধিপতি মহান আল্লাহর সাথে ধুলো-মাটির মানবের সম্বন্ধ কোনো সহজ বিষয় নয়।

পথহীন আলোহীন ও পথ-প্রদর্শকহীনভাবে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া বান্দার পক্ষে কস্মিন কালেও সম্ভব নয়। বস্তুগত পার্থিব জীবনের চেয়ে রূহানী জীবনের জন্য এগুলো আরো বেশি আবশ্যক।

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ্ পযর্ন্ত পৌছার রাস্তা দুনিয়াবী এই রাস্তা অবশ্যই নয়। আল্লাহ্ হলেন নূর। তিনি বস্তু হতে বহু উর্ধ্বে। রূহানিয়াত হতেও উর্ধ্বে। তাঁর সূক্ষ্মতার সামনে রূহানিয়াতও স্থূল। সুতরাং তাঁর সর্বজ্ঞাত সূক্ষ্ম বরকতময় সত্তা পর্যন্ত পৌছার জন্য যে পথ ও আলো প্রয়োজন তা কোনো বস্তুগত -পথ ও আলো হবে না, বরং তা হবে অদৃশ্য ও অর্থগত। এ পথ অতিক্রম করতে সূর্যের আলোতে কাজ হবে না। সূর্যের আলো আমাদেরকে হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তান, ইরান বা আরবে পৌছে দেবে, কিন্তু তার দ্বারা আরশে আজিমে পৌছা সম্ভব নয়, জান্নাত কিংবা আলমে বরযখে পৌছা সম্ভব নয়। যে জগতের জন্য যেমন আলো প্রযোজ্য তেমন আলোই আবশ্যক। আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছার জন্য বস্তুগত রাস্তা যথেষ্ট নয় বরং অর্থগত ও রূহানী রাস্তা আবশ্যক। আলোর ক্ষেত্রেও তদ্রূপ তাৎপর্যময় আর্থগত আলো আবশ্যক। যে আলো হবে অতিশয় সূক্ষ্ম, বস্তুর উর্ধ্বে এবং যাতে স্থূলতার নাম-নিশানাও থাকবে না। এ কথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছার জন্য রাস্তা ও পথ-প্রদর্শকও তেমনই হওয়া আবশ্যক। আর তার জন্য আমাদের এই পা-ও যথেষ্ট নয় যে এতে ভর করে মানুষ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছে যাবে; বরং তার জন্য অদৃশ্য এক অভ্যন্তরীণ শক্তি আবশ্যক। সুতরাং বস্তুগত মঞ্জিলের জন্য বস্তুগত পথ, পদ্ধতি ও পথ-প্রদর্শক আবশ্যক। আর অদৃশ্য জগতে পৌছার জন্য, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য রূহানী রাস্তা, রূহানী পথ-প্রদর্শক এবং রূহানীভাবে পথ চলার আবশ্যকতা রয়েছে।

রূহানী নূরের আবশ্যকতা

আল্লাহ তায়ালা পর্যন্ত পৌছার জন্য যে আলো প্রয়োজন সে আলো কোন্ আলো? সে আলো দ্বারা আমরা সঠিকভাবে রাস্তা দেখতে পাব? আরোহণ-অবরোহণের পদ্ধতিই বা কেমন? এজন্যই আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য একটি আলোর ঝিনর. আলোর সূর্য উদ্ভাসিত করেছেন। কিন্তু তা বস্তুগত সূর্য নয়, সে সূর্য হলো নুবুওয়াতের সূর্য। যে সূর্যের আলোয় আলোকিত পথ ধরে আপনি আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হবেন। তা হলো জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তা।

পৃথিবীর কোন্ পরিস্থিতিতে তিনি তাশরীফ আনলেন? পৃথিবী যখন চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, আঁধারের ঘনঘটায় সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, আলোর সবটুকু চিহ্ন নিভে গিয়েছিল, পথের চিহ্ন, পথের চিহ্নও মিটে গিয়েছিল, আঁধার আর আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল বিশ্বচরাচর। বাস্তব অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, বান্দা আল্লাহ ও মাখলুকের মধ্যকার পার্থক্য নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। মাখলুকের দুর্বল, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত গুণাবলি আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছিল আর আল্লাহর পবিত্র গুণাবলি বান্দার জন্য স্বীকৃতি দিয়েছিল। বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে বান্দাকে আল্লাহর সমপর্যায়ে নিয়ে নিয়েছিল এবং আল্লাহকে নামিয়ে এনেছিল বান্দার স্তরে।

ইহুদী-নাসারাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস

একদল বান্দার যাবতীয় মানবীয় গুণাবলিকে আল্লাহর জন্য স্বীকৃতি দিয়েছে। বর্তমানে তাওরাতের যে কপি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তাতে লেখা রয়েছে, একবার আল্লাহর সাথে হযরত ইয়াকুব আ.-এর কুস্তি হলো, বহু ধস্তাধস্তির পর শেষ পর্যন্ত ইয়াকুব আ. বিজয়ী হলেন এবং আল্লাহকে আছাড় দিলেন (নাউজুবিল্লাহ)।*

---

* মূসা আ.-এর ইন্তেকালের কিছুকাল পর ইহুদীরা তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থে তাওরাতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। হযরত ঈসা আ. আবির্ভাবের পূর্বেই মূলত তাওরাত বিকৃত হয়ে যায়। বিকৃতির এই ধারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের বহুকাল পর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। একই কথা ইঞ্জিলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বর্তমানে এই উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায় যৌথভাবে 'বাইবেল' অনুসরণ করছে। —অনুবাদক।

তাওরাতে আরো রয়েছে, হযরত নূহ আ.-এর সময়ে যখন মহাপ্লাবন শুরু হয়ে গেল তখন ফেরেশতারা গিয়ে আল্লাহকে সংবাদ দিলেন যে, আপনার সন্তানরা ডুবে যাচ্ছে, মাখলুক শেষ হয়ে যাচ্ছে। যখন কিছুই করা সম্ভব হচ্ছিল না তখন খোদা তায়ালা কান্না শুরু করে দিলেন। এত অধিক কাঁদলেন যে, চোখে ব্যথা হয়ে গেল। এমনকি পরবর্তীতে ফেরেশতারা তাঁর খোঁজ-খবর নিতে আসতেন– আপনার অবস্থা এখন কেমন? চোখের ব্যথা কি কমেছে?

এভাবে তারা বান্দার যাবতীয় অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত গুণাবলিকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল। পক্ষান্তরে অন্যপক্ষ (নাসারা) আল্লাহর গুণাবলিকে বান্দার জন্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল। যেমন হযরত ঈসা আ.কে খোদা ও খোদার ছেলে বলতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা মনে করত ঈসা আ. ইলমে গায়েবের অধিকারী ছিলেন, তারা আল্লাহর জন্য স্ত্রী সাব্যস্ত করে নিয়েছিল। একপক্ষ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত গুণাবলিকে বান্দার জন্য স্বীকৃতি দিয়েছিল, অন্যপক্ষ বান্দার ত্রুটিপূর্ণ গুণাবলিকে আল্লাহর জন্য মেনে নিয়েছিল। এক পক্ষ মানুষকে আল্লার আধার সাব্যস্ত করে নিয়েছিল– বান্দা কর্তৃক আল্লাহকে আচ্ছাদিত করে নেবার আকিদার উদ্ভব করেছিল। এ আকিদা অনুযায়ী তারা বিশ্বাস করত– মানব দেহের অভ্যন্তরে আল্লাহ বিরাজমান রয়েছেন। এভাবে মাখলুক হয়ে গেল আল্লাহকে ধারণ করার আধার, আল্লাহর ধারক-বাহক। পক্ষান্তরে অন্যপক্ষ আল্লাহকে আধার করে মাখলুককে তাঁর ভেতরে লীন হয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করেছে। মাখলুকের উদাহরণ দিতে গিয়ে তারা ফলের মধ্যের বিচির উদাহরণ দিয়েছে। তো একপক্ষ মাখলুককে আল্লাহর আধার সাব্যস্ত করেছে, অন্যপক্ষ আল্লাহকে মাখলুকের আধার সাব্যস্ত করেছে। প্রথম অবস্থা আল্লাহর জালালাতের পরিপন্থী আর দ্বিতীয় অবস্থা আল্লাহর অহদানিয়াতের বিরোধী। মোটকথা, সে সময়ে উভয় প্রকারের আকিদা বিদ্যমান ছিল এবং খালেক ও মাখলুকের মধ্যকার পার্থক্য বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

নাসারাদের বিশ্বাস খণ্ডন

নাসারা বা খ্রিস্টানদের দাবি হলো হযরত ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ

ইহুদীরা বলে উজাইর আ. আল্লাহর পুত্র, আর নাসারারা বলে ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র। [তাওবা ৯ : ৩০]

ইহুদীরা এর থেকে আরো অগ্রসর হয়ে দাবি করতে শুরু করল যে, শুধু উজাইর আ.ই কেবল আল্লাহর পুত্র নন, সকলেই আল্লাহর সন্তান–

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

আমরা সকলে আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়ভাজন। [মায়েদা ৫ : ১৮]

এভাবে তারা কেবল একজনকে নয়, লক্ষজনকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করল। এ প্রসঙ্গে আমার শিক্ষামূলক একটি বাস্তব ঘটনা মনে পড়ে গেল। দারুল উলুম দেওবন্দের একেবারে সূচনালগ্নের কথা। তখন দেওবন্দের সদরুল মুদাররিস ছিলেন মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ.। তিনি শুধু বিজ্ঞ আলেমই ছিলেন না, আরিফবিল্লাহ ও কাশফ-কারামাতের অধিকারী বুযুর্গও ছিলেন। তাঁর সময়ের ঘটনা। মাদরাসার নীচের দিকের জামায়াতে পড়ুয়া এক ছাত্র মাদরাসা থেকে বেশ দূরে কোথাও গিয়েছিল। সেখানে খ্রিস্টানদের এক সভা চলছিল। তাদের একজন পাদ্রী আলোচনা করছিল আর লোকজন তা শুনছিল। এ ছাত্রটিও সেখানে অংশগ্রহণ করল। আলোচনার এক পর্যায়ে পাদ্রী হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে বলল, তিনি ছিলেন আল্লাহর ছেলে। এরপর পাদ্রী নিজের মতো করে তা প্রমাণ করতে লাগল। উক্ত তালিবে ইলম তা সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদ করতে লাগল। বলল, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। আল্লাহর সন্তান হওয়া কী-করে সম্ভব? ছাত্রটি দলিল দিতে শুরু করল আর পাদ্রী তা খণ্ডন করতে লাগল। পাদ্রী খুব বুঝদার ব্যক্তি ছিল আর বেচারা তালিবে ইলম মাত্র কয়েক জামায়াত পড়েছে। কুরআন হাদিসের কিছুই সে জানে না। পাদ্রীর সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব প্রভাব পড়ল। তারা তো জানে না যে এ একজন ছাত্র। তারা মনে করেছে দারুল উলুম দেওবন্দের একজন আলেম, পাদ্রী তাকে হারিয়ে দিয়েছে। তার সামনে কথাই বলতে পারেনি।

সভাস্থলের পাশেই খাদ্যসামগ্রী বিক্রির একটি হোটেল ছিল। হোটেল মালিক হোটেলে বসে আলোচনা শুনছিল। তার খুব খারাপ লাগল। বলল, আমাদের দারুল উলুমের তো আরো বদনাম হয়ে যাবে। সে দোকান থেকে লাফিয়ে নেমে এল। ছাত্রটিকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, মৌলভী সাহেব! এখান থেকে সরে যাও। এ পাদ্রী জাহেল, আর জাহেলের সাথে জাহেলই লড়তে পারে। এটা আলেমের কাজ নয়। ওকে আমি বুঝাচ্ছি।

দোকানদারের আগমন ছাত্রটির কাছে গনিমতের মতো মনে হলো। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে খুব পেরেশান হচ্ছিল।

দোকানদার এবার পাদ্রীর দিকে মুখ করে বলল, জি পাদ্রী সাহেব, কী

বলছিলেন?

পাদ্রী বলল, আমি বলছি, ঈসা আ. আল্লাহর ছেলে।

দোকানদার বলল, আপনি বলছেন ঈসা আ. আল্লাহর ছেলে? আল্লাহ তাঁর পিতা? আল্লাহর বয়স কত?

পাদ্রী বলল, বেয়াকুব! আল্লাহ তো অনাদি, তাঁর বয়স কী-করে হতে পারে? বয়স জানতে চাওয়া যায় তার– যে প্রথমে ছিল না, পরেও থাকবে না। জন্ম তারিখ ধরে তার বয়স নিরূপণ করা যায়। যিনি অনাদি ও অনন্ত, তাঁর বয়স জানতে চাওয়া বেয়াদবি ছাড়া আর কী?

দোকানদার বলল, এত দীর্ঘ জীবনে তাঁর কতজন সন্তান হয়েছে?

পাদ্রী বলল, একজন, হযরত ঈসা আ.।

দোকানি বলল, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ! আরে, আমি বায়ান্ন বছরের জীবনে বারোজন সন্তান জন্ম দিয়ে ফেলেছি, আর আল্লাহ তায়ালার লক্ষ-কোটি অজস্র-অসংখ্য বছরের জীবন, আর মাত্র একটি সন্তান! বারোটি সন্তান তো কেবল আমারই হয়ে গেছে! জোয়ান-তাজা ছেলেগুলো এই সামনেই রয়েছে। পাদ্রীর কাছে এর কী-ই-বা জবাব ছিল? সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু জনতার আওয়াজে তা থেমে গেল। তারা বলল, দোকানি তো ঠিকই বলেছে! এত বড় যখন জীবন, তখন তো অজস্র-অসংখ্য সন্তান হওয়া আবশ্যক। সর্ব সাকুল্যে মাত্র একজন সন্তান! এ তো মানুষের জন্যেও দোষের কথা যে, একশ' বছরের জীবনে সাকুল্যে একটি সন্তান জন্ম হয়েছে। লোকেরা বলবে, কোন্ পাত্রের খানা খেয়েছ! তোমার মধ্যে কোনো জীবন কী আছে, না নেই? অনাদি হতে অসীম কালের জীবন যাঁর, অসীম যাঁর শক্তি-সামর্থ্য, তার সন্তান মাত্র একটি! বিষয়টি সাধারণ মানুষকে খুব প্রভাবিত করল। তারা তালি দিতে শুরু করল।

পাদ্রী বেচারা চিল্লিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু লোকজন বলল, তুমি ভুয়া! তোমার মুখে কথা সরছে না।

মোট কথা, বিতর্কের ইশতেহার ঘোষণা হলো– মুসলমান জিতে গেছে আর পাদ্রী হেরে গেছে।

এ ঘটনা যখন মাওলানা ইয়াকুব সাহেব শুনলেন, তখন তিনি বললেন, হোটেল মালিক বিজ্ঞ আলেমসুলভ উত্তর দিয়েছে। কিন্তু পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে সে তার কথা স্বীয় সাধারণ ভাষায় ব্যক্ত করেছে। তার কথার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পিতা হওয়া যদি আল্লাহর সিফাতে কামাল হতো এবং

সন্তান হওয়া যদি তাঁর জন্য কোনো কামালিয়াতের বিষয় হতো তাহলে তাঁর অন্যসব সিফাতের মতো এ সিফাতটিও অসীম হওয়া আবশ্যক হতো। তাঁর সন্তান অগণিত-অসংখ্য হওয়া আবশ্যক হতো– যার কোনো শেষ নেই, সীমা নেই। পক্ষান্তরে সন্তান হওয়া যদি আল্লাহর জন্য সমীচীন না হয়, দোষের হয়, তাহলে একটি সন্তান হওয়াও দোষের। একটি হতেও পবিত্র হওয়া আবশ্যক। এই ছিল হোটেল মালিকের উদ্দেশ্য। কিন্তু বেচারার পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে নিজের মতো করে ব্যক্ত করেছে। যাই হোক, নাসারারা আল্লাহর একজন সন্তান থাকার দাবি করত।

ইহুদীদের বিশ্বাস খণ্ডন

ইহুদীরা নাসারাদের চেয়ে আরো অগ্রসর হয়ে দাবি করল:

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

আমরা সকলে আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়ভাজন। [মায়েদা ৫ : ১৮]

এদের এই বিশ্বাস যেন উপরোক্ত হোটেল মালিকের ভাবনারই অনুরূপ। যিনি বিতর্কের সময় বলেছিলেন যে, বহু সন্তান হওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, ইহুদীরা মনে করেছিল যে, আল্লাহর মাত্র একজন ছেলে! হাজার হাজার, কোটি কোটি হওয়া উচিত। এ ভাবনায় পড়ে তারা বলতে শুরু করল যে, আমরা সবাই আল্লাহর ছেলে। আর ইহুদী ছাড়া অন্য যেসব সম্প্রদায় রয়েছে তাদের কেউ তার প্রিয়ভাজন, কেউ ভাই-ভাতিজা প্রভৃতি। মোটকথা তারা আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করে নিল। নৈকট্যপ্রণালীরূপে তারা আত্মীয়তাকে সাব্যস্ত করল। [এ বিশ্বাসের অসারতা সদ্য সমাপ্ত অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।]

মুশরিকদের বিশ্বাস খণ্ডন

মুশরিকরাও আল্লাহর সন্তান থাকার প্রবক্তা ছিল। তারা বলতো, ফেরেশতারা হলেন আল্লাহর মেয়ে। যার জওয়াব কুরআনে এভাবে এসেছে:

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى ○ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ○

তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত কর? এতো এক অসম বন্টন। [নাজম ৫৩ : ২১-২২]

অর্থাৎ তোমাদের স্বভাব হলো, পুত্র সন্তান হলে তোমরা আনন্দিত হও, নিজেদের জন্য পুত্র সন্তানই তোমাদের পছন্দ। কন্যা সন্তান হলে তোমরা নাক সিটকাও, অপছন্দ কর। নিজেদের যখন এই অবস্থা তখন আল্লাহর জন্য কিভাবে কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করলে? নিজেদের ভাগে পুত্র সন্তান আর আল্লাহর ভাগে কন্যা সন্তান– এতো এক পক্ষপাতিত্বমূলক অসম বণ্টন। যা নিজেদের জন্য পছন্দ করেনি এ জালিম তাই আল্লাহর মাথায় তুলে দিয়েছে। আল্লাহর জন্য সন্তান যদি সাব্যস্ত করবেই, তাহলে কমপক্ষে (নিজেদের পছন্দের ভিত্তিতে) ইহুদীদের মত অন্তত পুত্র সন্তান সাব্যস্ত করত।

যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনলগ্নের অবস্থা এমন ছিল যে, মাখলুক তার খালেকের কদর ও সম্মান বুঝতো না। খালেক ও মাখলুকের মধ্যকার পার্থক্য ভুলে গিয়েছিল। নিজেদের ত্রুটিপূর্ণ গুণাবলিকে আল্লাহর জন্যও প্রযোজ্য বলে ধরে নিয়েছিল– আমরা যেমন সন্তানের পিতা, তিনিও তেমন সান্তানের পিতা। আমাদের মত আল্লাহরও সন্তান রয়েছে, আমরা যেমন কোনো না কোনো স্থানে অবস্থান করি তিনিও তদ্রূপ স্থানের মুখাপেক্ষী। আমরা যেমন সীমাবদ্ধ, তিনিও তেমন সীমা ও গণ্ডিবদ্ধ (নাউজুবিল্লাহ)। মোটকথা অজ্ঞতার আঁধার এমনভাবে তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল যে, ইলমের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট ছিল না।

বুদ্ধি বিলোপ

এভাবে আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি ও তাওহীদের ব্যাপারে মানুষের ইলম বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাওহীদ হলো একটি বুদ্ধিভিত্তিক বিষয় (এর জন্য নবী-রাসূলের আবশ্যক হয় না, সুস্থ বিবেক অনায়াসে তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়)। মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা এ শিক্ষা লাভ করে থাকে; কিন্তু তখন অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তাওহীদ বোঝার মতো অনুভূতিও তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না।

জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের সামনে বিশুদ্ধ তাওহীদের দাওয়াত উপস্থাপন করলেন তখন মক্কার মুশরিকরা আশ্চর্য হয়ে বলল:

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلٰهًا وَّاحِدًا [سورة ص ٣٨: ٥]

হুই এ পয়গম্বর কি হাজারো দেব-দেবীকে বাদ দিয়ে মাত্র একজন আল্লাহ করেছেন? মাত্র একজন খোদা সমগ্র আসমান-জমিন নিয়ন্ত্রণ করবেন?

إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

এতো এক আশ্চর্য বিষয়। [সোয়াদ ৩৮ : ৫]

রূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একত্ববাদের দাবি তাদের কাছে র্য ও অদ্ভুত বিষয় বলে মনে হয়েছে। অথচ শিরকে লিপ্ত হওয়াটাই কিন্তু ্ আশ্চর্যের বিষয়। তাদের রগ-রেশায় শিরক ঢুকে যাওয়ার কারণেই তাওহীদকে তাদের কাছে অদ্ভুত মনে হতে লাগল।

তাওহীদের সংক্ষিপ্তসার

কৃত অর্থেই তাওহীদের মূল বিষয়টি বিবেক সমর্থিত। নবী আ.গণ যদি দুনিয়াতে নাও আগমন করতেন তবুও মানুষের সুস্থ বিবেক মৌলিক তাওহীদ ও আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দিত। এ কারণেই ওলামায়ে কেরাম লেখেন, দি কোনো জাতি বা ব্যক্তির কাছে নবীগণের দাওয়াত না পৌঁছে এবং সে ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে যায় তবুও কেয়ামতে তার কাছে তাওহীদ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। এমন ব্যক্তিকে শুধু মৌলিক তাওহীদের স্বীকৃতি দিতে হবে যে, 'হ্যাঁ, মি জানতাম সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন এবং তিনি এক ও একক।' (কেননা সুস্থ বিবেক এ কথা মানতে বাধ্য যে, এই বিশাল বিশ্বজগৎ একা একা সৃষ্টি হতে পারে না এবং একাধিক নিয়ন্ত্রক থাকলে এত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতে পারে না)।

তাওহীদের এই মৌলিক বিষয়টুকু এমনিতেই মানুষ বুঝতে পারে, তবে বিস্তারিত বিবরণ নবী আ.গণ দিয়ে থাকেন। বিশ্বস্ত সংবাদদাতা ও ওহী ব্যতীত তাওহীদের সুবিস্তারিত বিবরণ জানা সম্ভব নয়। তাওহীদের মূলকথা বিবেক দ্বারা বোঝার বিষয় হলেও সে যুগের মানুষের মধ্য হতে এ বুঝটুকুও শেষ হয়ে গিয়েছিল। অজ্ঞতার আঁধার তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের সামনে তাওহীদের বাণী উপস্থাপন করলেন তখন তারা বলল:

إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

ইনি কী আশ্চর্য ও অদ্ভুত কথা বলছেন! একজন মাত্র খোদা সমগ্র বিশ্বজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করবেন?

অজ্ঞতার আঁধার

অদ্রূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের সামনে পুনরুত্থানের বিষয় উপস্থাপন করলেন, বললেন– এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, সকলকে আবার জীবিত করা হবে, সেদিন তোমাদেরকে এই জীবন সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। তখন তারা এ কথা শুনে বিস্ময়াবিভূত হয়ে জানতে চাইল:

مَنْ يُحْيِى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ

আমাদের অস্থিমজ্জা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর কে আমাদেরকে জীবিত করবে? কিভাবে জীবিত করবে? [ইয়াসিন ৩৬ : ৭৮]

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এক সত্তা যে রয়েছেন তা তাদের বুঝে আসতো না। মোটকথা অজ্ঞতার অন্ধকার তাদের কলবকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল যে, তাওহীদের মতো বিবেক সমর্থিত বিষয়টিকেও তাদের কাছে অদ্ভুত বিষয় বলে মনে হচ্ছিল।

মানব-নবী প্রসঙ্গ

সে যুগের লোকজনের কাছে পয়গম্বরের শান ও সত্তাকেও অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তারা বলেছিল:

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْأَسْوَاقِ

ইনি কেমন রাসূল! পানাহার করেন, বাজারে যান। [ফুরকান ২৫ : ৭]

তারা ধরে নিয়েছিল রাসূল হবেন মানবিক গুণাবলির ঊর্ধ্বে। এ কারণেই তারা মানুষের মধ্য হতে রাসূল হওয়াকে অস্বীকার করা কর্তব্য মনে করেছিল। মনে করত, রাসূল কখনো মানুষ হতে পারেন না, মানবীয় গুণাবলি তার মধ্যে থাকা সম্ভব নয়।

অথচ বাস্তবতা ছিল এই– মানবীয় সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য আম্বিয়া আ.গণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, যেন মানুষ তাদেরকে আল্লাহ বলে সন্দেহ করার অবকাশ না

পায়। কেননা আম্বিয়া আ.গণ থেকে মুজেযা প্রকাশ পেত। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তার দিকে যদি দৃষ্টি দেই তবে দেখতে পাই– ইশারা করার দ্বারা চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায়; ইশারা করা দ্বারা মূর্তি এসে ওজুর পানি এগিয়ে দেয়; গাছের প্রতি ইশারা করা মাত্র দৌড়ে এসে মাথার উপর ছায়ার ব্যবস্থা করে; পানিতে হাত দেবার পর আঙুল হতে ঝর্ণা প্রবাহিত হয় এবং সে পানি পান করে পনেরশত মানুষ তৃপ্ত হয়। তো একদিকে এইসব কুদরতী আশ্চর্য বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ লাভ করেছে আর অপর দিকে অবস্থা এমন ছিল যে, যদি জ্বরও আসতো তবে তা প্রবলভাবে আসতো। তিনি বলতেন, স্বাভাবিকভাবে তোমাদের যে জ্বর আসে আমার জ্বর তার চেয়ে দ্বি-গুণ আসে। উহুদ যুদ্ধে পাথরের আঘাতে তাঁর মাথা মোবারক ফেঁটেগিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়, সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়ে যান। প্রিয় সাহাবীগণ ছটফট করতে করতে শহীদ হয়ে যান। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। দীনের দাওয়াতে তায়েফ পৌঁছেছেন তো বদমাশেরা তাঁর পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। পাথর নিক্ষেপ করে করে পা মোবারক যখম করে দিয়েছে। কাবাঘরে সিজদারত অবস্থায় মক্কার কুরাইশরা উটের নাড়িভূঁড়ি এনে এমনভাবে তাঁর মাথার উপর নিক্ষেপ করে যে, সিজদা থেকে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে যাদু করা হয়েছে, যাদুর প্রভাব তাঁর উপর কার্যকর হয়েছে। তো একদিকে এমন কুদরত যে ইশারা করা মাত্র চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যায় আবার অন্যদিকে অবস্থা এমন যে নাড়িভূঁড়ি নিক্ষেপ করা হলে তিনি উঠতে পারেন না। একদিকে আঙ্গুল হতে প্রশ্রবণ প্রবাহিত হয়, অপর দিকে নবীর ঘর হতে দুই মাস পর্যন্ত ধোঁয়া নির্গত হয় না, খাদ্য পাকাবার মতো কিছু থাকে না। এই বিপরীতমুখী বিষয়গুলো কেন রাখা হয়েছে? যদি শুধু মুজেযা দেওয়া হতো তবে তাঁর সত্তাকে 'আল্লাহ' বলে সন্দেহ করার অবকাশ থাকতো। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা সকল মানবীয় বিষয়াবলি তাঁর মধ্যে রেখেছেন, যাতে করে নবীগণের 'মানুষ' হওয়াকে কেউ অস্বীকার করতে না পারে।

নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব

ইরশাদ করা হয়েছে, নিজ মুখে ঘোষণা করুনঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ

হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ; তবে (পার্থক্য এই) আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়। [ফুসসিলাত ৪১ : ৬]

অর্থাৎ আপনি ঘোষণা করুন যে, আমি একজন মানুষ। শুধু মানুষ বলেই ক্ষান্ত হননি, বলেছেন مِثْلُكُمْ – তোমাদেরই মতো। অর্থাৎ তোমরা যে পদ্ধতিতে জন্মগ্রহণ করেছ, আমার জন্মগ্রহণ পদ্ধিতিও তাই। তোমরা যেভাবে মারা যাও, আমিও তদ্রূপ মারা যাব। তোমাদের উপর যেমন রোগবালাই, বিপদাপদ আসে, আমার উপরও তদ্রূপ আসে। সুতরাং আমি একজন মানুষ এবং তোমাদেরই অনুরূপ মানুষ। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এতটুকু শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন যে, আমার উপর ওহী অবতীর্ণ করেছেন, স্বীয় কালাম আমার উপর নাযিল করেছেন। এটা হলো আমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা তোমাদের কাউকে দেওয়া হয়নি। এ শ্রেষ্ঠত্বটুকু আল্লাহর পক্ষ হতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাকে এ শ্রেষ্টত্ব দান করা হয়েছে? মানুষকেই দান করা হয়েছে। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির পর মানবীয় সীমা বাতিল হয়ে যায়নি। আমার উপর আগত ওহীর অনুসরণ করতে তোমাদেরকে যেমন দাওয়াত দিচ্ছি, আমিও তদ্রূপ এ ওহীর অনুসারী। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ

আপনি বলুন, আমি তো নতুন কোনো রাসূল নই এবং আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী আচরণ করা হবে তাও আমার জানা নেই। [আহকাফ ৪৬ : ৯]

আমার দ্বারা রাসূল আগমন ধারার সূচনা হয়নি। আমি হঠাৎ আগত কোনো রাসূল নই। আমি ওহীর অনুসরণ করি। তোমরা যেমন আনুগত্যকারী, আমিও তদ্রূপ আনুগত্যকারী।

এই সকল বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এজন্যই পেশ করানো হয়েছে, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি একজন মানুষ।

মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করার ক্ষতি

মূল কথা হলো, মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করা একটি দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমাদের মধ্য হতে আল্লাহ এমন এক বরকতময় সত্তাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি

সমগ্র মাখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ হলো মানব জাতিকে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত সম্মান। এমন একটি সম্মানে আল্লাহ্ আমাদেরকে সম্মানিত করবার পর আমরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানবীয় সীমার ঊর্ধ্বে এক সত্তা সাব্যস্ত করি তাহলে তা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য ও বঞ্চিত হওয়া বলে গণ্য হবে। আমরা দলিলের ভিত্তিতে বলব যে, তিনি একজন মানুষ। এতে করে তার বরকতময় সত্তা দ্বারা মানব জাতির সম্মান প্রস্ফুটিত হবে। যাই হোক, একদিকে যেমন তাঁকে মুজেযা দেওয়া হয়েছে, অপর দিকে মানবীয় বিষয়াবলির সন্নিবেশও তাঁর মধ্যে ঘটানো হয়েছে। যেন তাঁর ব্যাপারে কারো মধ্যে প্রভুত্বের সংশয় দেখা না দেয়।

আবদিয়াত প্রকাশ করার নির্দেশ

কেউ যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর সমপর্যায়ের সত্তা না ভাবে সে জন্য এক স্থানে তিনি বলেছেন; এবং বলেছেনও আজ্ঞাবহ হয়েই–

قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ أَحَدٌ وَّلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِه مُلْتَحَدًا.

আপনি ঘোষণা করে দিন, আল্লাহ্ যদি আমাকে গ্রেফতার করেন তাহলে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। একমাত্র তাঁর অনুগ্রহ ও দয়াই কেবল আমাকে রক্ষা করতে সক্ষম। [জিন ৭২ : ২২]

তার সাথে সাথে আপনি আরো একটি বিষয় ঘোষণা করুন–

لَنْ یُّنْجِیَ اَحَدَکُمْ عَمَلُه

আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত তোমাদের কারো আমলই তাকে (আমলকারীকে) মুক্তি দিতে সক্ষম নয়।

এ কথা শুনে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. আরজ করলেন–

وَ اَنْتَ یَا رَسُوْلَ اللّٰه؟

হে আল্লাহর রাসূল! আপনার আমলও কি আপনাকে মুক্তি দিতে পারবে না?

আল্লাহর রাসূল বললেন–

لَا – اِلَّا أَنْ یَتَغَمَّدَنِیَ اللّٰه بِرَحْمَتِه

না, আমাকেও আমার আমল মুক্তি দেবে না, যতক্ষণ না আল্লাহর অনুগ্রহ আমার সঙ্গী হয়।

আম্বিয়া আ.দের যবান থেকে আবদিয়াতের এই ঘোষণা উচ্চারণ করানোর কারণ হলো, মানুষের মনে যেন তাদের ব্যাপারে প্রভূত্বের সন্দেহের উদ্রেক না হয়। এ কারণেই এইসব বিষয়ের অবতরণ হয়েছে।

আবির্ভাবকালের সংক্ষিপ্ত চিত্র

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবকালে শিরকে নিমজ্জিত পৃথিবীর মুশরিকদের ধারণা ছিল নবী হবেন মানব-সত্তা হতে ঊর্ধ্ব কোনো সত্তা, যারা পানাহার করবেন না, ঘর সংসার করবেন না। এ জন্যই তারা বলতো–

مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِى الْأَسْوَاقِ

ইনি কেমন রাসূল! পানাহার করেন, হাটবাজারে গমন করেন। [ফুরকান ২৫ : ৭]

মোটকথা আল্লাহর ব্যাপারে যেমন তারা চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, আল্লাহর রাসূলের ব্যাপারেও তদ্রূপই ছিল। আর তা কেবল আরবেই নয়; আরব-অনারব সর্বত্রই একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। এ প্রসঙ্গটা হাদিসে এভাবে এসেছে–

إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلى قُلُوْبِ بَنِىْ اٰدم، فَمَقَتَ عَرَبَهُمْ وَ عَجَمَهُمْ.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মানুষের কলবের দিকে দৃষ্টি দিলেন। আরব-অনারব সর্বত্রের অবস্থা দেখে তাঁর দৃষ্টি কঠোর হয়ে গেল। সামান্যতম শুদ্ধতাও ছিল না কোথাও। إِلا غُبَرَ أَهْلُ الكِتَاب কয়েকজন গুহাবাসী আহলে কিতাব ব্যতীত। যারা পাহাড়ের গুহায় বসে সত্যের সাধনা করছিলেন, নিজেদের দীন রক্ষা করে চলছিলেন। জনমানব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদেরকে দীন পালন করতে হচ্ছিল। জনসম্মুখে, সাধারণ লোকালয়ে নিজেদের দীনের উপর চলার অবকাশ ছিল না। দীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য লোকজনকে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হচ্ছিল। আকিদা, আমল, আখলাক, রুসুম– সবকিছুই ঘোরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। চারদিকে কেবল আঁধার আর আঁধার। এ পরিস্থিতিতে একটি তেজদীপ্ত আলোক ফোয়ারার একান্ত প্রয়োজন ছিল। যে আলোর দীপ্তিতে অন্ধকারের সকল পর্দা ছিন্ন হয়ে উজ্জ্বল দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। যার দ্বারা আকিদা, আমল ও বাস্তব অবস্থা ঠিক হয়ে যায়। সুতরাং এই ঘোরতম

অন্ধকারকে বিতাড়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন।

আবির্ভাবের শান

জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পৃথিবীতে তাশরীফ আনার শান এমন ছিল যে, তাঁর ডান হাতে ছিল সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ। একত্রে দুটি বস্তুসম্ভার নিয়ে তিনি পৃথিবীতে আগমন করেছেন। আপনারা হয়তো বলবেন, এটা আবার কেমন কথা। কোনো ইতিহাসে তো আমরা পড়িনি কিংবা কোনো হাদিসেও দেখিনি যে, তাঁর হাতে চাঁদ ও সূর্য ছিল। এতো এক নতুন কথা! আমি আপনাদেরকে বলছি, একটু ধৈর্য ধারণ করুন। নিঃসন্দেহে তাঁর ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ ছিল।

সূর্য দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডান হাতে ছিল আল্লাহর দেদীপ্যমান কিতাব আর বাম হাতে ছিল নবুওয়াতের কলব, যা ছিল আখলাকের দ্যুতিতে পূর্ণ। আল্লাহর কিতাবের মধ্যে ছিল উলুহিয়্যাতের প্রখর দীপ্তি। যদি শুধু কিতাব অবতীর্ণ হতো, পয়গম্বর না আসতেন, তাহলে আল্লাহর কিতাবের তাজাল্লি মানুষকে ভস্ম করে দিত। সে কিতাব বোঝার সামর্থ্য কারো হতো না। এই প্রখর রৌশনীকে নবীর কলবে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতঃপর নবীর আবদিয়াতের সাথে যখন উলুহিয়্যাতের নূরের সংযোগ ঘটেছে তখন তার মধ্যে শীতলতার সৃষ্টি হয়েছে, যা মানুষের জন্য সহনশীল। সুতরাং আল্লাহর কিতাব ছিল সূর্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কলব ছিল চাঁদ। যে কলব ছিল পূর্ণাঙ্গ আখলাকের কেন্দ্র। তাঁর পৃথিবীতে আগমনের শান এমনই ছিল। অর্থাৎ জালাল বা তেজদীপ্ততাও ছিল এবং জামাল বা স্নিগ্ধ সৌন্দর্যময়তাও ছিল। আল্লাহর কিতাবে ছিল 'জালাল' এবং রাসূলের কলবে ছিল 'জামাল'।

শরীয়তের ভারসাম্যতা

কিতাবের তেজদীপ্ততা এবং রাসূল-কলবের কোমনীয়তা– এই উভয় বিষয় ইসলামী শরীয়তে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ শরীয়ত রহমাতুল্লিল আলামীনের শরীয়ত। এতে একদিকে যেমন দয়া, সহমর্মিতা ও ক্ষমার বিধান রয়েছে; অপর দিকে তেমন হদ, কিসাস ও জিহাদের বিধান রয়েছে। চুরি করলে হাত কেটে দাও, ব্যভিচার করলে প্রস্তরাঘাত কর– এমন কঠোর বিধানও রয়েছে। সুতরাং

শরীয়তে একদিকে যেমন পরম কোমনীয়তা, জগতবাসীর জন্য রহমতের সুপেয় সুধা রয়েছে, অপর দিকে তেমন কঠোরতাও রয়েছে, সাজা-শাস্তির বিধান রয়েছে। এ জন্যই এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

بُعِثْتُ مَرْحَمَةً وَ مَلْحَمَةً.

অর্থাৎ আমি পরম রহমত ও চরম কঠোরতার সহিত প্রেরিত হয়েছি। অনুগতদের জন্য আমি রহমত স্বরূপ, দয়ার সাগর; আর অপরাধীদের ব্যাপারে কঠোর হতে কঠোর। তদ্রূপ আরো বলেন–

أنا الضَّحُوْكَ الْقَتَّالُ

আমি অধিক সহাস্যবদন, প্রবল যোদ্ধা।

অর্থাৎ আমার মধ্যে রহমতের শানও রয়েছে, আল্লাহর রহমত দ্বারা আমাকে সিক্ত করা হয়েছে, আবার আমার মধ্যে কঠোরতার শানও রয়েছে। খোদাদ্রোহীদের ব্যাপারে আমি প্রবল কঠোররূপ ধারণ করি। মোটকথা, কোমলতা ও কঠোরতা– এই উভয় প্রকার শান নিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছেন এবং তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর বরকতময় সত্তা প্রকৃতপক্ষে এক উজ্জ্বল নূর। কেমন ছিল সে নূর?

সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী নূর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনলগ্নে সমগ্র পৃথিবী যেমন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তার বিপরীতে তিনি নিয়ে এসেছিলেন প্রখর আলোক দীপ্তি। আখলাক-চরিত্র ও আকিদা-বিশ্বাসের তমসা মানুষকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল। প্রকৃতি ও স্বভাবজাত প্রবৃত্তির অন্ধকার এমনই এক অন্ধকার, যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করবার ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে এমনই এক জ্যোতির প্রয়োজন ছিল যা এই অন্ধকারকে দূর করতে সক্ষম। সূর্যের আলো দ্বারা এ অন্ধকার দূর করা সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন হলো নবুওয়াতের নূর। এ নূর হলো ইলম, কামালাত ও আখলাকের নূর। মূলত নবুওয়াত হলো একটি নূর, একটি জ্যোতির ফোয়ারা।

আমি যে অন্ধকারের কথা বলছি তার দ্বারা সূর্য অস্ত যাওয়ার কারণে যে অন্ধকারের সৃষ্টি হয় সে অন্ধকার উদ্দেশ্য নয়। সেটা হলো অনুভবযোগ্য দৃশ্যমান অন্ধকার। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ

জুলুম হলো ভীষণ এক অন্ধকার।

অর্থাৎ ইনসাফ হলো আলো আর জুলুম হলো আঁধার। ইনসাফের আলো কিংবা জ্ঞানের আলো কিন্তু সূর্যের আলোর অনুরূপ নয়। তবে এ আলো এমনই এক আলো, সূর্যের আলো যার সামনে ম্লান।

সূর্যের আলো কেবল ঘরবাড়ি ও বস্তুগত জগৎকে আলোকিত করে আর ইলমের আলো কলব ও রূহকে আলোকিত করে। সূর্যের আলো কেবল জমিন ও স্থানকে আলোকিত করে কিন্তু ইলমের আলোয় স্থান-কাল-পাত্র– সবকিছুই আলোকিত হয়ে যায়। যাই হোক, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর নূর, আল্লাহর জ্যোতি, কিন্তু এ নূর বস্তুগত কোনো নূর নয়, অদৃশ্য ও অর্থগত এক নূর। আল্লাহর ইলমের যে রশ্মি তাঁর উপর পতিত হয়েছে তা অন্য কারো উপর পতিত হয়নি।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُوْرِىْ

সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন।

এ রেওয়ায়াতকে কেউ কেউ 'জয়িফ' এবং কেউ কেউ 'মাউজু' বলেছেন (হাদিস শাস্ত্রের দুটি পরিভাষা, উদ্দেশ্য হলো বর্ণনাসূত্র বা সনদ অকাট্য নয়)। তবে বর্ণনাসূত্র যেমনই হোক, বিষয়বস্তু সহি আছে। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে:

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ

আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য এসেছে এক নূর।
[মায়েদাহ ৫ : ১৫]

এখানে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তা। 'সর্বপ্রথম আল্লাহ আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন'– এ হাদিসের সনদ যদিও দুর্বল কিন্তু এর বিষয়বস্তু উক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকায় তা সহি। যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন নূর, কিন্তু এ নূর অদৃশ্য, অর্থগত। এ হলো রূহানী নূর, আখলাকের নূর। মহান আল্লাহর কামালাত তাঁর মধ্যে বিচ্ছুরিত হতো। তাজাল্লি ছড়াতো। এ কামালাতের দ্যুতি তাঁর মধ্যে ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর কামালাতের এটম-এর প্রকাশক ছিলেন তিনি। যেমন আপনাদের সামনে এই যে বিদ্যুতের আলো রয়েছে, এর মধ্যে কী এমন বিশেষত্ব আছে? অতি সাধারণ কিছু তার; কিন্তু যখন পাওয়ার হাউজের সাথে এর সংযোগ হয়ে যায় তখন তা এমন উজ্জ্বল হয়ে যায় যে, মাঠঘাট পর্যন্ত

আলোকিত, চমকিত করে তোলে। এ আলো মূলত পাওয়ার হাউজ থেকে আসে। তারের মধ্যে কোনো আলো নেই। বাতি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পর তার আলোই কেবল চোখে পড়ে, তারের অস্তিত্ব নজরে আসে না। আলো আর ঔজ্জ্বল্যই কেবল দৃষ্টিগোচর হয়। এ অবস্থায় তার যদি বলে أَنَا النُّوْرُ (আমি নিজেই নূর) তাহলে সে বলতে পারে; কিন্তু প্রকৃত নূর অন্য জিনিস, তার সত্তা অন্য জিনিস। তারের সত্তার উপর নূরের তাজাল্লি পড়েছে, সে হয়ে উঠেছে নূরের প্রকাশক। সে কারণে তাকে নূরও বলা যায়। আর যদি সত্তার দিক বিবেচনা করা হয় তাহলে সে বলবে– আমি তো একটি তার, আলো যা দেখা যাচ্ছে তা অন্যজনের, যা আমার মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে।

আল্লাহর ইলমের তাজাল্লি নিজেদের মধ্যে বিচ্ছুরিত হওয়ার যোগ্যতা নিয়েই নবী আ.গণ পৃথিবীতে আগমন করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে থাকে আখলাকে রব্বানীর দ্যুতি। এ নূর রূপক নূর, যেমনিভাবে সে অন্ধকারও ছিল রূপক অন্ধকার। রূপক অন্ধকার দূর করতে রূপক নূরেরই আবশ্যকতা ছিল। সূর্যের আলো একে দূরীভূত করতে পারত না। তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা নূর হয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছে। তাঁর সত্তা দেখেই মানুষ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য চিনে নিয়েছে। ন্যায়-অন্যায়কে চিনে নিয়েছে। তাঁর আমল, আখলাক ও পবিত্র অবয়ব দেখে পৃথিবী একটি মানদণ্ড পেয়েছে এবং বুঝতে পেরেছে যে, কোন্ জিনিসের নাম নেকী? উত্তম আদর্শ কাকে বলে? পূর্ণতা কেমন জিনিস এবং দোষ-ত্রুটি বলতে কী বুঝায়?

আল্লাহ পার্যন্ত পৌঁছার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন একটি পথ ছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো পথের কল্পনাও করা যায় না। আলোর মশাল হয়ে তিনি পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং মানুষের জন্য আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথ উন্মুক্ত করেছেন।

সত্যের পথ-প্রদর্শক

পথ-প্রদর্শক কী জিনিস? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা মূলত একটি আলোক মশাল। যার দ্বারা পথ স্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু পথের জন্য পথ-প্রদর্শকের আবশ্যকতা রয়েছে। এ পথের পাথেয়, পথ-প্রদর্শক হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ও কর্মকাণ্ড। যে উসওয়ায়ে হাসানা তথা উত্তম আদর্শকে সীরাত বলা হয় সেই উসওয়ায়ে হাসানা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ ও অবস্থাদির সম্মিলিত

রূপ। প্রকৃতপক্ষে ইহাই হলো পথ-প্রদর্শক। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের জন্য দুটি বিষয় এসেছে। একটি হলো নূর, যার দ্বারা পথ স্পষ্ট হয়েছে। অপরটি হলো পথ-প্রদর্শক, পথের পাথেয়। তা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জীবন। যে জীবন আমাদেরকে পথ-নির্দেশ করে– এভাবে চলো।

আমলের আদর্শ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামপৃথিবীতে আগমন করে শুধু বিধান উপস্থাপন করেননি, বিধানের সাথে সাথে তার নমুনা, তার আদর্শও উপস্থাপন করেছেন। তিনি শুধু বলেননি যে صَلُّوْا – 'তোমরা নামাজ পড়'; বরং বলেছেন– صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ – 'তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ সেভাবে নামাজ পড়।' সুতরাং আমলের নমুনা হয়ে তিনি পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তাঁর সীরাত হলো আমাদের পথ-প্রদর্শক। তাঁর নামাজকে আদর্শ ধরে সে অনুযায়ী নামাজ পড়লেই কেবল তা সহি হবে, অন্যথায় সহি হবে না। এ জন্যই তিনি 'নামাজ পড়' না বলে 'আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ সেভাবে নামাজ পড়' বলেছেন।

অজুর ক্ষেত্রেও তিনি তদ্রূপ করেছেন। শুধু নির্দেশ দেননি বরং অজু করে দেখিয়েছেন। একবার তিনি অজু করে দেখালেন, প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধুলেন এবং বললেন–

هٰذَا وُضُوْءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلٰوةً إلاَّ بِهِ.

এই হলো অজু, যা ব্যতীত আল্লাহ নামাজ কবুল করেন না।

অঙ্গসমূহ যদি একবার করেও ধোয়া না হয় তাহলে অজু হবে না। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার অজু করলেন। এবার প্রতিটি অঙ্গ দুইবার করে ধুলেন এবং বললেন, এই হলো অজু, যা نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ তথা উত্তম পদ্ধতির অজু। এরপর তিনি তৃতীয়বার অজু করে দেখালেন। এবার অঙ্গসমূহকে তিনবার করে ধুলেন এবং বললেন–

هٰذَا وُضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ

এই হলো আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের অজু। তাঁরা এভাবেই অজু করতেন।

মুরব্বীর আবশ্যকতা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ, অজু প্রভৃতির নির্দেশ দিয়েই কেবল ক্ষান্ত হননি বরং বাস্তবে অজু করে দেখিয়েছেন এবং সেভাবে করতে বলেছেন। কেননা আমলের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য থাকে, যার স্বরূপ আমলকারী ব্যতীত বুঝে আসে না। কোনো কাজের আকৃতি সামনে না থাকলে শুধু শব্দের মাধ্যমে মানুষ তার উপর আমল করতে পারে না।

এটা কেবল দীনি বিষয়াবলির মধ্যেই প্রযোজ্য নয়, বরং কর্মের মাধ্যমে আদায়যোগ্য প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য যে, শুধু নিয়ম-নীতি ও কিতাব থাকাই যথেষ্ট নয়; বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাবার মতো একজন মুরব্বী, একজন উস্তাদ থাকা আবশ্যক।

দর্জি-বিজ্ঞানের কথাই ধরুন। সেলাই করার নিয়ম-পদ্ধতি বিষয়ে লিখিত পাঁচশত পৃষ্ঠার বইও যদি আপনি পড়ে শেষ করেন– যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো দর্জিকে আপনি সেলাই করতে না দেখবেন, আপনি সেলাই করতে পারবেন না। কেননা আমল করা বা কাজ করার ক্ষেত্রে এমন কিছু সূক্ষ্ম বিষয়াবলি থাকে যা কাগজে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এগুলো আয়ত্বে আনার জন্য অন্যের থেকে দেখে দেখে শিখতে হয়।

এদিকে লক্ষ করেই হযরত মুহাদ্দিসিনে কেরাম যখন কোনো আমলের হাদিস দরস দিতেন তখন তা বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতেন। রেওয়াতের ভিত্তিতেই তাঁরা আমলের বাস্তব রূপ দেখাতেন। আমি আমার সম্মানিত পিতার কাছে মিশকাত শরীফ পড়েছি। মিশকাত শরীফে নামাজ পড়ার পদ্ধতি বিষয়ে যখন রুকুর অধ্যায় এল, তখন তিনি রেওয়ায়াতগুলো পড়ে তা বুঝিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি শ্রেণীকক্ষে রুকু করে দেখালেন এবং বললেন, এই হলো রুকু; এমনই করতে হবে। অতঃপর যখন সিজদার বর্ণনা এল, তিনি বুঝিয়ে দেবার পর সিজদা করে দেখিয়ে বললেন, এমন করতে হবে। আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগল, আমরা তো রাতদিন রুকু-সিজদা করে থাকি, শ্রেণীকক্ষে তা দেখিয়ে দেবার কী প্রয়োজন?

তিনি বললেন, আমি এজন্য করে দেখালাম যে, আমি হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী রহ.-এর কাছে হাদিস পড়েছিলাম, তিনি আমাকে এভাবে করে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, আমি যখন শাহ আব্দুল গনি মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর কাছে হাদিস পড়েছিলাম তখন তিনিও এই হাদিস বর্ণনা শেষে এভাবে রুকু-সিজদা করে

আমাকে দেখিয়েছিলেন। শাহ আব্দুল গনি মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. আমাকে বলেছিলেন, আমি যখন শাহ ইসহাক রহ.-এর কাছে হাদিস পড়েছিলাম তিনিও আমাকে এভাবে রুকু-সিজদা করে দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি যখন শাহ আব্দুল আজিজ রহ.-এর কাছে হাদিস পড়েছি তখন তিনি আমাকে হাদিস বুঝিয়ে দেবার পর এভাবেই রুকু-সিজদা করে দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আমাকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. এভাবে করে দেখিয়েছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. বলেছেন, আমাকে শায়খ আবু তাহের মাদানী রহ. এভাবেই রুকু-সিজদা করে দেখিয়েছিলেন। এভাবে এর সনদ গিয়ে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ধারাবাহিকভাবে আমলের নমুনা উপস্থাপন

মুহাদ্দিসীনে কেরাম যখনই হাদিসের শব্দাবলি বর্ণনা করেছেন তখনই তার বাস্তব নমুনাও উপস্থাপন করেছেন, আমলটি করে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ শুধু শব্দাবলি বিধান নয়, তার সাথে আমলের ঐতিহাসিক সংযোগও সংযুক্ত রয়েছে। রেওয়ায়াতের শব্দাবলির সাথে আমলের ঐতিহাসিক সংযোগ না থাকলে তা বিধানের স্বীকৃতি পায় না। এ কারণেই হাদিসের রেওয়ায়াতের সাথে সাথে উম্মতের আমলও বিদ্যমান রয়েছে। এটা ঐ আমলটির ব্যাপারে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম সে আমলের অনুকরণ করেছেন, তাবেয়ীগণ সাহাবায়ে কেরামের আমলের অনুকরণ করেছেন এবং রেওয়ায়াতও পেশ করেছেন।

এ কারণেই 'মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত' নামে প্রসিদ্ধ যে রেওয়ায়াতগুলো রয়েছে সেগুলোকে মুহাদ্দিসীনগণ ওভাবেই বর্ণনার সাথে আমল করে দেখিয়েছেন। 'মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত' হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রকাশ পাওয়া এমন রেওয়ায়াত যাতে তিনি কোনো একটি হুকুম বর্ণনা করে ঐ মজলিসেই তার বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়েছেন। মুহাদ্দিসীনগণও সে রেওয়ায়াতগুলোর সনদ বর্ণনার সাথে সাথে বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়ে আসছেন।

যেমন 'মুসালসাল বিল মা-অত্তমার'-এর হাদিস। এটা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের ফযিলত বর্ণনা করে নিজে খেজুর খেলেন এবং অবশিষ্ট অংশ আব্দুল্লাহ

ইবনে ওমর রা.কে দিলেন, অতঃপর তিনি পাত্র হতে পানি পান করে তারও অবশিষ্ট অংশ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.কে পান করালেন।

পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. স্বীয় ছাত্রদেরকে খেজুরের ফযিলত সংক্রান্ত এ হাদিসটি বর্ণনা করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ খেজুর খেয়ে তার অবশিষ্ট অংশ ছাত্রকে খাওয়ালেন। একইভাবে পানি পান করে অবশিষ্ট অংশ ছাত্রকে পান করালেন। এমনিভাবে তাবেয়ীনগণ তাবে-তাবেয়ীন দিগকে, তাবে-তাবেয়ীনগণ তাদের অনুসারী দিগকে হাদিস ও তার বাস্তব প্রয়োগ দেখিয়ে এসেছেন। এমনকি ধারাবাহিকতার এই সনদ আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছেছে।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী রহ., যিনি আকাবির উলামাদের মধ্যে গণ্য, সাহারানপুরের বিখ্যাত মাদরাসা 'মাজাহিরুল উলুম' এর সদরুল মুদাররিস ছিলেন। ইনি ছিলেন হযরত রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর খলিফা।

একবার যাত্রাপথে হঠাৎ করে হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ.-এর সাথে আমার দেখা হয়ে যায়। হযরত তখন মিরাঠ যাচ্ছিলেন। আমাকে তিনি বললেন, বর্তমান সময়ের ওলামায়ে কেরামের জামাতের মধ্যে আমার হাদিসের সনদই সবচেয়ে উঁচু ও উন্নত; কোনে একভাবে আমি হযরত শাহ ইসহাক রহ.-এর শিষ্য। আমার মন চাচ্ছে তোমাকে সনদের অনুমতি দিতে। সুতরাং সাহারানপুর এসে তুমি আমার থেকে অনুমতি নিয়ে যেও। আমি বললাম– হযরত, অবশ্যই আমি যাব। অল্প বয়স ও উদাসীনতার কারণে ভুলেই গেলাম। এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আবারও হঠাৎ করেই যাত্রাপথে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি পুনরায় একই বিষয় উত্থাপন করলেন। আমি বললাম, এবার আমি অবশ্যই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব। কিন্তু আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। এভাবে ছয়মাস অতিবাহিত হবার পর আমি জানতে পারলাম যে, তিনি হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি চিন্তা করলাম, এই সনদ যদি আমি গ্রহণ না করি তবে বঞ্চিত হয়ে যাব। সুতরাং আমি সাহারানপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমাকে পেয়ে হযরত খুব খুশি হলেন। মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব, যিনি বর্তমানে মাজাহিরুল উলুমের শায়খুল হাদিস, তাকে হযরত বললেন, মাজাহিরুল উলুমের কুতুবখানায় হাদিসের যত কিতাব রয়েছে সব নিয়ে এসো। সিহাহ সিত্তাহ, মুজাম, মুসনাদ ও সুনানের সকল কিতাব নিয়ে আসা হলো। হযরত আমাকে ইজাজত দিলেন। বহু কিতাবের প্রথম অংশ আমার দ্বারা পড়ালেন, কিছু নিজে পড়ে আমাকে

শোনালেন। অতঃপর তিনি 'মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত'-এর কিতাব নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। اَلْيَانِعُ الْجَنِيْ কিতাবটি নিয়ে আসা হলো। এই কিতাবটিতে ঐ সকল হাদিস সংকলিত রয়েছে যার সাথে আমল করে দেখানো আবশ্যক। তিনি খেজুর ও পানি আনালেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর রেওয়ায়াত বর্ণনা করলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের ফযিলত বর্ণনা করে নিজে খেলেন এবং তাকেও খাওয়ালেন। অতঃপর নিজে পানি পান করে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা.কে পান করালেন। হযরতও তদ্রূপ করলেন। নিজে খেজুর খেয়ে আমাকে খাওয়ালেন, পানি পান করে অবশিষ্ট অংশ আমাকে পান করালেন এবং এই আমলের সনদ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিয়ে দিলেন।

মোটকথা, মুহাদ্দিসীনে কেরাম যখনই হাদিস বর্ণনা করেছেন, তখনই তার সাথে সাথে হাদিসের আমলকেও সংরক্ষণ করেছেন, তার সিফাত ও কাইফিয়াতও (বৈশিষ্ট্য ও ধরন) সংরক্ষণ করেছেন।

আমার মনে আছে, হাদিসের দরসে যখন 'রুন্নাতুন নিয়াহা'র হাদিস এলো, আমার পিতা তখন তা করে দেখালেন। 'রুন্নাতুন নিয়াহা' হলো জাহেলী যুগের একটি রুসুম। যখন প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি মারা যেত তখন ওসিয়াত করে যেত যে, আমার জন্য ছয়মাস কান্নার ব্যবস্থা করবে। কেউ কেউ এক বছর, দেড় বছরের জন্য কান্নার ব্যবস্থা করার ওসিয়াত করে যেত। এটা এজন্য করত, যাতে যিয়ারতকারীরা বুঝতে পারে লোকটা খুব বড় মাপের ছিল।

কার চোখে এত পানি আছে যে, বছরভর কাঁদবে? সুতরাং ওসিয়াত রক্ষার্থে কাঁদার জন্য পোশাদার মহিলাদের ভাড়ায় আনা হতো। এরা ছয়মাস, এক বছর পর্যন্ত কাঁদতো। কান্নার পদ্ধতি ছিল– সমবেদনা জ্ঞাপনার্থে যখন কেউ আসতো, দূর থেকে আগমনকারীদেরকে দেখে উক্ত মহিলারা দৌড়ে এসে গোল হয়ে বসে পড়তো। যখন আগন্তুক কাছে চলে আসতো তখন তারা বিলাপ সহকারে কান্না শুরু করে দিত– وَا كَذَا وَا جَبَلَا! 'হায়, তুমি এমন ছিলে! তুমি অমন ছিলে!' এভাবে নানা রকম বিলাপ করে তারা কাঁদতো। আগন্তুক চলে গেলে তারা কান্না বন্ধ করে দিত। পুনরায় কেউ এসে পড়লে আবারও কান্না শুরু করে দিত। এতে প্রচার হতো– লোকটা অনেক বড় মাপের ছিল, কান্নাই মোটে থামছে না। যাই হোক, সে সময় কান্নার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মহিলাদেরকে নিয়োজিত করা হতো। যারা বিলাপ মাতম করে কাঁদতো।

এ হাদিস পড়াবার সময় আমার পিতা ওভাবে কান্না করে আমাদেরকে দেখালেন। আমরা আশ্চর্য হলাম, এভাবে কেঁদে দেখাবার কী প্রয়োজন ছিল। আব্বা বললেন, মাওলানা গাঙ্গুহী রহ. এভাবেই সে কান্নার অনুকরণ করে আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, শাহ আব্দুল গনি রহ.ও তাকে এভাবে অনুকরণ করে দেখিয়েছিলেন। এভাবে সনদের ধারাবাহিকতা জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

মোটকথা, এসব আরজ করার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো এই, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা ছিল একটি নূরের মশাল। তাঁকে সামনে রেখে আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবার রাস্তা দৃষ্টিগোচর হতো। স্পষ্ট হয়ে যেত যে কোনটি সত্য পথ আর কোনটি বাতিল পথ। আলো ও আঁধারের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যেত। আর পথ-প্রদর্শনের জন্য ছিল তাঁর সুন্নাত, তাঁর আমল করার পদ্ধতি। যার দ্বারা মানুষ সত্যপথের সন্ধান লাভ করত– হজ এভাবে করতে হয়; নামাজ, রোজা, জিহাদ এভাবে করতে হয়। আল্লাহর পথে খরচ করা, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ, সন্ধি, জীবন-যাপন প্রভৃতির আমলী নমুনা তিনি উপস্থাপন করে গেছেন।

আমলী কুরআন

কুরআন মাজিদে যে বিষয়াবলি ইলম হিসেবে বিদ্যমান ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তার মধ্যে সে বিষয়গুলোর আমলী রূপ বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই বর্ণ-বাক্যে, কাগজে লিখিত যে কুরআন তা হলো আল্লাহর ইলমী কুরআন। আর আমলী কুরআন ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা। কুরআনে যা লিখিত আকারে ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে তা কর্ম আকারে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই হযরত আয়েশা সিদ্দিকী রা.-এর কাছে যখন জানতে চাওয়া হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ কী ছিল? তিনি উত্তর দিলেনঃ

كَانَ خُلُقُه الْقُرْاٰنُ

কুরআনের চরিত্রই তাঁর চরিত্র ছিল।

যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত দেখতে চাও, তাহলে কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে যাও। তাঁর সীরাত ছিল এই কুরআন।

অর্থাৎ কুরআনে যা লিখিত আমাকে রয়েছে তারই আমলী রূপ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কুরআনে যা বাণীবদ্ধরূপে রয়েছে, রাসূলের সত্তার মধ্যে তার প্রয়োগিক রূপ রয়েছে। মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত হলো পথ-প্রদর্শক। পৃথিবীতে যদি তাঁর সত্তার আগমন না ঘটতো তবে পথপ্রাপ্তি অসম্ভব ছিল।

আল্লাহর তালিম পদ্ধতি

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, আমল করার জন্য, দীনের পথে চলার জন্য আল্লাহর প্রেরিত ব্যক্তিসত্তা ব্যতীত শুধু কিতাব যথেষ্ট নয়। শুধু লিটারেচার যথেষ্ট হবে না, যতক্ষণ না ব্যক্তিসত্তা পথ প্রদর্শন করবে। এ কারণেই হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জমানা পর্যন্ত আল্লাহ এই পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন যে, কিতাব প্রেরণের সাথে সাথে তার প্রশিক্ষকও প্রেরণ করেছেন। আদম আ.কে সহিফা দান করে তার প্রশিক্ষণ দেবার জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ইদ্রিস আ.কে পঞ্চাশটি সহিফা দান করা হয়েছে, সাথে সাথে তাঁকেও প্রেরণ করা হয়েছে। ইবরাহিম আ.কে সহিফা দিয়েছেন, সাথে সাথে তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে মুসা আ.ও প্রেরিত হয়েছেন। ইঞ্জিল এসেছে তো ঈসা আ. সাথে এসেছেন। যাবুরের সাথে সাথে হযরত দাউদ আ. প্রেরিত হয়েছেন। সর্বশেষে কুরআন অবতীর্ণ হলে তার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তার আবির্ভাব ঘটেছে।

পয়গম্বর অবতীর্ণ না হলে শুধু কিতাবের শব্দাবলি দ্বারা মানুষ আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থ অনুধাবন করতে পারে না। এভাবে যদি বোঝা সম্ভব হতো তাহলে পয়গম্বর প্রেরণের প্রয়োজন ছিল না। কিতাবুল্লাহকে বাইতুল্লাহর ছাদের উপর রেখে দিয়ে ঘোষণা করা হতো– হে মানব সকল! তোমাদের আত্মায় রোগের সৃষ্টি হয়েছে, আর এ কুরআন হচ্ছে তার চিকিৎসাপত্র; তোমরা একে নিয়ে যাও এবং নিজেরা নিজেদের চিকিৎসা করে নাও। এভাবে যদি দেওয়া হতো এবং তারা তা নিয়ে যেত তাহলে তারা আল্লাহর উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝতে পারত না– যতক্ষণ না পয়গম্বর তাদের তালিম দিতেন।

নবী প্রেরণের আবশ্যকতা

পয়গম্বর কর্তৃক তালিম দেওয়া ব্যতীত কিতাবের অর্থ অনুধাবন সম্ভব নয়। কেননা কখনো কখনো কথা বলার ধরন ও উচ্চারণ-ভঙ্গির উপর অর্থ বোঝা নির্ভর করে। কাগজে লিখিত বাক্য দ্বারা সবসময় সঠিক অর্থ প্রকাশ পায় না। অবস্থা, উচ্চারণের ভঙ্গিমা ও পরিভাষার মাধ্যমে অর্থ স্পষ্ট হয়। আমি উদাহরণ দিয়ে থাকি যে, আমাদের উর্দু ভাষায় একটি বাক্য আছে– 'কিয়া বাত হ্যায়'। ব্যাপকভাবে এ বাক্যটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এ বাক্যটি অনেকগুলো অর্থ বহন করে আর সবগুলো অর্থই উচ্চারণ-ভঙ্গির সাথে সম্পৃক্ত। আমি যদি স্বাভাবিক উচ্চারণ-ভঙ্গিতে বলি– 'ভাই! কিয়া বাত হ্যায়?' আপনি বুঝবেন আমি জানতে চাচ্ছি– কী বিষয়? কী হচ্ছে? আর যদি আমি উচ্চারণ-ভঙ্গি পরিবর্তন করে এভাবে বলি– 'কিয়া বাত হ্যায়!' আপনি বুঝবেন যে, আমি মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি। অর্থাৎ অমুক জিনিসটা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর! এই একই বাক্য যদি তাচ্ছিল্য নিয়ে উচ্চারণ করি, আপনি বুঝবেন আমি বিষয়টাকে অপছন্দ করছি, তার নিন্দা করছি। আবার যদি উচ্চারণ-ভঙ্গিতে বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বাক্যটি উচ্চারণ করি তাহলে আপনি বুঝবেন যে আমি বিস্ময় প্রকাশ করতে বাক্যটি ব্যবহার করছি। দেখুন, একই বাক্য প্রশ্ন করা, বিস্ময় প্রকাশ করা, মাহাত্ম্য বর্ণনা করা, তুচ্ছতা জ্ঞাপন করা– নানা অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। প্রতিটি অর্থই উচ্চারণ-ভঙ্গির সাথে সম্পৃক্ত; কাগজ ও তাতে অঙ্কিত বর্ণ-নকশার সাথে সম্পৃক্ত নয়। 'কিয়া বাত হ্যায়' বাক্যটি যদি কাগজে লিখে আপনি কারো কাছে প্রেরণ করেন তাহলে ঐ অর্থটিই বুঝবে যেটি তার মস্তিষ্কে উদয় হবে, সেটি আপনার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। সে নিজের মতো করে বুঝবে; আপনার মতো করে নয়।

ঠিক এভাবেই কুরআনের একটি নিজস্ব ভঙ্গিমা, নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতি রয়েছে। কুরআনের সাথে যদি তার অর্থ বিবৃতকারী মুরব্বী আগমন না করতেন, পরিভাষা, বর্ণনাভঙ্গি, ধরন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী অর্থ বুঝিয়ে না দিতেন তাহলে কুরআন দ্বারা আল্লাহ তায়ালার উদ্দিষ্ট অর্থ আপনার-আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হতো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চারণ-ভঙ্গি, আমল পদ্ধতি ও স্বরূপ পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

হাদিসে এমনই একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রোজা সম্পর্কীয় আয়াত যখন অবতীর্ণ হল তখন প্রাথমিক অবস্থায় আদেশ এমন ছিল যে, রাতে যখনই ঘুম হতে জাগ্রত হবে তখন থেকেই পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা রাখবে। মধ্যর্তী

সময়ে পানাহার ইত্যাদি নিষিদ্ধ। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আদেশটিকে কিছুটা লঘু করে দিয়ে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ.

তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। [বাকারা ২ : ১৭৮]

অত্র আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানগণ কালো ও সাদা– এ দু'ধরনের সুতা প্রস্তুত করিয়ে শিয়রে রেখে দিলেন। যখন কালো ও সাদা সুতার মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হতো, তখন তারা পানাহার বন্ধ করতেন। হযরত আদি রা.ও অনুরূপ সুতা তৈরি করে বালিশের নীচে রেখে তা দেখতে থাকেন। যখন কালো সুতাকে সাদা সুতা হতে সম্পূর্ণ পৃথক করতে পারা যেত তখন পানাহার বন্ধ করে রোজার নিয়ত কতেন। অথচ ততক্ষণে সুবহে সাদিক হয়ে আরো পনের বিশ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। হযরত আদি রা. শাব্দিক অর্থের প্রতি লক্ষ করে এমনটি করেছিলেন যা আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ভুলও ছিল না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য এটা ছিল না, তাই সকলের অন্তরে একটা অশান্তির ভাব ছিল। শেষে বিষয়টি জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি হযরত আদি রা.কে জিজ্ঞেস করলেন– হে আদি! তুমি কী পদ্ধতি গ্রহণ করেছ? তিনি আরয করলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার বাণী كُلُوْا وَاشْرَبُوْا নাযিল হওয়ার পর দুটি সুতা আমার বালিশের নীচে রেখে দিয়েছি; আমি এগুলো দেখতে থাকি। যতক্ষণ উভয় প্রকারের সুতার মধ্যে পার্থক্য করা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আদি! তোমার বালিশ বড়ই প্রশস্ত, তার মধ্যে রাত ও দিন উভয়ই আত্মগোপন করে আছে।' কেননা কালো সুতা দ্বারা রাতের আঁধার এবং সাদা সুতা দ্বারা দিনের আলো বোঝানো হয়েছে। কালো-সাদা উদ্দেশ্য নয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারলেন যে, এখানে শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

তাঁরা যা করছিলেন শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী তাতে কোনো ভুল নেই কিন্তু তা আল্লাহর উদ্দিষ্ট অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। মোটকথা, কখনো কখনো

শব্দের অর্থ হয় এক আর আল্লাহর উদ্দিষ্ট অর্থ হয় আরেক। শাব্দিক অর্থ না হয়ে পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য হয়।

অর্থ নির্ধারণে পরিভাষার প্রভাব

আমাদের পরিভাষায় 'সোনায় সোহাগা' বলে একটি কথা আছে। শাব্দিক অর্থের দিকে তাকালে মনে হবে, স্বর্ণের উপর সোহাগা ছিটিয়ে দেবার কথা বলা হয়েছে। তবে উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। সাধারণ পরিভাষায় কোনো জিনিসের যখন অতি চমৎকারিত্ব বোঝানো উদ্দেশ্য হয় তখন বলা হয় 'সোনায় সোহাগা'। অর্থাৎ স্বর্ণ নিজেই তো একটি অতি উত্তম জিনিস, তদুপরি তার সাথে যখন সোহাগার সংমিশ্রণ ঘটলো তখন তাতে আরো ঔজ্জ্বল্য তৈরি হলো, তার সৌন্দর্য আরো বেড়ে গেল। সাধারণ ব্যবহার দেখে এবং ভাষাভাষীদের মধ্যে থেকে পরিভাষাসমূহ আয়ত্বে আসে, এরপর তার সূক্ষ্মতা বুঝে আসে। পরিভাষার দিকে লক্ষ না করে শুধু অভিধান দেখে যদি এর অর্থ করা হয়– 'সেহাগা পিষে তা স্বর্ণের উপর ছিটিয়ে দেওয়া' তাহলে তা শুনে আমরা হাসবো যে, লোকটা পরিভাষার অর্থ জানে না।

আপনাদের হাজারা জেলার অধিবাসী মাওলানা গোলাম রসূল খান সাহেব রহ. আমাদের দেওবন্দের উস্তাদ ছিলেন। পুরোপুরিভাবে তিনি উর্দু বলতে পারতেন না, কিন্তু দাবি করতেন যে, আমি সবার চেয়ে বেশি উর্দু জানি। একদিন কোনো এক স্থানে হযরত খায়খুল হিন্দ রহ., তাঁর ভাই মাওলানা মাহমুদ হাসান রহ.-সহ দারুল উলুমের সকল উস্তাদ উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব বললেন, মৌলভী গোলাম রাসূল! চল্লিশ বছর পর্যন্ত তুমি দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষকতা করছ অথচ উর্দু বলতে পারছ না। এ কথা শুনে মাওলানা সাহেব রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। বললেন– 'আমি উর্দু জানি না! আমি হিন্দুস্তানিদের চেয়ে অধিক উর্দু জানি কিন্তু এ ভাষাটিকে একটি ফালতু ভাষা মনে করি বিধায় বলি না।' তার এ কথা শুনে হাকিম সাহেব বলে উঠলেন, আপনি হিন্দুস্তানিদের চেয়ে উর্দু অধিক বোঝেন? গোলাম রসূল সাহেব বললেন, হ্যাঁ তাই। তিনি বললেন, বলুন তো এ বাক্যটি অর্থ কী–

کریلا اور نیم چڑھا

গোলাম রসূল সাহেব একটু চিন্তা করে বললেন, বাক্যের মধ্যখানে সংযোগমূলক অব্যয়টি (اور শব্দটি) ঝামেলা করছে, নইলে অর্থ স্পষ্ট ছিল। হাকিম সাহেব

বললেন, ঠিক আছে ওটা বাদ দিলাম, বলুন ہڑھ ٹم ہل کথাটির অর্থ কী হবে? বললেন, একেবারে সহজ অর্থ– করলা অর্ধেক কাঁচা রয়েছে এবং অর্ধেক সিদ্ধ হয়েছে। তার উত্তর শুনে উপস্থিত সবাই হেসে ফেললেন। [কেননা এটি ছিল একটি বাগধারা। দুটি তিক্ত স্বাদের বিষয়– করলা ও নিম-এর সমন্বয়ে বাক্যটি তৈরি। অধিকতর বিরক্তি, তিক্ততা ও ঝামেলা বোঝাতে বাক্যটি ব্যবহার হয়ে থাকে। –অনুবাদক]

স্পষ্ট কথা, মাওলানা সাহেব শাব্দিক অর্থ বিবেচনা করে উক্ত অর্থটি করেছেন। উর্দু ভাষাভাষীদের সাথে বসবাস না করার কারণে পারিভাষিক অর্থটি বুঝতে পারেননি। ہل নিয়েছেন উর্দু থেকে, ٹم নিয়েছেন ফার্সি থেকে এবং ہڑھ নিয়েছেন হিন্দি থেকে, অতঃপর নিজের মতো করে অর্থ নির্ধারণ করেছেন, যা শুনে উর্দু ভাষাভাষীরা হাসতে শুরু করেছেন।

এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল আমাদের সাহারানপুর জেলায়। চল্লিশ বছর পূর্বের কথা। সেখানে একজন ইংরেজ কালেক্ট ছিল। তারও দাবি ছিল যে, আমি হিন্দুস্তানিদের চেয়ে ভাল উর্দু জানি। তার ওখানের পেশকার ছিলেন দেওবন্দের মুন্সি হাবিব হাসান। যিনি ছিলেন একজন উন্নত মানের কবি, চমৎকার ছিল তার ভাষা জ্ঞান। কালেক্টর সাহেব প্রায়শই বলতো– 'পেশকার! আমি তোমার চেয়ে ভাল উর্দু জানি।' উর্দু যার মাতৃভাষা নয় তার মুখে এমন অর্থহীন দাবি শুনেও মুন্সি হাবিব সাহেব সহ্য করে যেতেন। যেহেতু তার অধীনে চাকরি করছে, তর্ক করতে গিয়ে না আবার বরখাস্ত হয়ে রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যায়, তাই এড়িয়ে যেতেন।

একদিন কোনো এক প্রসঙ্গে কালেক্টর সাহেব টেবিলের উপর থাপড় মেরে জোশের সাথে বলল– 'পেশকার! উর্দু বিষয়ে তুমি মূর্খ, আমি উর্দু জানি।' পেশকার সাহেব এবার আর সহ্য করতে পারলেন না। ভাবলেন, চাকরি থাক বা না থাক, কালেক্টরের মস্তিষ্ক থেকে ফালতু ধারণা অপসারণ করতেই হবে। কালেক্টর সাহেব টেবিলের উপর একটি থাপড় মেরেছিল তো তিনি দুটি থাপড় মেরে বললেন– 'সাহেব বাহাদুর! উর্দু সম্পর্কে আপনি মহামূর্খ, এ ভাষার প্রাথমিক জ্ঞানও আপনার নেই। উর্দু কিভাবে বলে তা আমি জানি।' কালেক্টর সাহেবের মেজাজ সপ্তমে উঠে গেল। আরো কিছু উচ্চ-বাচ্চ হল। এক পর্যায়ে মুন্সি সাহেব বললেন– ঠিক আছে, আমি আপনার পরীক্ষা নিচ্ছি। বলুন তো এ কথার অর্থ কী– আমি যখন জিজ্ঞেস কলাম, সাহেব বাহাদুর তখন (بغلیں جھانکنے

(ﻟﻮ) 'বগল ঝাড়তে থাকলেন'। কালেক্টর সাহেব বলল– 'এদিকে ঝাড়া দিল, ওদিকে ঝাড়া দিল, এই তো বগল ঝাড়া হল।' তার কথা শুনে মুন্সি সাহেব হেসে ফেললেন– 'এই অর্থ বুঝেছেন আপনি!'

কালেক্টর সাহেব বলল, তাহলে এর কী অর্থ হবে? মুন্সি সাহেব বললেন, আপনি তো হিন্দুস্তানিদের চেয়ে ভাল উর্দু জানেন, আপনিই বলুন, আমি কেন বলব?

কালেক্টর সাহেব চিন্তায় পড়ে গেল, এ বাক্যের অর্থ কি? বহু চিন্তাভাবনা করল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। শেষপর্যন্ত বলল, আমাকে তিন দিনের সময় দাও। মুন্সি বললেন এক সপ্তাহ সময় দেয়া হল। ইংরেজ সাহেব অভিধান তালাশ করতে লাগলেন, কিন্তু অভিধানে কিছুই নেই। অভিধানে 'বগল' এবং 'ঝাঁকনা' শব্দ দু'টি পৃথক পৃথক রয়েছে, কিন্তু একত্রিতভাবে সম্পূর্ণ বাক্য অভিধানে ছিল না। কেননা এটা ছিল একটি বাগধারা, একটি পরিভাষা, যা অভিধানে থাকে না।

তিন চারদিন পর কালেক্টর সাহেব মুন্সি সাহেবের কাছে অপারগতা প্রকাশ করে বাক্যটির অর্থ জানতে চাইল। মুন্সি হাবিব সাহেব বললেন, এই শর্তে বলতে পারি যে, আর কখনো এ জাতীয় আস্ফালন করবেন না। ইংরেজ কালেক্টর স্বীকারোক্তি করলে মুন্সী সাহেব বললেন, এর অর্থ হল, পেরশান ও চিন্তিত হয়ে যাওয়া।

প্রত্যেক ভাষায়ই এ বিষয়টি রয়েছে যে, বক্যের শাব্দি অর্থ থাকে এক রকম এবং পারিভাষিক ও প্রচলিত অর্থ থাকে অন্যরকম। ফার্সিতে একটি কথা বলা হয়– 'অমুক ব্যক্তি ঝুড়িতে পানি ঢালছে।' এর শাব্দিক অর্থ হলো ঝুড়ি নীচে রেখে কোনো পাত্রের মাধ্যমে উপর থেকে তাতে পানি ঢালছে। কিন্তু বাক্যটির উদ্দেশ্য মোটেও তা নয়। কোনো ব্যক্তি যখন অর্থহীন কোনো কাজ করে তখন বলা হয় সে ঝুড়িতে পানি ঢালছে। অর্থাৎ এমন কাজ করছে যার ফলাফল শূন্য। ঝুড়িতে হাজার বালতি পানি ঢাললেও যেমন তাতে কিছুই জমবে না, সব গড়িয়ে যাবে– তার কাজটিও ঠিক তেমন হচ্ছে। অযথা পণ্ডশ্রম।

যে ব্যক্তি ফার্সি ভাষার বাগধারা সম্পর্কে জ্ঞাত নয় কিংবা ফার্সি ভাষাভাষীদের সান্নিধ্যে থাকেনি সে যদি অভিধানের সাহায্য নিয়ে শাব্দিক অর্থে বাক্যটির অর্থ নিরুপন করে তাহলে ফার্সি ভাষাভাষীগণ তার নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা দেখে হাসাহাসি করবে।

কুরআন ও হাদিসের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। কুরআন-হাদিসের নিজস্ব পরিভাষা রয়েছে, নিজস্ব বাক-পদ্ধতি রয়েছে এবং উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গি রয়েছে। এগুলোকে রক্ষা করার মাধ্যমেই কেবল সঠিক অর্থ নির্ধারিত হবে।

কেউ যদি কুরআন বিশারদদের পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে কিংবা তাদের সান্নিধ্যে থেকে এ বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন না করে শুধু অভিধান ও শাব্দিক অর্থের সাহায্যে কুরআন বোঝার চেষ্টা করে তাহলে সে কখনোই আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারবে না। এমনকি মাকামাতে হারীরি কিংবা অন্যান্য আরবী সাহিত্যের কিতাবও যদি আপনি পাঠ করেন, আরবী সাহিত্যের জ্ঞানও যদি আপনার থাকে, তথাপি কুরআনের পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়ে কুরআন বুঝতে পারবেন না।

কুরআনের উদ্দেশ্য নির্ধারণে সুন্নাতে রাসূলের অবস্থান

অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার হলো– অনেকেই কুরআনের অনুবাদ পড়ে নিজেকে মুফাসসির, কুরআন বিশারদ ভাবতে শুরু করে। আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থ অনুধাবন না করা পর্যন্ত তাকে কুরআন বোঝা বলা যাবে না। আর তা কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন কুরআনের তাফসীরের অনুকূলে রাসূলের কথা ও কাজকে মিলিয়ে নেওয়া হবে।

খারেজীদের ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন করে তাদেরকে সঠিক দীন বোঝানোর জন্য একবার হযরত আলী রা. ইবনে আব্বাস রা.কে বললেন– 'দেখ, খারেজীদের সমাবেশে তাদের সামনে কুরআন দিয়ে কোনো দলিল উপস্থাপন করবে না বরং রাসূলের কথা ও কাজ দ্বারা দলিল পেশ করবে।'

হযরত ইবনে আব্বাস রা. আরজ করলেন– 'হযরত! কুরআনের উপরেই তো আমার পারদর্শিতা, আল্লাহর রাসূল আমাকে কুরআনের বুঝ দান করার জন্য মাকবুল দোয়া করেছেন। আমি কুরআনের আলেম এবং কুরআনই আমার আলোচ্য বিষয়। এতদসত্ত্বেও আপনি আমাকে কুরআন দ্বারা দলিল দেওয়া হতে নিবৃত করছেন, এতে কী কল্যাণকামিতা নিহিত রয়েছে?' (তিনি যে হাদিস বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন না এমন নয়। উদ্দেশ্য ছিল, আমি খুব ভালভাবে তাদেরকে কুরআন বুঝাতে সক্ষম হব। সুতরাং কুরআনের চেয়ে বড় দলিল আর কী হতে পারে?)।

হযরত আলী রা. বললেন– 'কুরআন মাজিদের আয়াত হলো ব্যাপক অর্থবোধক মূলনীতিমূলক বাক্য। কখনো কখনো একাধিক (এমনকি বিপরীতমুখী) অর্থে

ব্যবহার যোগ্য। সাধারণ মানুষের সামনে তুমি যখন কুরআনের আয়াত পড়ে তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে, বিরুদ্ধপক্ষ তখন আয়াতের ব্যাপকতার সুযোগ নিয়ে অন্য অর্থ উপস্থাপন করবে। সাধারণ মানুষ তখন বলবে– এরা যেমন কুরআন পড়ছে, তারাও তো তদ্রূপ কুরআনই পড়ছে। সুতরাং এতে হক ও বাতিল স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে না।

কিন্তু তুমি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত দ্বারা দলিল পেশ করবে তখন তাঁর কথা ও আমল দ্বারা বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্য কোনো কিছুর অবকাশ থাকবে না। সুতরাং সত্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে। সাধারণ মানুষও বুঝবে যে, এটাই সত্য।'

এ কারণেই কুরআনের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্নাতকে মেলানো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হবে না। অর্থাৎ নির্ধারিত হবে না। রাসূলের সুন্নাত ছাড়া যদি আপনি কুরআনের অর্থ নির্ধারণ করেন তবে তা হবে একান্তই আপনার ব্যক্তিগত মতামত; কুরআন নয়।

আপনি যদি নিজে থেকে কুরআনের আয়াতের অর্থ নির্ধারণ করেন তাহলে হয়তো তা 'তালবিস' (অর্থ বিকৃতকরণ) হবে, না হয় 'নিফাক' (কপটতা বা মুনাফেকী) হবে। অথচ দেখুন, দুনিয়াবী কথাবার্তার ক্ষেত্রেও বক্তা যতক্ষণ না ব্যক্ত করে দেয় যে আমার কথার উদ্দেশ্য এই, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথার অর্থ ব্যক্ত করার অধিকার আপনার নেই। সুতরাং আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত ব্যক্তির মাধ্যমে যতক্ষণ না স্বীয় কালামের উদ্দিষ্ট-মর্ম ব্যক্ত করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার অর্থ নির্ধারিত হতে পারে না।

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় রেখেই কুরআনের দুটি শান বর্ণিত হয়েছে (একটি হলো কুরআনের শব্দাবলি সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজ জিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন, আরেকটি হলো অর্থ বুঝিয়ে দেবার জিম্মাদারীও তাঁরই। এবার সে আলোচনা শুনুন)। শান দুটি হলো– ওহী অবতরণ হওয়া কালীন সূচনালগ্নের দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল এই যে, ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় দ্রুততার সাথে বার বার আবৃত্তি করতে থাকতেন, যাতে করে তা স্মৃতিতে বদ্ধমূল হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

তাড়াতাড়ি শিখে নেবার জন্য আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। [কিয়ামাহ ৭৫ : ১৬]

ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় এবং দ্রুত মুখস্থ হয়ে যাওয়ার আশায় এমনটি করার প্রয়োজন নেই। কেননা–

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্বে (আপনার ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই)। [কিয়ামাহ ৭৫ : ১৭]

এভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআন সংরক্ষণের জিম্মাদারী নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিলেন। আল্লাহ বলেন:

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

আমি যখন (ফেরেশতার মাধ্যমে) পাঠ করতে থাকি আপনি তখন মনোযোগসহকারে তা শ্রবণ করতে থাকুন। [কিয়ামাহ ৭৫ : ১৮]

কুরআনের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশ্যে এ ছিল প্রথম নির্দেশ।

এ কথা স্পষ্ট যে, সংরক্ষণ বা মুখস্থ করানো ও পাঠ করানোর সম্পর্ক হলো শব্দের সাথে। মর্ম বা অর্থ মুখস্থও করানো হয় না এবং পাঠও করানো হয় না।

বাকি থাকলো অর্থের ব্যাপারটি। অর্থের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে ছিলেন না। কোথাও কোনো বর্ণনায় আপনি দেখবেন না যে, আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে ভাবছেন যে আয়াতের অর্থ এই হতে পারে, কিংবা অপর অর্থ এও হতে পারে, অথবা এই অর্থটি সময়ের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ, তোমরা এটাই গ্রহণ কর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনোই এমন করতে দেখা যায়নি। কেননা কখনো যদি এমন হয়েই যেত তাহলে তা হতো আল্লাহর উদ্দিষ্ট অর্থ বহির্ভূত নিজস্ব মতামত। শব্দ সংরক্ষণের দায়িত্বের মতো অর্থ সংরক্ষণের দায়িত্বও আল্লাহ নিজ জিম্মায় নিয়ে নিয়েছেন। ইরশাদ করেন:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

অতঃপর আয়াতের বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব। [কিয়ামাহ ৭৫ : ১৯]

আয়াতের অর্থ কী, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী তা আমি খুলে খুলে আপনাকে বলে দেব। দেখুন, ব্যাখ্যার সম্পর্ক কিন্তু শব্দের সাথে হয় না, অর্থের সাথে হয়। এর বস্তুসংক্ষেপ দাঁড়ালো এই– কুরআনের শব্দের ব্যাপারেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন তথা বিশ্বস্ত ছিলেন। নিজের পক্ষ হতে তাতে মোটেও সংযোজন-বিয়োজন করেননি। আর অর্থের ব্যাপারেও আমীন ছিলেন। তাঁর পবিত্র কলবে আল্লাহ যেই অর্থ ইলহাম করেছেন তিনি সেই অর্থই বুঝেছেন। নিজের বিবেকবুদ্ধি ও চিন্তাভাবনা দ্বারা অর্থ নির্ধারণ কেরননি। সুতরাং নবীকে কখনো ওহীর ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি যে, স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী অর্থ নির্ধারণ করুন। বরং নাযিলকৃত শব্দের মতো নাযিলকৃত অর্থেরও আনুগত্য বাধ্যতামূলক ছিল।

আল্লাহর রাসূলেরই যখন অর্থের মধ্যে সামান্যতম হ্রস-বৃদ্ধির স্বাধীনতা ছিল না তখন সে স্বাধীনতা আপনার আমার কী-করে থাকে? স্বীয় ইচ্ছা মাফিক আয়াতের অর্থ নির্ধারণের কোনো অধিকার আমাদের নেই। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে অর্থ বুঝিয়েছেন সে অর্থই গ্রহণ করা আমাদের জন বাধ্যতামূলক। এটা স্বয়ং কুরআনেরই দাবি। এখন প্রশ্ন হলো আয়াতের সে অর্থ ও ব্যাখ্যা কোথায় পাওয়া যাবে? উত্তর হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ব্যাখ্যাকেই বলা হয় হাদিস। একেই বলা হয় সুন্নাত। কোনো-কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা তিনি কথার মাধ্যমে দিয়েছেন, কোনোটা আমলের মাধ্যমে দিয়েছেন, আবার কোনোটা মৌন-সমর্থনের মাধ্যমে দিয়েছেন। অর্থাৎ অন্যজন আমল করেছেন আর তিনি তা দেখে কিছু বলেননি। একে বলা হয় 'বয়ানে তাকরিরী'। অন্য দুটিকে বলা হয় 'বয়ানে কওলী' ও 'বয়ানে ফেয়লী'। এই তিন প্রকারের বয়ানের সম্মিলিত নাম হলো 'সুন্নাত'।

কুরআনের গবেষণা

কুরআনের ব্যাখ্যা মানুষকে বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অর্পণ করেছেন। আল্লাহ বলেন:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ○

হে রাসূল! আমি এ উপদেশবাণী আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর ব্যাখ্যা তাদের সামনে উপস্থাপন

করেন, আর এ কারণে যে হয়তো তারা এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করবে। [নহল ১৬ : ৪৪]

লক্ষ করুন, চিন্তাভাবনা ও গবেষণাকে 'ব্যাখ্যা'র পরে স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ, সর্বাগ্রে যেন উদ্দিষ্ট লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তার গণ্ডির ভেতরে থেকে হাকিকত, মারেফাত ও ইলমের উচ্চস্তরের জ্ঞান লাভ করার জন্য মানুষ যেন চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করে। এর কারণ হলো, ইলম ও মারেফাত আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে; আমাদের মতামতের মধ্যে নয়। সুতরাং প্রথমে যখন আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে তখন তার মধ্যে চিন্তাভাবনা করার পর জ্ঞানগত হাকিকত প্রকাশ লাভ করবে। আর যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যই আমাদের কাছে স্পষ্ট না হয় তাহলে কিসের মধ্যে আমরা চিন্তা-গবেষণা করব? তাতো হবে কুরআনের উপর চাপিয়ে দেওয়া আমাদের একান্ত নিজস্ব মতামত। অথচ তা থেকে কুরআন পবিত্র। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ব্যাখ্যাকাররূপে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। কেননা ব্যাখ্যা ব্যতীত কুরআনের উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝে আসে না।

হাদিস সংরক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা

হাদিস ব্যতীত কুরআনের মর্ম আয়ত্ব করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বিধায় হযরত মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদিস সংকলন, সংরক্ষণ ও তার ব্যাখ্যা অনুধাবন কল্পে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করেছেন আর মহান আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে বিস্ময়কর স্মরণশক্তি দান করেছেন। এক-একজনের স্মৃতিতে লক্ষ লক্ষ হাদিস সংরক্ষিত ছিল। (কাগজ-কলম সুলভ হবার পর) হাদিস লিপিবদ্ধ করণার্থে বিশাল বিশাল মজলিসের আয়োজন করা হতো। (তখনও ছাপাখানার প্রচলন হয়নি, হাতে লিখে কপি করা হতো)। এক একজন মুহাদ্দিস উঠে দাঁড়াতেন। তাঁদের স্মৃতিতে মতন ও সনদ (মূল পাঠ ও বর্ণনাসূত্র)সহ দুই/তিন লক্ষ করে হাদিস জমা থাকত। এ হাদিস তাঁরা জনসমাবেশে পাঠ করে শুনাতেন আর ছাত্রগণ তা লিপিবদ্ধ করত। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে এক বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযী রহ.-এর শায়েখ একবার মক্কায় সফর করার উদ্দেশ্যে ছাত্রদের নিয়ে জাহাজে উঠলেন। সে যুগে পালতোলা জাহাজ ছিল। বাতাস অনুকূলে থাকলে জাহাজ চলত, প্রতিকূল হলে নোঙর করে রাখতো। জেদ্দায় পৌঁছতে

ছয়/সাত মাস সময় লেগে যেত। একবার হজ করতে এক বছর, দুই বছর সময় পার হয়ে যেত। যাই হোক, ইমাম তিরমিযী রহ.-এর শায়খ জাহাজে আরোহণ করলেন। ইমাম তিরমিযীসহ বহু ছাত্র তাঁর সঙ্গী হলেন। যেহেতু দীর্ঘদিন জাহাজে থাকতে হবে, তাই ছাত্রগণ শায়খের কাছে আরজ করলেন যে, এ সময়টা আমরা হাদিস শুনে ও লিখে কাটাই। শায়খ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বললেন, আগামীকাল থেকে একটি সময় নির্ধারণ করে নাও, আমি তোমাদেরকে হাদিস লেখাব।

ইমাম তিরমিযী রহ.-এর কাছে না ছিল কাগজ, না ছিল দোয়াত-কলম। তিনি ভাবলেন, আমি যদি কাগজ ও দোয়াত-কলম ছাড়া মজলিসে যাই তাহলে আমাকে উঠিয়ে দেওয়া হবে। কেননা হাদিস লেখানোর মজলিসে কাগজ-কলম না থাকা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং তিনি গিয়ে মজলিসের একেবারে পেছনে বসলেন। এক হাঁটু তুলে তার উপর বামহাত রেখে ডানহাত লেখার মতো করে নাড়তে থাকলেন, শায়খ যেন দেখে বুঝতে পারেন যে লিখছে। এভাবে ত্রিশ-চল্লিশ দিন কেটে গেল। প্রতিদিন দশ/বিশটি করে হাদিস রেওয়ায়াত হলো। হঠাৎ একদিন শায়খের দৃষ্টিতে পড়ে গেল যে, তার কাছে কোনো কাগজ-কলম নেই। শায়খ বললেন–

'তুমি যে হাত নাড়াচ্ছ, তোমার কাছে কি কাগজ আছে?'

ইমাম তিরমিযী বললেন, 'না।'

'কলম আছে?'

'না।'

'তাহলে ওভাবে হাত নাড়াচ্ছ কেন?'

ইমাম তিরমিযী বললেন–

'কাগজ-কলম নেই জেনে আপনি যেন আমাকে উঠিয়ে না দেন এ জন্যই আমি এমন করছিলাম, যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে, আমি লিখছি।'

শায়খ রাগান্বিত হয়ে বললেন– 'তুমি আমার মেহনতকে অর্থহীন করে দিলে, তুমি আর দরসে বসো না।'

ইমাম তিরমিযী আরজ করলেন–

'হযরত! আপনার মেহনত বিফলে যায়নি। আল-হামদুলিল্লাহ, সকল রেওয়ায়াত আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।'

এবার তিনি ধারাবাহিকভাবে সেগুলো পড়ে শুনাতে লাগলেন– প্রথমদিন আপনি এই হাদিসগুলো এই এই সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়দিন শুনিয়েছেন এই হাদিসগুলো, যার সনদ এই। তৃতীয়দিন আপনার শোনানো হাদিসগুলো এই এবং তার সনদ হলো এই। এভাবে এতোদিন যাবত লেখানো সবগুলো হাদিস ইমাম তিরমিযী রহ. শুনিয়ে দিলেন। শায়খ তার স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে নিশ্চয়তা পেয়ে তাকে দরসে বসার অনুমতি দিলেন। এমনই বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি মহান আল্লাহ তাদেরকে দান করেছিলেন।

ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর ছেলে, যিনি নিজেও একজন মুহাদ্দিস ছিলেন। একবার বাগদাদ সফরে গেলেন। বাগদাদবাসী যখন শুনলেন ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর ছেলে এখন বাগদাদে অবস্থান করছেন যিনি নিজেও একজন মুহাদ্দিস, তখন হাজার হাজার সাধারণ মুসলমান বরকত লাভের আশায় তার নিকট থেকে হাদিস শোনার জন্য বাগদাদের জামে মসজিদে এসে ভিড় করলেন।

ওলামায়ে কেরাম এসে আরজ করলেন, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, আপনি এখানে তাশরীফ এনেছেন। আল্লাহ আপনাকে মুহাদ্দিস বানিয়েছেন। আমরা আপনার নিকট থেকে কিছু হাদিস শুনতে ও লিখতে চাচ্ছি। তিনি বললেন, যে খাতায় আমি হাদিস লিপিবদ্ধ করে রেখেছি তাতো সাথে আনিনি।

এ কথা শোনার পর তাকে খুব তুচ্ছ জ্ঞান করা হতে লাগলো। যে মুহাদ্দিস বলেন যে, আমি আমার হাদিস সংকলন সাথে আনিনি– এমন দুর্বল স্মৃতিশক্তির মানুষ মুহাদ্দিস হয় কী-করে?

কেউ কেউ দু'একটি কটুবাক্যও উচ্চারণ করলে তার মর্যাদাবোধে আঘাত লাগলো। তিনি উঠে মিম্বরে বসে আবু দাউদ শরীফের হাদিসসমূহ শোনাতে শুরু করলেন। টানা তিনদিনে পুরো আবু দাউদ শরীফ সনদ ও মতনসহ স্বীয় স্মৃতি থেকে শুনিয়ে দিলেন। দু'একটি জায়গা ব্যতীত কোথাও আটকে যাননি। এবার লোকজন মেনে নিলো যে বাস্তবিকই তিনি একজন মুহাদ্দিস। যাই হোক, স্বীয় পয়গম্বরের কালাম সংরক্ষণ করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল বিধায় বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী লোকজন সৃষ্টি করেছিলেন।

বর্তমান যুগে হাদিস রেওয়ায়াত পদ্ধতি

মানুষের সিনা তথা স্মৃতি থেকে হাদিস যখন কাগজে স্থানান্তরিত হলো তখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে হাফেজে হাদিসের সংখ্যা দ্রুত কমে যেতে থাকলো, আমাদের স্মৃতিশক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকলো। বর্তমানে আমরা

এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যে, পকেটে যদি নোটবুক না রাখি তাহলে সকালের কথা সন্ধ্যা পর্যন্ত মনে থাকে না। নোটকৃত কাগজ দেখে দেখে আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করি।

আমার কথাই বলি, আপনাদের এখানে পনের দিনের সফরে এসে যে সফরসূচি তৈরি হয়েছে তা হলো– কয়েকটি মাহফিলের তারিখ ঠিক করা হয়েছে, কোথাও চায়ের দাওয়াত রয়েছে, কোথাও খানার দাওয়াত রয়েছে, কোথাও তাকরীর, কোথাও বৈঠক– মোটকথা পুরো পনের দিনের প্রোগ্রাম লিখিত হয়েছে। সে আমলনামা এখন আমার পকেটে রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, ডান দিকেই আছে, বাম দিকে নয়! প্রতিদিন ফজরের নামাজ পড়ে আমি দেখে নেই যে আজ কোথায় তাকরীর রয়েছে এবং কোথায় যেতে হবে। আমাদের স্মৃতিশক্তির অবস্থা এই যে, পনের দিন তো দূরের কথা, সকালের কথাই সন্ধ্যায় মনে থাকে না। আজ যদি কেউ দাবি করে যে, আমি ইমাম বুখারী, আমি ইমাম মুসলিম কিংবা আমি ইমাম আবু দাউদ তাহলে সেটা হবে হাস্যকর কথা। যাদের স্মৃতিতে হাদিস সংরক্ষণের ইচ্ছা আল্লাহর ছিল তাদেরকে তদ্রূপ স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন। রেওয়ায়াতসমূহ কিতাব আকারে সংকলিত হবার পর এখন মুহাদ্দিসের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, তারা শুধু হাদিসের সূত্র উল্লেখ করে দেন– এটি বুখারীতে আছে, এটি মুসলিমে আছে, এটি তিরমিযীতে আছে প্রভৃতি। সনদের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পড়া এবং বর্ণনাকারীর (রেজাল) মান বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা এখন আর অবশিষ্ট নেই। এ কাজগুলো মুহাদ্দিসগণ করে দিয়েছেন। একেবারে প্রস্তুতকৃত অবস্থায় আমাদের সামনে এসে গেছে। এখন যদি আমরা নিজেকে বুখারীর অনুরূপ দাবি করি তবে তা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা। সকালের কথা সন্ধ্যায় মনে থাকে না অথচ দাবি করছি বুখারী হওয়ার।

এটি একটি কুদরতি ব্যাপার যে, যখন কোনো প্রতিভার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় তখন সে প্রতিভা হ্রাস পেতে শুরু করে। এ কারণেই স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে পেতে আজ এ স্তরে এসে পৌঁছেছে।

ইজতেহাদী যোগ্যতা হারিয়ে যাওয়া

আমি বলে থাকি, কুরআন-হাদিস থেকে সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুসন্ধান ও ফিকহী মাসয়ালা নির্ধারণ করণ– যাকে 'ইজতেহাদ' বলা হয়, তার ক্ষেত্রেও একই বিষয় ঘটেছে। কুরআন হাদিস যখন মানুষের স্মৃতিনির্ভরতামুক্ত হয়ে কিতাব আকারে

কাগজের পৃষ্ঠায় চলে এলো তখন আল্লাহ তায়ালা ইমামগণের মধ্যে এক বিস্ময়কর ইজতেহাদী ক্ষমতা তৈরি করে দিলেন। তাঁরা এক রাতে একটি আয়াত থেকে একশ করে মাসয়ালা বের করেছেন। এমন বিস্ময়কর প্রতিভা দ্বারা তাঁরা ফিকহী মাসায়িল নির্ধারণ করেছেন।

এই ইসতেম্বাতি ও ইজতেহাদী মাসয়ালাসমূহ যখন ইমামগণের সিনা থেকে কাগজে চলে এলো এবং কিতাব তৈরি হলো তখন ইজতেহাদী যোগ্যতাও হ্রাস পেতে শুরু করল। হ্রাস পেতে পেতে এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, একজন ব্যক্তি আলেম হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো উল্টাটা বুঝে যাচ্ছে। বলে এক জিনিস, বোঝে আরেক জিনিস। আমাদের বুঝশক্তিও খারাপ হয়ে গেছে, খতম হয়ে গেছে। সঠিকটা বাদ দিয়ে উল্টাটা বোঝে। একজনের মুখ হতে বের হওয়া একটি বর্ণনা কয়েকজনের মুখ হয়ে অন্যত্র গিয়ে সম্পূর্ণ এলোমেলো হয়ে যায় এবং প্রপাগাণ্ডায় রূপ নেয়। মূল জিনিসের খবরও থাকে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়– ইজতেহাদী ক্ষমতাও শেষ হয়ে গেছে। সে জন্যই আজ যদি কেউ আবু হানিফা বা শাফেয়ী হওয়ার দাবি করে তবে তা হবে হাস্যকর দাবি। ইমামগণ তাঁদের দায়িত্ব আদায় করে গিয়েছেন বিধায় ইজতেহাদী যোগ্যতা বজায় থাকা জরুরি ছিল না। দেখা যাচ্ছে, স্মৃতিশক্তি এবং তারই ধারাবাহিকতায় ইজতেহাদী শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। এ কারণেই বর্তমান যুগে হাদিস রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে যেমন ঐ ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যিনি কিতাবের সূত্র উল্লেখ করে দেন। তেমনি মাসয়ালা ইস্তেম্বাতের ক্ষেত্রে বড় ফকীহ হলেন তিনি যিনি কিতাবের সূত্র বলে দেন যে, অমুক কিতাবে আছে। মোটকথা, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা 'মুবাইয়িন' তথা ব্যাখ্যাকারকরূপে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি আল্লাহর কালামকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেন। কোন্ আয়াতের কী উদ্দেশ্য এবং কী তার ব্যাখ্যা তা বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব ছিল তাঁর। যেমন হযরত আদি ইবনে হাতেম রা.কে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যথায় আদি রা. তো তুলা নির্মিত সুতা নিয়ে বসে গিয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, তুলা দ্বারা তৈরি সুতা উদ্দেশ্য নয় বরং সকালের শুভ্রতা ও রাতের কালিমা উদ্দেশ্য। এভাবেই তিনি বর্ণনা ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দিয়েছেন। যদি পয়গম্বর প্রেরিত না হতেন, শুধু কুরআন নাযিল হতো, তাহলে আয়াতের এ উদ্দেশ্য আমাদের সামনে স্পষ্ট হতো না। আমরা যে যার বুঝ অনুযায়ী ব্যাখ্যা নির্ধারণ করতাম।

আত্মার পরিশুদ্ধি

মানুষের আত্মা ও মস্তিষ্ক যদি তারবিয়াতপ্রাপ্ত না হয়, পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন না হয় এবং তাতে যদি আখলাকী শক্তি না থাকে এ অবস্থায় যদি সে চিন্তাভাবনা করে তাহলে সে উল্টোটা বুঝবে, নিজ রুচি-মর্জি মাফিক বুঝ গ্রহণ করবে। এ কারণেই আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবার জন্য ব্যক্তিসত্তা প্রেরণের আবশ্যকতার সাথে সাথে মানুষের মন-মানসিকতাকেও সে বুঝ গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলার আবশ্যকতা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থাপনের সাথে সাথে মানুষের আত্মশুদ্ধিও করেছেন, মানসিকতাকে ঠিক করে দিয়েছেন।

কেউ যদি মুশরেকসুলভ মানসিকতা নিয়ে কুরআনের দিকে দৃষ্টি দেয় তাহলে তার কাছে মনে হবে প্রতিটি আয়াত দ্বারা শিরকের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কেউ যদি নাসারা (খ্রিস্টান)সুলভ মানসিকতা নিয়ে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনা করে তাহলে তার কাছে মনে হবে যে, প্রতিটি আয়াতই যেন খ্রিষ্টীয় মতাদর্শের ভাণ্ডার। কেননা কুরআন হলো এক দানশীল ব্যক্তির মতো– বন্ধুরাও তার থেকে উপকৃত হয়, শত্রুরাও উপকৃত হয়। কেননা কুরআনের আয়াতসমূহ হলো নানা অর্থের সম্ভাবনাময় এক উসুলী বাক্য, মূলনীতিমূলক বাক্য, একে এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে মানুষ নিজের মতো করে অর্থ বের করতে পারে।

তদ্রূপ কেউ যদি ইহুদী মানসিকতা নিয়ে কুরআনের আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেয় তাহলে তার কাছে মনে হবে কুরআন ইহুদী মতাদর্শে পূর্ণ। কিন্তু কেউ যদি একত্ববাদ বা তাওহীদের মানসিকতা নিয়ে কুরআনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাহলে দেখতে পাবে যে, প্রতিটি আয়াত থেকে কেবল তাওহীদই নির্গত হচ্ছে। এ কারণেই যখনই উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেবার আবশ্যকতা ছিল তখনই মানসিকতা তৈরি করে নেবার প্রয়োজনীয়তা ছিল। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের আত্মশুদ্ধিও করেছেন, সাহাবায়ে কেরামের রিয়াজাত ও মুজাহাদা (আত্মশুদ্ধির চেষ্টা-সাধনা) করিয়েছেন, তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশী হওয়ার প্রশিক্ষণও দিয়েছেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, আল্লাহর প্রতি ধাবিত হওয়া এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করারও মুজাহাদা করিয়েছেন। এগুলো এজন্য করিয়েছে যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বন্ধন যেন সহি হয়, অন্তরে স্থিরতা ও দৃঢ়তা তৈরি হয় এবং অন্তর হতে বক্রতা ও বিচ্যুতি দূর হয়ে যায়। অন্তরে যখন স্থিরতা আসবে তখন তার সামনে উপস্থাপিত আয়াত ও ব্যাখ্যার সঠিক অর্থ সে বুঝবে, ভুল বোঝার অবকাশ

থাকবে না। সুতরাং অন্তরে দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনয়ন করা একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং নবী আগমনের উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

এ কারণেই পবিত্র কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি দায়িত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে:

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

আল্লাহ হলেন তিনি যিনি নিরক্ষরগণের প্রতি তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন যে রাসূল তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূ তিলাওয়াত করে শোনান, তাদের আত্মশুদ্ধি করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। [জুমুয়াহ ৬২ : ২]

আল্লাহ হলেন সেই সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। কেমন রাসূল? যে রাসূল নিজেও একজন উম্মী, লেখাপড়া জানেন না কিন্তু তিনি এমনই জ্ঞান বর্ণনা করেন, যে জ্ঞানের দ্যুতির সামনে অন্যসব জ্ঞান মুখ থুবড়ে পড়ে।

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, এঁদের কাজ কী ছিল? এঁরা কোন্ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন? তাদের দায়িত্ব হলো তাঁরা মানুষের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক অবতীর্ণ শব্দাবলি সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে হবহু পৌঁছে দেন। তা ছাড়া উম্মতকে আয়াতের তালিমও দিয়ে থাকেন। তালিম বলা হয় উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করাকে। অর্থাৎ পয়গম্বরগণ আল্লাহ প্রেরিত আয়াতসমূহ মানুষকে তিলাওয়াত করে শোনানোর সাথে সাথে তার অর্থ ও ব্যাখ্যাও তাদেরকে জানিয়ে দিতেন। অর্থের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তত্ত্ব তালিমের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতেন।

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে– 'তারা হিকমতের তালিম দেন'। হিকমত দুই প্রকার– তত্ত্বগত হিকমত ও আমলগত হিকমত। তত্ত্বগত হিকমত, যাকে হিকমতে নজরী বলা হয়, তা হলো জ্ঞানগত বিষয়– যা তালিমের মধ্যে এসে গেছে। সুতরাং এখানে হিকমত দ্বারা আমলী হিকমত নির্দিষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ তাঁরা আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, অর্থ বুঝিয়ে দেন এবং বাস্তবায়ন করে দেখান– যেন আমলের নমুনাও সামনে থাকে। যাকে বলা হয় উসওয়ায়ে হাসানাহ বা উত্তম আদর্শ। এভাবে

আমলের স্বরূপ সামনে উপস্থাপন করা হয়, যেন রাসূলের আমলের মাধ্যমে আয়াতের অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে সাথে চতুর্থ আরো একটি বিষয়ের আবশ্যকতা ছিল। সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– وَيُزَكِّيهِمْ 'তাদের আত্মশুদ্ধি করেন'। তাদের আন্তরকে ঘষামাজ করেন। অন্তর থেকে বিদ্বেষ ও বক্রতাকে দূরীভূত করে তাতে শুদ্ধতা আনয়ন করেন। কারো মধ্যে ইহুদী-মানসিকতা ছিল, তারা ইহুদী থেকে মুসলমান হয়েছেন। কারো নাসারা-মানসিকতা ছিল, তারা নাসারা হতে মুসলমান হয়েছেন। কারো মানসিকতা ছিল মুশরিকসুলভ, তারা শিরক ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মোটকথা, তিনি পূর্ববর্তী প্রভাবসমূহ বিদূরিত করে অন্তরকে পবিত্র করে তুলেছেন। এর জন্য রিয়াজাত ও মুজাহাদার আবশ্যক হয়। অর্থাৎ তিনি যেমন হালাল হারামেরও বিবরণ দিতেন আবার অন্তরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টিরও দেখাশোনা করতেন।

আমলের তত্ত্বাবধান

রাতে উঠে সাহাবায়ে কেরামের আমলের নেগরানি করতেন, দেখতেন তারা আমল করেন নাকি করেন না? যদি করে থাকেন তাহলে কিভাবে করেন? একবার তিনি রাতের বেলায় সিদ্দিকে আকবার রা.-এর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, তিনি কুরআন তিলাওয়াত করছেন; কিন্তু এত আস্তে তিলাওয়াত করছেন যে, একেবারে কান লাগিয়ে শুনলে তবেই কেবল আওয়াজ শোনা যায়। অন্যথায় নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে এগিয়ে গেলেন। হযরত ওমর ফারুক রা.-এর ঘরের কাছে গিয়ে দেখলেন তিনিও কুরআন তিলাওয়াত করছেন; কিন্তু তিনি এতই উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করছেন যে, পুরো মহল্লায় সে আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে। ফজরের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে দুজনই যখন উপস্থিত ছিলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি এত আস্তে কেন পড়ছিলে যে, একেবারে কান না লাগিয়ে শুনলে শোনাই যাচ্ছিল না? হযরত আবু বকর রা. আরজ করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি যাকে শুনাচ্ছিলাম, না তিনি বধির, না আমার থেকে দূরে। অর্থাৎ আল্লাহকে শুনাচ্ছিলাম। সুতরাং উচ্চস্বরে পড়ার কী প্রয়োজন?

অতঃপর তিনি হযরত ওমর ফারুক রা.-এর কাছে জানতে চাইলেন– তুমি কেন এত জোরে জোরে পড়ছিলে? ওমর ফারুক রা. আরজ করলেন–

أُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَ أُطْرِدُ الشَّيْطَنَ

ঘুমন্তদেরকে জাগাচ্ছিলাম এবং শয়তানকে ভাগাচ্ছিলাম। এ কারণেই আমি জোরে জোরে পড়ছিলাম।

তাঁর শানই তো ছিল এমন। أَشَدُّهُمْ فِيْ أَمْرِ اللهِ عُمَرُ আল্লাহর নির্দেশের ব্যাপারে সাহাবাগণের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর হলেন হযরত ওমর রা.।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আবু বকর! তোমার আওয়াজকে তুমি আরেকটু জোরালো করো। ওমর! আরেকটু নিচু স্বরে তুমি তিলাওয়াত করো। এতে উভয়ের তিলাওয়াতে সমতা আসবে।

এটা কোনো হালাল হারাম বা জায়েজ না-জায়েজের মাসয়ালা ছিল না, এ ছিল আমলের নেগরানি। উদ্দেশ্য ছিল আমলের ধরন উপস্থাপন, যাতে স্থিরতা ও সমতার সৃষ্টি হয়।

কলবের চিকিৎসা

হাদিসে এসেছে, কেউ কেউ জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে আরজ করতেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা আসে। তিনি বললেন, কী ওয়াসওয়াসা? তারা বললো, আমাদের অন্তরে ধারাবাহিক কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন– অন্তরে প্রশ্ন জাগে, বিশাল এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? অন্তর থেকে উত্তর আসে 'আল্লাহ' সৃষ্টি করেছেন। আসমান কে সৃষ্টি করেছেন? উত্তর আসে 'আল্লাহ'। এ প্রশ্নগুলোর পর অন্তরে যে সিদ্ধান্তটি স্থির হয় তা হলো– প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই একজন স্রষ্টার আবশ্যকতা রয়েছে, প্রত্যেক আস্তিত্বশীলের জন্য অস্তিত্বে আনয়নকারীর আবশ্যকতা রয়েছে। এ অবস্থায় আমাদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, মাহান আল্লাহ তায়ালাও যেহেতু অস্তিত্বশীল এক সত্তা, সেহেতু তাঁর সৃষ্টিকর্তা কে?

এমন প্রশ্নই যখন আমাদের মনে এসে যাচ্ছে তখন আমাদের ঈমান আর বাকি থাকলো কই? আল্লাহর ব্যাপারেই যখন প্রশ্ন জাগলো যে তাঁকে কে সৃষ্টি করেছেন, তখন কিভাবে তার ঈমান থাকতে পারে? আর যখন ঈমানই থাকলো না, তখন আমলের অবস্থা কী হবে? ঈমানের ভিত্তিতে আমলের মধ্যে শক্তি আসে, আমল ঊর্ধ্ব জগতে আরোহণ করে। ঈমানহীন আমল তো অর্থহীন,

বাতিল। ওয়াসওয়াসার প্রভাবে আমল বাতিল ও অর্থহীন হয়ে গেল, আমলী যিন্দেগী ও আমলের ঊর্ধ্বারোহণ বাধাপ্রাপ্ত হলো।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর রাসূল এ ওয়াসওয়াসা দূর করে দিলেন, অত্যন্ত বিজ্ঞতাসুলভ পদ্ধতিতে এ ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহের অবসান করলেন–

বললেন, তোমাদের মনে এই যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয়, এগুলোকে তোমরা কি খারাপ মনে কর না কি ভাল মনে কর?

তাঁরা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূ! আমরা একে এতই খারাপ মনে করি যে জ্বলে-পুড়ে কালা হয়ে যাওয়া সহ্য হয় কিন্তু এ ওয়াসওয়াসা সহ্যযোগ্য নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

ذٰلِكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ

ইহাই তো ঈমানের আলামত

ওয়াসওয়াসাকে খারাপ মনে করাই তো ঈমান। ভেতরে ঈমান না থাকলে মানুষ ওয়াসওয়াসাকে খারাপ মনে করে না। কেন ভয় পায়? ঈমানই তার মধ্যে ভয়ের উদ্রেক করে। এ যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠা। ঈমান হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠা। এ অস্থিরতা মূলত তার ঈমানের স্পষ্টতাকেই জানান দিচ্ছে। আমলের ক্রমোন্নয়ন ধারায় যে ছেদ পড়েছিল তা পুনরায় দূরীভূত হয়ে গেল।

দেখুন, এগুলো কিন্তু কোনো জায়েয না-জায়েযের মাসয়ালা কিংবা হালাল হারামের মাসয়ালা ছিল না। এ ছিল কলবের তারবিয়াতের মাসয়ালা, অন্তরের গতিপথ ঠিক করার মাসয়ালা। অন্তরকে এ মর্মে পথ-প্রদর্শন করা যে, এদিকে যাও, ওদিকে যেও না।

একবার হযরত হানজালা রা. কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। আবু বকর রা. তার কুশল জানতে চাইলে হানজালা রা. বললেন: نَافَقَ حَنْظَلَةُ 'হানাজালা মুনাফিক হয়ে গেছে'। এখন আর তার মধ্যে ঈমান নেই। সিদ্দিকে আকবার রা. বললেন: وَمَا ذَاكَ 'এ তুমি কেমন কথা বলছো? কেন এমন কথা বলছে?' উত্তরে তিনি বললেন, এ কারণে বলছি যে, যতক্ষণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে উপস্থিত থাকি ততক্ষণ যেন জান্নাত ও জাহান্নাম চোখের সামনে থাকে। আর যখন ঘরে ফিরে আসি, স্ত্রী-সন্তানদের কাছে থাকি তখন আর পূর্বের অবস্থা থাকে না। এতে বোঝা যাচ্ছে, আমার মধ্যে 'মুখ দেখা' ঈমান আছে, প্রকৃত ঈমান নেই। হুজুরের মজলিসে গেলে ঈমান এসে যায় কিন্তু ঘরে ফিরে এলে সে ঈমান চলে যায়।

একেই তো মুনাফেকী বলা হয়। হানজালা রা.-এর কথা শুনে হযরত আবু বকর রা. বললেন, আমার অবস্থাও তো এমনই। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে থাকি তখন আরশ-কুরসী পর্যন্ত যেন প্রত্যক্ষ করি কিন্তু বাড়িতে এমন অবস্থা হয় না। সুতরাং তোমার ও আমার অবস্থা যেহেতু একই এবং বোঝা যাচ্ছে যে, এটা অন্তরের রোগ, সেহেতু চলো দু'জনেই জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে গিয়ে এর চিকিৎসা করাই।

দু'জনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত আবু বকর রা. ঘটনার আদ্যোপান্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে ঈমান কোথায়? এতো নিফাক (ঈমানের বিপরীত বিষয়, মুনাফেকী)। আমাদের ঈমান তো মুখ দেখা ঈমান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَّ سَاعَةً

হানজালা! ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। সময় সময় এমনটি হয়ে থাকে। সন্নিধ্য ও উপস্থিতির অবস্থা এবং অনৈকট্য ও দূরবর্তী অবস্থার মধ্যে 'অবস্থাগত ভিন্নতা' পরিলক্ষিত হয়।

বিষয়টিকে একটি উদারহরণের মাধ্যমে তিনি বুঝালেন। বললেন, সমুদ্রের দিকে লক্ষ করো, কোনো কোনো ঋতুতে সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। যেমন মে-জুন-জুলাই মাসে। আবার অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বরে এসে সমুদ্র একেবারে শান্ত হয়ে যায়। ঢেউয়ে ঢেউয়ে সমুদ্র যখন উত্তাল হয়ে ওঠে তখন মনে হয় যেন সমুদ্র দ্বি-গুণ, তিনগুণ, এমনকি চারগুণ হয়ে গিয়েছে, সমুদ্রের পানি বহু বেড়ে গেছে। আবার সমুদ্র যখন শান্ত হয়ে যায় তখন মনে হয় যেন পানি কমে গিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না উত্তাল মুহূর্তে পানি বেড়ে যায়, না শান্ত অবস্থায় কমে যায়।

তুফান যখন সমুদ্রের পানিতে আলোড়ন তোলে তখন উত্তাল তরঙ্গমালা দেখে মনে হয় পানি বুঝি চারগুণ হয়ে গেছে। স্থিরতার সময় একমনটি হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

'ঠিক তদ্রূপ, তোমরা যখন আমার মজলিসে উপস্থিত হও তখন তোমাদের ঈমানের সমুদ্রে আলোড়ন জাগে, চারগুণ হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয়। যখন ঘরে চলে যাও তখন স্থিরতা আসে। এতে ঈমান হ্রাস পায় না। এটা ঠিক সমুদ্রেরই অনুরূপ অবস্থা– না স্থিরতার সময় হ্রাস পায়, না উত্তাল মুহূর্তে বৃদ্ধি ঘটে।

মনের মধ্যে তৈরি হওয়া ওয়াসওয়াসা দুর হয়ে গেল এবং আমলের ক্রমোন্নয়ন ধারায় যে ছেদ পড়েছিল তা কেটে গিয়ে পুনরায় জারি হয়ে গেল। এগুলো হলো আত্মার কিচিৎসা; হালাল ও হারামের বর্ণনা নয়। এ হলো নফসের তারবিয়াত ও আত্মশুদ্ধি, অন্তরের গতিকে শুদ্ধ করণ।

যাই হোক, তালিম হলো মুদাররিস বা শিক্ষকের কাজ আর তারবিয়াত হলো যুগের শায়খের কাজ। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় উস্তাদ, অপর দিকে সবচেয়ে বড় শায়খ। একদিকে তিনি আমলের শুদ্ধিকরণ করতেন অপর দিকে অন্তরকে ঘসে মেজে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করে তাতে নূর সৃষ্টি করতেন।

নূরান্বিত আত্মার প্রভাব

কলবের মধ্যে নূরের সৃষ্টি হওয়া এবং আত্মার গতিপথ শুদ্ধ হওয়ার প্রভাব এই যে, কুরআনের কোনো আয়াত সামনে এলে আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট সঠিক অর্থটি তার বুঝে আসবে; অর্থ অনুধাবন করা কখনো বাকি থাকবে না। যে হাদিস সামনে আসবে তার সঠিক অর্থ সে বুঝবে, কোনো রকম বক্রতা তাতে থাকবে না। পক্ষান্তরে যার কলবের তারবিয়াত শুদ্ধ হয়নি, সে আয়াতের মধ্যে সন্দেহ করবে, রেওয়ায়াতের মধ্যে সন্দেহ করবে। কেননা তার অন্তরেই তো বক্রতা রয়েছে। বক্রতা হাদিস বা কুরআনে নয়। বক্রতা তার অন্তরে। তার অন্তরের বক্রতাই তার কাছে কুরআন হাদিসের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অথচ কুরআন ও হাদিস এ ধরনের ত্রুটি হতে পবিত্র। সে তার অন্তরকে কারো দ্বারা শুদ্ধ করায়নি বলে তার এ পরিণতি।

আত্মার শুদ্ধি ছাড়া কুরআনের বুঝ

তারবিয়াতহীন, শুদ্ধিহীন একটি আত্মা, যার মধ্যে লোভ, রিপুর আনুগত্য, অহংকার, হিংসা ও আমিত্ব ভরপুর, সে যখন তার এই চরিত্র নিয়ে কুরআনের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবে তখন সেতো উল্টাপাল্টা অর্থ বের করবেই। কেননা তার কলব ও পথ সঠিক নয়, তার দৃষ্টি স্বীয় নফসের দিকে নিবদ্ধ, আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ নয়।

এ কারণেই হাদিসকে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল বলেছেনঃ

يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانَ عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَقُوْلُ

অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন উদরপূর্ণ ব্যক্তিরা সোফার উপরে আয়েশ করে বসা অবস্থায় বলবে–

حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ

আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট।

আমরা হাদিস মানি না। কুরআনে যা হালাল বলা হয়েছে তাকে হালাল মনে করব আর যা হারাম বলা হয়েছে তাকে হারাম বলব।

দেখুন, যে বর্ণনা দ্বারা হাদিসকে অস্বীকার করার ফেতনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে সে বর্ণনাতেই কিন্তু এ ফেতনার উদ্ভাবকদেরকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

رَجُلٌ شَبْعَانَ عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ

প্রথমত বলা হয়েছে যে তার পেট খাদ্য দ্বারা পূর্ণ থাকবে। ঐ ব্যক্তিই কেবল পূর্ণ উদরপূর্তি করে খানা খায় যার নফসের মধ্যে লোভ-লালসার পরিমাণ অধিক থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহভীরু ও মুত্তাকীগণ কেবল প্রয়োজন মাফিক আহার করেন। বাছ-বিচারহীন খাওয়া এবং নাক পর্যন্ত পেট ভরে খাওয়া লোভী হওয়ার আলামত। আর লোভী হলো সেই ব্যক্তি যে নফসের গোলাম। মানুষ আল্লাহর গোলাম হলে তার মধ্যে কোনোরূপ বক্রতা থাকে না; কিন্তু নফসের গোলাম হলে সে নফসমুখী হবে। সুতরাং কেউ যদি নফসমুখী হয়ে আল্লাহর আয়াতের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে তো সে বিপরীত অর্থটি বুঝবে, সঠিক অর্থ কখনোই তার বুঝে আসবে না। এ কারণেই হাদিসে দুটি শব্দ বর্ণিত হয়েছে– شَبْعَانَ এবং عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ। প্রথম শব্দটি দ্বারা লোভী হওয়ার দিকে ইশারা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় শব্দটি দ্বারা গর্ব ও অহংকারের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান নিয়ে গর্ববোধ করে এবং অন্যদেরকে মূর্খ ভাবে, সে তার অহংকার ও লোভী মানসিকতার দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা কুরআনকে বুঝতে গেলে নিজের মতো করেই বুঝবে এবং সেই অর্থকেই আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থ মনে করবে। এভাবে কখনোই সে সঠিক অর্থ উপলব্ধি করতে পারবে না। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। যাঁরা তিলাওয়াত করে শোনান, অর্থ বুঝিয়ে দেন এবং আমল করে দেখান। সাথে সাথে তাঁরা তাজকিয়া ও আত্মশুদ্ধিও করেন।

আল্লাহর রাসূল পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর এই চারটি বিষয়ই বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, তবেই না দীনের পূর্ণতা বলবৎ থাকবে। এর কোনো একটিতে যদি ত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে বলা হবে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অসম্পূর্ণ দীন রেখে গিয়েছেন; পূর্ণাঙ্গ ইসলাম অবশিষ্ট নেই।

খেদমতে কালামুল্লাহ্

আলহামদুলিল্লাহ। কুরআনের আয়াতের তিলাওয়াত বর্তমানে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রয়েছে। উম্মতের মধ্যে লাখো হাফেজে কুরআন বিদ্যমান রয়েছেন। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি যের-যর যাদের মুখস্থ রয়েছে। মুসলমানরা যেভাবে কুরআনের এ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে, দুনিয়ার কোনো জাতি তাদের ধর্মীয় কিতাবের ব্যাপারে তা করেনি। ছয় বছরের একটি বাচ্চা 'আলহামদু' থেকে 'আন-নাস' পার্যন্ত পূর্ণ কুরআন শরীফ কী অনায়াসেই না পড়ে যায়। পবিত্র রমজানে আপনারা দেখবেন, মসজিদগুলো কুরআনের দ্যুতিতে যেন চমকিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন মসজিদে খতম তারাবীর আয়োজন করা হয়। ইমাম সাহেব কুরআন তিলাওয়াত করেন, মুক্তাদিগণ মনোযোগসহকারে শুনতে থাকেন। ইমাম কোথাও ভুল করলে মুক্তাদিগণ লোকমা দেন। যতক্ষণ না শুদ্ধ করে পড়েন ততক্ষণ সামনে অগ্রসর হতে দেন না। দেখা যাচ্ছে, তিলাওয়াতকারীও হাফেজ, শ্রোতাও হাফেজ। এভাবে যুগের পর যুগ হাফেজে কুরআনের একটি জামাত কুরআনকে হেফাযত করে আসছেন। সুতরাং কুরআনের শব্দাবলির সংরক্ষক মূলত হাফেজে কুরআনগণ।

কুরআনের অর্থের সংরক্ষক হলেন ওলামায়ে কেরাম। আমলের মাধ্যমে নমুনা উপস্থাপনকারী হলেন মুহাক্কিক সুফীগণ। যাঁরা পরিপূর্ণ তাকওয়া ও বিশ্বস্ততার সাথে আমলের স্বরূপ উপস্থাপন করেন ও আমল করে দেখান। অপরদিকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা বা আত্মশুদ্ধির দায়িত্ব পালন করছেন সেইসমস্ত ওলামায়ে হযরত যাঁরা খানকায় বসে কলবের তারবিয়াত করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তিলাওয়াত, তালিম, তাজকিয়া ও উসওয়া (আদর্শ)-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ডই চলমান রয়েছে। এগুলোর কোনো একটি বিষয় যদি বিদ্যমান না থাকত তাহলে বলা যেত যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবর্তমানে ইসলামের চারটি স্তম্ভের একটি স্তম্ভ ধ্বসে গেছে। এমন হলে ইসলাম নামক ভবনটি কিভাবে টিকে থাকত?

আলহামদুলিল্লাহ। বর্তমানে এই চার স্তরে কর্মসম্পাদনকারী ব্যক্তিই বিদ্যমান রয়েছেন। এ চার ধরনের ব্যক্তিবর্গই পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি। একদল আল্লাহর ইলমী খলিফা, যারা তাঁর শব্দাবলিকে সংরক্ষণ করছেন। একদল তাঁর ঐ ইলমী খলিফা যারা কালামুল্লাহর অর্থ সংরক্ষণ করছেন। আরেকদল হলো আমলী খলিফা, যারা আয়াতের অন্তর্নিহিত কাইফিয়াত, যা কলবের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেই কাইফিয়াতকে রিয়াজাত ও মুজাহাদার দ্বারা সংরক্ষণ করছেন। এগুলো কখনোই বিলিন হয়ে যাবে না। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। বিরুদ্ধবাদীরা, অস্বীকারকারীরা অস্বীকার করেই যাবে। প্রথম যুগেও এ ধরনের লোক ছিল।

হাদিসের খেদমত

এ যুগ ও প্রথম যুগের হাদিস অস্বীকারকারীদের মধ্যে পার্থক্য হলো, তখন সরাসরি হাদিসকে অস্বীকার করা হতো না, বরং স্বীকৃতি দেবার পদ্ধতি অবলম্বনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করত। অর্থাৎ সহি হাদিসের সাথে মনগড়া কথাবার্তা সংযুক্ত করে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলতো। এটা এজন্য করত, যেন হাদিসের উপর হতে মানুষের আস্থা উঠে যায়, মানুষ একে অগ্রহণযোগ্য ভাবে। দেখা যাচ্ছে, হাদিসকে অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস তখন ছিল না। সুতরাং স্বীকৃতি দেবার পদ্ধতি অবলম্বন করে সুকৌশলে বিরোধিতা করা হতো। কিন্তু এ চক্রান্তে তারা সফল হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাদ্দিসীনে কেরামকে উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁরা এ অপচেষ্টাকে আলোর মুখে নিয়ে এসেছেন। অতি উত্তমভাবে ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা স্বতন্ত্র কিতাব লিখে সহি, জয়িফ, মাউজু হাদিসসমূহ চিহ্নিত করে দিয়েছেন। হাদিসের প্রকারভেদ বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং দলিলগ্রহণের স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সকল হাদিস একই স্তরের নয়। হাদিসটি যদি মুতাওয়াতির হয় তাহলে তার সনদের প্রমাণ হবে কুরআনের অনরূপ। এ হাদিস দ্বারা যা প্রমাণিত হবে তা হবে অকাট্য। এর দ্বারা দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রমাণিত হবে। হাদিসের প্রমাণসূত্র যদি আরেকটু নিচু স্তরের হয় তাহলে তাকে বলা হয় খবরে ওয়াহেদ। এ ধরনের হাদিস দৃঢ় নিশ্চয়তা প্রদান করবে না, সম্ভাবনার ধারণা সৃষ্টি করবে। এরূপ হাদিসের সাথে যখন অন্য কোনো দুর্বলতা যুক্ত হবে তখন তা কেবল কোনো বর্ণনাকে সমর্থন করার উপযুক্ততা রাখবে, কোনো হুকুমের ভিত্তি হতে পারবে

না। কৌতুকথা, মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদিসের প্রকারভেদ বর্ণনা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ মতন বা মূলপাঠ-এর ভিত্তিতে এত প্রকার, সনদের ভিত্তিতে এত প্রকার, রিজাল বা বর্ণনাকারীর ভিত্তিতে এত প্রকার প্রভৃতি। যদি সূচনার দিক থেকে অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের দিক থেকে কোনো রাবি (বর্ণনাকারী) ছুটে যায় তাহলে তাকে বলা হয় 'মুরসাল'। প্রথম দিক থেকে কোনো বর্ণনাকারী (সাহাবী নয়) বর্ণনায় উপস্থিত না থাকলে তাকে বলা হয় 'মুয়াদ্দাল'। মধ্যখান থেকে রাবি ছুটে গেলে তাকে বলা হয় 'মশাক্কাল'। মুয়াদ্দাল, মুরসাল ও মুশাক্কাল সূত্রে বর্ণিত যে হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং তার সকল বর্ণনাকারী সিকা বা নির্ভরযোগ্য তাকে 'মারফুয়ে মুত্তাসিল' বলা হয়। যাই হোক, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদিস বর্ণনা পদ্ধতিকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ দিয়েছেন। পৃথিবীতে রেওয়ায়াত বর্ণনা শাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না, মুসলমানরা এর উদ্ভাবক।

হাদিস বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা চার লাখের কাছাকাছি। মুহাদ্দিসগণ এই চার লক্ষ ব্যক্তির পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত সংকলন করেছেন। এটা এ জন্য করেছেন, যেন বোঝা যায় যে, তিনি কোন ধরনের চরিত্রের অধিকারী এবং কিভাবে জীবন-যাপনকারী ছিলেন।

হাদিস রেওয়ায়াতের ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা

কোনো বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। বর্ণনাকারী সমগ্র জীবনে কোনো একবার মিথ্যা বলেছে বলে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তার জীবনভর বর্ণিত সকল রেওয়ায়াত সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য ঘোষিত হয়েছে। যেন তার থেকে কোনো রেওয়ায়াতই বর্ণিত হয়নি। এমন ব্যক্তির বর্ণিত রেওয়ায়াতের কোনোই গ্রহণযোগ্যতা নেই। মিথ্যা বলা তো দূরের কথা, যদি মিথ্যার মতো বলে মনে হয় কিংবা মিথ্যার সন্দেহ তৈরি হয় তবুও তার বর্ণিত রেওয়ায়াত বাতিল করে দিতেন।

জনৈক মুহাদ্দিসের জীবনীতে একটি ঘটনা উল্লেখ আছে। একটি হাদিসের সনদ সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, এ হাদিসের উন্নততর সনদ সিরিয়ার একজন মুহাদ্দিসের রয়েছে। একটি মাত্র হাদিসের সনদ লাভ করার জন্য তিনি মদীনা হতে তিনশত মাইল দূরের সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। সে যুগের সফর পায়ে হেঁটে বা উটে চড়ে সম্পাদিত হতো। কোথাও সফর করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। মাত্র একটি হাদিস শোনার জন্য তিনশত মাইল দীর্ঘ পথের

কষ্টসহিষ্ণু সফর করে সিরিয়ায় গিয়ে পৌছলেন। লোকজনের কাছে সন্ধান নিয়ে ঐ মুহাদ্দিসের বাড়িতে গিয়ে পৌছলেন। বাহির থেকে আওয়াজ দেবার পর তিনি বেরিয়ে এলেন। সালাম ও মুসাফাহা করলেন। সিরিয়ার মুহাদ্দিস মদীনার মুহাদ্দিসকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে গ্রহণ করলেন। যথারীতি তিনি হাদিসের দরস দিতে বসলেন। অন্যান্য জ্ঞান পিপাশুদের সাথে মদীনা হতে আগত মুহাদ্দিস সাহেবও মজলিসে বসলেন। মুহাদ্দিস সাহেবের একটি শিশুপুত্র মজলিসে চলে এলো। শিশুরা মাঝে মাঝে জিদ করে থাকে। উক্ত শিশুটিও কোনো এক কারণে জিদ করেছিল। তিনি শিশুটিকে নানাভাবে বুঝিয়ে নিবৃত করতে চাইলেন। কিন্তু শিশুটি ছিল অত্যন্ত জেদী, কিছুতেই মানছিল না। শেষ পর্যন্ত ঐ মুহাদ্দিস সাহেব হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শিশুটিকে বললেন, এই নাও, তোমাকে একটি জিনিস দিচ্ছি। শিশুটি কাছে এলো। হাতে তো কিছুই ছিল না, ছেলেটিকে ভুলিয়ে কাছে আনার উদ্দেশ্যে ছিল বলে কাছে আসার পর তাকে ধরে বের করে দিলেন। এই ঘটনা দেখে যিনি হাদিস শুনতে গিয়েছিলেন তিনি 'লা-হাওলা' পড়ে মজলিস থেকে উঠে চলে এলেন এবং বললেন, একটি মাসুম বাচ্চার সাথে যে মিথ্যা বলতে পারে, হাতে কিছু না থাকা সত্ত্বেও বললো যে কাছে এসো তোমাকে একটি জিনিস দিচ্ছি; এমন ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর উপর মিথ্যা বলাতে অসুবিধা কী? সে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যা বলে তাহলে কি জবান আটকে দেওয়া হবে? এটা ছিল সম্পূর্ণ একটি মোবাহ বিষয়, কিন্তু মদীনা হতে আগত মুহাদ্দিস সাহেব তা মেনে নিতে পারলেন না। তিনশ মাইলের এই দীর্ঘ সফরকে অর্থহীন করে তিনি পুনরায় মদীনার পথে যাত্রা করলেন। কেননা এ উপযুক্ততা উক্ত মুহাদ্দিসের নেই যে তার থেকে হাদিস শোনা যাবে। একটা শিশুকে ভোলানোর জন্য মিথ্যা বলে দিল। হাতে কিছু নেই অথচ কিছু দেবার কথা বলে ডাকল। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, এটা কিন্তু মিথ্যা ছিল না। এটা ভোলাবার একটা পদ্ধতি। এমন ব্যক্তিকে 'মিথ্যাবাদী' বলা যায় না। কিন্তু হাদিসের সনদের বেলায় 'মিথ্যার মতো' বিষয় কিংবা 'মিথ্যা বলে সন্দেহ হওয়ার মতো' বিষয়কে মিথ্যা বলে ধরে নিয়েছেন। এমনই সতর্কতার সাথে তারা বর্ণনা গ্রহণ করেছেন বলেই আজ নিখাঁদ দীন আমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে। কোনো রকমের আপত্তি তোলার অবকাশ না রেখে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কৃত ব্যাখ্যাবলি যদি সংরক্ষণ করা না হতো তাহলে কুরআন বুঝিয়ে দেবার মতো কেউ আর অবশিষ্ট থাকতো না। অবস্থা দাঁড়াতো এমন– প্রত্যেকে কুরআনের আয়াতের অনুবাদ দেখে

নিজের মতো করে তার ব্যাখ্যা করত এবং বলতো, এটাই হলো আল্লাহর উদ্দেশ্য। নিজের মতামতকে আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দিত।

যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে চারটি দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল সে চারটি দায়িত্ব আজও বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত চারটি বিষয়েই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি বিদ্যমান রয়েছেন। শব্দ সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রতিনিধি রয়েছেন, অর্থ ও আহকাম বর্ণনা করার জন্য প্রতিনিধি রয়েছেন, আত্মশুদ্ধির পথে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বের আঞ্জামদাতা রয়েছেন এবং আমলের নমুনা প্রদর্শনকারী প্রতিনিধিও রয়েছেন।

তালিমের আদব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইলম ও আমলের প্রতিনিধি পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছেন, তবে তাদেরকে খুঁজে নিতে হয়। কেননা এ জাতীয় ব্যক্তিবর্গ মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলেন না যে, আমার নিকট থেকে তোমরা জ্ঞান আহরণ করে নাও; বরং আগ্রহীদেরকে তাদের নিকটে যেতে হয়।

العِلْمُ يُؤْتٰى وَلَا يُؤْتِىْ

ইলমের কাছে ব্যক্তিকে যেতে হয়, ব্যক্তির কাছে ইলম আসে না।

একবার খলিফা হারুনুর রশিদ ইমাম মালেক রহ.কে বললেন, আমি চাচ্ছি আমার দুই ছেলে আপনার কাছে মুয়াত্তা পড়ুক (মুয়াত্তা হলো ইমাম মালেক রহ. কর্তৃক সংকলিত হাদিসগ্রন্থ)। ইমাম সাহেব পড়াবার ওয়াদা করলেন। হারুনুর রশিদ জানতে চাইলেন, কখন আমার এখানে তাশরীফ আনবেন? ইমাম মালেক রহ. বললেন, এখানে তাশরীফ আনার কী অর্থ?

العِلْمُ يُؤْتٰى وَلَا يُؤْتِىْ

ইলম নিজে কি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরবে নাকি? তাদেরকে আমার ওখানে আসতে হবে। হারুনুর রশিদের কাছে বিষয়টা ভাল ঠেকলো না। তবুও বললেন, ঠিক আছে, ওরা আপনার ওখানেই যাবে, তবে শর্ত হলো, সাধারণ ছাত্রদের সাথে আমার ছেলেদের বসাবেন না, ওদের জন্য একটু আলাদা ব্যবস্থা করবেন।

ইমাম মালেক রহ. বললেন, তালেবে ইলমের ক্ষেত্রে সবাই সমান। ওদেরকে মূর্খ রাখতে চাইলে আমি আলাদা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু আলেম বানাতে চাইলে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

এরপর খলিফা হারুনুর রশিদকে উদ্দেশ্য করে ইমাম মালেক রহ. বললেন, এ ইলম আপনাদের ঘর হতেই নির্গত। আপনি আব্বাস রা.-এর বংশধর। আপনারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটাত্মীয়। আপনারাই যদি এ ইলমকে বেইজ্জতি করেন তাহলে একে ইজ্জত করার জন্য আর কে এগিয়ে আসবে?

এরপর শাহজাদাদ্বয় অন্যান্য ছাত্রদের মতই দরসে যেতেন, আদবসহকারে বসতেন, উস্তাদের ধমক-ধামকও শুনতেন। এভাবেই তারা হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীতে খলিফা হারুনুর রশিদের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছিল। যেমন– একবার ইমাম মালেক রহ. অজু করছিলেন আর শাহজাদা মামুন বদনা দিয়ে পানি ঢালছিলেন। অজুর শেষ পর্যায়ে ইমাম মালেক রহ. যখন ডলে ডলে নিজের পা পরিষ্কার করছিলেন তখন হঠাৎ করে খলিফা হারুনুর রশিদ সেখানে এসে দৃশ্যটি দেখলেন। খলিফা ইমাম মালেক রহ.-এর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। এ অভিযোগ করেননি যে কেন পা ধোয়ালেন? কেন পানি ঢালালেন? বরং অভিযোগ এই করলেন যে, আপনি আপনার হাত দ্বারা পা পরিস্কার করছেন, অথচ মামুনের উপর কর্তব্য ছিল যে এক হাতে বদনা নিয়ে পানি ঢালবে এবং অন্য হাত দিয়ে ডলে ডলে পা পরিষ্কার করে দেবে। শুধু পানি ঢালার দ্বারা তো তার কর্তব্য আদায় হয় না। দেখুন, হারুনুর রশিদ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন।

ইলমের যথার্থ অন্বেষণ

ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে প্রকৃত বাস্তবতা হলো এই:

العلمُ عِزٌّ لاَ ذُلَّ فِيْهِ يَحْصُلُ بِذُلٍّ لاَ عِزَّ فِيْهِ

এটা ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর বাণী। যার অর্থ হলো–

> ইলম হলো এমনই এক সম্মানজনক বিষয় যাতে বিন্দু পরিমাণে অসম্মান ও লাঞ্ছনা নেই। অথচ তা এমনই বেইজ্জতি ও লাঞ্ছনার সাথে অর্জন করতে হয় যে, তাতে ইজ্জতের চিহ্নও থাকে না।

ইলম অর্জন করতে গিয়ে মানুষকে গোলামি করতে হয়। শিক্ষকদের সামনে মাথানত করতে হয়, নানা প্রকার কষ্ট সহিষ্ণুতা ও বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়- তারপর গিয়ে দু'এক হরফ জ্ঞান অর্জিত হয়। কেউ একজন হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছে জানতে চাইলেন, এত অধিক ইলম আপনি কিভাবে লাভ করলেন? তিনি উত্তর করলেন–

بِلِسَانٍ سَئُولٍ و قَلبٍ عَقُوْلٍ

অধিক জিজ্ঞাসু যবান ও বুঝদার কলবের মাধ্যমে।

প্রশ্ন করতে আমি কখনো লজ্জাবোধ করিনি। মাসয়ালা জানা না থাকলে ছোটদের নিকট থেকেও প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছি। যথা– একবার একটি মাসয়ালার ব্যাপারে খটকা লাগল। মাসয়ালাটি জানার জন্য ওহী লেখক হযরত যায়েদ বিন সাবেত রা.-এর শরণাপন্ন হওয়া জরুরি ছিল। দুপুর বারটার দিকে যখনই প্রশ্নটি মনে উদয় হলো তখনই তিনি যায়েদ বিন সাবেত রা.-এর বাড়িতে চলে গেলেন। কিন্তু সময়টা অসময় হওয়ায় তিনি ঘরে না গিয়ে দহলিজে বসে রইলেন, যেখানে রয়েছে উত্তপ্ত পাথর, মাথার উপরে মরুভূমির প্রখর রোদ। এ খেয়ালে তিনি সেখানে বসে রইলেন যে, যখন যোহরের নামাজ পড়তে বের হবেন তখন প্রশ্নটি করবেন। কেননা মসজিদে পৌঁছে যাওয়ার পর দরস শুরু করে দিবেন, তখন আর প্রশ্ন করার সুযোগ থাকবে না। পুরোটা দুপুর এভাবে রোদের মধ্যে বসে রইলেন।

যায়েদ বিন সাবেত রা. ঘর হতে বের হয়ে ইবনে আব্বাস রা.কে বসে থাকতে দেখে বললেন– 'হে রাসূলের চাচার বেটা! আপনি এ কোথায় বসে আছেন?'

ইবনে আব্বাস রা. বললেন– 'হযরত! একটি মাসয়ালার ব্যাপারে আটকে গিয়েছি, সেটি জানার জন্য এসেছি।' যায়েদ রা. বললেন– 'তাহলে ভেতরে চলে আসতেন।'

বললেন– 'যখনই মনের মধ্যে খটকা তৈরি হয়েছে, তখনই চলে এসেছি; কিন্তু সময়টা কারো কাছে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত নয় বলে এখানে বসে রয়েছি।'

দেখুন, যখনই মনের মধ্যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে তখনই তা জানার জন্য ছুটে গিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁর প্রচণ্ড জানার আগ্রহ সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল। সাথে সাথে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, সকল আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে কতই না তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। ইলম অর্জনের ব্যাপারে না কোনো আত্মমর্যাদার কথা বিবেচনা করেছেন, না কোনো নিজস্বতার কথা বিবেচনা

করেছেন– বরং গোলাম ও খাদেমের মতো দহলিজের উপর বসে রয়েছেন। এভাবেই তাঁরা ইলম অর্জন করতেন।

শিক্ষকের মর্যাদা

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. এর একবার শূকরের মাসয়ালা তাহকীক করার প্রয়োজন পড়ল। অর্থাৎ ফিকহী মাসয়ালার কোনো এক স্থানে শূকরের প্রসঙ্গ এলে এ প্রাণী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আবশ্যকতা দেখা দিল। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন, মেথরদের নিকট থেকে জানা যেতে পারে। যেহেতু তারা শূকর পোষে সেহেতু তারাই ভাল বলতে পারবে।

হযরত নানুতুবী রহ.-এর বাড়িতে যে সুইপার ময়লা পরিষ্কার করতে আসতো তার নিকট থেকে একদিন বিস্তারিত জানলেন। এদিনের পর যখনই উক্ত সুইপার বাড়িতে আসতো তিনি দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানাতেন। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলতেন– 'তার মাধ্যমে আমি একটি জ্ঞান অর্জন করেছি।'

হযরত আলী রা. বলেছেন–

أَنَا عَبْدٌ مَنْ عَلَّمَنِىْ حَرْفًا، إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ عَتَقَ

> আমাকে যিনি একটিমাত্র হরফ শিক্ষা দিয়েছেন আমি তার কৃতদাস; ইচ্ছা করলে আমাকে তিনি বিক্রিও করতে পারেন, ইচ্ছা করলে আযাদও করে দিতে পারেন।

নিজেকে এমনই নিচু ও অপদস্থতার পর্যায়ে নামিয়ে ইলম অর্জন করতে হয়। পরম বিনয় ও নম্রতার পথ অনুসরণ করতে হয়। আমরা তো চাই যেন ঘরে বসে সকল ইলম এমনিতে এমনিতেই আমাদের সিনার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তা হবার নয়। কেননা তা সৃষ্টিরাজির মধ্যে পরিচালিত আল্লাহ তায়ালার চিরাচরিত অভ্যাস পরিপন্থী।

আহলে ইলমের অমুখাপেক্ষিতা

যারা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, ইলমী বিষয়াবলি নিয়েই যারা জীবন অতিবাহিত করছেন, যারা ইলমে নিবেদিত প্রাণ– তারা দ্বারে দ্বারে গিয়ে মানুষের দরোজায়

নক করে বেড়ান না। এমন ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে জ্ঞান আহরণ করা লোকজনের জন্য কর্তব্য। যারা আসে তারা সফল হয়, যারা আসে না তারা ইলম হতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু পুরো উম্মত কখনো ইলমশূন্য হয় না। উম্মত ইলমশূন্য হয়ে পড়লে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার সত্যতা থাকে না। তিনি বলেছেন:

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُه يُنْفَوْنَ عَنْه تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ.

প্রত্যেক অগ্রগামীর পর অনুগামী সৃষ্টি হতে থাকবে, যারা হবেন এ ইলমের ধারক-বাহক। এঁরা এঁদের এই জ্ঞান দ্বারা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মনগড়া মিথ্যার পর্দা উন্মোচন করতেই থাকবেন। ইলমের ফায়েজের মাধ্যমে বাতিলের অসারতা প্রমাণ করতেই থাকবেন এবং জাহেলদের বিভ্রান্তিকর ঠুনকো তাবিলের পর্দা উন্মুক্ত করতেই থাকবেন। ইলম তার উজ্জ্বল দ্যুতি নিয়ে সামনে আসতেই থাকবে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য হতেই থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বেওয়ারিশরূপে রেখে যাননি। তিনি আমাদের হাতে ইলম, আমল, প্রেরণা, অবিচলতা ও মস্তিষ্কের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের জন্য সকল পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন।

গোমরাহী হতে মুক্তির জিম্মাদারী গ্রহণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বাক্যে ঘোষণা করেছেন:

تَرَكْتُمُ الثَّقَلَيْنِ لَنْ تُضِلُّوْا بَعْدِىْ اَبَدًا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا.

আমি তোমাদের জন্য ভারী তথা গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় রেখে যাচ্ছি। এ দু'টিকে তোমরা যদি দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর তাহলে কখনোই তোমরা পথহারা হবে না।

كِتَابُ اللهِ وَ سُنَّتِىْ

বিষয় দু'টি হল: আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত তথা আমলের পদ্ধতি।

বিষয় দু'টিকে কেন ভারী বলা হল? এ কারণে যে, যখন তুফান শুরু হয় তখন খড়কুটার আশ্রয় নিমজ্জিত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। ভাসমান বড় কোনো কাঠখণ্ডকে যদি আকড়ে ধরা হয় তাও জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কেননা সেও তো গভীর জলরাশির দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু আশ্রয়ের জন্য যদি কোনো মাঠ, কোনো ভূখণ্ড পাওয়া যায়, যা স্থির, অনড় তাহলে তাকে আকড়ে ধরার পর তুফান আপনার কিছুই করতে পারবে না। কিতাব ও সুন্নাতও ঠিক এমনই এক মজবুত প্রান্তরের ন্যায়। পৃথিবীতে অজ্ঞতা ও মিথ্যার হাজারো তুফান আসুক, এ মজবুত প্রান্তরকে যারা আকড়ে ধরে থাকবে তারা কখনো বিচ্যুত হবে না, গোমরাহ হবে না, হতে পারে না। কেননা আল্লাহর কিতাব স্বস্থানে দৃঢ় ও অটল, তার অর্থও তদ্রূপ অটল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস ও তার অর্থও স্বস্থানে অনড়, অটল। যারা একে মজবুতভাবে আকড়ে ধরবে, তারা মিথ্যা ও প্রতারণার সকল পর্দা ছিন্ন করতে সক্ষম হবে। এভাবে বাতিলের সকল পদক্ষেপ ও জাহেলদের সূক্ষ্ম কৌশলকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। যাই হোক, জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অবহিত করে গিয়েছেন যে, উম্মতের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত সৎকর্মশীল উত্তরসূরী সৃষ্টি হতে থাকবে।

দীনের সংস্কার

যেখানে নানা ফেরকা, দল, মত ও গোমরাহ সম্প্রদায় জন্ম নেবার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এও বলা হয়েছে যে, হক্কানী সম্প্রদায়ও বরাবর বজায় থাকবে। এ উম্মত থেকে হক কখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না।

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ مَنْصُوْرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَاذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرَ اللهِ.

এ উম্মতের মধ্যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দল সবসময় বিদ্যমান থাকবে, যারা আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, অপদস্থকারীরা তাদেরকে অপদস্থ করতে পারবে না। এ অবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

তেমনিভাবে আল্লাহর রাসূল আরো বলেছেন:

اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِأَةِ سَنَةٍ مَنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا.

এ উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দিতে একজন করে মুজাদ্দিদ আসতে থাকবেন। যারা দীনের সংস্কার সাধন করবেন।

অর্থাৎ দীনের মূলনীতির ভিত্তিতে সময়োপযোগী দীনি মাসয়ালা-মাসায়িল বর্ণনা করবেন।

একেকটি শতাব্দির শেষ প্রান্তে এসে ইলমের স্বল্পতা ও মূর্খতার আধিক্যতা হেতু লোকজনের মধ্যে নানা উল্টাপাল্টা বিষয় ছড়িয়ে পড়বে, মনগড়া নানা রুসুম ও আমল পালন করবে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, প্রত্যেক শতাব্দির শেষান্তে মুজাদ্দিদগণ আগমন করে দীনের সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করবেন। শতাব্দির শেষে পুনরায় ইলমী ও আমলী ফেতনা সৃষ্টি হবে, অতঃপর মুজাদ্দিদ আগমন করবেন। চাই তারা জামাতবদ্ধ হয়ে আসুক বা একাকী আসুক। মোটকথা উম্মত কখনো গোমরাহ হবে না। যেমন আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন:

لَا تَجْمَعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ

আমার উম্মত কখনোই সম্মিলিতভাবে গোমরাহীতে লিপ্ত হবে না।

হকপন্থীগণ সর্বদাই বিদ্যমান থাকবেন। হাদিস শরীফে আল্লাহর রাসূল বলেছেন:

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ اَنَا اَوَّلُهَا وَالْمَسِيْحُ اٰخِرُهَا وَالْمَهْدِى وَسَطُهَا.

সেই উম্মত কিভাবে গোমরাহ হবে যার অগ্রভাগে রয়েছি আমি, শেষভাগে রয়েছেন হযরত ঈসা আ. এবং মধ্যভাগে রয়েছেন হযরত মাহদী আ.।

দেখুন, উম্মতের শুরু ও শেষ যুগের ব্যাপারে বলেছেন যে, তারা সত্যের উপর কায়েম থাকবে, মধ্যবর্তী যুগের ব্যাপারেও বলেছেন যে, প্রতি শতাব্দিতে মুজাদ্দিদের আগমন ঘটবে। প্রতি যুগে, প্রতিটি বছরের ব্যাপারে বলা হয়েছে–

يَحْمِلُ هٰذَ الْعِلمَ من كلّ خَلَفٍ عَدوله.

তালিম ও তাদরিসের ধারা চলতে থাকবে এবং সৎকর্মশীল উত্তরসূরি তৈরি হতে থাকবে।

এ উম্মত এমন কোনো বেওয়ারিশ উম্মত নয় যে যার ইচ্ছা এর অবয়ব বিকৃত করে দেবে। যদি বিকৃতকারী তৈরি হয় তবে তার প্রতিরোধকারীও সৃষ্টি হয়ে যাবে। অর্থাৎ বিকৃতকারী তৈরি হলে প্রতিরোধকারীও তৈরি হবে। মোটকথা, এ দীন সর্বকালে, সর্বযুগে সম্পূর্ণ পরিপাটি থাকবে।

মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়

হকপন্থীরা কখনো বিলীন হবেন না, সবসময়ই থাকবেন। তবে পার্থক্য এই যে, কখনো কখনো হকপন্থীদের সংখ্যা কমে যাবে আবার কখনো কখনো বেড়ে যাবে। হাদিসে طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ বাক্য ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ ছোট একটি জামাত অবশ্যই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কম হোক, কিন্তু সত্যপন্থী অবশ্যই সবসময় বিদ্যমান থাকবে।

তেমনিভাবে যে হাদিসে সংবাদ দেওয়া হয়েছে, উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং বাহাত্তর দল হাজান্নামী হবে সেখানেও সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে একটি দল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত। এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন–

وَمَنْهم يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

হে আল্লাহর রাসূল! মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি?

বললেন–

مَا انَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَاَصْحَابِىْ

আজকে আমি ও আমার সাহাবীগণ যে পথে রয়েছি সে পথের অনুসরণকারী দলটিই হবে মুক্তিপ্রাপ্ত দল।

সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি

উপরোক্ত হাদিস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا انَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَاَصْحَابِىْ

অর্থাৎ আমি ও আমার সাহাবীগণ যে পথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি সেটিই মুক্তির পথ। এ হাদিসে আল্লাহর রাসূল তাঁর সাহাবীগণকে নিজের সাথে শরিক করেছেন। এতে স্পষ্ট হলো যে, আমার যে দীন, আমার সাহাবায়ে কেরামেরও হুবহু সেই একই দীন। আমার যে আকিদা আমার সাহাবায়ে কেরামেরও হুবহু সেই একই আকিদা, আমার যে আমল আমার সাহাবায়ে কেরামেরও হুবহু সেই একই আমল। পার্থক্য এতটুকু যে, এসব আমলের সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তার মধ্যে আরো এমন কিছু আমলও ছিল যা নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণে উম্মতের পক্ষে তা আঞ্জাম দেওয়া ছিল অসম্ভব। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আমলের নানাবিধ নমুনা বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা ব্যবসায়ী হলে বাণিজ্যের বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর নমুনা তাদের মধ্যে বিদ্যমান। কোনো কোনো সাহাবী কৃষিকাজ ও চাষাবাদ করতেন, কৃষিকাজের মাসয়ালাসমূহ বিশ্বস্ততার সাথে তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা যোদ্ধা হলে যুদ্ধবিদ্যার মাসায়িল বিশ্বস্ততার সাথে তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারী হলে এ বিষয়ক বিশ্বস্ত মাসয়ালা তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে নানা বর্ণের সমাহার ঘটেছে কিন্তু প্রতিটি বর্ণই আমানতদারী ও বিশ্বস্ততায় ভরপুর। লাল, নীল, সবুজ– যে রঙই হোক না কেন তার অভ্যন্তরে কার্যকর রয়েছে দীনের রূহ।

উম্মতের মধ্যে যেহেতু স্তরের ভিন্নতা রয়েছে, স্বভাব-প্রকৃতির ভিন্নতা রয়েছে, মন-মানসিকতার ভিন্নতা রয়েছে সেহেতু সাহাবায়ে কেরামের মধেও আল্লাহ তায়ালা বিবিধ মানসিকতার লোক তৈরি করে দিয়েছেন, যাতে করে প্রত্যেকের জন্য স্বীয় মন-মানসিকতার ব্যক্তিত্ব সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে জুটে যায়। এদিকের প্রতি লক্ষ করেই আল্লাহর রাসূল বলেছেন– 'আমি ও আমার সাহাবীগণ'। (আল্লাহর রাসূল যেন বলছেন) সকল সাহাবী একই দীনের অনুসারী, সুতরাং যে ব্যক্তি সাহাবীগণের অনুসরণ করল, সে আমার অনুসরণ করল।

দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সত্তাকে, স্বীয় সাহাবীগণকে মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছেন। এভাবে যে– স্বীয় ঈমান ও আমলকে তাঁদের ঈমান-আমল দ্বারা যাচাই করে নাও। অর্থাৎ তোমরা সাহাবায়ে কেরামের কর্মকাণ্ডের খবরদারী করতে পারো না, তাঁরা তোমাদের কর্মকাণ্ডের মাপকাঠি হবেন। কেননা তাঁরা হলেন তোমাদের ত্রুটি ও খুঁত যাচাইয়ের কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথরই বলে দেবে যে স্বর্ণে খুঁত ও খাদ আছে কি না। কষ্টিপাথরে কোনো দোষ-ত্রুটি

আছে কিনা তা যাচাই করা স্বর্ণের কাজ নয়। সুতরাং কষ্টিপাথর হলো প্রভাবশালী, তাঁবেদার নয়।

সাহাবায়ে কেরাম হলেন আমাদের আদর্শ, আমরা তাঁদের অনুসরণ করব। অনুসরণ করতে আমরা আদিষ্ট। নীতির কথা হলো, যার অনুসরণ করা হয় তিনি হন প্রবল ও শ্রেষ্ঠ আর যিনি অনুসরণ করেন তিনি হন অনুগত। আমরা যদি সাহাবায়ে কেরামের উপর খবরদারী করতে যাই তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমরা নিজেদেরকে তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবছি, তাদের আমলের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় করার যোগ্য ভাবছি। অথচ প্রকৃতবাস্তবতা হলো সাহাবায়ে কেরাম হলেন আমাদের আমলের ব্যাপারে কষ্টিপাথর। তাঁরাই বলে দেবেন যে তোমাদের এই আমলটি আমাদের আমলের অনুরূপ নয় বিধায় এটি ত্রুটিপূর্ণ। তোমাদের যে আমল আমাদের আমলের অনুরূপ হবে সেটিই কেবল সঠিক। যেন সাহাবায়ে কেরাম রা.কে আমলের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আহলে হকের পরিচয়

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, যদি সাহাবায়ে কেরামের সম্মান, ভালবাসা ও আনুগত্য অন্তরে বিদ্যমান থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে দল হকের উপর রয়েছে। পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরামর প্রতি সম্মান, ভালবাসা ও আনুগত্য যাদের অন্তরে নেই তারা হলো বাতিলপন্থী। এটি একটি সুস্পষ্ট উন্মুক্ত মানদণ্ড। এ কারণেই যে সম্প্রদায় সাহাবায়ে কেরামকে গালাগাল করে তাদেরকে কখনোই হকপন্থী বলা যাবে না। যারা সাহাবায়ে কেরামের ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজতে থাকে তারা তাদের হকপন্থী থাকার প্রথম ভিত্তিকেই চুরমার করে দিল। কোনোক্রমেই এরা পরিপূর্ণ দীনের অধিকারী হতে পারবে না। পূর্ণ দীনের অধিকারী কেব লভারাই হবেন যারা সহাবায়ে কেরামের পূর্ণ মর্যাদার স্বীকৃতিদাতা। এ জন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো এই–

اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ.

সাহাবায়ে কেরামের সকলেই ন্যায়পরায়ণ, মুত্তাকিন ও বিশ্বস্ত।

আম্বিয়া আ. যেমনিভাবে কথা ও কাজের ব্যাপারে মাসুম বা নিষ্পাপ ছিলেন, সাহাবায়ে কেরামও নিয়ত ও চিন্তায় মাহফুজ ছিলেন। অর্থাৎ তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে আল্লাহ কর্তৃক নিরাপত্তাবেষ্টনী দ্বারা হেফাযত করা হয়েছে। তাদের দ্বারা আমলী ত্রুটি প্রকাশ পেলেও পেতে পারে কিন্তু তাদের অন্তরের পবিত্রতা ও

বিশুদ্ধতা আল্লাহ কর্তৃক আগেই পরীক্ষিত হয়ে আছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

এরা হলেন তারা, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তায়ালা তাকওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান। [হুজুরাত ৪৯ : ৩]

উপরোক্ত ঘোষণা সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে। বলা হয়েছে, পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়েছেন। স্বীয় রাসূলের ভালবাসার জন্য তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহ পরীক্ষা নিয়েছেন আর সে পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ কারণে তাদের জন্য দুটি বিষয়ের ঘোষণা করা হয়েছে। একটি হলো ক্ষমা, আরেকটি হলো মহান প্রতিদান।

অনুরূপ আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন:

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কারের ঘোষণা প্রমাণ করে যে, তাদের অন্তরে কোনো খুঁত নেই, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর রয়েছে দৃঢ় নিশ্চয়তা।

সন্তুষ্টিও এমন যে, তা ঘোষণাসহকারে প্রকাশ করা হয়েছে। আর ঘোষণাও করা হয়েছে স্বয়ং কুরআনে। যেন কেয়ামত পর্যন্ত ঘোষণা জারি থাকে যে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এমন কোনো মুহূর্ত আসা সম্ভব নয় যে মুহূর্তে তাদের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি প্রমাণ করা যাবে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো তাদের কলব ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত করানো যে, আমি তাদের কলবকে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়েছি।

এতো গেল তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা। তাদের আমল বিষয়ে অন্যত্র বলেছেন:

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَه أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا.

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। [ফাতাহ ৪৮ : ২৯]

তোমরা তাদেরকে দেখতে পাবে রুকু-সিজদায় বিভোর হয়ে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করছেন। সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহর নৈকট্য প্রত্যাশী, আল্লাহমুখী হয়ে থাকেন। সিজদার চিহ্ন তাদের ললাটে প্রদর্শিত হচ্ছে। তো একদিকে তাদের আমলকে সুসজ্জিত করেছেন, একদিকে অন্তরকে সুশোভিত করেছেন, অপর দিকে তাদের মর্যাদাগত স্তর বলে দিয়েছেন। উম্মতের মধ্যে পুরো জামাত হিসেবে কুরআন মাজিদে যে জামাতের প্রশংসা করা হয়েছে তা হচ্ছে হযরত সাহাবায়ে কেরামের জামাত। পরবর্তী যুগে ব্যক্তিসত্তার আগমন হতে থাকবে, এককভাবে বিভিন্ন হকপন্থী ব্যক্তিবর্গ থাকবেন, কিন্তু সম্মিলিতভাবে, পুরো জামাতকে পবিত্র ঘোষণা করা সাহাবায়ে কেরাম ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের বেলায় ঘটেনি। এ জন্যই বলা হয়েছে:

أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

আমার সাহাবীগণ প্রত্যেকেই নক্ষত্র সমতুল্য। যার আলোতেই পথ চলবে, হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে, তোমাদের জন্য পথ মিলে যাবে।

অত্র হাদিসে সকল সাহাবায়ে কেরামকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কাউকে পৃথক করা হয়নি। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম রা. বিশ্বস্ত সাব্যস্ত হলেন।

নবুওয়াতের ওয়ারিশ

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা. হলে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রূহানী সন্তান। অতঃপর তাদের রূহানী সন্তান হলেন তাবেয়ীনগণ, এদের রূহানী সন্তান হলেন তাবে-তাবেয়ীনগণ। নবুওয়াতের ওয়ারিশের ধারা এভাব চলতে চলতে আজ পর্যন্ত আহলে হক যারা রয়েছেন তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কামালাত ও নবুওয়াতের ওয়ারিশের গৌরবে গৌরবান্বিত। তবে আমাদের ওয়ারিশ হওয়ার ইলমী রিশতা কেবল তখনই কার্যকর হবে যখন আমাদের পিতা-পিতামহের (ইলমী ও রূহানী

পিতা) সনদের ধারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। মধ্যখান থেকে একটি গ্রন্থিও যদি ছুটে যায় তাহলে 'ওয়ারিশ' হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা ওয়ারিশ কেবল সেই হতে পারে যার নসব বা বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে। বংশ পরিচয় জানা না থাকলে ওয়ারিশ হওয়া যায় না। যাদের সিলসিলা বা সংযোগ-সম্পর্ক সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনদের সাথে নেই; মধ্যখান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাদের কাছে দীন কিভাবে পৌঁছল? ওহী দ্বারা পৌঁছা তো সম্ভব নয়, কেননা ওহী তো বন্ধ হয়ে গেছে। জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাবিত বিষয়ের নাম দীন নয়, আল্লাহর পক্ষ হতে আগত বিষয়াবলির নাম হলো দীন। যেহেতু আল্লাহর পক্ষ হতে নবীর মাধ্যমে দীন প্রেরিত হয়েছে সেহেতু সে দীন আমাদের পর্যন্ত পৌঁছার জন্য ধারাবাহিক সিলসিলার আবশ্যকতা রয়েছে। এর মধ্যে কোথাও যদি ছেদ পড়ে তাহলে দীনের যথার্থতা কিভাবে বজায় থাকে? তাজকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধির বেলায়ও তদ্রূপ ধারাবাহিকতা বজায় থাকতে হবে। সবকিছু প্রজন্ম পরম্পরায় বর্ণিত হয়ে যখন আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে তখনই কেবল দীনের পূর্ণতা আমাদের মধ্যে তৈরি হবে। মাঝখানে কোথাও ছেদ পড়লে সে দীন অসম্পূর্ণ বিবেচিত হবে। আল্লাহর রাসূল ওয়াদা করেছেন যে, কামিল দীনই সবসময় বলবৎ থাকবে। কোনো এক জায়গা থেকে সনদের ধারাবাহিকতা ছুটে গেলে বা ছুটে যাওয়া সম্ভব হলে দীনের পূর্ণতা বজায় থাকে না। তেমনটি হওয়া সম্ভব হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা এ বিষয়টি হতে পবিত্র যে, কেউ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে। (সুতরাং সর্বযুগে, সর্বকালে হকপন্থীগণ পৃথিবীতে বিদ্যমান থেকে কামেল দীনের ধারাকে অব্যাহত রাখবেন। এ ধারায় কখনো ছেদ পড়বে না)।

পথের আলোকবর্তিকা ও পথ-প্রদর্শক

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের আলোকবর্তিকা হয়ে আমাদের মাঝে তাশরিফ এনেছেন। পৃথিবীতে আকিদা, আমল ও কুসংস্কারের যে আঁধার ছড়িয়ে পড়েছিল, নবুওয়াতের সূর্য উদিত হয়ে আঁধারের সে পর্দা ছিন্ন করে উজ্জ্বল আলোর প্লাবণ ডেকে আনে। অন্যান্য নবী-রাসূলগণ তারকার ন্যায়। আকাশের সকল তারকাও যদি উদিত হয় তাতে যদিও পরিবেশ আলোকিত হয় কিন্তু রাত পোহায় না। সূর্যোদয়ের সময় যখন ঘনিয়ে আসে, সূর্য উদিত না হওয়া সত্ত্বেও রাত অদৃশ্য হয়ে যাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য নবী-রাসূলগণ

পৃথিবীতে আগমন করে মানুষের অন্তরে, মস্তিষ্কে আলো ছড়িয়েছেন, কিন্তু রাত রাতই রয়ে গেছে। অতঃপর নবুওয়াতের সূর্য উদিত হবার সাথে সাথেই রাত বিদূরীত হয়ে গেছে এবং দিন প্রকাশ লাভ করেছে। প্রত্যেকটা জিনিস দিনের বেলায় যতটা দৃষ্টিগোচর হয় রাতের বেলায় ততটা হয় না। নিঃসন্দেহে অন্যান্য আম্বিয়া আ. তাওহীদ ও রিসালাতের সূক্ষ্ম বিষয়াবলি উম্মতের সামনে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু রাত্রিকালীন বুঝ সংক্ষিপ্ত আকারের হয়ে থাকে। দিবসের ঔজ্জ্বল্যে সূক্ষ্ম ও লুকায়িত বিষয়াবলি প্রদর্শিত হয়। সুতরাং এই দীনে মুহাম্মাদীতে তাওহীদ ও রেসালাতের যতগুলো সূক্ষ্ম বিষয়াবলি প্রকাশ লাভ করেছে, পূর্ববর্তী দীনসমূহে সে হাকিকত প্রকাশিত ছিল না। তাওহীদ ও রেসালাতের যত ইলম ও মারেফতা অত্র দীনে প্রকাশ লাভ করেছে তা পূর্ববর্তী কোনো দীনে প্রকাশিত হয়নি। পূর্ববর্তী নবীগণও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন কিন্তু যুগ ও সময়ের দ্যুতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে বিধায় এগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপটাই তাদের সামনে ফুটে উঠেছে। অতঃপর যখন প্রখর আলোর আগমন ঘটলো তখন অন্তরালের বিষয়াবলিও প্রকাশ লাভ করল ও প্রদর্শিত হল।

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা নবুওয়াতের সূর্য ও নূরের প্রদীপ। তিনি সামনে থাকা প্রমাণ করে যে, হক প্রকাশিত হয়েছে। তার অন্তরালে যা রয়েছে তা না-হক। পথ চলতে আলোর দরকার হয় বিধায় আল্লাহ তায়ালা উজ্জ্বল এক আলোকবর্তিকা প্রেরণ করেছেন। পথ-প্রদর্শনের আবশ্যকতা ছিল বিধায় তার সুন্নাতকে আমাদের জন্য পথ-প্রদর্শক করা হয়েছে। শেখানো হয়েছে– নামাজ এভাবে আদায় কর, জিহাদ করবে এভাবে, পারিবারিক জীবন-যাপন করবে এভাবে প্রভৃতি। একেকটি সুন্নাতের প্রচলন আমলের জন্য পথ-প্রদর্শকের কাজ করে। পথের জন্য যেমনিভাবে আলোর আবশ্যকতা ছিল তেমনিভাবে পথ-প্রদর্শকেরও আবশ্যকতা ছিল।

সরল ও সুদৃঢ় পথ

আল্লাহর দীপ্ত কিতাব আল কুরআন হলো সিরাতুল মুস্তাকিত বা সরল ও সুদৃঢ় পথ। এ পথ ধরে অগ্রসর হওয়া ব্যক্তি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে:

القُرآنُ حَبْلُ اللهِ المدود من السماء إلى الأرض.

এ কুরআন হলো আল্লাহর রশি, যা তিনি আসমান হতে জমিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

এখন তোমাদের করণীয় কী?

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর। [আলে ইমরান ৩ : ১০৩]

এ রশিকে যখন টান দেওয়া হবে তখন এর সাথে ঝুলন্ত ব্যক্তি ঊর্ধ্ব জগতে পৌছে যাবে।

শায়খ মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী রহ. লিখেছেন, কেয়ামতের দিন আসমান হতে নিয়ে সপ্ত জমিন পর্যন্ত এই পুরো এলাকা হবে জাহান্না। এখানে থাকবে প্রজ্জলিত আগুন ও সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি।

পথম আসমানের উপরে জান্নাতকে নিয়ে আসা হবে। যে জান্নাত সপ্তম আকাশে রয়েছে তাকে কেয়ামতের দিন প্রথম আকাশে এনে রাখা হবে। আসমান ও জান্নাতের মধ্যখানে পাঁচশত বছরের দূরত্বের পরিমাণ যে স্তরটি থাকবে সেটি হলো আরাফ। আরাফে কিছু জান্নাতের ও কিছু জাহান্নামের নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য থাকবে। যাই হোক, আপনি আমি এখন যেখানে রয়েছি এটা হলো জাহান্নামের এলাকা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রশি ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এ মর্মে যে, জাহান্নাম থেকে যে ভাগতে চায় সে যেন এ রশিকে আকড়ে ধরে। এ রশির প্রান্ত আমার হাতে। আমি একে টেনে তুলবো। যে ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে আকড়ে ধরবে সে আমার কাছে চলে আসবে। প্রকৃত কথা হলো, যে কাফেররা এ রশি ধারণ করেনি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, তারা তো জাহান্নামেই রয়েছে।

আল্লাহর রজ্জু কখনো ছিঁড়ে যাবার নয়। অবশ্য ছুটে যেতে পারে। সুতরাং খুব সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে যেন রশি ছুটে না যায়। এ কালাম, এ রজ্জু আল্লাহর সত্তা হতে নির্গত হয়েছে। একে যে আকড়ে ধরবে তার সম্পর্ক আল্লাহর সত্তার সাথে স্থাপিত হবে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে:

تَبَرَّكْ بِالْقُرْاٰنِ فَاِنَّه كَلَامُ اللهِ وَ خَرَجَ مِنْه

তোমরা কুরআন দ্বারা বরকত হাসিল কর। কেননা ইহা আল্লাহর কালাম এবং তাঁর সত্তা হতে প্রকাশ পেয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার যে বরকত সরাসরি পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে তা কেবল এই উম্মতের হাতেই রয়েছে। তা হলো আল্লাহর কালাম। তিনি কথা বলেছেন এবং সে কথা হুবহু আমাদের হাতে বিদ্যমান রয়েছে।

আসমান, জমিন, চাঁদ, সূর্য প্রভৃতিও তদ্রূপ আল্লাহর বরকত। এগুলো দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা উপকৃত হচ্ছি; কিন্তু এগুলো হলো আল্লাহর মাখলুক, আল্লাহর সৃষ্টি। পক্ষান্তরে কুরআন হলো আল্লাহর কালাম, আল্লাহর কথা। এ কালাম তার থেকে প্রকাশ পেয়েছে। কুরআনকে তিনি সৃষ্টি করেননি, কুরআন মাখলুক নয়। কুরআন হলো আল্লাহর সিফাত বা গুণ। কোনো গুণের যিনি আধার হন, অধিকারী হন, তিনি ঐ গুণের স্রষ্টা হন না। গুণটি তার থেকে প্রকাশ পায়। এই যে আমি আপনাদের সামনে কথা বলছি, আমি বলব না যে, আমি আমার কথাগুলো সৃষ্টি করছি, বরং বলব যে আমি কথা বলছি। অর্থাৎ কথা আমার থেকে প্রকাশ পাচ্ছে, নির্গত হচ্ছে। আমার ভেতরে যা সঞ্চিত আছে তা বাইরে বেরিয়ে আসছে। এ কথা বলা হবে না যে, আমি কথা সৃষ্টি করছি। সুতরাং যে জিনিস আল্লাহ হতে প্রকাশমান তা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার উর্ধ্বপ্রান্ত আল্লাহর সাথে সংযুক্ত আর অপর প্রান্ত রয়েছে তোমাদের হাতে। একে যদি তোমরা দৃঢ়তার সাথে আকড়ে ধর তবে আল্লাহর সত্তা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হবে। এ জন্যই অধিক তিলাওয়াতজনিত কারণে মানুষের যে উন্নতি সাধিত হয় তার দ্বারা আল্লাহর সত্তার সাথে বন্ধন সৃষ্টি হয়। অন্যান্য ইবাদত দ্বারা মানুষ আল্লাহর সিফাত পর্যন্ত পৌঁছে। যাই হোক, এটি অতি দীর্ঘ এক আলোচনা। এখানে এতটুকু বুঝে নিন যে, কুরআন হলো আল্লাহর এক রজ্জু। জাহান্নাম থেকে যে ব্যক্তি দূরে সরে থাকতে চায় সে যেন মজবুতভাবে এ রশিকে আকড়ে ধরে। মোটকথা, কুরআন হলো 'সিরাতুল মুস্তাকিম' বা সহজ ও সুদৃঢ় এক পথ, যে পথে পরিচালিত হয়ে মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্তা হলো নূরের প্রদীপ, তাঁর সুন্নাত হলো পথ-প্রদর্শক আর আল্লাহর কিতাব হলো সরলপথ। এ পথের পথিক ও রাহী হলেন আপনি। আপনার মধ্যে যদি চলার প্রেরণা থাকে তাহলে আপনি খুঁজে পাবেন আলোকিত পথ, পথের মাইলপোস্ট ও মঞ্জিলের নিদর্শন-মিনার। আপনি পৌঁছে যাবেন অপনার কাঙ্ক্ষিত সন্তব্যে। কারো যদি সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার ইচ্ছাই না থাকে তাহলে তার জন্য পথ ও প্রদীপ দুটোই অর্থহীন। সুন্নাত ও ওয়াজিবসমূহ অর্থহীন।

কুরআন ও হাদিসের পক্ষ হতে কোনো কমতি ও সংকীর্ণতা নেই। এগুলো রয়েছে কেবল ব্যক্তির মধ্যে। আল্লাহর ফায়েজ, আল্লাহর যথার্থ অনুগ্রহ ঠিকই রয়েছে, ব্যক্তিই কেবল সঠিক পথে পরিচালিত হতে চায় না।

লক্ষ্য অর্জনের শর্তাবলি

আমি শুরুতেই আলোচনা করে এসেছিলাম যে গন্তব্যে পৌঁছার জন্য চারটি বিষয়ের আবশ্যকতা রয়েছে। যথা– আলোকিত পথ, সরলপথ, পথ-প্রদর্শক এবং পথের পথিক। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা হলো আমাদের পথ চলার দীপ্ত প্রদীপ। আমাদের চলার জন্য যে সরলপথ, সে পথ হলো আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন, যাতে কোথাও কোনো বক্রতার চিহ্ন নেই–

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

ইহা হলো এমন এক কিতাব যাতে কোনো সংশয় নেই,
কোনো প্রকার বক্রতা নেই। এ হলো অত্যন্ত সরল এক পথ।

কুরআনে বলা হয়েছে- لَا رَيْبَ فِيهِ অর্থাৎ এ কুরআনে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। এ কথা বলা হয়নি যে لَا رَيْبَ فِيهِمْ অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে সন্দেহ-সংশয় নেই। তার মানে যত খটকা, যত সন্দে তা কেবল আমাদের অন্তরেই। কিতাবের মধ্যে কোনো খটকা নেই। তবে আমাদের অন্তরের সন্দেহ-সংশয় দূর করবার জন্যও কিতাবেরই শরণাপন্ন হতে হবে, এমনি এমনি দূর হবে না। আপনি কি এ অপেক্ষায় রয়েছেন যে, প্রথমে মনের দ্বিধা-সংশয় দূর হোক তারপর কিতাবকে আকড়ে ধরবো? এটা হলো এমন নির্বুদ্ধিতা যে, গায়ে নাপাকী লাগা ব্যক্তি সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে বলছে, আগে পাক হয়ে নেই তারপর সমুদ্রে নামবো। এমন ব্যক্তিকে সমুদ্র বলবে– হে নির্বোধ! আমার কাছে এসে দেখ্, তোকে পবিত্রও আমিই করব। এ কারণেই কারো অন্তরে যদি বক্রতা থাকে, দ্বিধা-সংশয় থাকে এবং সে তার চিকিৎসা করাতে চায় তাহলে সে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য কিতাবও সুন্নাতই হলো মাধ্যম।

সাহিত্য ও প্রকাশনা আধিক্যের ক্ষতিকর দিক

অন্তরের বক্রতা ও দ্বিধা-সংশয় তারবিয়াত ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে দূর হয়ে থাকে। এর জন্য ব্যক্তিসত্তার আবশ্যকতা রয়েছে। পথপ্রাপ্ত ব্যক্তিসত্তার প্রতি

রুজু হওয়া ব্যতীত কাগজে মুদ্রিত সাহিত্য ও কালো কালো বর্ণ-নকশা দ্বারা কার্য সিদ্ধি হবে না। আজ আমরা যতই অকাট্য লিটারেচার তৈরি করি না কেন, হাজারো কিতাব প্রকাশ করি না কেন– যতক্ষণ না নফসের তারবিয়াত করব ততক্ষণ তা কোনো কাজে আসবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানসিকতা তৈরি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যে কিতাবই সামনে আসুক না কেন তা থেকে উল্টোটাই কেবল বুঝবে। যদি সরল-শুদ্ধ মানসিকতা নিয়ে দেখে তাহলে শুদ্ধ কথাই কেবল বুঝে আসবে। মানুষের মস্তিষ্ক সাধারণত তারবিয়াতপ্রাপ্ত থাকে না। এ কারণে আমি মনে করি, লিটারেচারের আধিক্য সাধারণ মুসলমানদের ক্ষতিরই কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা কেবল কাগজেরই আনুগত্য করছে, আহলে হকের প্রতি রুজু হচ্ছে না। শুধু কিতাব দেখেই চলতে চাচ্ছে। কিতাব দ্বারা কি আর দীন পাওয়া যায়? দীন তো আল্লাহওয়ালা ও সালেহীনদের সান্নিধ্যের দ্বারা লাভ হয়।

ইলমের কেন্দ্র হলো ব্যক্তিসত্তা
কিতাব হলো আলামত

আহলুল্লাহ ও সালেহীনদের সান্নিধ্যের দ্বারাই ব্যক্তির মধ্যে ইলম আসে। এ জন্যই কোনো আলেমের ইলম যখন যাচাই করার প্রয়োজন পড়ে তখন তার কাছে জানতে চাওয়া হয় যে আপনার উস্তাদ কে? সেই উস্তাদের উস্তাদ কে? তার উস্তাদ কে? সিলসিলা কি? অর্থাৎ সনদ জানতে চাওয়া হয়। এ কথা কেউ জানতে চায় না যে আপনি কোন প্রকাশনা সংস্থার ছাপানো কিতাব পড়েছেন? যদি প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশিত কিতাব পড়ে থাকেন তাহলে আপনি বড় আলেম, আর যদি অখ্যাত কোন প্রকাশকের কিতাব পড়ে থাকেন তাহলে আপনি নিকৃষ্ট পর্যায়ের আলেম। কেননা তাদের ছাপানো কিতাবে ভুল-ত্রুটি থাকে, ছাপার মান ভাল থাকে না, কাগজ ভাল থাকে না। সুতরাং আলেমের ইলম কাগজ ও কিতাব দ্বারা চেনা যায় না, কালির উত্তমতা দ্বারা চেনা যায় না; বরং চেনার পদ্ধতি হলো এই যে, তার শিক্ষক কেমন ছিলেন? তার মধ্যে দীন ছিল কিনা? আল্লামা ইবনে সিরিন রহ. বলেন:

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ، فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْا دِيْنَكُمْ.

> এ ইলম হলো তোমাদের দীন। সুতরাং কারো নিকট থেকে দীন শেখার পূর্বে দেখে নাও যে, তার মধ্যে দীন আছে কি না?

কেননা দীন সিনা হতে সিনায় স্থানান্তরিত হয়, কাগজের পাতা থেকে নয়। কিতাব হলো মূলত কিছু নকশা ও আলামত। এ নকশা ও আলামতের হাকিকত সিনায় সংরক্ষিত রয়েছে। এ বিষয়টি কুরআনে এভাবে এসেছেঃ

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ

এই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আহলে ইলমের সিনায় সংরক্ষিত রয়েছে। [আনকাবুত ২৯ : ৪৯]

সিনায় সংরক্ষিত ইলম সাধনা ও মুজাহাদা এবং বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর সাথে অপর সিনায় স্থানান্তরিত হয়। কিতাবের সনদ সংরক্ষিত থাকে না। অর্থাৎ এ কিতাবের পূর্বে কোন কিতাব ছাপা হয়েছিল? তার পূর্বে কোন কিতাব ছাপা হয়েছিল? এগুলো সংরক্ষণের জিনিস নয় এবং সংরক্ষণও হয় না। কিন্তু আপনি এ বিষয়টি সংরক্ষণ করতে দেখবেন যে, তাকে কে পড়িয়েছে, আবার তিনি কার নিকটে পড়েছিলেন। মুহাদ্দিসীনে কেরাম সনদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তাকে উপস্থাপন করেন, কিতাবসমূহ উপস্থাপন করেন না। কেননা ইলমের কেন্দ্র হলো ব্যক্তিসত্তা, কিতাব নয়। কিতাব হলো আলামত, যার দ্বারা ঐ ইলম সংরক্ষিত থাকবে এবং ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে ঐ কিতাবের দ্বারস্থ হবে।

পথের আদব

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আমরা যদি শুধু কিতাব এবং মুদ্রিত কাগজ দ্বারা দীন হাসিল করি তাহলে কখনোই দীন হাসিল করা হবে না। দশ ধরনের (নানাবিধ) রায় ও মতামত কেবল সৃষ্টি হবে। এর কারণ হলো কিতাব যিনি দেখবেন তিনি তার নিজস্ব রায় ও মতামত তার সাথে সংযুক্ত করবেন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত থাকে। বিষয়টির উদাহরণ এমন, জ্যামিতির আটচল্লিশটি সূত্র বুঝিয়ে দেবার জন্য কোনো গেঁয়ো-মূর্খ লোক আপনার কাছে আবদার করল। নিশ্চয়ই আপনি তার কাছে জানতে চাইবেন যে, এ বিষয়ে যেসব উসূল ও মূলনীতি রয়েছে তা কি আপনার জানা আছে? সে বলবে তাতো আমি পড়িনি। আপনি জানতে চাইলেন, জ্যামিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিদ্যা সম্পর্কে আপনি কি অবগত? দেখলেন তাও সে পড়েনি। শিক্ষক তখন বলবেন, কিভাবে আমি বোঝাবো? বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞানও আপনার নেই। বিস্তারিত জ্ঞান কিভাবে দেই। মোটকথা, ইলমের জন্য বহুবিধ প্রাথমিক বুনিয়াদি বিষয়াবলি ও ভূমিকা শেখার আবশ্যকতা রয়েছে, যেগুলো কুরআন ও হাদিসে বিদ্যমান আছে। এই ভূমিকা সম্পর্কে অবগত না

হয়ে কেউ যদি বিশদ ব্যাখ্যা বুঝতে চায় এবং তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক শুরু করে দেয় তাহলে কিভাবে তাদেরকে বুঝানো সম্ভব হবে? সুতরাং লিটারেচারের আধিক্য এই ক্ষতি করছে যে, দশ হাজার ব্যক্তি থাকলে মাসয়ালার মধ্যে দশ হাজার রায় তৈরি হচ্ছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ রায়ের উপর, নিজ মতামতের উপর অটল থেকে বলছে, এটাই আমি মানবো, এটাই সঠিক। তা না হলে আমাকে বুঝিয়ে দাও। আবার কোনো জিনিস যদি বুঝে না আসে, চাই তার বুঝের ত্রুটির কারণে হোক, সে মনে করে মাসয়ালাটাই ভুল। আমি যা বুঝেছি সেটিই সঠিক।

এ জন্যই কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি আলামত বলা হয়েছে:

إِعْجَابُ كُلِّ ذِيْ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মতামতের উপর এমন অনড় ও অবিচল থাকবে যে তাকে আল্লাহর ওহী সমতুল্য জ্ঞান করবে, যার ব্যতিক্রম হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতকে যখন গ্রহণ করা হবে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর কালামের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হবে তখন নিজের ত্রুটিগুলো নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীপ্ত আলোয় সর্বাগ্রে মানুষ নিজের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দেখতে পায়। এ ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার জন্য ভালবাসা ও কিতাবের আনুগত্য দ্বারা নিজের ভেতর নূর তৈরি করে। আর আনুগত্যের জন্য রাসূলের সুন্নাতের কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করে এবং তাঁর সত্তা দীপ্তি ছড়ায়। আর সরলপথ হলো আল্লাহর সুস্পষ্ট কিতাব। এখন দরকার শুধু সে পথে পরিচালিত হওয়া। পথিক হলাম আপনারা আর আমরা। আমরাই যদি সে পথে না চলি তাতো আমাদের ত্রুটি, কিতাব ও সুন্নাতের তো কোনো ত্রুটি নেই। ঘরে বসে একটি রায়, একটি মতামত দিয়ে দিলাম, তাতো কুরআন হাদিসের উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। এ জন্যই আনুগত্যশীল ও আদব প্রদর্শনকারীরূপে দীনের উপর চলা আবশ্যক।

ইলমের মাধ্যম ও উপায়-উপকরণের প্রতি আদব প্রদর্শন

দীনের ভিত্তি আদবের উপর নির্ভরশীল।

بے ادب محروم ماند از فضلِ رب

বেয়াদব আল্লাহর অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত থাকে।

আদব প্রদর্শন করা ব্যতীত দীন অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়। দীনের বুনিয়াদ আদবের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর আদব, আল্লাহর রাসূলের আদব, আলেমের আদব এবং ইলমের মাধ্যম-উপকরণের আদব যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ষিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দীন প্রাপ্তি সম্ভব নয়।

হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ., যিনি বাস্তবিকই 'আল্লাহর নিদর্শনাবলি হতে এক নিদর্শন' ছিলেন। দুর্লভ ইলম, দীনের বুঝ ও আমলের দিক দিয়ে এ যুগে যিনি ছিলেন পূর্ববর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণের নমুনা। নিজের সম্পর্কে তিনি ছোট্ট একটি ঘটনা বললেন। বিষয়টি যদিও অতি ক্ষুদ্র কিন্তু মানুষের পক্ষে তা করা এবং তাতে অটল থাকা অতি কঠিন। তিনি বললেন–

> পাঁচ বছর বয়স থেকে যখন আমি বুঝতে শিখেছি, তখন থেকে আজ এই ষাট বছর বয়স পর্যন্ত কোনো দীনি কিতাবকে আমি অজু ছাড়া স্পর্শ করিনি।

অর্থাৎ শুধু কুরআনের ব্যাপারে নয়, হাদিসের কিতাব, ফিকাহ'র কিতাব, উসুলে ফিকাহ'র কিতাব, মোটকথা যে কিতাবই দীনি কিতাব বলে সাব্যস্ত সে কিতাবই তিনি বিনা অজুতে স্পর্শ করেননি। এতখানি আদব ছিল বলেই তিনি 'শাহ সাহেব' হতে পেরেছিলেন। বেয়াদবের পক্ষে কস্মিন কালেও 'শাহ সাহেব' হওয়া সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَه بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ○

> হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে অথচ তোমরা টেরও পাবে না। [হুজুরাত ৪৯ : ২]

নবীর মজলিসে বসে নবীর আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে কথা বলা নবীর শানে বেয়াদবি। এর অর্থ হলো নবীর আওয়াজের চেয়ে নিজের আওয়াজকে

প্রবল করতে চাওয়া। এটা ধৃষ্টতা। এমনটি হলে তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জানা গেল, আমল আদব নির্ভর। যদি বেয়াদবি হয়ে যায় আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। কোনো প্রতিদান জুটবে না।*

হযরত ওমর ফারুক রা. স্বভাবগতভাবেই উচ্চস্বরের অধিকারী ছিলেন। অত্র আয়াত নাযিল হবার পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে বসে এত আস্তে কথা বলতে শুরু করলেন যে তার কথা শুনতে অধিক মনোযোগ দিতে হতো। জানতে চাইলে বলতেন, আমার আওয়াজ যেন আল্লাহর দরবারে আমার আমলকে ধ্বংসকারী না হয়। মোটকথা, এ আয়াতে আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তদ্রূপ অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا

তোমরা পরস্পরকে যেভাবে ডাকো রাসূলকে সেভাবে ডেকো না। [নূর ২৪ : ৬৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করার সময়, তাঁকে ডাক দেবার সময় সম্মান ও ইহতেরামের সাথে ডাক দাও।

কোনো কোনো সাহাবী يَا مُحَمَّدُ 'হে মুহাম্মাদ!' বলে সম্বোধন করত। তাদেরকে সতর্ক করা হলো। 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বা 'ইয়া নাবিয়াল্লাহ' সম্বোধন করতে বলা হলো এবং নাম নিতে নিষেধ করা হলো।

---

* এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে একমাত্র কুফরীই সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। কোন গুনাহের কারণে কোন সৎকর্ম বিনষ্ট হয় না। আবার কুফরী হলো একটি ইচ্ছাধীন কাজ, যা অজ্ঞাতসারে হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং রাসূলের শানে বেয়াদবি কিভাবে মুমিনগণের আমলকে বিনষ্ট করে দেবে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, সাহাবায়ে কেরাম ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেবেন তা অকল্পনীয়। উচ্চ আওয়াজে কথা বলার দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কষ্ট পাচ্ছেন এবং তাঁর শানে যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হচ্ছে– তা হচ্ছে তাদের অজ্ঞাতসারে। কোন কোন গুনাহের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে গুনাহে লিপ্ত থাকা ব্যক্তি ধীরে ধীরে কঠোর হতে কঠোর গুনাহের দিকে ধাবিত হয়। সেই ছোট্ট গুনাহ-ই পর্যায়ক্রমে কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যায়। শেষ পর্যায়ে এসে সে কিন্তু ইচ্ছাকৃতই কুফরী গ্রহণ করে, অথচ এর সূচনা কিন্তু হয়েছিল অজ্ঞাতসারে ঘটে যাওয়া ছোট গুনাহ দ্বারা। –অনুবাদক।

যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সকল আম্বিয়া আ.কে নাম ধরে সম্বোধন করেছেন এবং জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পদবী ধরে সম্বোধন করেছেন। অন্যান্য নবীদেরকে এভাবে নাম ধরে সম্বোধন করেছেন–

يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ

يَا نُوْحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيٰى

لِيَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

يٰعِيْسٰى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

يٰمُوْسٰى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلَتِيْ وَبِكَلَامِيْ.

মোটকথা, প্রত্যেক নবীকে নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। পক্ষান্তরে প্রিয় হাবীবকে কিভাবে সম্বোধন করেছেন দেখুন–

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ○ قُمْ فَأَنْذِرْ○يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ.

কোথাও 'ইয়া মুহাম্মাদ' বলে সম্বোধন করা হয়নি। নানা উপাধি ও পদবীতে সম্বোধন করে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। সাথে সাথে সম্বোধনের নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে যে, নাম ধরে কেউ তাঁকে সম্বোধন করো না, আল্লাহ যেভাবে তাঁকে সম্বোধন করেছেন সেভাবে করো। তাঁকে সম্বোধনের শব্দ হলো রাসূল ও নবী।

আল্লাহর রাসূলের আরেক উপাধি হলো 'হাবিবুল্লাহ'। এ উপাধি দ্বারা আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত ও মর্যাদাশীল সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরই সৃষ্টি যেন তাঁর কাছে এমনই উন্নত মনে হয়েছে যে, নিজেই সম্মান করছেন। সুতরাং আপনার আমার তাঁকে অসম্মানজনকভাবে উপস্থাপন করার মতো ধৃষ্টতা দেখাবার অধিকার কোথেকে আসে? তাঁকে যদি আমরা অসম্মান ও অমর্যাদা করি তাহলে আমাদের

আকিদা, আমল ও দীন বরবাদ হয়ে যাবে। কোটকথা, কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং তাঁকে সম্বোধন করার কুরআনী রীতি আল্লাহর রাসূলের আদব সম্পর্কে আমাদেরকে পথ নির্দেশ করছে।

পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহর কিতাবের আদব এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

এ কিতাবকে কেবল তারাই স্পর্শ করেন যারা পবিত্রতা অর্জন করেছেন। [ওয়াকিয়াহ ৫৬ : ৭৯]

অর্থাৎ অজু ও গোসলের মাধ্যমে (এমনকি কুফরীর নাপাকি হতে ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে) পবিত্রতা অর্জনকারীরাই কেবল কুরআনকে স্পর্শ করতে পারেন। এভাবে কিতাবুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ, বাইতুল্লাহ এবং মসজিদসমূহের আদব বর্ণিত হয়েছে।

লোকজনের অভ্যাস হলো মসজিদে একত্রিত হয়ে নানা ধরনের কথাবার্তা শুরু করে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে:

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِيْ خَرَابِهَا اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। [বাকারা ২ : ১১৪]

মসজিদ ধ্বংস করার দুই অর্থ। একটি হলো মসজিদের আকৃতি বা সুরত, যা ইট-পাথর দিয়ে তৈরি। একে ধ্বংস করার অর্থ হলো ইমারাত বা ভবন গুড়িয়ে দেওয়া। আরেকটি হলো মসজিদের হাকিকত। তা হলো আল্লাহর জিকির, আল্লাহর ইবাদত। মসজিদে ইবাদতরত ব্যক্তিকে যে ডিস্টার্ব করল সে মসজিদের হাকিকতকে ধ্বংস করল। দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে মসজিদের পরিবেশ এমন করে তোলে যে অন্যরা নফল নামাজ পড়তে পারে না। উচ্চস্বরে কথা বলার কারণে তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত বিঘ্নিত হচ্ছে। এসবই হলো মসজিদের হাকিকতকে ধ্বংস করে দেওয়া, গুঁড়িয়ে দেওয়া। ঐ ব্যক্তিবর্গের জন্য এগুলো জায়েজ ছিল না। তাদের বরং উচিত ছিল ভীত-কম্পিত ও শ্রাদ্ধাবনত

হয়ে মসজিদে প্রবেশ করা। কেননা এ হলো আল্লাহর দরবার। এখানে বেয়াদবি, ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা ও বেপরোয়াভাবে প্রবেশ কর যায় না।

তেমনিভাবে আল্লাহর অলিগণের আদব বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর অলিগণের আযমত ও মর্যাদা রক্ষা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাদিসে এসেছে:

مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ

যিনি কোনো মুত্তাকিন আলেমের পেছনে নামাজ পড়লেন তিনি যেন নবীর পেছনে নামাজ পড়লেন।

এভাবেই আল্লাহওয়ালাদের মর্যাদা ও আদব বর্ণিত হয়েছে।

মোটকথা, ইলমের আদব, ইলমের মাধ্যমের আদব, ইলমের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের আদব বর্ণিত হয়েছে। আদব ব্যতীত দীন হাসিল হয় না। যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঔদ্ধত্য ও বেয়াদবি থাকবে সেই সম্প্রদায় দীন থেকে বঞ্চিত থাকবে।

মহা ফাসাদ

হেদায়া গ্রন্থকার একটি শের লিখেছেন:

فَسَادٌ كَبِيْرٌ عَالِمٌ مُتَهَتِّكٌ

وَ اَكْبَرُ مِنْــهُ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ

هُمَا فِتْنَــةٌ فِى الْعَالَمِيْنَ كَبِيْرَةٌ

لِمَنْ بِهِمَا فِىْ دِيْنِــهِ يَتَمَسَّكُ

অর্থাৎ মহা বিশৃঙ্খলা ও কেতনা সৃষ্টিকারী হলো ঐ আলেম যে বেয়াদব ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকারী। এমন ব্যক্তি পৃথিবীকে বেয়াদবির পথে নিয়ে যাবে। আলেম হয়েও এমন ব্যক্তিরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়াচ্ছে। এমন ব্যক্তিদের চেয়ে অধিক কেতনাবাজ, অধিক বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী হলো সেই জাহেল বা মূর্খ ব্যক্তি যে নিজের মনগড়া পদ্ধতিতে ইবাদত করে। এমনসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যার কোনো দলিল নেই, সনদ নেই। ভিত্তিহীন নানা রুসুম পালন করে। বিদয়াতে লিপ্ত হয়। এ জাতীয় জাহেল ব্যক্তি বেয়াদব আলেম অপেক্ষা অধিক

ফেতনা সৃষ্টিকারী। এরা এদের অজ্ঞতাকে বিজ্ঞতা মনে করে সে অনুযায়ী ইবাদত করে। কারো কাছে মাসয়ালা জানতে চায় না, ফতোয়া জিজ্ঞেস করে না। এই আলেম ও জাহেল হলো বিশ্বের জন্য ফেতনা। দীন শেখার জন্য যারা এ ধরনের ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে, এদেরকে পথ-প্রদর্শক সাব্যস্ত করে তারাও ফেতনায় পতিত হয়ে যাবে।

আলেমের সৌন্দর্য

একজন আলেমের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য হলো তার আদব।

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করেন।
[ফাতির ৩৫ : ২৮]

যার ভেতরে ইলম যত বেশি, তার মধ্যে আল্লাহভীতি তত প্রবল। আর ইলম থেকে যে যত বঞ্চিত, আল্লাহর ব্যাপারে সে তত নির্ভয়। সুতরাং আদব হলো একটি বুনিয়াদি বিষয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আদব রক্ষা করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দীন প্রাপ্তি ঘটবে না। এ জন্য আমাদের প্রথম কাজ হলো রিসালাত সংক্রান্ত বিষয়াবলিতে আদবের পথ গ্রহণ করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উচ্চারণ করলে দুরুদ শরীফ পাঠ করব। তাঁর নাম আলোচনা হলে বলব– সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এক প্রকারের দুরুদ আছে রসমী দুরুদ। 'দুরুদপাঠ' নামক এ পদ্ধতিটি আমরা তৈরি করে নিয়েছি। এটা একটা প্রচলন। আরেক দুরুদ হলো এই যে, কোথাও যখন আল্লাহর রাসূলের নাম আসবে তখন পড়বে– সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হাদিস শরীফে আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেন:

> যে ব্যক্তির সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলো অথচ সে আমার উপর দুরুদ পাঠ করলো না, তার চেয়ে অধিক কৃপণ আর কে হতে পারে?

সুতরাং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আদব রক্ষা করা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেলায় দুরুদ শরীফ হলো আদবের প্রকাশ। আর এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ। আনুগত্য না করে যদি

আদব রক্ষা ও ভালবাসার দাবি করা হয় সে ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নয়। কেননা আদব ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য আনুগত্য হলো একান্ত আবশ্যকীয়।

মোটকথা ইলমের মাধ্যম ও উপায়-উপকরণের প্রতি আদব প্রদর্শন একান্ত আবশ্যক, অন্যথায় তার উপর আমল করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ আপনি পথ অতিক্রম করতে পারবেন না, পথ চলতে পারবেন না। অর্থাৎ সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার যে শর্ত ছিল সে শর্ত অপূর্ণ থেকে যাবে। তিনটি বিষয় ছিল এই– আলোকিত পথ, একটি সরলপথ ও পথ-প্রদর্শক। এ পথে চলতে গেলে আদব রক্ষা করে চলতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় বুক টান করে, দর্পভরে চলবে না। মাথা অবনত করে চলবে। অবনত মস্তকে চললে পর তাকে উন্নত ও সম্মানিত করা হবে; আর দর্পভরে চললে তাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত করা হবে।

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ

যে আল্লাহর জন্য বিনম্র হয় আল্লাহ তাকে মর্যাদাশীল করেন।

ইবাদতের তাৎপর্য

কেউ যদি বিনয় প্রদর্শন না করে অহংকার প্রকাশ করে তার ব্যাপারে বলা হয়েছে:

الكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ والْعظمَةُ إزَارِى فَمَنْ نَازَعنِى فِيهما قَصَمْتُه

গর্ব ও অহংকার আমার চাদর, আযমত ও মর্যাদা আমার লুঙ্গি। এ দুটো নিয়ে যে ব্যক্তি টানা-হেঁচড়া করবে আমি তার ঘাড় মটকে দেব। [হাদিসে কুদসী]

অর্থাৎ আমি তাকে লঞ্ছিত, অপমানিত করব। সুতরাং বিনীত হলে তাকে সম্মানিত করা হবে আর অবিনীতের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান। কোনো এক কবি চমৎকার বলেছেন:

پستی سے سربلند اور سرکشی سے پست :: اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں

এখানে যাদের মস্তক অবনত থাকে তারাই হলো উন্নত আর যারা অহংকারে উন্নতশির তারা হয় চরম লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এ এক আজব উত্থান-পতনের পথ।

এ পথে কেউ উগ্র-অহংকারী হয়ে চললে তাকে আছড়ে ফেলা হয় আর ঋজু ও অবনত হয়ে চললে তাকে উন্নত ও সম্মানিত করা হয়। এ পথ মাথানত করে চলার পথ। উগ্রতা নিয়ে চলার পথ এটি নয়। সে পথ ভিন্ন পথ।

তবে হ্যাঁ, স্বয়ং তিনি যদি আমাদেরকে বুক টান করে, মাথা উঁচু করে চলতে বলেন তাহলে আমরা শতবার সেভাবে চলবো। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন:

وَلاَ تَمْشِ فِى الأَرْضِ مَرَحًا

আল্লাহর জমিনে তুমি গর্বভরে চলাচল করো না। [বনী ইসরাইল ১৭ : ৩৭]

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً

নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনোই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। [বনী ইসরাইল ১৭ : ৩৭]

অর্থাৎ যতই অহংকার ভরে মাথা উঁচু করে চল না কেন তুমি তো জমিনকে বিদীর্ণ করে ফেলতে পারবে না, আসমানে পৌঁছে যেতে পারবে না। যেখানে আছ সেখানেই তো থাকবে। তবে কেন এমন মসিবতে নিজেকে জড়িয়ে নিচ্ছ? অহংকার করে যদি উর্ধ্ব জগতের কোথাও চলে যেতে পারতে তাহলে না হয় ঠিক ছিল, কিন্তু তাতো পারছ না। কবি আকবার এলাহাবাদী (লিসানুল আসার) চমৎকার বলেছেন:

تعجب، نخوتِ اہلِ زمیں پر مجھ کو آتا ہے

یہ کیوں اسپر اکڑتے ہیں کہ جس میں مر کر گڑنا ہے

সেই অহংকারীদের কথা ভেবে আমি বিস্মিত হই যারা গর্ব নিয়ে জমিনের উপর বিচরণ করে। যে মাটির মধ্যে মরে পড়ে থাকবে সে মাটির উপর কেন তারা গর্ব করে বেড়ায়? যে জিনিসের অভ্যন্তরে মাথা লুকাতে হবে, মাথা পঁচে-গলে যাবে, সে জিনিসের উপরে বসে অহংকার করা জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থী। এ কারণেই অহংকার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে এ কথাও ঠিক, যখন গর্বভরে, বুক টান করে চলার নির্দেশ দেওয়া হবে তখন আমরা তেমন করেই চলবো। যেমন হজের বেলায় যে তাওয়াফের পর সায়ী করা হয় তার শুরুর তিন চক্করে গর্বভরে চলার নির্দেশ রয়েছে। এ নির্দেশ আমরা শতবার মান্য করব।

কবি বলেন–

گر طمع خواہد ز من سلطانِ دین :: خاک بر فرقِ قناعت بعد ازیں

বাদশা যদি লোভী হতে বলেন তাহলে আমি লোভী হব, অল্পেতুষ্ট থাকাকে গ্রাহ্য করব না।

আল্লাহ যদি আমাদেরকে বলেন যে তোমরা লোভী হও, তাহলে শতবার আমরা লোভী হব; অল্পেতুষ্ট তাকার মুখে ছাই ছিটিয়ে দেব। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ○

আর এরূপ বস্তুর প্রতিই লোভকারীদের লোভ করা উচিত [মুতাফফিফীন ৮৩ : ২৬]

এখানে জান্নাতের প্রতি লালসা করার ও প্রতিযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে। জান্নাতের ব্যাপারে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার লোভ করা উচিত। আগে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এ ক্ষেত্রে অত্যধিক লোভ প্রকাশ করবে। অল্পে তুষ্টির গুণ অর্জন করতে চাইলে দুনিয়ার মালের ব্যাপারে করবে। লালসা ত্যাগ করুন; কিন্তু পরকালের নিয়ামতরাজির প্রতি অধিক লোভী হোন। এ লালসার কোনো সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করবেন না।

ইলম ও মারেফাতও জান্নাতী নিয়ামতের অন্তর্ভূক্ত বিধায় বর্ণিত হয়েছে যে,

مَنْهُوْمَانِ لاَ يَشْبَعَانِ طَالِبُ الْعِلْمِ وَ طَالِبُ الدُّنْيَا

দুই ধরনের ক্ষুধার্তের পেট কখনো ভরে না– একজন হলো ইলম অন্বেষী, আরেকজন হলো দুনিয়া অন্বেষী।

امّا طَالِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضَى الرَّحْمٰنِ

وَ امَّا طَالِبُ الدُّنْـيَا فَيَتَمَادٰى فِى الطُّغْـيَانِ.

ইলম অন্বেষণকারী যতই পড়বে ততই আল্লাহর সন্তুষ্টি বাড়তে থাকবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদার যতই দুনিয়ার মোহে জড়াবে ততই তার অহংকার বাড়তে থাকবে।

সুতরাং যেখানে অল্পেতুষ্ট থাকা আবশ্যক সেখানে অল্পেতুষ্ট থাকবে আর যেখানে লোভ করা কাম্য সেখানে লোভী হবে। উভয়টিই আল্লাহর নির্দেশ মতো হতে হবে।

মূল কথা হলো, প্রকৃত বান্দা হলো ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর নির্দেশের অনুগত হয়। বন্দেগি ও আবদিয়াতের অর্থই হলো এই যে, যখন যে নির্দেশ দেওয়া হয় তা মেনে নেওয়া। তিনি যখন নামাজ পড়ার নির্দেশ দেবেন তখন নামাজ পড়া ইবাদত হয়ে যাবে। আবার যখন নামাজ পড়তে নিষেধ করবেন তখন নামাজ পড়া হতে বিরত থাকা হবে ইবাদত। পাঁচ সময়ে নামাজ পড়ার নির্দেশ করেছেন বিধায় এই পাঁচ সময়ে নামাজ পড়া ইবাদত। অপর তিনটি সময়ের কথা বলা হয়েছে যে কখনোই এ সময়ে নামাজ পড়না– সূর্যোদয়ের সময়ে, সূর্যাস্তের সময়ে এবং দ্বি-প্রহরে। এ সময়গুলোতে নামাজ পড়া হলে গুনাহগার হবে, কোনো সাওয়াব পাওয়া যাবে না। এতে বোঝা গেল, না নামাজ পড়া ইবাদত, না না-পড়া ইবাদত, বরং নির্দেশ মান্য করা হলো ইবাদত। যা বলা হয় তাই কর।

হুকুম দেওয়া হলো রোজা রাখ, সুন্দর কথা। ব্যাস, রোজা রাখা ইবাদত। ঈদের দিনের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– খবরদার, রোজা রেখ না। এদিন যদি রোজা রাখা হয় তাহলে গুনাহগার হবে। এদিন ইফতার করা, পানাহার করা ওয়াজিব। এতে বোঝা গেল– রোজা রাখা বা না রাখা ইবাদত নয়, নির্দেশ মান্য করা হলো ইবাদত।

আত্মহত্যাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে, বলা হয়েছে নিজ রক্ত প্রবাহিত করো না; তদ্রূপ অন্যকে হত্যা বা জখম করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে:

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করার পরিণতি হলো জাহান্নাম।

বোঝা যাচ্ছে, হত্যা করা একটি মস্তবড় গুনাহ। এ গুনাহর শাস্তি হলো জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে তিনি হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য বলেছেন, সে ক্ষেত্রে তা ইবাদত। সে মতে জিহাদে যাওয়ার পর সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো রক্ত প্রবাহিত করা, হত্যা করা। বোঝা গেল, রক্ত প্রবাহিত করা বা না করা গুনাহ নয়, গুনাহ হলো নির্দেশ অমান্য করা। আর নির্দেশ মানার নাম হলো ইবাদত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই একই নিয়ম কার্যকর।

ফিতরাত ও শরীয়ত

ইসলাম হলো একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম। প্রতিটি বিষয়ে উভয় দিকে সমতা বিধান করা হয়েছে। ঢালাওভাবে কোনো কিছুকে গুনাহ সাব্যস্ত করা হয়নি। মিথ্যা বলা নিঃসন্দেহে অপরাধ। এটি গুনাহে কবিরাহ, তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। মানুষের মধ্যে একটি স্বভাবজাত আবেগ কাজ করে। আবেগ তাড়িত হয়ে কখনো-সখনো মিথ্যা কথা, ভুল কথা বলে ফেলে। এ আবেগকেও শরীয়ত নিয়ন্ত্রণ করেছে। বলেছে, আবেগ-তাড়িত হয়েও মিথ্যা বলো না। তবে কখনো প্রয়োজন হলে আমার অনুমতি সাপেক্ষে অবশ্যই মিথ্যা বলবে।

যথা বিবাদ-বিগ্রহ মেটানোর ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে লড়াই বেধে গেছে, রক্তের পিপাসায় তারা উন্মুখ। এ অবস্থায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হলেও তাদের মধ্যে মীমাংসা করাতে পারলে করাও। এ অবস্থায় মিথ্যা বলার দ্বারা সেই সাওয়াব মিলবে, যা মিলে নামাজ পড়ার দ্বারা। আপনি এক ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললেন, ভাই রে, তুমি কার সাথে লড়ছ? রাতের বেলায় তো দেখলাম সে তোমার খুব প্রশংসা করছিল আর এই বলে কাঁদছিল যে, আমার ভাই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

এ কথা শুনে ভাই বলবে, এই তার মনের অবস্থা! আমি তো তাকে শত্রুই ধরে নিয়েছিলাম। আপনি বললেন– আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলেন।

অপর ভাইয়ের কাছে গিয়েও একই কথা বললেন– আপনি কার সাথে দুশমনি করছেন? রাতভর তো দেখলাম সে আপনাকে স্মরণ করল, আপনার প্রশংসা করল এবং আপনাদের মধ্যকার বিচ্ছেদের জন্য আফসোস করল।

আপনার এই পদক্ষেপে উভয়ের শত্রুতার মধ্যে শিথিলতা এলো, সকাল বেলায় দু'ভাই হাত মেলালো। অথচ আপনি মিথ্যা বলেছিলেন। এ মিথ্যা দ্বারা আপনার সেই সাওয়াব ও প্রতিদান মিলবে যা মিলতো ইবাদত ও আনুগত্য দ্বারা। সত্য বলার দ্বারা কখনো যদি ফেতনা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে তাহলে সে সত্য প্রকাশ করা হারাম। এ জন্যই গিবাত বা পরনিন্দা করা হারাম। সত্য বলাকেই গিবাত বলে। কেননা গিবাতের সংজ্ঞা হলো– কারো প্রকৃত দোষ তার অনুপস্থিতিতে বর্ণনা করা। দোষটি যদি তার মধ্যে না থাকে, অর্থাৎ তার নামে মিথ্যা বলা হয়, তাহলে তাকে গিবাত বলা হবে না, তাকে বলা হয় 'ইফতেরা' বা মিথ্যা অপবাদ। সুতরাং এ ধরনের সত্য প্রকাশ করা হারাম। কেননা ইহা ফেতনা সৃষ্টির মাধ্যম। পক্ষান্তরে উপরে যে ধরনের মিথ্যার কথা বলা হয়েছে সেরূপ মিথ্যা বলা জরুরি, কেননা তা ফেতনা দূর করার মাধ্যম।

স্বরূপ ধোঁকা দেওয়া একটি জঘন্য অপরাধ। হাদিসে এসেছে–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا

যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভূক্ত নয়, আমার উম্মত নয়।

অথচ অন্যত্র আল্লাহর রাসূল বলেছেন: اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ অর্থাৎ ধোঁকা দেওয়া জিহাদেরই অংশ। জিহাদে ধোঁকা দেওয়াও জায়েজ। এখানে এসে ধোঁকা ইবাদতে পরিণত হলো। আমাদের সকল আবেগ শরীয়ত নিয়ন্ত্রিত। শরীয়ত ব্যবহার করতে বললে ব্যবহার করব, ব্যবহার করতে নিষেধ করলে বিরত থাকব। কেননা আমরা হলাম আল্লাহর গোলাম, স্বীয় নফসের গোলাম নই। নফসের চাহিদা মতো কাজ করব না, আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক কাজ করব। নফসের চাহিদাকে দূরে নিক্ষেপ করতে হবে।

মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা এগুলো নিঃসন্দেহে গুনাহের কাজ এবং এ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতাও মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেওয়া, প্রতারণা করা, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি দুষ্ট প্রবৃত্তির প্রেরণা মানুষের অন্তরে রয়েছে। সৃষ্টিগত ও স্বভাবজাত প্রবৃত্তিকে নির্মূল করার জন্য শরীয়তের আগমন ঘটেনি, শরীয়ত এসেছে এসবের প্রয়োগ ক্ষেত্র বলে দেবার জন্য, ব্যবহার বিধি নির্দেশ করার জন্য। মানুষের স্বভাবে ক্রোধ রয়েছে। শরীয়ত একে নির্মূলে উৎসাহিত করেনি। যদি আপনার মধ্যে ক্রোধ না থাকে আপনি জিহাদ কিভাবে করবেন? আপনার মধ্যে যদি আবেগ, উত্তেজনা ও জযবা না থাকে আপনি বাতিলের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করবেন? সকলেই যদি শান্ত প্রকৃতির হয় তাহলে দেশের হেফাযত কে করবে? সৈনিকসুলভ শক্তি-সামর্থ্যেরও প্রয়োজন রয়েছে এবং মাঝে মাঝে তার প্রয়োগেরও আবশ্যকতা রয়েছে। এতে বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এ কারণে ক্রোধও আল্লাহ প্রদত্ত এক নিয়ামত। একে নির্মূল করা হয়নি। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– আমি যেখানে প্রয়োগ করতে বলি সেখানে প্রয়োগ কর। যেখানে করতে না বলি সেখানে শান্ত-শিষ্ট হয়ে থাক। অপাত্রে ব্যবহার করলে গুনাহগার হবে। সঠিক স্থানে ব্যবহার করলে নেককার বলে সাব্যস্ত হবে। মোটকথা, আমাদের দৃষ্টিতে মানব স্বভাবের যেসব বৈশিষ্ট্য চরম নিন্দনীয় তাকেও শরীয়ত নির্মূল করেনি। তবে হ্যাঁ, তা প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে।

'দীনে ফিতরাত'-এর অপূর্ব ব্যাখ্যা

'দীনে ফিতরাত' বা স্বভাবজাত ধর্মের অর্থ এটাই। অর্থাৎ মানব চরিত্রের কোনো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যকেই নির্মূল করা হয়নি বরং প্রতিটির জন্য ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং নিজস্ব স্বাভাবিক চরিত্রবৈশিষ্ট্য ব্যবহারের নাম হলো ফিতরাত এবং তা ব্যবহারের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দেবার নাম হলো শরীয়ত। এ কারণেই ফিতরাতকে নির্মূল করা হয়নি।

মানুষ যদি এসব বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতাকে ধ্বংস করে দেয় তবে সে মানুষই থাকবে না। তখন শরীয়তের উপর আমল করবে কে? চারিত্রিক সকল স্বভাব-চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যাবলির সম্মিলিত নাম হলো মানুষ।

হাত ও পায়ের সম্মিলিত রূপের নামই হলো মানুষ। হাতকে কেটে যদি দূরে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে শরয়ী আমলসমূহ আঞ্জাম দেবে কে? পা দু'টো যদি কেটে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে বাইতুল্লাহ ও মসজিদে কে যাবে? এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সঠিক রেখেই কেবল দীনের উপর সঠিকভাবে আমল করা সম্ভব।

কোনো কোনো ধর্মে রয়েছে, সক্ষমতা ও অঙ্গহানির মাধ্যমে তাদের ধর্ম পালন করতে হয়। কোনো কোনো যোগী হাত উপর দিকে উত্তোলন করে রেখেছে তো রেখেছেই। ওভাবে থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে সে হাত অকর্ম, অকেজো হয়ে গেল। এভাবে হাতের সক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়ে সে মনে করছে আমি দীনদার হয়ে গেলাম। বস্তুত অঙ্গের শুদ্ধতার নাম দীন নয়, রূহের শুদ্ধতার নাম হলো দীন। রূহের শুদ্ধতা বা তাহজীব তখনই হবে যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে লাগিয়ে আমল করা হবে।

সুতরাং হাত কেটে ফেলা বা হাতকে অক্ষম করে ফেলার নাম দীন নয়। হাতকে শরীয়ত মোতাবেক সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করার নাম দীন। আল্লাহর রাসূল বলেছেন:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার হাত ও মুখ দ্বারা অপরাপর মুসলিম ব্যক্তিবর্গ নিরাপদ থাকেন।

হাতকে মারামারির কাজে ব্যবহার করার নামও দীন। কিন্তু মুমিনের বিরুদ্ধে, সত্যের বিরুদ্ধে হাতকে এ কাজে ব্যবহার করো না। মিথ্যার বিপরীতে, অপরাধীর বিপরীতে হাতকে এ কাজে ব্যবহার কর। হাতকে যদি শক্তিহীন করে

তোলা হয়, অথর্ব করে রাখা হয় তাহলে অপরাধির বিরুদ্ধে হাত তুলবে কে? ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে সকলে লুলা-খোঁড়া হয়ে পড়বে। সারকথা হলো, ইসলামী শরীয়ত হলো একটি ফিতরাতী দীন, একটি স্বভাবজাত দীন। আর এ ফিতরাতী দীনের অর্থ হলো মানবীয় কোনো শক্তি ও বৈশিষ্ট্যকে নিশ্চিহ্ন ও বিলীন না করে তাকে সঠিক ক্ষেত্রে, সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা। এভাবে ক্রোধ, মিথ্যা, ধোঁকা, আবেগ, উত্তেজনা, আনুগত্য, বিনয় প্রভৃতির ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হলো শরীয়তের কাজ আর সকল সামর্থ্যের হক আদায় করার নাম হলো ইসলাম। কোনো একটি সামর্থ্যকে যদি আপনি খুইয়ে ফেলেন, তার হক আদায় না করেন তাহলে সে বিষয়ে আপনার ইসলাম অসম্পূর্ণ হয়ে গেল, আপনার দীন অসম্পূর্ণ হয়ে গেল।।

মানবীয় সকল শক্তি-সামর্থ্য ও বিশেষণকে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছিলেন। হাত কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, পদক্ষেপ কিভাবে নিতে হয়, ক্রোধ কিভাবে করতে হয়, দয়া কিভাবে করতে হয়, ভালবাসার পদ্ধতি কী, শত্রুতার স্বরূপ কেমন– সবকিছুই তিনি বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। এই সুন্নাতসমূহকে পথ-প্রদর্শক করে আপনি আপনার অভ্যন্তরীণ শক্তিকে ব্যবহার করুন। আপনার ভেতরে রয়েছে প্রেরণা, সম্মুখে রয়েছে রাসূলের প্রেরণা, সুতরাং আপনার দীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। বস্তুত পথিকের ভেতরে পথ চলার প্রেরণা, চলৎশক্তি থাকতে হবে। শক্তি-সামর্থ্য যদি থাকে তাহলে পথও সে খুঁজে পাবে। পথের আলামত বিদ্যমান আছে, আলো আছে, পথ-প্রদর্শকও আছে। ত্রুটি যদি কিছু থেকে থাকে তা রয়েছে পথিকের ভেতরে, আপনার আমার ভেতরে।

ع۔ راہ دکھلائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں

কাকে দেখাবে পথ? মঞ্জিল অভিমুখী যাত্রীই তো নেই!

ক্ষমা ও বদান্যতা

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যহ রাতে প্রথম আসমানে আল্লাহর তাজাল্লি অবতীর্ণ হয় এবং হাত প্রসারিত করে থাকেন; যেমন হাত তাঁর শানের সাথে সংগতিপূর্ণ। বলতে থাকেন:

اَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَالَّذِىْ يَدْعُوْنِىْ

اَنَا الْغَافِرُ مَنْ ذَالَّذِىْ يَسْتَغْفِرُنِىْ

اَنَا الرَّازِقُ مَنْ ذَالَّذِىْ يَسْتَرْزِقُنِىْ

আমি হলাম বাদশা, আমার কাছে কিছু চাওয়ার মতো কেউ কি আছে? আমি হলাম ক্ষমাকারী, আমার কাছে মাফ চাওয়ার মতো কেউ কি আছে? আমি হলাম রিজিকদাতা, আমার কাছে রিজিকপ্রার্থী কেউ কি আছে?

অর্থাৎ বান্দাকে তিনি আদেশ করেননি যে তুমি আকাশে উড়ে এসো, স্বীয় তাজাল্লি দ্বারা আরশ হতে প্রথম আসমানে তাশরিফ আনেন, যে আসমান আমাদের। আমাদের জন্য সহজ-করণার্থে বাদশার বাদশা মহান আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লি আমাদের নিকটবর্তী হয়। তিনি হাত প্রসারিত করে দেন। হাত পাতা হলো প্রার্থনাকারীর কাজ কিন্তু এখানে দাতা হাত পেতে আছেন- আমার কাছে কে কী চাইবে চাও। সুবহে সাদিক পর্যন্ত এ আওয়াজ ধ্বণিত হতে থাকে। আল্লাহ যাকে তাওফিক দিয়েছেন তিনি ওঠেন, তাহাজ্জুদ পড়েন, কান্নাকাটি ও প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তার চাওয়া পূরণ করেন। আর যে দুর্ভাগা সে বিছানায় পড়ে থাকে।

অনুগ্রহ প্রদর্শন ও সহজকরণ

ইবাদত-বন্দেগিকে আমাদের জন্য কত সহজ করে দেওয়া হয়েছে দেখুন। তাহাজ্জুদের কথাই ধরুন না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বারো রাকাতও প্রমাণিত আছে, আট রাকাতও আছে আবার চার কিংবা দুই রাকাতও প্রমাণিত আছে। এর অর্থ হলো এই– আপনি যদি দুই রাকাতও পড়েন তবু আপনি তাহাজ্জুদগুজার। এমনকি একটি হাদিসে এও বর্ণিত হয়েছে যে, শেষ রাতে ওঠা যদি কঠিন মনে হয় তাহলে ইশার সুন্নাতের পর বিতরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে দুই কিংবা চার রাকাত নামাজ পড়ে নেবে। এ নামাজও তাহাজ্জুদ বলে গণ্য হবে। এ নামাজও হবে শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ার অনুরূপ।

এমনকি হাদিসে এ বর্ণনাও রয়েছে যে কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তি এসে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে। আল্লাহ ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলবেন, এর আমলনামায় লিখে দাও যে সে সারা জীবন তাহাজ্জুদ পড়েছে। ফেরেশতাগণ আরজ করবেন, হে আল্লাহ! তিনি তো একদিনও পড়েননি, কিভাবে লিখব?

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করবেন, যখন এই ব্যক্তি ঘুমবার উদ্দেশ্যে বিছানায় যেত তখন নিয়ত করত যে অবশ্যই আমি উঠবো, কিন্তু যথাসময়ে তার ঘুম ভাংতো না। ঘুম হতে জাগ্রত হওয়া তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না, এটা আমার নিয়ন্ত্রণাধীন। সেতো ওঠার নিয়ত করেছিল।

نِيَّةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه

মানুষের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

সারা জীবন যেহেতু প্রত্যহ নিয়ত করতো, সেহেতু লিখে দাও যে প্রতিদিন তাহাজ্জুদ পড়তো। ঘুমিয়ে থাকা সত্ত্বেও সারা জীবন আমল করার সাওয়াব ও প্রতিদান জুটবে। তাই আমি বলে থাকি যে, কেউ যদি তাহাজ্জুদ নাও পড়ে, সে যেন ঘুমবার সময় অন্তত এ নিয়ত করে যে, হে আল্লাহ! আজ আমি অবশ্যই উঠব। যদি জাগতে পারি, তাহাজ্জুদ পড়ে নেব। জাগতে না পারলে নিয়তের বদৌলতে তাহাজ্জুদগুজার হয়ে যাব। সুতরাং এর চেয়ে সহজ, এর চেয়ে আসানী আর কী কামনা করতে পারি? নিয়ত করতে কোনো কিছুই লাগে না– না শ্রম, না পয়সা। একেবারে বিনামূল্যে পাওয়া এক সাওয়াব। এতটুকু চেষ্টাও যদি কেউ না করে তাহলে তার মতো ভাগ্য-বঞ্চিতের জন্য কার কী করবার আছে? মানুষের বরং সকল প্রকার কল্যাণকর বিষয়েরই নিয়ত করা উচিত।

সুন্নাতের নূর

আচ্ছা, আলাদাভাবে না হয় ইবাদত নাইবা করলাম, ফরজ ইবাদত বাদে প্রত্যহ আমরা যে কাজগুলো করে থাকি, যেমন বাজারে যাচ্ছি, মালামাল ক্রয় করছি, চাষাবাদ করছি– দিনভর কতশত কাজ করছি। এই কাজগুলো করার সময় আমরা যদি এই নিয়ত করে নেই যে, এসব হলো আল্লাহর নিয়ামত আর তিনি আমাদেরকে তাঁর নিয়ামতরাজি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে আমরা এ জিনিসগুলো ক্রয় করছি, এই কাজগুলো করে যাচ্ছি। সামান্য এই নিয়তটুকু করে নেবার দ্বারাই সেই সাওয়াব ও প্রতিদান প্রাপ্তি শুরু হয়ে যাবে যা ইবাদত দ্বারা প্রাপ্তিযোগ্য ছিল। সুতরাং সামান্য নিয়ত পরিবর্তনের দ্বারা মানুষ ইচ্ছা করলে তার স্বাভাবিক কাজকর্মকে ইবাদতে পরিণত করতে পারে। তদ্রূপ সামান্য অবহেলার দ্বারা ইবাদতসমূহকে 'অভ্যাসবশত কাজে' পরিণত করে তাকে নিষ্ফল করে তুলতে পারে। আল্লাহ যখন আমাদের স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্যও সাওয়াব ও প্রতিদানের ব্যবস্থা রেখেছেন এবং তার জন্য কেবল নিয়তই যথেষ্ট হয়, এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি অতীব দুর্ভাগা যে নিয়তটুকুই

করে না। অথচ নিয়ত করতে কোনো খরচ নেই, কোনো মেহনত নেই, শুধু একটু চিন্তা করতে হয় এই যা।

সুতরাং নবী আ.গণের সুন্নাত ও আদর্শ এমনই এক সহজসাধ্য বিষয় যে বিনা পরিশ্রমে সামান্য একটু চিন্তাশক্তি প্রয়োগে অজস্র সাওয়াব ও প্রতিদানের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু–

ع ـ اگر تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں

তুমি নিজেই যদি পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী না হও তাহলে হাজারো অজুহাত দেখাতে পারবে।

নিজেই যদি ইচ্ছা করা না হয় তাহলে এ রোগের কোনো চিকিৎসা কারো কাছে নেই। এ এক এমন রোগ, যার ওষুধ স্বয়ং লোকমান হাকিমের কাছেও নেই।

বুযুর্গানে মুহতারাম!

সর্বাগ্রে দীন, দীনের উপকরণাদি ও দীনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা রক্ষা করুন, আদব রক্ষা করুন। নিয়ত বিশুদ্ধ করার সাথে সাথে নিজের মধ্যে এ আগ্রহ ও জযবা তৈরি করুন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের মধ্যে যে নূর ও বরকত রয়েছে তা আপনাদের তৈরি করা নমুনার মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, মাশায়েখগণ তরিকতের পথ বাতলে দেবেন, তা হবে তাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু অনুকরণ যখন করা হবে তখন পয়গম্বর কর্তৃক প্রবর্তিত রুসুমের অনুকরণ করবে। কারণ, পয়গম্বরের রুসুমের উন্নত কোনো রুসুম হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বলার পদ্ধতি ও উপস্থাপনার ধরনে যে নূর রয়েছে সে নূর অন্য কারো কথায় থাকতে পারে না। আল্লাহওয়ালাদের কলবেও নূর ও বরকত রয়েছে, কিন্তু নেবই যখন তখন মহাভাণ্ডার জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতেই নেই। মোটকথা, আসল জিনিস হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের আনুগত্য।

ভালবাসার প্রভাব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মুহাব্বাতের সম্পর্ক স্থাপন করার আগ্রহের সাথে সাথে তাঁর আনুগত্যের আগ্রহও থাকতে হবে। হাদিস শরীফে তিনি ইরশাদ করেন:

مَنْ أَحَبَّنِىْ فَقَدْ أَطَاعَنِىْ وَمَنْ أَطَاعَنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّة

যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে সে অবশ্যই আমার আনুগত্য করবে, আর যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে জান্নাতে সে আমার সাথে থাকবে।

জানা গেল, ভালবাসা আনুগত্যকে আবশ্যকীয় করে তোলে। এটাই হলো ভালবাসার প্রভাব। যদি আনুগত্য ও সুন্নাতের অনুসরণ না থাকে তাহলে ভালবাসার দাবি বাতিল বলে গণ্য হবে।

অবশ্য প্রকৃত আশিক কখনো ভালবাসার দাবি করে না, আশিক তো আমল করে। কেউ যদি বলে বেড়াতে থাকে যে আমি অমুকের আশিক, লোকজন বলবে– মিথ্যা কথা, আশিক কি কখনো ভালবাসার দাবি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? ইশকের প্রথম স্তর হলো ভালবাসার দাবি পরিহার করা। অর্থাৎ তার কোনো দাবি-দাওয়া থাকবে না, প্রেমাস্পদের প্রেমে ফানা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি প্রেমের দাবি করে বেড়ায় সে তার নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়। তার মধ্যে 'ফানা' বা বিলীন হওয়ার মানসিকতা কোথায়?

মোটকথা, আশিকের পক্ষে দাবি উপস্থাপনের সুযোগ নেই, তার জন্য সর্বপ্রথম বিষয় হলো দাবি ত্যাগ করা। এ কারণেই আশেকে রাসূলের আলামত হলো এই, সে নিজেকে আশেকে রাসূল বলে দাবি করবে না বরং এই বলে লজ্জিত হবে যে, তাঁকে যতটা ভালবাসা উচিত ছিল ততটা পারছি না। তা ছাড়া আনুগত্য দিয়ে তার ভালবাসাকে চেনা যাবে। কেননা আল্লাহর রাসূল নিজেই বলেছেন:

مَنْ أَحَبَّنِىْ فَقَدْ أَطَاعَنِىْ

আমাকে যে ভালবাসবে সে আমার আনুগত্যও করবে।

সুতরাং ভালবাসার আলামত এবং তা প্রকাশের পদ্ধতি মূলত আনুগত্য। যেমনিভাবে ঈমানের আলামত আমলে সালেহ। আর ঈমান তো মুহাব্বতেরই আরেক নাম।

لاَ يُؤمِنُ أحَدُكُمْ حَتّى أكُوْنَ أحَبَّ إلَيْه مِنْ وَّلَدِه وَ وَالِدَيْه وَالنَّاس أجْمَعِيْنَ.

তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার সন্তানসন্ততি, পিতামাতা, সমগ্র মানব জাতি, এমনকি নিজ সত্তা অপেক্ষা আমাকে ভালবাসবে।

এ ভালবাসার পরিচয় তখন পাওয়া যায় যখন সন্তানের ভালবাসা ও আল্লাহর রাসূলের ভালবাসা মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়ায়। যিনি সত্যিকারের প্রেমিক ও মুমিন তিনি অবশ্যই আল্লাহকে প্রাধান্য দেবেন এবং সন্তানকে ত্যাগ করবেন।

হাদিসে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলো তখনও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর এক ছেলে ঈমান গ্রহণ করেনি। যুদ্ধের সময় সে ছিল কাফেরদের দলে আর আবু বকর রা. ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাতারে। বদর যুদ্ধ শেষে আবু বকর রা.-এর ঐ ছেলে ঈমান গ্রহণ করলেন। একদিন তিনি পিতা সিদ্দিকে আকবার রা.-এর কাছে আরজ করলেন– আব্বা! ঐ যুদ্ধের সময় কয়েকবারই এমন হয়েছে, আপনি আমার আয়ত্বের মধ্যে চলে এসেছেন। আমি ইচ্ছা করলে তীর নিক্ষেপ করে কিংবা তলোয়ার চালিয়ে নিশ্চিত আপনাকে শেষ করে দিতে পারতাম। কিন্তু অন্তরে চিন্তা এলো, সন্তান হয়ে আমি পিতার উপর হামলা করব?

হযরত সিদ্দিকে আকবার রা. ছেলের কথা শুনে বললেন, যুদ্ধের সময় একবারও তুমি আমার আয়ত্বের মধ্যে আসনি। যদি আসতে, আল্লাহর কসম, সর্বপ্রথম তোমার গলায় তলোয়ার চালাতাম। কেননা তুমি যখন রাসূলের শত্রুতে পরিণত হলে তখন আর তুমি আমার ছেলে ছিলে না। আমি যুদ্ধ করছিলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রুদের সাথে, পরিবার আর সন্তানের কোনোই গুরুত্ব সেখানে ছিল না।

সুতরাং আল্লাহর প্রতি ভালবাসার প্রকাশ তখনই ঘটে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার মোকাবেলায় অন্য কোনো কিছু এসে দাঁড়ায়। সিদ্দিকে আকবার রা. ঈমান এবং রাসূলের ভালবাসার বিপরীতে স্বীয় সন্তানকে খতম করে দিতে চেয়েছিলেন।

যাই হোক, দু'টি বিষয়ের মাধ্যমে ভালবাসার পরিচয় লাভ করা যায়। একটি হলো ভালবাসার দাবি পরিহার করা, অপরটি হলো প্রেমাস্পদের আনুগত্য করা।

আনুগত্য করার নাম নেই অথচ মুখে রাসূল প্রেমের দাবি– এ দাবি মিথ্যা দাবি, প্রকৃত দাবি নয়। এজন্যই দাবিও পরিহার করুন, নিয়তও বিশুদ্ধ করে নিন। রাসূলের প্রতি যদি ভালবাসা থেকে থাকে, রাসূলের সুন্নাতের আনুগত্য করুন।

উত্তম আদর্শ

জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম আদর্শ এবং তাঁর উপস্থাপিত নমুনা যদি পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে, আপনারাই যেমন দাবি করে থাকেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য সার্বিক পূর্ণাঙ্গ এক রাসূল প্রেরণ করেছেন, জীবনের এমন কোনো দিক নেই যার আমলী নমুনা উপস্থাপন করেননি– তাহলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে, এ কাজটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন তা খতিয়ে দেখা। যদি শোকতাপে পতিত হন তাহলে দেখবেন, আমার রাসূল কিভাবে শোক সামলেছেন। আজ মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে তিনদিন, দশদিন ও চল্লিশদিন কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। রাসূলের সুন্নাত বহির্ভূত এ মনগড়া অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা কোথায়?

তেমনিভাবে আনন্দ-খুশির বিষয় হলে দেখতে হবে আমার রাসূল কিভাবে তা উদযাপন করেছেন। এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন মুমিনের প্রথম দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত রাসূলের দিকে, আমার রাসূল কিভাবে কাজটি করে দেখিয়েছেন। নামাজে তো আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করছেন, বিয়ে-শাদীতে তাঁর আনুগত্য না করার তো কোনো কারণ নেই। কারো মৃত্যুতে, শোকের সময়ে আনুগত্য না করার কী কারণ থাকতে পারে? বস্তুত এসব ক্ষেত্রে আপনাকে আনুগত্য না করার অধিকারই দেওয়া হয়নি। এগুলো তো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি। আমি মনে করি, অতি সাধারণ বিষয়াবলিতেও এখতিয়ার দেওয়া হয়নি। পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও নিজস্ব মতামত গ্রহণ করার অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহর রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত নমুনা অনুযায়ী পোশাক পরিধান করতে আপনি আদিষ্ট।

হাদিস শরীফে এসেছ, জামা পরিধান করার সময় প্রথমে ডানহাত ডান হাতার ভেতরে প্রবেশ করাও, অতঃপর বামহাত প্রবেশ করাও। এটা হলো সুন্নাত পদ্ধতি। কিন্তু বর্তমান যুগের সংস্কৃতি হলো বাম দিক থেকে শুরু করা। যুগের গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দেবে আর নিজেকে 'মুহিব্বে রাসূল' ও আশেকে রাসূল দাবি করবে তাতো হতে পারে না। আশিক তো সেই ব্যক্তি যে পোশাক

পরিধান করার সময় লক্ষ করে যে আমি কি সুন্নাত মতো করছি, না-কি সুন্নাতের খেলাফ করছি। প্রেমাস্পদের পথ-পদ্ধতি অনুযায়ী চলছি, না-কি নিজের নফস্‌কে প্রেমাস্পদ সাব্যস্ত করে রেখেছি এবং তার দেখানো নমুনা অনুযায়ী চলছি। যা হোক, পোশাকের ক্ষেত্রেও আপনি স্বাধীন নন।

বর্ণিত হয়েছে, রাতে ঘুমবার সময়ে যখন পোশাক ছাড়ো, তখন তাকে মাটিতে বা বিছানায় ওভাবেই রেখে দিও না, দুই/তিনটি ভাঁজ দিয়ে রাখ কিংবা ঝুলিয়ে রাখ। আল্লাহর রাসূল বলেছেন:

إِطْوُوْا ثِيَابَكُمْ تَرِدُ إِلَيْهَا أَرْوَاحُهَا

তোমরা তোমাদের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রেখ, কেননা কাপড়েরও রূহ আছে।

কাপড়-চোপড়েরও এক ধরনের প্রাণ আছে। এ প্রাণ যদি বের হয়ে যায় তাহলে কাপড়ের বরকত চলে যায়। পরিধান করার মজা ও আনন্দ শেষ হয়ে যায়। সুতরাং বোঝা গেল, পোশাক খুলে রাখার ব্যাপারেও আমরা স্বাধীন নই, এখানেও আমাদের জন্য একটি পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে।

নিদ্রার সুন্নাত পদ্ধতি

অন্যান্য বিষয়ের মতো ঘুমের ক্ষেত্রেও আমরা স্বাধীন নই। নিদ্রা যাওয়ার চারটি পদ্ধতি হতে পারে। যথা– উপুড় হয়ে, চিৎ হয়ে, ডানকাতে ও বামকাতে শুয়ে নিদ্রা যাওয়া। দাঁড়িয়ে বা উল্টো হয়ে ঘুমানো সম্ভব নয় বিধায় ঘুম যাওয়ার জন্য উপরোক্ত চারটি পদ্ধতিই নির্ধারিত হয়ে আছে।

হাদিস থেকে জানা যায়, এই চারটি পদ্ধতির মধ্য হতে প্রথম পদ্ধতিটি অর্থাৎ উপুড় হযে শুয়ে ঘুমানো মাকরূহ। শরীয়ত এ পদ্ধতিটি পছন্দ করেনি। হযরত আবু হুরায়রা রা. একবার মসজিদে নববীতে উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পা দ্বারা মৃদু আঘাত করে বললেন–

يَا جُنْدَبُ، يَا جُنْدَبُ! إِنَّ هٰذِهِ بِدْعَةُ أَهْلِ النَّارِ.

এভাবে উপুড় হয়ে শোয়া জাহান্নামীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

জাহান্নামীদেরকে মুখ হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামীদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করা মুমিনের কাজ নয়। সেজন্যই উপুড় হয়ে শোয়াকে অপছন্দ করা হয়েছে এবং মাকরূহ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

চিৎ হয়ে শোয়া জায়েজ তবে পছন্দনীয় নয়। কেননা এটা দুর্বলদের স্বরূপ। অসুস্থ ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি চিৎ হয়ে পড়ে থাকে। এমনিভাবে কেউ যদি আত্মনিয়ন্ত্রণহীনভাবে পড়ে যায় তবে চিৎ হয়ে পড়ে। বলা হয়, অমুক পাহলোয়ান অমুককে আছাড় দিয়েছে এবং সে একেবারে চিৎপটাং হয়ে পড়েছে। এমনভাবে ধরাশায়ী বুঝাতে 'কাত হয়ে পড়েছে'– এমন বলা হয় না। বোঝা গেল, চিৎ হয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণহারা হওয়ার আলামত। সুতরাং দুর্বলতা সুলভ ভঙ্গিমাকে শরীয়ত পছন্দ করেনি। বর্ণিত হয়েছে:

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ

দুর্বল মুমিন অপেক্ষা শক্তিশালী মুমিন উত্তম।

বীর বাহাদুর মুসলমান কাপুরুষ মুসলমানের চেয়ে উত্তম। ইসলাম ও কাপুরুষতা কখনো এক হতে পারে না। ইসলামের সম্মিলন বীরত্বের সাথে। যা হোক, দুর্বল ও আত্মনিয়ন্ত্রণহীনের মতো ভঙ্গিমা অবলম্বন করাকে অপছন্দ করা হয়েছে।

বাকি থাকলো বাম দিকে কাত হয়ে শোয়ার বিষয়টি। এভাবে শোয়াও জায়েজ তবে শরীয়ত একে কিছুটা অসমীচীন মনে করেছে। কারণ আমাদের কলব রয়েছে বুকের বাম পাশে। আপনি যখন বাম কাতে শুয়ে ঘুমাবেন তখন কলব অধিক প্রশান্তি লাভ করবে। কলব যত প্রশান্তি লাভ করবে, ঘুম তত গভীর হয়ে আসবে। আর ঘুম যত গভীর হবে আপনার সজাগ হওয়ার চেতনা তত লোপ পাবে। এতে করে আপনার মধ্যে নামাজের চিন্তা, তাহাজ্জুদের চিন্তা কিংবা কিয়ামুল-লাইলের চিন্তা থাকবে না। এভাবে ইবাদতের রুটিং ও শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটবে, বন্দেগিতে ত্রুটি দেখা দেবে। এসব বিবেচনায় গভীর ঘুমকে শরীয়ত অপছন্দ করেছে। ঘুমের মধ্যেও চৌকস থাকাকে শরীয়ত পছন্দ করেছে। এ কারণেই বাম কাতে শুয়ে ঘুমানো শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়।

অবশিষ্ট পদ্ধতিটি, অর্থাৎ ডান কাতে শুয়ে ঘুম যাওয়া হলো সুন্নাত। এটাই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধতি। কলব যেহেতু বাম পাশে, সেহেতু ডান কাতে শুয়ে ঘুমালে কলব ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। কলব এভাবে ঝুলে থাকলে ঘুম কখনো গভীর হবে না, হবে সতর্ক নিদ্রা। নামাজের সময়ে সজাগ হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে যখন এভাবে ঘুমাবে তখন যথাসময়ে চোখ খুলে যাবে। এ কারণেই আমি বলি, নিদ্রা যাওয়ার ব্যাপারেও আমরা মুক্ত নই, আযাদ নই। আপনারা হয়তো ভেবে থাকবেন, এগুলো তো মানুষের অভ্যাস বা স্বভাবজাত কর্ম। হ্যাঁ, এগুলো মানুষের স্বভাবজাত কর্ম ঠিকই কিন্তু শরীয়ত মানুষের স্বভাবজাত কর্মকাণ্ডের মধ্যেও কিছু আদব সংযুক্ত করে দিয়েছে। নিদ্রা

যাওয়ার মতো স্বাভাবিক মানবীয় বিষয়াবলির ক্ষেত্রেও আমরা স্বাধীন নই, সুতরাং শোকতাপ ও আনন্দ-খুশির মতো বিষয়াবলির ক্ষেত্রে কিভাবে মুক্ত স্বাধীন থাকব? বিভিন্ন রুসুম পালনের ক্ষেত্রে কিভাবে স্বাধীন থাকব? যাই হোক, লেবাস-পোশাক ও নিদ্রা-জাগরণের মতো বিষয়াবলিতে শরীয়তের বিধান আমাদের উপর কার্যকর।

রুসুম-প্রথা, চিন্তাভাবনা এবং শরীয়তের বিধান

আমাদের কর্মকাণ্ড, আচার আচরণকে তো শরীয়ত নিয়ন্ত্রণ করছেই, এমনকি আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যেও শরীয়তের বিধান কার্যকর রয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– খারাপ চিন্তাও মনের ভেতর আনবে না। চিন্তাও শুদ্ধ হতে হবে, আকিদা বিশ্বাসও শুদ্ধ হতে হবে। কলব হলো একটি পবিত্র বিষয়, একটি পবিত্র আধার, এতে পবিত্র জিনিসই রাখ। নাপাক জিনিস রেখ না। যা হোক, আমাদের কলবের উপরও শরীয়তের বিধান কার্যকর রয়েছে।

দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের বিধানাবলি শরীরের উপর কার্যকর হয়। কেননা তাদের দৌড় ঐ শরীর পর্যন্তই, কলবের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে তারা অবগত হতে পারে না। কিন্তু যিনি عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ তথা অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন তাঁর বিধান তো অন্তরের উপরও কার্যকর হবে। অন্তরের নড়াচড়াও তিনি দেখছেন। সুতরাং ন্যায়ানুগতা অনুযায়ী আমাদের জন্য জরুরি হলো একাকী নির্জনতায় থাকা অবস্থায়ও আমরা খারাপ চিন্তা করব না। খারাপ পরিকল্পনা মাথায় আনবো না। কোনো কুমন্ত্রণাকে প্রশ্রয় দেব না। অনিচ্ছায় এসে গেলে তাতো অযাচিত বিষয়।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, কলবের চিন্তাভাবনা পোশাক-পরিচ্ছদ কিংবা নিদ্রা-জাগরণের ক্ষেত্রেও আমরা যেখানে শরীয়তের বিধানের আওতাভূক্ত, সেখানে পার্থিব লেনদেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কী-করে আমরা স্বাধীন থাকতে পারি? এ ক্ষেত্রেও আমরা সম্পূর্ণ শরয়ী বিধানভূক্ত। আনন্দ-খুশির বিষয় হলে দেখতে হবে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রা. কিভাবে তা উদযাপন করেছেন। দুঃখ-যাতনার বিষয় হলে দেখতে হবে যে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম তেমন সময়ে কী করেছেন। বলা হয়নি যে তোমরা মৃত ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করে করে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদো বরং বলা হয়েছে:

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

স্বজনের বিলাপে মৃত ব্যক্তিকে আজাব দেওয়া হয়।

এ আজাব মানে এই নয় যে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। মাতমকারী যখন বলে– হায়! তুমি ছিলে পর্বত সমতুল্য, তুমি ছিলে স্বর্ণতুল্য। তখন ফেরেশতাগণ মৃত ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করে বলেন– সত্যিই কি আপনি পাহাড় ছিলেন? বাস্তবিকই আপনি এত বড় ছিলেন? এগুলো কোনো স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা নয়, তাচ্ছিল্য ভরে বিদ্রূপ করা। এমন বিদ্রূপ মানুষকে বর্শা অপেক্ষা বেশি কষ্ট দেয়। এদিকে আমরা বিলাপ সহকারে তার প্রশংসা করছি, ওদিকে সেই প্রশংসাকে কেন্দ্র করে তাকে আজাব দেওয়া হচ্ছে। শরীয়তের দিক-নির্দেশনা হলো, যত কঠিন শোকই আসুক না কেন, ধৈর্যধারণ কর। সবর কর। স্বাভাবিক আমলের ধারায় যেন বিঘ্ন না ঘটে। কান্নাকাটি করা, কাঁদার জন্য আয়োজন করে বসা এবং বিলাপ-মাতম করা হীনমনা মহিলাদের কাজ। কেঁদেকেটে একাকার হয়ে যাওয়া পুরুষের কাজ নয়। যত বড় শোকতাপই আসুক, অন্তরকে দৃঢ় রাখুন। মাতম করার কী অর্থ থাকতে পারে?

যখন কাঁদার সময় আসবে তখনও আপনি শরীয়তের দিকে দৃষ্টি দেবেন যে, আমার নবী এ অবস্থায় কী করেছেন। চোখ দ্বারা কাঁদা জায়েজ। বয়ান করে করে কাঁদা, বিলাপ-মাতম করা নাজায়েজ।

সুন্নাত ত্যাগ করার পরিণতি

আনন্দ-বেদনা, চলাফেরা, ওঠাবসা, নিদ্রা-জাগরণ– মোটকথা সব ক্ষেত্রেই পথ-প্রদর্শক হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। যদি সুন্নাতকে ত্যাগ করা হয় এবং হাদিসকে উপেক্ষা করা হয় তাহলে ইসলামী জিন্দেগী গঠন করা যাবে না। কুরআন হলো মৌলিক সংবিধান। মৌলিক বিধান দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয় না। মৌলিক বিধানকে ব্যাখ্যা করে তার শাখাগত দিকগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত উপস্থাপন করা না হবে এবং ব্যাখ্যাকৃত বিষয়ের মধ্যে গবেষণা করে তার খুটিনাটি সকল দিক স্পষ্ট করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা আমল করার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। সরাসরি মূলনীতির ব্যাখ্যাকৃত শাখা প্রশাখার উপর আমল করা হয়। এ শাখা-প্রশাখা মূলনীতির আলোকেই নির্ধারিত হয়। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃককৃত ব্যাখ্যাকে (হাদিসকে) পরিহার করা হয় তাহলে থাকবে শুধু মূলনীতি। আর সরাসরি মূলনীতির উপর আমল করা সম্ভব নয়। এর দ্বারা বোঝা গেল, যারা হাদিসকে উপেক্ষা করে শুধু

কুরআন নির্ভর হয়ে থাকতে চায় তারা মূলত 'কাম চোরাদের' জামাত। কেননা তাদের উদ্দেশ্য আমল করা নয় এবং আমল করার কষ্টও তারা সইতে পারে না। পক্ষান্তরে তারা আবার এও চায় যে, লোকজন আমাদেরকে পাক্কা মুমিন মনে করুক।

তারা বলছে, হাদিসের পথ (কুরআন হতে) বিচ্ছিন্ন করে দাও। এমনটি করা গেলে আমল করার আবশ্যকতা আর দেখা দেবে না। কুরআনের যতটুকু মন চাইবে গ্রহণ করলাম, যতটুকু চাইবে না তা গ্রহণ করলাম না। এ কারণেই আমি আরজ করেছি যে, সুন্নাত হলো পথ-প্রদর্শক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা হলো এক উজ্জ্বল মিনার, যার দ্বারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার রাস্তা দৃষ্টিগোচর হয়। আর তাঁর সুন্নাত সে রাস্তায় চলতে পথ প্রদর্শন করে। সে পথ হলো আল্লাহর কিতাব, যে কিতাব আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আর এ পথের পথিক হলেন আপনি। আপনার যদি চলার শক্তি-সামর্থ্য থাকে তবে আপনি চলবেন, আর যদি শক্তি না থাকে কিংবা আপনি শক্তি সঞ্চয়ও করতে না চান তাহলে পথে কোনো পথিক থাকলো না। এ অবস্থায় কিতাব ও সুন্নাতকে দোষারোপ করা হবে না, দোষারোপ করা হবে পথিককে।

নূর এবং কিতাব

উপরোক্ত বিষয়গুলো পবিত্র কুরআন মাজিদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ○

يَهْدِىْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِه وَيَهْدِيهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ○

তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। এর দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন। [মায়েদাহ ৬ : ১৫-১৬]

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সুসংবাদ শুনিয়েছেন যে, তোমাদের নিকট নূরের আবির্ভাব ঘটেছে। এ নূর আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে; আল্লাহ মাফ করুন, এটা কারো

মনগড়া বিষয় নয়, কেউ মিথ্যামিথ্যি নিজেকে নূর বলে দাবি করেনি; বরং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নূর তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। কুরআন বিশারদগণ লিখেছেন, এখানে 'নূর' দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমুন্নত সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। যা হলো পথের আলোকবর্তিকা।

আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, শুধু নূর বা জ্যোতিরই আবির্ভাব ঘটেনি, كِتَابٌ مُبِينٌ তথা সুস্পষ্ট কিতাবও এসেছে। যে কিতাব হলো 'সরলপথ'।

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه.

অর্থাৎ আমার প্রদর্শিত এই পথ সরলপথ, তোমরা এ পথে চল। এই একটিই মাত্র পথ। তোমরা বিবিধ পথে চল না। [আনআম ৬ : ১৫৩]

হাদিসের ভাষ্য হতে জানা যায়, সুন্নাতকে উপেক্ষাকারী ও সুন্নাতের অনুসারীর কিছু নিদর্শন আছে। সুন্নাত উপেক্ষাকারী বিদআতীদের আলামত হলো তারা সর্বদা বিবাদে লিপ্ত থাকে এবং খারাপ ধরনের কথাবার্তা বলে। পক্ষান্তরে সুন্নাতের অনুসারীদের আলামত হলো, তারা সর্বদা শান্তভাবে সততার সাথে মাসয়ালা বর্ণনা করেন। হাদিস শরীফে আল্লাহর রাসূল বলেন, যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদআত ঢুকে পড়েছে তাদের মধ্যে কলহ বিবাদ, দুর্ব্যবহার, অশালীন কথাবার্তা ও ঝগড়াঝাটি অবশ্যই তৈরি হয়ে যাবে। কলহ বিবাদ ও ঝগড়া-ফাসাদের বিস্তার তাদের স্বভাবজাত বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়।

আর যারা সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকা উপস্থাপন করবে। এতে না আছে আবেগী হয়ে ওঠার আবশ্যকতা, না আছে খারাপ কথাবার্তা বলার আবশ্যকতা। যাই হোক, নূর এবং সুস্পষ্ট কিতাব দ্বারা জ্যোতি ও সরলপথ উদ্দেশ্য। এরপর আল্লাহ বলেন:

يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه سُبُلَ السَّلَامِ

অর্থাৎ আল্লাহ তাকে সরলপথ প্রদর্শন করেন। নিরাপদ পথ তার সামনে উন্মুক্ত করেন। এসব তাদের জন্য যারা তাঁর সন্তুষ্টি বিধানে মনোযোগী হয় এবং তারা চায় যে আল্লাহ তাদের উপর রাজি থাকুক।

ইসলাম আইন নয়, দীন

কোনো বিধান ও নীতিমালাকে দুইভাবে পালন করা যায়। একটি হলো শুধু প্রথা মাফিক ইসলামকে একটি 'ল' বা আইনরূপে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী চলা, আরেকটি হলো মুহাব্বত ও ভালবাসার সাথে ইসলামকে গ্রহণ করা।

আইন আর দীনের মধ্যে পার্থক্য হলো, বিশৃঙ্খলা দূর করার পদ্ধতির নাম হলো আইন। পক্ষান্তরে দীন হলো সেই জীবন-বিধান যাতে মুহাব্বত ও ইশকের সংযোগ রয়েছে। সুতরাং ইসলাম কোনো আইন নয়, কোনো বিধান নয়, ইসলাম হলো দীন। আর দীনের মধ্যে সাওয়াবও থাকবে, ইশকও থাকবে, মুহাব্বতও থাকবে এবং কলবের আবেগ ও জযবাও থাকবে। এ কারণেই আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশীদেরকে দীনের পথে আহ্বান করা হয়েছে। আইন তো এ জন্যও মান্য করা হয় যে, যদি না মানা হয় তাহলে পেটানো হবে, জেলে পুরে রাখা হবে। কিছুটা জীবনের আশঙ্কা ও কিছুটা লাভ বিবেচনায় আইন মান্য করা হয়। পক্ষান্তরে দীনের উপর শুধু এ কারণে চলা হয় যে, আমার আল্লাহ আমার উপর সন্তুষ্ট হবেন। প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টির জন্য আনুগত্য ও অনুসরণ করছি। পক্ষান্তরে কেউ সন্তুষ্টি কামনা না করলে তিনি বলবেন যে, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে চাচ্ছি না। আমি তো غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ আমি অভাবমুক্ত, জগৎবাসীর প্রতি আমার কোনো মুখাপেক্ষিতা নেই। মুখাপেক্ষী হলে তোমরা। তোমরাই যদি সন্তুষ্টি কামনা না করো, আমি কেন সন্তুষ্ট হব?

ইলম ও আখলাকের নূর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী?

يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।

এতে বোঝা গেল, নূর দ্বারা আক্ষরিক অর্থের নূর বা আলোকে বুঝানো হয়নি। আলো তো প্রথম হতেই বিদ্যমান ছিল। সূর্যও ছিল, চাঁদও ছিল। এগুলো নতুন করে নিয়ে আসার কিছু ছিল না। সুতরাং নূর দ্বারা উদ্দেশ্য অর্থগত নূর, অভ্যন্তরীণ জ্যোতি। আর জুলুমাত বা অন্ধকার দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো অর্থগত অন্ধকার। বোঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন এক দীপ্ত নূর। এমন নূর যার দ্বারা ভাল ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করা যায়। এ নূর

হলো পরিপূর্ণ ইলম, ইনসাফ ও আখলাক। যার দ্বারা মানুষ সাদা ও কালোর মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। জানা গেল, ইলমের নূর ও আখলাকের নূরের সম্মিলিত রূপ হলেন জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর এর উপরেই নবুওয়াতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

নবীগণ ইলম ও ওহী নিয়ে আগমন করেন এবং স্বীয় ফিতরাত ও আল্লাহর দীন দ্বারা পূর্ণাঙ্গ আখলাক পেশ করেন। আখলাকের নূর ও ইলমের নূর– এই উভয় বিষয়ই পেশ করেন। ইলমের নূরের মধ্যে থাকে তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা আর আখলাকের নূরের মধ্যে থাকে কোমলতা ও সহানুভূতিশীলতা। কারণ, ইলম হলো আল্লাহর সিফাত। ইলমের মধ্যে ঊর্ধ্বমুখিতা ও উন্নততার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। আলেম কখনো মাথানত করে রাখে না, ইলম সর্বদা তাকে উন্নতশির করে রাখে, সমুন্নত মর্যাদার দিকে নিয়ে যায়। ফলে কখনো কখনো তার মধ্যে অহংকার তৈরি হয়ে যায়, গর্ব চলে আসে, কখনো বা গৌরববোধ ও অহংবোধ চলে আসে। সুতরাং ইলমের ঔদ্ধত্য দূর করতে 'আবদিয়াতের' আবশ্যকতা রয়েছে। আর আবদিয়াতও ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত হবে না যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তিসত্তার কাছে নিজেকে সঁপে দেবে। (কবি বলেন):

پیش مرد کاملے پامال شو

কামেল ব্যক্তির কাছে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দাও।

তো ইলম চাচ্ছিল উন্নততা ও ঊর্ধ্বমুখিতা, আর 'ব্যক্তিসত্তার কাছে সমর্পিত হওয়া' শেখাচ্ছিল বিনয় ও বিনম্রতা। এই দুইয়ের যখন সমন্বয় ঘটলো তখন তাতে মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সংযুক্ত হল। ইলম ব্যক্তিকে মাহাত্ম্যশীল করে তোলে আর ব্যক্তিসত্তার কাছে নিজেকে সঁপে দেবার দ্বারা বিনয় তৈরি হয়। যদি ইলম না থাকে আর ব্যক্তিসত্তার কাছে সমর্পিত হয় তাহলে তা নিজের জন্য চরম অপদস্থতা ও লাঞ্ছনার বিষয়। এর দ্বারা শির্‌কে লিপ্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি শুধু ইলম থাকে এবং নিজেকে কোনো মুর্শিদের কাছে সমর্পণ না করে তাহলে তাকাব্বুর ও অহমিকার পথ উন্মুক্ত হবে। এ কারণেই যে আলেমগণ কোনো শায়েখের সাথে সম্পৃক্ত নন তারা সাধারণত অহংকারী হয়ে থাকেন। আর যারা ইলমের সাথে সংযুক্ত নয় কিন্তু ব্যক্তিসত্তার সাথে সম্পৃক্ত তাদের মধ্যে আত্ম-অপদস্থতা তৈরি হবে।

ব্যক্তি সত্তার আনুগত্যহীন ইলম

উপরোক্ত দু'টি বিষয় অর্থাৎ আনুগত্যহীন ইলম এবং ইলমহীন আনুগত্য পূর্ববর্তী দুই কওমের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। ইহুদী জাতি একটি ইলমী জাতি। তাদেরকে তাওরাত দান করা হয়েছিল। যে তাওরাত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে:

تَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ

প্রত্যেক জিনিসের বিশদ বিবরণ তাতে দেওয়া হয়েছে।
[আনআম ৬ : ১৫৪]

কিন্তু তারা ব্যক্তিসত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকাকে পরিহার করলো। আম্বিয়াগণের সাথে সম্পৃক্ততা কমিয়ে দিল। তাদেরকে অপমান-অবজ্ঞা করলো, হত্যা করলো।

اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوٰى اَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج
فَفَرِيْقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُوْنَ ○

যখনই কোনো রাসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদি বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ। [বাকারা ২ : ৮৭]

তারা নবীগণকে অসম্মান করলো। বললো– তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ। কিতাবুল্লাহ (তাওরাত) আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাওরাত যেহেতু আমাদের সামনে রয়েছে সেহেতু আমরা তা পড়ে বুঝবো এবং সেইমতো আমল করব। নবীর কী প্রয়োজন! এভাবে তারা পথ-প্রদর্শক ব্যক্তিত্ববর্গের অনুসরণ পরিহার করলো। সুতরাং শুধু কিতাবের ইলম তাদেরকে দাম্ভিক-অহংকারী করে তুললো। ঔদ্ধত্যে এরা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে:

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط
وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُوْا بِهَا ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لاَ
يَتَّخِذُوْهُ سَبِيلاً ج.

অর্থাৎ আমি আমার নিদর্শণসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায়। তাদের অহমিকা ও দাম্ভিকতা তাদের অন্তরের সত্যগ্রাহ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কলবের গতিপথ পাল্টে দিয়েছে এবং এমন

বক্রতা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। যদি হেদায়াতের সরলপথ সামনে উপস্থাপিত হয় তবু তা গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর বক্রপথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়, দ্রুত সে পথে চলতে থাকে। সুন্নাত উপস্থাপন করলে তা গ্রহণ করে না কিন্তু বিদয়াত পেলে দ্রুত লুফে নেয়। যা হোক, আয়াতে ইহুদীদেরকে অহংকারী বলা হয়েছে, কেননা তারা কেবল কিতাবকে গ্রহণ করেছে এবং ব্যক্তিসত্তাকে বর্জন করেছে।

ইলমহীন আনুগত্য

নাসারাগণ হলো আমলী উম্মত। তাদেরকে অধিক ইলম দেওয়া হয়নি। ইঞ্জিলে বেশি আহকাম নেই। এটা মূলত তাসাউফের কিতাব। এতে তাজকিয়ায়ে নফস তথা আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে অধিক মনোযোগী করে তোলা হয়েছে। তারা ব্যক্তিসত্তাকে এমন দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছে যে, কিতাব বাদ দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করে নিয়েছে।

হযরত ঈসা আ.কে তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ আবার তাকেই আল্লাহ বলে ফেলেছে:

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ

তারা তাদের ওলামা ও সুফীগণকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে এবং মরিয়ম তনয় ঈসা আ.কেও। [তাওবা ৯ : ৩১]

এভাবেই তারা ব্যক্তিসত্তার আশ্রয় নিয়েছিল। অতঃপর মাথা অবনত করতে করতে আত্মমর্যাদাহীন হয়ে শির্‌কে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে তাদের থেকে ইলম হারিয়ে গিয়ে সেখানে শিরক আশ্রয় নিয়েছে। ইহুদীদের মধ্যে শিরক ছিল না বটে তবে অহংকার এসেগিয়েছিল। সুতরাং শুধু কিতাবের আনুগত্য করা হলে অহংকার তৈরি হবে এবং শুধু ব্যক্তিসত্তার আনুগত্য করা হলে আত্ম-অপদস্থতা তৈরি হবে। আর যদি কিতাব ও ব্যক্তিসত্তা– এই উভয়ের সংযোগ-সংমিশ্রণ করা হয় তাহলে মর্যাদা প্রাপ্তির সাথে সাথে আল্লাহর জন্য বিনীত হওয়ার গুণ তৈরি হবে। না গর্ব-অহংকার থাকবে, না আত্মমর্যাদাহীনতা তৈরি হবে। মুসলমানগণ উভয় দিকের সাথে সমন্বয় সাধন করেন। একদিকে আল্লাহওয়ালাগণের আস্তিন ধরে রাখেন, আরেক দিকে কুরআন ও সুন্নাতের আস্তিন ধরে রাখেন। উভয় দিক

রক্ষা করার কারণে সম্মানও রক্ষিত হয়েছে, আত্মমর্যাদাশীলতাও বজায় রয়েছে এবং আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হওয়াও বিদ্যমান রয়েছে।

হাদিস শরীফে আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন:

لَقَدْ تَتَّبِعُوْنَ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، بَاعًا بِبَاعٍ، ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتّٰى لَوْ دَخَلَ أَحَدٌ...الخ.

> হে মুসলমানগণ! তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের প্রচুর অনুসরণ করবে। একেবারে বিঘাতে বিঘাতে, হাতে হাতে, গজে গজে অনুসরণ করবে। অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়াবলি থেকে নিয়ে অতি বড় বড় বিষয়াবলিতে তাদের অনুসরণ করবে। এমনকি পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্য হতে কেউ যদি গুঁইসাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে; যা একান্তই বেহুদা ও অর্থহীন একটি কাজ– তোমাদের মধ্যেও এমন লোক তৈরি হবে যারা এ ধরনের অর্থহীন ফালতু কাজ করবে।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী সে সম্প্রদায় কোনটি? আল্লাহর রাসূল বললেন, ইহুদী ও নাসারা।

মোটকথা, অত্র হাদিসে বলা হয়েছে, তোমরা ইহুদী-নাসারাদের অনুসরণ করবে। ইবাদত, আকিদা-বিশ্বাস, লেনদেন, জীবন-যাপন, পারিবারিক জীবন কিংবা সামাজিক জীবনে তোমরা হুবহু তাদের অনুসরণ করবে। এমনকি আকার আকৃতি ও চিন্তা-তাৎপর্যে তাদের অনুসরণকারী হয়ে থাকবে।

ইহুদী-নাসারাদের দুটি নিন্দনীয় বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো অহংকারী সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করলেও হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে ত্যাগ করেছে। অপরটি হলো পথহারা ঈসায়ী উম্মত– যারা ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করে কিতাবকে বর্জন করেছে। সুতরাং আমাদের এই উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যেও উক্ত উভয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। উভয় উম্মতের নমুনা আমাদের মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে একদল এমন আছে যারা শুধু আল্লাহর কিতাব হাতে নিয়ে চলে। সালফে সালেহীন, ইমামগণ ও ওলামায়ে কেরাম– সকলকেই তারা পাশ কাটিয়ে চলে। বলে– نَحْنُ رِجَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ তারা মানুষ ছিলেন এবং আমরাও মানুষ। সুতরাং অন্যের সামনে নত হওয়ার কী প্রয়োজন? কিতাব তো রয়েছেই। নিঃসন্দেহে তাদের এ দাবিটুকু ঠিক ছিল কিন্তু

কথা হলো, শুধু কিতাবের প্রভাব এই দাঁড়িয়েছিল যে, তার মধ্যে অহংকার-অহমিকা ও গর্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে।

আরেকদল এমন আছে, যারা বলে, আল্লাহর কিতাব কী তা আমরা জানি না, বুখারী ও মুসলিম কী তাও আমরা জানিনা। এই যে আল্লাহওয়ালা ও কামেল ব্যক্তিগণ রয়েছেন, এরাই আমাদের জন্য কিতাব, এরাই আমাদের তরিকা। এরা যা বলবেন, আমরা তাই করব।

শরীয়ত ও তরিকতের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য

এ কথা সুস্পষ্ট, নবীগণের পরে আল্লাহওয়ালাদের মধ্যে কেউ মাসুম বা নিষ্পাপ নন। মাসুম না হওয়ার মানে এই নয় যে তারা গুনাহ করেন। অর্থাৎ দীনি কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা বিশেষ হালাতে এমন কিছু জিনিস প্রকাশ পায় যা প্রকৃতপক্ষে সঠিক হলেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে শরীয়তের খেলাফ মনে হয়। এই যে বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তির থেকে আপাত দৃষ্টিতে শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজটি প্রকাশ পেল তা একজন স্বাভাবিক মানুষের জন্য বৈধ নয়। যদি শুধু ব্যক্তির অনুসরণ করা হয়, কুরআন হাদিসের উসূল সামনে না থাকে তাহলে বিশেষ অবস্থায় প্রকাশ পাওয়া বিষয়াবলির অনুসরণ করবে এবং গোমরাহ হবে। মানসুর হাল্লাজ বিশেষ হালাতে উপনীত হয়ে 'আনাল হক' বলে ফেললেন। তাঁর সবকিছু যদি শরীয়ত হয়ে যায় তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, দুনিয়ার সবাই 'আনাল হক' বলবে– অর্থাৎ আমিই খোদা। অথচ উক্ত কথাটি এক বিশেষ অবস্থায় মানসুর হাল্লাজের মুখ হতে প্রকাশ পেয়েছিল। কোনো নীতিমালা, কোনো উসূলের ভিত্তিতে কথাটি তিনি বলেননি। সুতরাং শরীয়ত হলো এক সার্বিক নীতিমালার নাম আর তরিকত হলো ব্যক্তির অবস্থা বিশেষের নাম। সাধারণ নীতিমালা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই পালনীয় বিষয়, আর ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবস্থা আমলের জন্য কখনো দলিল হয় না। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হালাত স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। মানসুর আনাল হক বলেছে বলে আমারও আনাল হক বলা কর্তব্য নয়। তবে হ্যাঁ, ঐ অবস্থা যদি আমার মধ্যেও তৈরি হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি বলে ফেলি তাহলে তাতে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। কিন্তু যদি তেমন অবস্থা সৃষ্টি না হয় এবং বিশেষ অবস্থার শিকার ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ডের অনুকরণ করি তবে তা হবে রুসুমের অনুকরণ।

মোটকথা, একটি সম্প্রদায় এমন তৈরি হয়ে গিয়েছে যারা বলে, এই আল্লাহওয়ালাগণই তো হলেন আসল কিতাব, কথা বলা কিতাব। কিতাবে কী

লেখা আছে আমরা জানি না। আমরা কেবল এদেরকে চিনি, এরাই হলেন মূল। আমরা এদের অনুগত হব। তারা এমনই অনুগত হয় যে, এক পর্যায়ে শির্ক ও বিদআতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে অন্য সম্প্রদায়টি কিতাবের প্রতি এমনই অনুগত হয় যে, ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে অহংকার ও দাম্ভিকতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. লিখেন:

مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَاءِنَا فَفِيْهِ شِبْهٌ مِنَ الْيَهُوْدِ، وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيْهِ شِبْهٌ مِنَ النَّصَارٰى.

> আমাদের আলেমগণের যাদের পদস্খলন ঘটে তারা ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, আর আমাদের আবেদগণের মধ্যে যাদের পদস্খলন ঘটে তারা নাসারাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাহলে সঠিক মুহাক্কিক কে? মুহাক্কিক হলেন তিনি, যিনি না অহংকারে লিপ্ত, না অপদস্থতায় লিপ্ত। আত্মমর্যদা ও সম্মানের সাথে যিনি আল্লাহতে বিনীত হন। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন কিতাব ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের সমন্বয় করে মানুষ তার জীবন পরিচালনা করবে। এই দুইয়ের সমন্বয় ব্যতীত হক্কানী ইলম ও আমল নসিব হতে পারে না। উভয়ের সম্মিলন ব্যতীত আল্লাহর আদব-সম্মান রক্ষা করা নসিব হয় না।

মাদরাসা ও খানকা

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, চিন্তা করলে দেখা যাবে, মাদরাসার মধ্যে ইলম শেখানো হয় এবং তারবিয়াতে আখলাক বা চরিত্র গঠন হয়ে থাকে খানকায়। মানুষকে মাদরাসামুখী হওয়ার সাথে খানকামুখী হতে হবে, অন্যথায় পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয় না। কেউ যদি শুধু খানকায় যাতায়াত করে, খানকামুখী হয় তাহলে সে 'অজদী' বা প্রভুর প্রেমে আত্মহারা হয়ে যাবে। খানকায় বসে এমন অবস্থা প্রবল হবে। পক্ষান্তরে যদি শুধুই মাদরাসামুখী হয় তাহলে অহংকারী হয়ে উঠবে। সুতরাং দীনের পথে না শুধু আত্মহারা হওয়া যথেষ্ট, না শুধু ইলম যথেষ্ট। যখন উভয়ের সমন্বয় সাধন করা হবে তখনই কেবল দীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। একদিকে মানুষের ইলম অর্জন করা আবশ্যক, এর জন্য তাকে মাদরাসায় যেতে হয়। অপরদিকে তার তারবিয়াত আবশ্যক, এ জন্য তাকে খানকায় যেতে হয়। এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটানো মুহাক্কিক হওয়ার আলামত।

মৌলবী ও সুফিগণের যে বিরোধ দেখা যায়, আমি বলে থাকি, এটা এজন্য হয় যে, একদিকে থাকে আনকোরা নবীন মৌলবী, যার মধ্যে ইশকের কমতি রয়েছে, অপরদিকে থাকে অদ্রূপ আনকোরা নতুন আশিক, যার মধ্যে ইলমের কমতি রয়েছে। মুহাক্কিক ও কামেল ব্যক্তিগণ কখনো বিরোধ বাধান না। সুতরাং কামেল হওয়ার চেষ্টা করুন।

بر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق

ہر ہوسناکے نداند جام و سنداں باختن

একহাতে শরীয়তের পেয়ালা ও অপরহাতে ইশকের পোয়ালা থাকা উচিত। আগুনও থাকবে, পানিও থাকবে। কঠোরতাও থাকবে, কোমলতাও থাকবে। তবেই কেবল মানুষের মধ্যে কামাল বা পূর্ণতার সৃষ্টি হবে। এ পদ্ধতি ছাড়া কামাল বা পূর্ণতার অন্য কোনো পদ্ধতি নেই। সমতা ও ন্যায়ানুগতাও তখনই পাওয়া যাবে যখন জালাল ও জামালের সমন্বয় ঘটবে।

রূহের চিকিৎসা

ঘোষণা করা হয়েছেঃ

يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَه

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হেদায়াত দান করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশী। [মায়েদাহ ৬ : ১৬]

সন্তুষ্টি বা রেযা হলো একটি স্তর। এ স্তর লাভ হবে ঐ ব্যক্তির যিনি তার কলবকে সেদিকে নিবিষ্ট করবেন। অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগতের সাথে এর সংযোগ। আধ্যাত্মিকতায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মাধ্যমে চিকিৎসা করানোর দ্বারা রেযা বা সন্তুষ্টি তৈরি হবে।

শরীরে যেমন নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি হয় অন্তর এবং নফসের মধ্যেও অদ্রূপ রোগ-ব্যাধীর সৃষ্টি হয়। শারীরিক রোগের জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়। ডাক্তার যা বলে তাই করা হয়। রূহের রোগ হলে রূহানী ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তিনি যা নির্দেশ করবেন তা মান্য করতে হবে। রূহানী ডাক্তারও শারীরিক ডাক্তারের মতো ওষুধ দেবেন, পথ্য দেবেন এবং কিছু বিধিনিষেধ বাতলে দেবেন। বলবেন, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। প্রত্যাহিক শরয়ী আমল হলো পথ্য। এগুলোর ব্যাপারে আলসেমি করবে না। আর ঔষধ হলো আল্লাহর

জিকির। এতো বার তাঁর তাসবীহ পড়তে হবে, এতো বার আল্লাহর নাম নিতে হবে। সুতরাং ঔষধ, পথ্য ও বিধিনিষেধ সবকিছুই রয়েছে।

মোটকথা, শরীরে যেমন রোগবালাই আক্রমণ করে, নফসেও তদ্রূপ ব্যাধির সৃষ্টি হয়। শরীরের রোগের জন্য যেমন চিকিৎসক আছেন কলবের রোগের জন্যও আল্লাহ তদ্রূপ চিকিৎসক তৈরি করে দিয়েছেন। এসব চিকিৎসকের দ্বারা যিনি কলবের চিকিৎসা করাবেন তার কলবে 'মাকামে রেযা' (সন্তুষ্টির মাকাম বা স্তর) তৈরি হবে। তেমনিভাবে ইশক, মুহাব্বত ও ফায়েজের মাকাম তৈরি হবে। অন্যথায় কিছুই হবে না। এ কারণেই বাতেন বা অভ্যন্তরীণ বিষয়েরও আবশ্যকতা রয়েছে এবং বাহ্যিকতারও আবশ্যকতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গেই ইরশাদ করা হয়েছে যে, পথের প্রদীপ হলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়। আর তাঁর সুন্নাত হলো পথ-প্রদর্শক। আর আল্লাহর কিতাব হলো সীরাতুল মুস্তাকিম। এ পথে চলবে ঐ ব্যক্তি যার অন্তর শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর আল্লাহর সন্তুষ্টির চিহ্ন তাতে পরিলক্ষিত হয়।

সীরাতে নববীর চার উপাদান

একটি আলোকিত পথ ও পথনির্দেশ নিয়ে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য কী ছিল? আল্লাহ নিজেই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন:

يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّورِ

তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে পথ-প্রদর্শন করেন। [মায়েদাহ ৬ : ১৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসা। অন্ধকার যেমন ব্যাপক ছিল, তার বিপরীতে নিয়ে এলেন তদ্রূপ প্রবল আলোর ফোয়ারা। অজ্ঞতা, জুলুম ও গুনাহের অন্ধকারের বিপরীতে যে নূরের আগমন ঘটবে তা হওয়া চাই ইলম, আনুগত্য, পূর্ণতা ও আখলাকে রব্বানীর নূর। এসবের মারকাজ বা কেন্দ্র করে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই তাঁর সীরাতের উপাদান হলো চারটি– কিতাবের তালিম, শব্দ ও বাক্যের তিলাওয়াত, হিকমতের তালিম এবং আত্মশুদ্ধি। এর সাথে সাথে এ কথাও সত্য যে, তিনি হলেন নূরের মশাল, তাঁর সুন্নাতসমূহ হলো পথ-প্রদর্শক, তিনি যে পথ

প্রদর্শন করেছেন তা হলো কুরআন। আর যেসব ব্যক্তিবর্গ এ কুরআনকে মেনে চলবে তারা হলো মুসলিম। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সে পথে চলার তাওফিক দান করুন। এই উপাদানসমূহকে আমাদের জীবনের জন্যও প্রযোজ্য করুন। আমাদের শরীর ও রূহের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। আমাদের আত্মাকে পূর্ণতা দান করুন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলার তাওফিক আমাদেরকে দান করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের উপর আমল করার তাওফিক দান করুন। মনগড়া পথ পরিহার করার তাওফিক দান করুন। আমাদের ইলমকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার তাওফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন, যেন কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের মাকাম আমাদের মধ্যে এসে যায়। আমীন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْلَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا فِتْـنَةً لِّلْـقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ غَيْرَ جَزَايَا وَلاَ مَفْتُوْنِيْنَ. وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِه مُحَمَّدٍ وَّاٰلِه وَصَحْبِه اَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

২৩ সফর ১৪০৫ হিজরী।

বয়ান : ৩

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা

কুরআনুল কারীম পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সংরক্ষক। তাতে সঠিক তালিম যা ছিল কুরআন তা বলবৎ রেখেছে এবং পরবর্তীতে যা সংযোজন করা হয়েছে কুরআন তা ছুঁড়ে ফেলেছে। এ কারণেই কেউ যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন সে মুসলমান হবার সাথে সাথে খাঁটি ঈসায়ী (খ্রিস্টান)ও হয়ে যায়। এভাবে যে, সঠিক বিশ্বাসে হযরত ঈসা আ.-এর উপরও সে ঈমান আনলো। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি মুসলিম হলো সে সঠিক অর্থে ইহুদীও হল। কেননা সনদে মুত্তাসিলের সাথে সে মুসা আ.-এর উপর সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করলো। এভাবেই সে ইবরাহিমী হবে, আদমী হবে। অর্থাৎ ইবরাহিম ও আদম আ.-এর উপর ঈমান আনবে। পৃথিবীতে সনদে মুত্তাসিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মাত্র আসমানী কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। এ কিতাবই অন্যান্য কিতাবসমূহ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছে। এ কিতাবকে মেনে নেওয়া মানে সকল কিতাবকে মেনে নেওয়া। এ কিতাব আনীত দীনে প্রবেশ করা মানে সবকিছুকে নিজের সামনে নিয়ে আসা।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّابَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قُولُوْا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيمَ وَاِسْمٰعِيلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ○

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

প্রাজ্ঞ শুকরিয়া

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আমার পরিচয় দিতে গিয়ে যা কিছু বলা হলো তা নিজেদের উচ্চ ধারণারই বহিঃপ্রকাশ; আমার সাথে ওসবের কোনো সম্পর্ক নেই। এর দ্বারা তাঁরা

নিজেদের বিজ্ঞতাকে সমুন্নত করলেন, আমার উচ্চ মর্যদা ওতে প্রকাশ পায়নি। সে জন্যই শুকরিয়া আদায় করা আমার জিম্মাদারী নয়। কারণ আপনারা নিজেদের বিজ্ঞতা ও প্রাজ্ঞতা প্রকাশ করলেন আর শুকরিয়া আদায় করব আমি? আপনারা নিজেদের প্রশংসা করলেন (আমরা এভাবে ধন্য হয়েছি, এই হয়েছি, সেই হয়েছি) তার জন্য শুকরিয়া আদায় করা তো আমার দায়িত্ব হতে পারে না। যদি আপনারা আমার প্রশংসা করতেন তাহলে আমি তার জন্য শুকরিয়া আদায় করতাম।

আর আপনারা প্রশংসাও করলেন এমনভাবে, যার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নাই। কেউ কেউ বললেন, ইনি হলেন চাঁদ ও সূর্য। আমি আবার কবে চাঁদ-সূর্য হলাম? আমি তো মানুষ। এ আমার কেমন প্রশংসা, যার সাথে বাস্তবতার মিল নেই!

একজন বললেন, আমি নাকি খুব বড় একজন মানুষ। আমি আবার কবে বড় হলাম? মোটকথা, আপনারা আমার প্রশংসা করলে আমি শুকরিয়া আদায় করতাম। আপনারা তো আমার প্রশংসা করেননি, সুতরাং শুকরিয়া আদায় করার জিম্মাদারী আমার নেই।

দারুল উলুমের একজন তালিবে ইলম

পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন যদি থেকেই থাকে তাহলে আমিই আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আমার পরিচয় না চাঁদ-সূর্য দ্বারা হবে, না ইলম ও ফজল দ্বারা হবে। কেননা ইলম ও ফজলে উক্ত ওলামায়ে হযরত (যাঁরা আমার প্রশংসা করলেন) আমার চেয়ে অনেক বড়। আপনাদের সম্মুখে মাওলানা হাসান সাহেব দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি আমাদের দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদ। আমিও তাঁকে তাজিম করি। তার সামনে আমি একজন তালিবে ইলম। উপস্থিত রয়েছেন মাওলানা আনজার শাহ সাহেব। বয়সে তিনি আমার ছোট কিন্তু ইলমে অনেক বড়। আমি অন্তর থেকে তাকে সম্মান করি। সুতরাং আমার পরিচয় হলো এই, আমি দারুল উলুমের একজন তালিবে ইলম। ওখানকার উস্তাদ ও বুযুর্গানের জুতা সোজা করা আমার কাজ। এ ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। তাই এর চেয়ে বেশি কিছু যেন বোঝা না হয়।

এটা কোনো বিনয়ের কথা নয়। কেননা এই হযরতগণ তো দিনরাত তালিমে লেগে রয়েছেন। তাদের ইলম তাজা রয়েছে। আমি পড়েছি ষাট বছর পূর্বে। তাদের ইলম তাজা এবং আমারটা বাসি। আর বাসিও একেবারে চুরাশি

বছরের। যেন নিঃশেষ হওয়ার কাছাকাছি। এ কারণেই আমার পরিচয় এর চেয়ে মোটেও অতিরিক্ত নয় যে, আমি দারুল উলুমের একজন তালিবে ইলম, আর এই ওলামায়ে হযরতের খেদমত করা আমার অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব। তাঁরা যা কিছু বলেছেন, স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা বলেছেন, তার সাথে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

কর্তব্য পালন

যেহেতু আপনারা আমাকে সদর (প্রধান অতিথি) নিযুক্ত করেছেন সেহেতু শুকরিয়া আদায় করা আমার জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আসলে, যারা সদর নিযুক্ত করেন তারাই তো প্রকৃত সদর। এরা একজন তুচ্ছ ব্যক্তিকেও প্রধানের সম্মানে ভূষিত করতে পারেন। এরাই তো হলেন প্রকৃত সদর, যাদের সদর নিযুক্তির সামর্থ্য আছে। এরা নিজেরাই তো সদর। যাই হোক, আপনারা যেহেতু আমাকে সভাপ্রধান নিযুক্ত করে এই চেয়ারে বসিয়েছেন সেহেতু এর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা আমার জন্য অবশ্যকর্তব্য। এরই ধারাবাহিকতায় আমি কয়েকটি কথা বলতে চাচ্ছি। আমি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি সে প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করলেই ভাল হয়। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে ছোট্ট একটি ভূমিকা আলোচনা করব, এতে বিষয়বস্তু বুঝতে সহজ হবে এবং আয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইনশাআল্লাহ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ভূমিকা

প্রথম কথা হলো, সমগ্র পৃথিবী এখন হাতের নাগালে চলে এসেছে। অর্থাৎ পুরো দুনিয়া যেন সংকোচিত হয়ে একটি গোত্র, একটি পরিবারে পরিণত হয়েছে। কোনো একটি দেশে যেতে আগে যদি এক মাস সময় লাগতো, এখন তা একদিনে সম্ভব হচ্ছে। যে সফর করতে দিন পার হয়ে যেত, আজ তা এক ঘণ্টায় করা যাচ্ছে। যা হতো এক ঘণ্টায় তা হচ্ছে এক মিনিটে। সুতরাং সমগ্র পৃথিবী যেন সংকোচিত হয়ে একটি গোত্রের মতো হয়ে গেছে।

শৈশবে আমরা যখন দশ মাইলের সফরে যেতাম তখন ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হতো। সে সফর আজ আর কোনো সফরের মধ্যেই পড়ে না। শহর এলাকায় দশ বারো মাইলের সফর তো প্রতিদিনই করতে হয়। এমনসব মাধ্যম তৈরি হয়ে গিয়েছে যে, করেয়ক মাসের সফর এক ঘণ্টার সফরে পরিণত হয়ে গিয়েছে। উড়োজাহাজে করে আপনি ইউরোপ যেতে চাইলে বারো ঘণ্টার মধ্যে

পৌঁছে যাবেন। প্রথম দিকে দেওবন্দ থেকে দিল্লি যেতে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় লাগতো, আর এখন বারো ঘণ্টায় লন্ডন পৌঁছে যায়। হাজার মাইলের সফর হয়ে গেছে যেন আধা কি এক মাইলের সফর। এমনসব বাহন তৈরি হয়ে গিয়েছে যে, সেগুলো যেন সমগ্র দুনিয়াকে নিজ আওতার মধ্যে জড়িয়ে নিয়েছে।

মতাদর্শের একাত্মতা

যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটেছে। এখানে বসে আপনি আজ যে জ্ঞানের অধিকারী, লন্ডনের একজন অধিবাসীও সে জ্ঞানের অধিকারী। আমেরিকা ও জার্মানির অধিবাসীদেরও সেই একই জ্ঞান রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভৌগোলিক সীমারেখার কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখন আর অবশিষ্ট নেই। এমনকি সামাজিকতা ও কৃষ্টি-কালচারের পার্থক্যও মিটে যাচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকা ও ভারতের কালচার প্রায় এক হয়ে গেছে। লন্ডনে আপনি যা দেখবেন, মুম্বাই ও কলকাতায়ও তা দেখতে পাবেন। আমেরিকায় যার প্রচলন রয়েছে সেই স্টাইল এখানেও আপনার চোখে পড়বে। এভাবে কৃষ্টি-কালচারে মিল, মতাদর্শের মিল– পুরো পৃথিবী মিলে যেন একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। একটি দেশ বা একটি এলাকার সমস্যা সমাধানে পুরো পৃথিবী উদ্যোগী হয়ে ওঠে। এভাবে কোনো দেশের শাসনব্যবস্থা তার নিজস্ব ব্যাপার হয়ে থাকেনি বরং বহির্গত শাসনের অনুগামী হয়ে রয়েছে। এ বিষয়টি সকল দেশের জন্যই প্রযোজ্য। কাশ্মীর সমস্যা আপনার দেশের একটি আঞ্চলিক সমস্যা, অথচ এটি জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়েছে। আপনার দেশের এই সমস্যা সমাধানে ইউরোপ-আমেরিকার লোকজন বসে বুদ্ধি-পরামর্শ করছে, উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত-দিগন্তের ছোটখাটো সমস্যাবলিও জাতিসংঘে উত্থাপিত হয় এবং জাতিসংঘ তার ফয়সালা করে। সুতরাং কোনো দেশের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য এখন আর অবশিষ্ট নেই। এ কারণেই মতাদর্শও একই হয়ে যাচ্ছে। সামাজিকতা ও কৃষ্টি-কালচারের ক্ষেত্রে ইউরোপের যে মতাদর্শ, সেই একই মতাদর্শ আমেরিকা ও রাশিয়ারও। সামাজিকতা ও মতাদর্শ এক হয়ে যাচ্ছে। একেকটা বিষয় তৈরি হচ্ছে, নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। আপনার দেশে চলে আসছে। আপনি গ্রহণ করে নিচ্ছেন। এভাবে প্রত্যেক দেশ ও এলাকার বিশেষত্ব মিটে গিয়ে একই মতাদর্শ তৈরি হয়ে গিয়েছে। সবার চিন্তা চেতনা এক

হয়ে গিয়েছে, প্লাটফর্ম এক হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীবাসী এটাই চাচ্ছে যে, সবার মতাদর্শ এক হয়ে যাক। এ হলো বর্তমানে চলমান একটি মতবাদ।

ধর্মীয় একাত্মতা

মতাদর্শ যখন এক হয়ে গেল, সামাজিকতা ও কৃষ্টি-কালচার যখন এক হয়ে গেল তখন স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়টি সামনে এসে যায় যে, মাজহাবও এক হোক। কৃষ্টি-কালচার এক হওয়ার পরেও দীন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। কৃষ্টি বা তামাদ্দুন এক হবে আর দীন ভিন্ন হবে– এটা ফিতরাত ও স্বভাব বিরুদ্ধ। বর্তমানে মতাদর্শের একাত্মতা তৈরি হয়ে গেছে, বাকি আছে মাজহাব বা দীনের একাত্মতা। তাও আস্তে আস্তে আসছে এবং দীন সজিব হচ্ছে। এক হাদিসে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَا يَبْقٰى عَلٰى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَ بِذُلِّ ذَلِيْلٍ

পৃথিবীতে এমন কোনো কাঁচাঘর বা পাকাঘর বাকি থাকবে না যেখানে ইসলামের কালিমা পৌঁছবে না। হয়তো ভালবাসা নিয়ে গ্রহণ করবে, নয়তো অপারগ হয়ে গ্রহণ করবে।

অপারগ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানগণ কারো গলায় ছুরি ধরে বলবে, হয়তো গ্রহণ কর, না হয় জবাই করে দেব। এমন ধরনের কাজের বিরোধিতা করে ইসলাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছে:

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। কল্যাণ ও অকল্যাণ, ভাল ও মন্দ সুস্পষ্টরূপে সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। [বাকারা ২ : ২৫৬]

যার ইচ্ছা ইসলাম গ্রহণ করবে, যার ইচ্ছা করবে না। কোনো প্রকার জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতার ব্যাপার নয়। এমনকি এ পর্যন্ত বলা হয়েছে–

اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ. يونس ١٠: ٩٩

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি কি লোকজনকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবেন? এ দায়িত্ব আপনার নয়, এ হলো আল্লাহর দায়িত্ব। যাকে ইচ্ছা তিনি ঈমান দান করেন। আপনার কাজ শুধু তাবলিগ বা দীন পৌঁছে দেওয়া। মানা বা না-মানা এটা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন বিষয়। যে বিষয়টি পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এভাবে এসেছে:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا.

যার ইচ্ছা ঈমান গ্রহণ করুক আর যার ইচ্ছা গ্রহণ না করুক। আমি পরকালের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। যার ইচ্ছা নিজেকে রক্ষা করুক আর যার ইচ্ছা নিজেকে সে আযাবের হাতে সঁপে দিক। [কাহাফ ১৮ : ২৯]

সুতরাং দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। এ কারণেই বলা হয়েছে بِعِزَّ عَزِيْز وَ بِذِلَّ ذَلِيْل অর্থাৎ ইসলামের কালিমা সবার কাছে পৌঁছে যাবে। চাই মুহাব্বতের সাথে গ্রহণ করুক বা অপারগ হয়ে গ্রহণ করুক। অপারগ বা বাধ্য হওয়ার অর্থ তলোয়ার দ্বারা বাধ্য করা নয়। বাধ্য হওয়ার অর্থ হলো প্রত্যেকে ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে অন্য কোনো উপায় না পেয়ে ইসলামী নীতিমালার আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দেবে। লোকজন এ নীতিমালা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না। সারকথা দাঁড়াল এই– প্রত্যেক ঘরে ইসলামের বাণী পৌঁছে যাবে এবং স্থিরতা পাবে। সুতরাং আমি মনে করি বর্তমানে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যাচ্ছে। কৃষ্টি-কালচার এক হয়ে গেছে, মতাদর্শ এক হয়ে গেছে, সামাজিকতাও এক হতে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আবশ্যকীয়ভাবে এই বিষয়টি সামনে এসে যায় যে, মাজহাব বা দীন কেন এক হবে না? সকল জাতি মিলে কেন এক প্লাটফর্মে সমবেত হব না? এমনটি হলেই তো কেবল ঐক্য তৈরি হবে। আগামীতে এমনটিই হবে। মুখে মুখে এ কথা আলোচিতও হচ্ছে। কিছুদিন পরে বাস্তবায়নও দেখা যাবে।

বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা

পৃথিবীর সকল দেশ ও রাষ্ট্র যেহেতু এখন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত, সবাই সবার সাথে সম্পৃক্ত, সেহেতু সকলে মিলে এমন একটি জীবনব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করবে যে জীবনব্যবস্থাটি হবে একটি আন্তর্জাতিক জীবনব্যবস্থা। দীন যদি এক

এলাকার হয়, অপর এলাকার সাথে তার যদি কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তা আন্তর্জাতিক দীন নয়। এ দীন হলো আঞ্চলিক দীন। অথবা দীন যদি কোনো এক নির্দিষ্ট বংশ বা গোত্রের হয় তাহলে অন্য বংশ বা গোত্র তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে না। কিন্তু যে জীবনব্যবস্থা বিশ্বজনীন, সকল দেশ ও এলাকার জন্য প্রযোজ্য, তার প্রতি মানুষ এমনিতেই আকৃষ্ট হবে। হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

كَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ إِلى قَوْمِه خَاصَّةً وَ بُعِثْتُ إِلىٰ النَّاسِ كَافَّةً.

পূর্ববর্তী নবীগণ তাদের কওমের জন্য বিশেষভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন, আর আমি প্রেরিত হয়েছি সকল মানব জাতির জন্য।

নবীগণের দাওয়াতী কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট ছিল। যেমন কোনো কোনো নবী এক নির্দিষ্ট খান্দানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। যথা 'বনী ইসরাইল' একটি খান্দান। এ খান্দানে হাজারো নবী প্রেরিত হয়েছেন। প্রত্যেক নবীরই দায়িত্ব এই ছিল যে, ইসরাইলী খান্দানের ইসলাহ করবে। অন্য খান্দানের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না। হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, ঈসা আ. হলেন বনী ইসরাইলের রাসূল। স্বয়ং হযরত ঈসা আ. বলেন, আমি ইসরাইলী জনসাধারণকে একত্রিত করার জন্য আগমন করেছি, যেন তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে না থাকে। অন্য কওমের লোকদের সাথে আমার সম্পর্ক নেই। জানা গেল, কিছু কিছু নবী নির্দিষ্ট খান্দানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, ঐ খান্দানের সংশোধনের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত ছিল। কিছু কিছু নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা নির্দিষ্ট কওমের প্রতি।

যেমন হযরত ইউসুফ আ.। তিনি চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এই চারটি সম্প্রদায়ের সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। অন্যান্য আম্বিয়া আ.ও তদ্রূপ নিজ নিজ কওম, খান্দান এবং গোত্রের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। যেমন কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে:

و اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيرٌ.

এমন কোনো উম্মত অতিবাহিত হয়নি যাদের মধ্যে শতর্ককারী প্রেরণ করিনি। [ফাতির ৩৫ : ২৪]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ প্রমাণাদি উপস্থাপন করা ব্যতীত কোনো কওমকে শাস্তি প্রদান করি না। [বনী ইসরাইল ১৭ : ১৫]

পরিপূর্ণ দলিল-প্রমাণসহ দীন উপস্থাপন করার পরও যদি তারা না মানে তাহলে আমি শাস্তি দেব। অন্যথায় আমি আযাব দেই না। সুতরাং কুরআনের বর্ণনা দ্বারা জানা গেল, এমন কোনো কওম ও এলাকা বাকি নেই যেখানে রাসূল প্রেরণ করা হয়নি। দালিলিক প্রমাণ হলো, আমাদের অত্র এলাকাতেও রাসূল আগমন করেছেন। শতকোটি মানুষের দেশ, এখানে আল্লাহর পক্ষ হতে সতর্ককারী না আসা কী-করে সম্ভব?

ইসলামের সূচনা

আমি বলে থাকি, প্রথম পয়গম্বর তো ভারতীয় উপমহাদেশেই প্রেরিত হয়েছেন। হযরত আদম আ. এখানেই আগমন করেছেন। ভারতে তার অবতরণ করা সুপ্রমাণিত।

হযরত আদম আ. হিন্দুস্তান থেকে আরবে সফর করেছে এবং একশত বিশবার হজ করেছেন। এর মধ্যে চল্লিশবার করেছেন পায়ে হেঁটে এবং বাকিগুলো করেছেন ষাড়ের পিঠে আরোহণ করে। সুতরাং সর্বপ্রথম 'দারুন নবুওয়াত' ও সর্বপ্রথম 'দারু খেলাফাতিল্লাহ' (আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের কেন্দ্র) হলো ভারত। এখান থেকেই মাজহাবের সূচনা হয়েছে। মাজহাবের (দীনের) পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটেছে আরবে কিন্তু সূচনা হয়েছে ভারতে। পূর্ণতা প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতরাজিও তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম, আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীনরূপে মনোনীত করে সন্তুষ্ট হলাম। [মায়েদাহ ৫ : ৩]

হযরত আদম আ. ইসলাম নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তার মাধ্যমে ইসলামের সূচনা হয়েছে এবং আরবে গিয়ে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মাঝখানে অন্যান্য নবীগণের আগমন অব্যাহত ছিল। প্রত্যেক ভূখণ্ড ও কওমের প্রতি নবীগণ প্রেরিত হচ্ছিলেন এবং ইসলামের তাবলিগ করছিলেন। কিন্তু আল্লাহর দীন সর্বত্র একই ছিল। শুধু শরীয়তের মধ্যেই পরিবর্তন পরিবর্ধন হচ্ছিল। কোনো একটি জিনিস প্রথম শরীয়তে হালাল ছিল তো পরের শরীয়তে তা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। অথবা পূর্বের শরীয়তে হারাম ছিল, পরবর্তী শরীয়ত এসে তাকে হালাল সাব্যস্ত করেছে। এভাবে শরীয়তের মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন হচ্ছিল; কিন্তু দীন একই ছিল।

শরীয়তের পূর্ণতা

দীন হলো মৌলিক উসূলের নাম। মূলনীতির নাম। আল্লাহর তাওহীদ, নবীর মর্যাদা, পরকালের বিশ্বাস, জান্নাত-জাহান্নামের অস্তিত্ব, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, পুলসিরাত, আরশ-কুরসী ও লাওহ-কলমের অস্তিত্ব– এসব গায়েবী বিষয় সকল নবীর যুগেই এক ছিল। অবশ্য হালাল-হারামের আহকাম, যাকে আমরা আমলী প্রোগ্রাম বলে থাকি, সেই আমলী প্রোগ্রামে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হচ্ছিল। শেষ পর্যায়ে এসে তাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল। শরীয়ত এমনই পরিপূর্ণ হয়ে গেল যে, এখন আর তাতে হ্রাস-বৃদ্ধির কোনোই অবকাশ নেই।

এর দৃষ্টান্ত হুবহু এমন– যেমন একটি শিশু জন্ম নেবার পর তার গায়ের জন্য এক বিঘাত সাইজের জামা তৈরি করা হয়। এ জামাও তার গায়ে বড় হয়ে যায়, শিশুটি যেন পোশাকের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। এই শিশুই যখন আস্তে আসস্তে বড় হতে থাকে তখন পোশাকের মাপও বড় হতে থাকে। মানুষটি কিন্তু সেই একই মানুষ; কিন্তু পোশাক তার বারবার পরিবর্তন হচ্ছিল। (এক পর্যায়ে সে যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় তখন তার পোশাকের মাপের মধ্যে স্থিরতা আসে, পূর্ণতা আসে। আর কখনো এ মাপের পরিবর্তন ঘটে না)। দীনের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ শুরু থেকেই একই দীন ছিল কিন্তু আমলী প্রোগ্রামের পোশাক পরিবর্তন হচ্ছিল।

দীনের একাত্মতা

যুগে যুগে নবীগণ আগমন করছিলেন আর নানা ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটছিল, কিন্তু দীন সকলের একই ছিল–

كَانَ دِيْنُ الْاَنْبِيَاءِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

সকল নবী-রাসূলের দীন ছিল তাওহীদ। আল হাদিস।

অর্থাৎ একই সত্তাকে মান্য কর। একজনকেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে মেনে নাও। একজনকেই উপকার ও অপকারের মালিক মনে কর। একজনকেই পথ-প্রদর্শক মনে কর। একই সত্তাকে মৃত্যু ও জীবনদাতা বলে মেনে নাও। তিনি ছাড়া অন্য কারো হাতে জীবন বা মৃত্যুর ক্ষমতা নেই। কারো হাতে হেদায়াত বা পথপ্রদর্শনের ক্ষমতা নেই। এগুলো কেবল আল্লাহর কাজ। আমাদেরকে নাজাত বা মুক্তি দেওয়াও তাঁরই কাজ। তো সকল নবী আ.-এর দীন ছিল তাওহীদ। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ○

এমন কোনো রাসূল আমি পৃথিবীতে প্রেরণ করিনি যিনি এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত কর। [আম্বিয়া ২১ : ২৫]

না নবীগণের ইবাদত করো, না আউলিয়াগণের ইবাদত করো, আর না ওলামা-মাশায়েখদের ইবাদত করো। ইবাদতের উপযুক্ত কেবল একই সত্তা। সেই সত্তা হলেন মহান আল্লাহ। কেননা জীবন দানকারী ও জীবন হরণকারী কেবল তিনি। জীবিত করার ব্যাপারে (নাউজুবিল্লাহ) যদি তাঁর কোনো শরিক থাকতো, যথা কিছুটা আপনার-আমার শক্তি এবং কিছুটা আল্লাহর শক্তি একত্র করে কাউকে মৃত্যু দেওয়া হতো কিংবা আল্লাহ ও বান্দার শক্তির সমন্বয়ে কাউকে জীবন দেওয়া হতো এবং এভাবে মৃত্যু ও জীবনদানের ব্যাপারে যদি কারো অংশীদারিত্ব থাকতো তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রেও অংশীদারিত্ব তৈরি হতো। সুতরাং আল্লাহরও ইবাদত করত এবং যারা তাঁর শরিক তাদেরও ইবাদত করত।

কিন্তু বাস্তবতা হলো এই– জীবন, মরণ, সুস্থতা ও অসুস্থতার মালিক এবং রিযিকদাতা একমাত্র তিনি এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড তাঁরই হাতে। সুতরাং ইবাদতও একমাত্র তাঁরই হবে। এটা কী-করে সম্ভব যে, কাজ করবেন তিনি আর ভিক্ষা চাইবে অন্যের কাছে, অন্যের সামনে কপাল ঠুকবে। জীবন ও মৃত্যুর বাগডোর যাঁর হাতে তাঁরই ইবাদত করা হবে। তো কুরআনের উক্ত অয়াতে বলা

হয়েছে যে, সকল নবী-রাসূলের তালিম এই ছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁকেই ভয় কর।

যদি তাঁকে ভয় কর তাহলে অন্যদেরকে ভয় করা ছেড়ে দেবে। আর যদি তাঁকে ভয় না কর তাহলে অন্য সকলকেই ভয় করতে হবে। যদি তাঁরই ইবাদত কর তাহলে অন্য সকলের ইবাদতকে ত্যাগ করবে। যদি তাঁর ইবাদত না কর তাহলে দ্বারে দ্বারে মাথানত করতে হবে।

তাওহীদ বর্জনের অভিশাপ

দেখুন, কেউ আজ আপনার সামনে মাথানত করছে, কেউ পাথরের সামনে মাথানত করছে, কেউ আগুনের সামনে মাথানত করছে, কেউ পানির সামনে অবনত হচ্ছে। আমি বলি, এগুলো শির্ক নয়, এ হলো অভিশাপ। যখন এক সত্তার ইবাদত করলো না তখন এক একটি জিনিসের সামনে নাকে খত দিয়ে এখানেও লাঞ্ছিত হয়ে থাকে, ওখানেও লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে। মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত ও ইজ্জতদার বানিয়েছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে যেন তার মস্তক অবনত না হয়। সে যখন নিজেই নিজেকে সম্মানের স্থান হতে বিতাড়িত করলো তখন তাকে বিভিন্ন মাখলুকের সামনে মাথা নোয়াতে হলো, অপদস্থ হতে হল। অথচ এই আগুন, পানি, মাটি, বাতাস হলো আমাদের কাদেম, আমাদের সেবক। এগুলো আমাদের মাবুদ কী-করে হয়? এগুলো দ্বারা তো আমরা উপকৃত হই, কাজ করি। পানি দ্বারা আমরা ময়লা ও কদার্য পরিষ্কার করি। তা ছাড়া পানির ধর্ম হলো নীচের দিকে ধাবিত হওয়া। আপনি যদি একে পাইপ দ্বারা আট/দশ তলায় নিতে চান, সে যেতে বাধ্য। আপনি পানির বাধ্য নন, পানি আপনার বাধ্য। সে নীচের দিকে যেতে চায়, আপনি তাকে তার স্বাভাব-বিরুদ্ধ উর্ধ্ব দিকে পরিচালিত করেন।

আগুনের ধর্ম হলো উর্ধ্বমুখিতা। সে উপরের দিকে যেতে চায়। আগুনের শিখা উপরেরর দিকে যায়। নীচের দিকে যায় না। কিন্তু মেশিনের মাধ্যমে আপনি তাকে নীচের দিকে নিয়ে যান। মেশিন চলছে, শিখা বাধ্য হয়ে নীচের দিকে যাচ্ছে। তো আগুন আপনাকে বাধ্য করেনি, আপনি আগুনকে বাধ্য করেছেন। জমিন আপনার বাধ্য, আপনার কাছে পরাজিত, আপনি জমিনের কাছে পরাজিত নন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ○ سورة الملك ٦٧: ١٥

অর্থাৎ আমি জমিনকে তোমাদের অনুগত করেছি, বাধ্য করেছি। আল্লাহ তায়ালা বাধ্য ও অনুগত বুঝাতে এখানে 'জালিল' শব্দটি ব্যবহার না করে 'অধিকতর বাধ্য' বুঝাতে মুবালাগার শব্দ 'জালুল' ব্যবহার করেছেন। এ জমিনকে আপনি কাটেন, খনন করেন, চাষ দিয়ে ধুলোয় পরিণত করেন, বেচারী টুঁ-শব্দটি করে না। তেমনিভাবে তাতে পানি প্রবাহিত করেন, পুকুর-নালা খনন করেন, কোনো চুঁ-চেরা করে না। তো জমিন আপনার অনুগত, আপনি জমিনের অনুগত নন।

বাতাসেরও একই অবস্থা। আপনি বাতাসকেও আপনার বাধ্য-অনুগত করে রেখেছেন। শূন্যমণ্ডলে পরিপূর্ণ যে বাতাস, এই বাতাস যখন আপনার আয়ত্বে চলে আসে তখন তাকে আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করেন। সাইকেলের টিউবের মধ্যে আপনি তাকে বন্দি করে রেখেছেন। বের হতে চাচ্ছে কিন্তু যেতে পারছে না। এমনিভাবে পাঁচ আনার বেলুনে আপনি বাতাসকে বন্দি করে রাখেন। বেলুনকে নীচের দিকে নিক্ষেপ করবেন, সে ছিটকে উপরের দিকে উঠবে। এতো বাতাস-ই। বের হতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না। আপনি তাকে বন্দি করে রেখেছেন। মোটকথা, বাতাস আপনার কাছে অসহায়, আপনার বাধ্য, অনুগত।

আগুনেরও একই অবস্থা। এই যে বিজলী বা বিদ্যুৎশক্তি আপনাদের সামনে রয়েছে, এ বিদ্যুৎই পাহাড়কে পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। এ বিদ্যুৎ যখন মানুষের হস্তগত হলো তখন তাকে পাতল এক তারে বন্দি করে রাখল। পাহাড়কে যে চুরমার করে দেয় মানুষের হাতে এসে সে বন্দি হয়ে গেল। এখন সে চুঁ-চেরাও করতে পারছে না, বন্দি হয়ে রয়েছে। বিদ্যুৎ কী হলো? মানুষের খাদেম হল। তো খাদেমের কাজ হলো এই যে, সে মানুষের সামনে মাথানত করবে। মানুষ উল্টা কাজ শুরু করে দিল। নিজে খাদেমের সামনে মাথানত করতে শুরু করল। কখনো আগুনের সামনে, কখনো পানির সামনে, কখনো গাছের সামনে অবনত হল। এগুলো তো তোমার খাদেম। তোমার ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলোর কাজ হলো তোমার আনুগত্য করা– না এই যে, মানুষের মতো সম্মানিত সত্তা এগুলোর সামনে মাথানত করবে, এদের আনুগত্য করবে। সুতরাং মানুষের জন্য মাথানত করার মতো শুধু এক সত্তা বিদ্যমান রয়েছেন। চন্দ্র-সূর্য, গাছপালা ও পাহাড়-পর্বত যাঁর হাতে রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ○

তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও সিজদা করো না, সিজদা কর সেই আল্লাহর যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। [হা-মীম সিজদাহ ৪১ : ৩৭]

এগুলোকে আল্লাহ তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সূর্য উদিত হয়ে আলো ছড়ায়, যেন তোমরা কাজকর্ম করতে পার। রাতের বেলা চাঁদ ওঠে। রাতেও যদি সূর্য থেকে যেত তাহলে খুব মুশকিল হয়ে যেত। রাতের বেলায় তাই তিনি নক্ষত্রের ব্যবস্থা করেছেন, যাতে রয়েছে ঠাণ্ডা আলো। দিনে করেছেন প্রখর আলোর ব্যবস্থা, রাতে করেছেন শীতল আলোর ব্যবস্থা। তো যিনি এই উভয় আলোর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি প্রবল পরাক্রমশালী– তিনি ইবাদতের যোগ্য হবেন, নাকি এই চাঁদ-সূর্য ইবাদতের যোগ্য? এগুলো তো তাঁর কুদরতের প্রকাশ যে, কোনোটার মধ্যে গরম আলো এবং কোনোটার মধ্যে ঠাণ্ডা আলো সৃষ্টি করেছেন। পাহাড়সমূহকে বড়ত্ব ও উচ্চতা দান করেছেন, আসমানকে উর্ধ্বে তুলে রেখেছেন, কিন্তু সবার বড়ত্ব অপেক্ষা যিনি বড় সত্তা, সবার আযমত অপেক্ষা যার আযমত বহু উর্ধ্বে তিনি হলেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সত্তা।

সকল নবী-রাসূলের দীনই এই ছিল যে, আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে কর এবং তাঁর সম্মানে মাথানত কর।

তাওহীদের প্রভাব

একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার দ্বারা কলবে শক্তি আসে।

یک در گیر محکم گیر

দৃঢ়তার সাথে একটি দরোজা আকড়ে থাক।

যিনি একজনে বিশ্বাসী হন তার কলবে এ দৃঢ়তা আসে যে, আমার মনিব আমার সাথে রয়েছেন। বহু মনিবের গোলাম কোনো মনিবের খেদমত করতে পারে না। একজনের প্রতি ধাবিত হলে তার মনে আশংকা তৈরি হবে যে, অন্যজন আবার হারিয়ে না যায়, মনঃক্ষুণ্ন না হয়। দ্বিতীয়জনের প্রতি ধাবিত হলে তৃতীয়জনের ব্যাপারে আশংকা তৈরি হবে যে, সে যেন মনঃক্ষুণ্ন না হয়। সুতরাং বহু মনিবের

খেদমত কোনো মনিবের খেদমত করতে পারে না। গোলাম যখন খেদমত করবে, একই মনিবের করবে, যার ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকবে যে তারই হাতে আমার মৃত্যু নিহত রয়েছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের হাতে উপকার ও অপকার, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব এবং জীবন ও মৃত্যু রয়েছে। এ কারণে তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। সকল নবী আ. তাদের উম্মতকে এ তালিমই দিয়েছেন। অত্র আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল এই, সকল নবী আ.-এর দীন একই ছিল। শরীয়ত কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যেমনিভাবে মানুষের পোশাক পরিবর্তন হতে থাকে কিন্তু ব্যক্তি একই থাকে, ঠিক তেমন। যে শিশু এক সময় এক বিঘাত পোশাক পরিধান করেছে আজ সে আড়াই গজের পোশাক পরিধান করবে। কেননা তার বয়স এখন বিশ বছর হয়ে গেছে। দৈহিক কাঠামো যখন তার পূর্ণতাপ্রাপ্ত তখন আর বৃদ্ধির অবকাশ থাকল না। এখন সে যে পোশাক পরিধান করবে তার মাপ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। এটা কমও হতে পারে না, বেশিও হতে পারে না। কেননা হ্রাস-বৃদ্ধি তো তখন হয় যখন মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার অবকাশ থাকে। যখন তার দৈহিক কাঠামো পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলো তখন আর বৃদ্ধির অবকাশ রইল না। এখন পোশাকের মাপ নির্দিষ্ট হয়ে গেল। মোটকথা, সকল নবীর দীন একই ছিল, শরীয়ত পরিবর্তন হচ্ছিল। এ জন্যই ইবাদত কেবল একই সত্তার করা হবে।

ইবাদত ও তাজিমের পার্থক্য

ইবাদত করা হবে একমাত্র আল্লাহর। তবে ইবাদত ও তাজিম বা সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন জিনিস। কোনো জিনিসের তাজিম করার নির্দেশ থাকলে তার তাজিম করতে হবে।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম সদরুল মুদাররিস হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব ছিলেন কাশফ ও কারামতের অধিকারী বুযুর্গ এবং কামেল অলি। অধিকাংশ সময় তাঁর মধ্যে জযবার হালাত বিরাজ করত। একবার হযরতের মনে খেয়াল জাগল, গঙ্গা নদীর উৎস কোথায়? নানা সম্প্রদায়ের লোকজন কেন এ নদীকে এমনভাবে সম্মান প্রদর্শন করে? কী এর কারণ? যেই মুহূর্তে এই চিন্তা মাথায় এল তখনই উঠে সফর শুরু করলেন। দেওবন্দ হতে চল্লিশ মাইল দূরে গঙ্গার অবস্থান। তিনি সফর করে গঙ্গার উৎস পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গা নদীর উৎস। জায়গাটির নাম গঙ্গোত্রী (গঙ্গোত্রী হিমবাহ হতে উৎপন্ন বলে নদীটির নাম হয়েছে গঙ্গা, যার বাংলাদেশ অংশের

নাম পদ্মা)। ওখানে তিনি সাতদিন অবস্থান করলেন। অতঃপর ফিরে এসে জানালেন, আমি গঙ্গার উৎসস্থলে গিয়ে রোজা রেখেছি, ইবাদত করেছি, জিকির ও তিলাওয়াত করেছি। এভাবে প্রচুর ইবাদত করতে থাকলাম। এরপর আমার এই কাশফ হলো যে, গঙ্গার উৎস্থলে আমি নবুওয়াতের নূর অনুভব করলাম। হয়তো ওখানে কোনো নবীর কবর রয়েছে অথবা ওটা কোনো নবীর বসার স্থান, যেখানে বসে তিনি কওমকে হেদায়াত করেছেন। নবীর সে বরকতের প্রভাব এ পানিতে রয়েছে বিধায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন একে সম্মান করছে।

কথা হলো, কোনো কিছুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এক জিনিস আর ইবাদত করা আরেক জিনিস। ইবাদত জায়েজ নেই, আযমত বা সম্মান প্রদর্শন আবশ্যকীয়।

জমজমের পানিকে আমরা সম্মান দেই, তাজিম করি। এ জন্য যে, এটি হযরত ইসমাইল আ.-এর সাথে সম্পর্কীত। হযরত হাজেরা আ. এর সাথে হযরত ইসমাইল আ. ছিলেন। ছোট্ট শিশু। পিপাসা লেগেছিল। তাঁরা অবস্থান করছিলেন এমন এক স্থানে যাকে বলা হয় وَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ তথা গাছপালাহীন বিরান মরুপ্রান্তর। যেখানে আজ বাইতুল্লাহ রয়েছে। তখন এখানে ছিল ধু-ধু মরুপ্রান্তর। কোথাও পানির কোনো চিহ্ন ছিল না। শিশু ইসমাইল আ. পিপাসায় ছটফট করতে শুরু করলেন। হযরত জিবরাঈল আ. এসে স্বীয় পাখা দ্বারা জমিনে আঘাত করলেন। আঘাতের ফলে জমজম কূপের সৃষ্টি হল। সুতরাং জমজমের সাথে হযরত ইসমাইল আ.-এর সম্পর্ক থাকায় একে তাজিম করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আপনি তাজিমের সাথে এ পানি পান করে থাকেন। সকল পানি বসে পান করা সুন্নাত কিন্তু জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত। এটা করা হয় সম্মানের কারণে। হাদিসে আরো এসেছে–

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَه

জমজমের পানি পান করে যে দোয়া করবে আল্লাহ তা কবুল করবেন।

সুতরাং জমজম পানি পান করার পূর্বে নিজের কিছু উদ্দেশ্য হাসিলের নিয়ত করা উচিত। আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা রয়েছে, উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হবে। সাধারণ সব পানিতে এ বিষয়টি নেই। এটা কেবল জমজমের বৈশিষ্ট্য। এ জন্যই সকল মুসলমান জমজমের সম্মান করে। পাত্রে ভরে নিয়ে আসি। এ পানির ফোঁটা মাটিতে পড়তে দেই না। কেননা এ পানি সম্মানিত পানি, পবিত্র পানি। কিন্তু এ পানিকে সিজদা করি না, পূজা করি না। সিজদা করি একমাত্র আল্লাহর জাতকে, আল্লাহর সত্তাকে।

সম্মানপ্রদর্শনমূলক সিজদা

তদ্রূপ নবী আ.গণের সম্মান করা আপনার উপর কর্তব্য। সামান্য অসম্মান করলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবেন, ঈমানহারা হয়ে যাবেন। এ কথা কেবল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে নয়, সকল আম্বিয়া আ.-এর ব্যাপারে। তো তাজিমপ্রদর্শন এমনই এক বিষয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত নবীর তাজিম করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানই শুদ্ধ হবে না। কিন্তু নবীর ইবাদত করা জায়েজ নেই। নবীকে সিজদা করা যাবে না। শরীয়ত নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সিজদা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এ কী করলে? উক্ত সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রুম ও পারস্যের বাদশা কায়সার ও কিসরার দরবারে কেউ উপস্থিত হলে বাদশাকে সিজদা করে। আল্লাহর রাসূল তাদের অপেক্ষা অধিক সিজদা পাওয়ার যোগ্য বিধায় আমি সিজদা করেছি। আল্লাহর রাসূল বললেন–

> 'গাইরুল্লাহকে সিজদা করা হারাম। আমি যদি কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম তাহলে নারীদেরকে অনুমতি দিতাম যে তারা যেন তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করে।'

কিন্তু তাদের জন্য সিজদা নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ। এ জন্যই এ কাজ কখনোই করা যাবে না। নবী হোক বা অন্য যে কেউ হোক, কারো ইবাদত জায়েজ নেই। সম্মানপ্রদর্শনমূলক সিজদাও করা যাবে না। কেননা উক্ত সাহাবী তো তাজিমী সিজদাই করেছিলেন; ইবাদত তো করেননি। তাকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিলেন। সুতরাং গাইরুল্লাহর সামনে ইবাদতের আকৃতি গ্রহণ করাও অনুচিত। কিন্তু তাজিম করা আবশ্যক।

তাজিমের মাপকাঠি

আমরা আম্বিয়া আ. ও আল্লাহর অলিগণের তাজিম করব। অলিগণের জবান থেকে যদি এমন বাক্য বের হয় যা বাহ্যত শরীয়ত বিরোধী তাহলে আমরা তার তাবিল ও ব্যাখ্যা খুঁজবো। এমন নয় যে, আমরা বেয়াদবি ও অমর্যদা করব। তো আল্লাহওয়ালাদের পর্যন্ত অমর্যদা করা জায়েজ নেই। আম্বিয়া আ. তো আরো বহুগুণ উর্ধ্বে।

এমনকি হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. তাঁর কোনো কোনো কিতাবে এমনও লিখেছেন যে, হিন্দুদের যেসব বড় বড় ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাদেরকে তারা অনুসরণ করে থাকে, যেমন শ্রী কৃষ্ণজি, শ্রী রামচন্দ্রজি প্রমুখদের নাম নিয়ে এদের শানে বেয়াদবি হয় এমন কিছু করো না। সম্ভাবনা রয়েছে যে, এরা হয়তো নিজ যুগের পয়গম্বর বা হকপন্থী লোকও হতে পারেন। আমরা যদি প্রমাণ দ্বারা অবগত হতে পারতাম যে, বাস্তবিকই তারা পয়গম্বর ছিলেন, তাহলে আমরা তাদের উপর সেভাবে ঈমান গ্রহণ করতাম যেভাবে হযরত মুসা বা ঈসা আ.-এর উপর ঈমান রাখি। কিন্তু যেহেতু তাদের নবী হওয়া দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং তারা স্বীয় যুগের নবী হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে সেহেতু হযরত নানুতুবী রহ. বলেছেন যে, তাদের শানে বেয়াদবি হয় এমন বাক্য যেন না বলা হয়। সম্ভাবনা রয়েছে যে, তারা আল্লাহর পক্ষ হতে শরীয়ত নিয়ে আগত হক পন্থীও হতে পারেন। কিন্তু যেমনিভাবে হযরত মুসা ও ঈসা আ.-এর শরীয়তকে তাদের কওম বিকৃত করে ফেলেছে, এখানেও তদ্রূপ ঘটেছে। নবীগণ যখন শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন তখন তা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত একই ছিল। পরবর্তীতে লোকজন তাতে নানাবিধ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে তাকে বিকৃত করে ফেলেছে, মিথ্যা সংযোজিত করেছে। কিতাবের মধ্যে রদ-বদল করেছে। এই বিকৃতির দায়ভার কওমের উপর। পয়গম্বর এ থেকে মুক্ত। তাঁরা স্বীয় সময়ে হক ছিলেন। তো পরিবর্তন করা হলো কওমের কাজ; তবে যেখানেই কিতাবের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সেখানেই তা আসমান হতে অবতীর্ণ। তার উপর ঈমান গ্রহণ আবশ্যক। যেসব পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে নির্দিষ্টভাবে তাদের উপর এবং যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি অনির্দিষ্টভাবে তাদের উপর ঈমান গ্রহণ আবশ্যক।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো ঘটনা আমি আপনার কাছে বর্ণনা করেছি এবং কারো কারো ঘটনা আপনার কাছে বর্ণনা করিনি। [মুমিন ৪০ : ৭৮]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, কিছু কিছু নবীগণের ঘটনাবলি আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি। তাঁদের নামও বলে দিয়েছি। আবার এমন নবীও রয়েছেন যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। আমি যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের প্রতি নামসহ ঈমান গ্রহণ কর। আর যাদের নাম উল্লেখ করিনি তাদের ব্যাপারে

এভাবে বলো যে, আল্লাহর যত পয়গম্বর পৃথিবীতে আগমন করেছেন তাদের সকলের প্রতি ঈমান গ্রহণ করলাম।

সুতরাং তাজিম এক জিনিস আর ইবাদত আরেক জিনিস। আম্বিয়া ও আউলিয়াগণেরও তাজিম করতে হবে এবং ওলামায়ে রব্বানী ও মাশায়েখে হক্কানীরও তাজিম করা আবশ্যক। কিন্তু করোরই ইবাদত করা যাবে না। ইবাদত কেবল এক আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্যই করা হবে। তিনিই মালিক এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁরই হাতে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের বাগডোর। এভাবে সকল নবী আ. তাওহীদের বাণীর প্রচার করেছেন। বলেছেন, একমাত্র আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে মান্য কর। ইবাদত স্বরূপ অন্যের সামনে মাথানত কর না। যথাযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে সম্মানপ্রদর্শন কর।

প্রভুত্বের গুণাবলি

আগুন হোক বা পানি, বায়ূ হোক বা মাটি– সবগুলোকেই আমরা গুরুত্ববহ ভাববো, সম্মান করব। কেননা এগুলো আল্লাহর এক বরকতময় সৃষ্টি। মাটিও তাঁর এক মহান দান, যার মাধ্যমে আমাদের শস্য, ফলফলাদি ও অন্যান্য জিনিস তৈরি হয়। আবার আমরা নিজেরাও এ মাটি হতেই সৃষ্ট। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মাটি আমাদের মাতৃস্থানীয়। এ কারণেই 'মাতৃভূমি'র ধারণা বিশ্বজনীন। অর্থাৎ যে মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি সে মাটিকে মা জ্ঞান করে। কোনো কোনো রেওয়ায়াতেও এ বাক্য রয়েছে যে, জমিন মায়ের মত। এভাবেই মাতৃভূমির ধারণা ও শব্দ বিশ্বময় বিস্তৃত। কেননা এ মাটির খামিরা দ্বারা আমরা সৃষ্টি হয়েছি, এ মাটি হতে আমাদের খাদ্য উৎপন্ন হয়। একে আমরা মায়ের স্থানে জ্ঞান করব। আল্লাহর এক মহান দানরূপে আমরা মাটিকে সম্মান করব কিন্তু তার ইবাদত করব না। আগুনকেও আমরা আল্লাহর এক মহান দান মনে করি কিন্তু তার ইবাদত করব না। শীতে আগুন ছাড়া তাপ পাওয়া যায় না, আগুন ব্যতীত খাদ্য পাকানো সম্ভব নয়– এসব যুক্তিতে আগুনের ইবাদত করতে পারি না। কেউ আগুনের ইবাদত করলে আমি বলব– এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতার বিষয় আর কী হতে পারে! কেননা যখন আগুনের দিকে ঝুঁকে যাবে তখন যদি অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তখন সর্বাগ্রে সেই ব্যক্তি ভস্ম হয়ে যাবে যে তাকে সিজদা করছে। আগুনের এ অনুভূতি নাই যে, এ ব্যক্তি আমাকে মান্য করছে, আমার পূজারী, আমি একে রক্ষা করব এবং অন্যদেরকে মুহূর্তের মধ্যে খতম করে দেব। কে তার উপাসক এবং কে উপাসক নয়– এ অনুভূতি যে উপাস্যের নেই

সে কী-করে ইবাদতের যোগ্য হয়? কে শত্রু আর কে মিত্র তাও সে চিনতে পারে না।

তদ্রূপ পানির ব্যাপারটি ধরুন। কেউ পানির ইবাদতে রত হল। যদি তুফান আসে তবে সর্বাগ্রে ঐ ব্যক্তি নিমজ্জিত হবে যে ইবাদত করছে। পানির এ খেয়াল হবে না যে, এই ব্যক্তিকে আমি নিমজ্জিত করব না, এতো আমার ইবাদত করছে; আমি অন্যদেরকে ডুবাবো। তো যে মাবুদের এ জ্ঞানটুকু নেই যে কে আমার আবেদ এবং কে আবেদ নয়, কে আমার অনুগত এবং কে অনুগত নয়, সে মাবুদ কী-করে ইবাদতের যোগ্য হয়? তিনিই কেবল ইবাদতের যোগ্য যিনি আলিম ও খবির– সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন।

اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না! (অবশ্যই জানবেন)। [মুলক ৬৭ : ১৪]

তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা। যিনি সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই অবগত ছিলেন যে কী সৃষ্টি করছি। সৃষ্টি করার পরেও তিনি জানেন যে, আমি কী সৃষ্টি করেছি। এর পরিণতি সম্পর্কেও তিনি অবগত যে এর ফলাফল কী দাঁড়াবে। সুতরাং শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সবকিছু সম্পর্কে যিনি সম্যক জ্ঞাত তিনিই কেবল ইবাদতের যোগ্য। তো সকল নবী আ. একই জিনিসের তালিম দিয়েছেন, আর তা হলো তাওহীদ।

তাওহীদের পূর্ণতা

তাওহীদের জন্য নবুওয়াতের স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক। অন্যথায় তাওহীদ পূর্ণ হয় না। কেননা তাওহীদের অর্থ হলো একজনকে সর্বময় কর্তা বলে স্বীকৃতি দাও, একজনেরই সন্তুষ্টি অর্জন কর, একই সত্তার ইচ্ছা মাফিক চল এবং তাঁর অপছন্দনীয় বিষয়াবলি পরিহার কর। তিনি যাতে খুশি হন তাই গ্রহণ কর। দীনের মূল কথা দাঁড়াচ্ছে এই– আল্লাহর সন্তুষ্টি মাফিক আমল কর এবং তাঁর অসন্তুষ্টি হতে দূরে থাক। যা নির্দেশ করেছেন তা মান্য কর, যা নিষেধ করেছেন তা হতে বেঁচে থাক। সুতরাং সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি রক্ষা করে চলাই মূলত দীনের রূহ। কিন্তু আপনি এ কথাও জানেন যে, কারো মনের খবর সে নিজে বলে দেওয়া ব্যতীত অন্য কারো বুঝে আসতে পারে না। দু'জন সহোদর ভাই যদি একে অপরের বুকের সাথে বুক মিলিয়ে বসে থাকে তবু একজনের মনের কথা অন্যজনের মনে স্থানান্তরিত হবে না। যতক্ষণ না অন্যজন মুখ দ্বারা প্রকাশ করে

যে, অমুক জিনিস দ্বারা আমি খুশি হব এবং অমুক জিনিস দ্বারা নাখোশ হব। তো আপন দু'ভাই, যারা একই প্রজাতি এবং একই বাবামার সন্তান, একই মাতৃগর্ভে যারা লালিত হয়েছে– তাদেরও মনের খবর একজন বলে দেওয়া ব্যতীত অন্যজন অবগত হতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত, যিনি হচ্ছেন একচ্ছত্র নূরের অধিকারী এবং মানুষ হচ্ছে চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত; তিনি ঊর্ধ্ব হতে মহা ঊর্ধ্বে আর মানুষ অধঃ হতে অধস্তনে; বান্দার সাথে খোদার কোনোই সংযোগ-সম্পর্ক নেই– সেই আল্লাহর সন্তুষ্টির ইলম তিনি বলে দেওয়া ব্যতীত মানুষ কী-করে বুঝবে? যতক্ষণ না তিনি নিজে জানিয়ে দেবেন যে অমুক জিনিসে আমি সন্তুষ্ট, অমুক জিনিসে অসন্তুষ্ট, অমুক জিনিস পারিহার কর এবং অমুক জিনিস গ্রহণ কর, এ হলো আমার নির্দেশ ও অর্ডার– ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারবো না।

এ ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি এই হতে পারে যে মহান আল্লাহ নিজে ঘরে ঘরে উপনীত হয়ে ঘোষণা করবেন যে, অমুক জিনিসে আমি সন্তুষ্ট এবং অমুক জিনিসে অসন্তুষ্ট। এভাবে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে নিজে অবহিত করবেন। কিন্তু ইহা তাঁর মহান শানের উপযুক্ত নয়। দুনিয়ার সামান্য রাজা-বাদশাগণ, যাদেরকে আমরা নিজেরাই নির্বাচন করি। বাদশাহী তার সত্তাগত বিষয় নয়, আমরা ভোট দিয়েছি বলে বাদশা হয়েছেন। ভোট না দিলে বাদশা হতে পারতেন না। সেই ব্যক্তিরা বাদশা হয়ে যাওয়ার পর মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে আইন-কানুন জানিয়ে দেওয়াকে নিজের জন্য লজ্জাজনক মনে করেন। এ কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেন। প্রধানমন্ত্রী দেন গভর্ণরকে, গভর্ণর দেন কমিশনারকে, কমিশনার দেন তহশিলদারকে এবং তহশিলদার একজন সুইপারকে ডাক দিয়ে বলেন, এলাকায় ঘোষণা করে দাও যে, বাদশা এই নির্দেশ দিয়েছেন। এভাবে বাদশার কথা প্রজাদের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে। দুনিয়ার বাদশা, যাদেরকে আমরা নিজেরাই নির্বাচন করি তাদেরও ঘরে ঘরে গিয়ে আইন কানুন প্রচার করতে আত্মমর্যাদায় বাধে। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যিনি বাদশাদের বাদশা, তাঁর পক্ষে কী-করে সমীচীন হয় ঘরে ঘরে গিয়ে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া? তিনি নিজের উজির নিযুক্ত করেন। আর এই উজির হলেন হযরত আম্বিয়া আ.গণ। যাঁদের অন্তরে স্বীয় ওহী অবতরণ করেন। ওহীর মাধ্যমে ঘোষণা করেন যে, এই আমার বিধান। আমি একক ও তুলনাহীন। ওহীর দ্বারা হযরত আম্বিয়া আ. জেনে নিয়েছেন যে, আমাদের মালিক একজন। আর এই এক হওয়াটা হলো তাঁর শান। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

إِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ

হযরত মুসা আ.-এর কলবে ওহী অবতীর্ণ করেছেন যে, আমি হলাম আল্লাহ। আমি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত কর না। [ত্বহা ২০ : ১৪]

নিজের শান বর্ণনা করেছেন এভাবে:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

আমার মতো কেউ নেই। না আমার কোনো শরীর আছে, না আমর বিপরীত কেউ আছে, না আমার কোনো সমতুল্য বা শরিক আছে। قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ হে নবী! আপনি বলে দিন, আল্লাহ এক। اللهُ الصَّمَدُ আল্লাহ হলেন সামাদ। সামাদ অর্থ হলো অমুখাপেক্ষিতা। অর্থাৎ সবকিছু তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী এবং তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তিনি রূহ দেওয়া ব্যতীত জীবন লাভ সম্ভব নয়, তিনি মৃত্যু দেওয়া ব্যতীত মৃত্যু আসা সম্ভব নয়। তিনি আমাদেরকে টিকিয়ে রাখা ছাড়া আমরা টিকে থাকতে পারি না। সবকিছু তাঁর কুদরতি হাতে। সুতরাং আমরা আমাদের মৃত্যু ও জীবন, ধ্বংস ও স্থায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর অস্তিত্ব তাঁর নিজস্ব, কোথাও তিনি অস্তিত্ব চাইতে যাননি। তাঁর কুদরত তাঁর নিজস্ব, তিনি অন্যের কাছে কুদরত চাইতে যাননি। তাঁর ইলম তাঁর নিজস্ব, তিনি অন্যের কাছে কখন্ বলেছিলেন যে আমাকে ইলম দাও?

মাবুদ হওয়ার যোগ্যতা

ইলম ও কুদরত হলো আল্লাহর নিজস্ব গুণাবলি। তাঁর ইলমের সামান্য ছায়া যখন আমাদের উপর পড়ে তখন আমরা আলেম বলে সম্বোধিত হতে থাকি। তাঁর কুদরতের সামান্য দূরবর্তী ছায়া যখন আমাদের উপর পতিত হয় তখন আমরা কাদির বলে আখ্যায়িত হই। অর্থাৎ আমাদেরও কিছু শক্তি থাকার, সামর্থ্য থাকার স্বীকৃতি পাই। তো মূল কুদরতময় হলেন একজন। যার উপর তিনি তাঁর কুদরতের নূরের আভা ছড়িয়ে দেন তার ভেতরে নূর এসে যায়। যার উপর স্বীয় ঈলম ঢেলে দেন তাকে আলেম বলে স্বীকৃতি দেওয়া হতে থাকে। যার উপর স্বীয় আখলাকের রঙের ছটা ছড়িয়ে দেন তাকে দরবেশ বলা হতে থাকে। সর্বপ্রকার দান তাঁর পক্ষ হতে। কারো সত্তার ভেতর কিছুই নেই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, মানুষের সত্তা একেবারেই শূন্য ও সাদা। না তার মধ্যে ইলম আছে, না কুদরত বা শক্তি-সামর্থ্য আছে, আর না অন্য কোনো কামাল আছে। শুধু কামালাতকে গ্রহণ করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য রয়েছে।

জন্মগতভাবে মায়ের পেট থেকে কেউ কামালাত নিয়ে আসে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে বের করে এনেছেন, এ অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন; যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। [নাহল ১৬ : ৭৬]

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে যখন বের করে এনেছি তখন তোমাদের অণুপরিমাণ জ্ঞানও ছিল না। ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশু কেবল একটি মাংসপিণ্ড। না তার ভালর অনুভূতি আছে, না মন্দের অনুভূতি আছে, না কালোর জ্ঞান, না সাদার জ্ঞান। কোনোই পার্থক্য ক্ষমতা ও ইলম তার থাকে না। তো মাতৃগর্ভ হতে ইলমহীন অবস্থায় মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে। এ হলো মানুষের প্রাথমিক অবস্থা। মানুষের শেষ অবস্থা কেমন? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেনঃ

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ط .

অতঃপর পৌঁছে যায় জরাগ্রস্থ অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানতো সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকে না। [নহল ১৬ : ৭০]

অর্থাৎ শেষ পরিণতিতে এসে আমি তোমাদেরকে এমন অবস্থানে নিয়ে যাই যে, আলেম হওয়ার পরও তোমরা পুনরায় জাহেল হয়ে যাও।

নব্বই, একশ বছর হবার পর চোখ এখন জওয়াব দিয়ে দিয়েছে। চোখ জ্যোতিহীন হয়ে পড়েছে। চোখ দিয়ে দেখে ইলম অর্জন করা হতো, সে পথ বন্ধ হয়ে গেল। তদ্রূপ কানও জওয়াব দিয়ে দিয়েছে, কানে বধিরতা এসে ভর করেছে। তো শুনে শুনে যে ইলম অর্জিত হতো সে পথও বন্ধ হয়ে গেল। কিছু ইলম ছিল স্মৃতিতে সংরক্ষিত কিন্তু শেষ বয়সে এসে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে স্মৃতিতে সংরক্ষিত ইলমও শেষ হয়ে যায়। তো একদিকে নতুন করে ইলম অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল, অপর দিকে অতীতের ইলম শেষ হয়ে গেল। ফলাফল দাঁড়ালো এই– যেমন শূন্য জ্ঞানে পৃথিবীতে আগমন করেছিল তেমনই শূন্য অবস্থায় চলে গেল। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা বলে দিলেন যে,

তোমাদের সত্তায় কোনো ইলম নেই। আমি যখন ইচ্ছা করেছি ইলম ঢেলে দিয়েছি; যখন ইচ্ছা করেছি, বের করে নিয়েছি। এ জিনিস যদি তোমাদের সত্তাগত হতো তাহলে তোমরা জন্মগতভাবে আলেম হতে এবং আমৃত্যু আলেম থাকতে। মোটকথা আমাদের ইলম, আমাদের শক্তি-সামর্থ্য সবই তাঁর দান। সুতরাং এসব যিনি দান করেছেন তারই সম্মুখে আমরা অবনত হব। অন্যরা দেয়নি, সুতরাং তাদের সম্মুখে কী-করে অবনত হব? তাজিম-সম্মান করা ভিন্ন বিষয় কিন্তু ইবাদত করব না। নিজেকে হীনভাবে উপস্থাপন করব না। যা হোক, আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, এগুলো সব আমার দান। মানুষের প্রকৃত অবস্থা এই যে, না জন্মগতভাবে তার মধ্যে ইলম আছে আর না আখলাকী কামালাত আছে। আর যেটুকু সে লাভ করে তাও শেষ দিকে এসে হারিয়ে যায়। উদাহরণ প্রসিদ্ধ– শিশু ও বৃদ্ধ সমপর্যায়ের। অর্থাৎ শিশু যেমন মাসুম ও অন্যের উপর নির্ভরশীল, তারাও তদ্রূপ অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যতক্ষণ কেউ সাহায্য না করে , চলতে পারে না। বসিয়ে না দিলে বসতে পারে না। মোটকথা সম্পূর্ণ শিশুদের মতো পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অতঃপর তার মধ্যে নিষ্পাপতা চলে আসে, মাসুম হয়ে যায়। স্পষ্ট হলো যে, মানুষের সত্তা হলো শূন্য ও সাদা। তার মধ্যে কিছুই নেই। মানব সত্তা যখন শূন্য বলে প্রমাণিত হলো, তখন এ মানব কখনো ইবাদত পাওয়ার, উপাস্য হওয়ার যোগ্য হতে পারে না। সত্তাগতভাবে যে মূর্খ সে কী-করে মাবুদ হবে? মাবুদের শান হলো আলেম হওয়া।

মানুষ যখন মাবুদ হতে পারলো না তখন অন্য কোনো মাখলুকের পক্ষে মাবুদ হওয়া সম্ভব নয়। কেননা মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা। অন্যরা মানুষের চেয়ে নীচে, মানুষ অপেক্ষা হীন। মানুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণী জানোয়ার কি মাবুদ হবে? আগুন-পানি কি মাবুদ হবে– যাকে মানুষ অস্তিত্বহীনতা হতে অস্তিত্বে আনয়ন করে? মানুষের হাতে দিয়াশলাইয়ের খোঁচায় আগুন জ্বলে ওঠে এবং ফু দিয়ে তাকে নিবিয়ে ফেলা যায়, এই আগুন হবে মানুষের মাবুদ?

মানুষ মাবুদ হতে না পারলে অন্যসব জিনিস যা মানুষ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর এবং মানুষের খাদেম, তা কী-করে মাবুদ হতে পারে? এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। মানুষের মাবুদ হলেন সেই একমাত্র সত্তা যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। নবী আ.গণ উম্মতকে এ তালিমই দিয়েছেন। আম্বিয়া আ. সমগ্র পৃথিবীতে আগমন করেছেন এবং একই জিনিস নিয়ে আগমন করেছেন।

মাজহাবের ভিন্নতার কারণ

শুরুতে সকল মানুষ একই দীনের উপর ছিল কিন্তু যখন মানুষ নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির ব্যবহার শুরু করল তখন দীনের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি হতে লাগল। মানুষ যদি শুধু আনুগত্য করত, আল্লাহর রাসূল কর্তৃক আনিত বিষয়াবলি চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করত এবং তার উপর চলতো তাহলে কোনো বিরোধ-বিতর্ক হতো না। বিতর্ক তখনই হয় যখন উপর হতে আসা জিনিসের মধ্যে মানুষ বুদ্ধি বিবেক খাটাতে যায় এবং নির্বোধের মতো আকিদা তৈরি করতে যায়। এর দ্বারাই মানুষের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি হওয়া শুরু হয়ে যায়।

তেমনিভাবে কখনো কখনো অসীম ভালবাসার কারণে আকিদা বিকৃত হয়ে যায়। যথা– কোনো ব্যক্তির প্রতি অগাধ ভালবাসার কারণে তাকে প্রভুত্বের স্তরে পৌঁছে দেয়। কখনো কখনো চরম শত্রুতাবশত আকিদার মধ্যে বিকৃতি ঘটে। যথা– কারো প্রতি শত্রুতা এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, তার নাম উল্লেখ করে তাকে লানত করতে শুরু করো, নাম উল্লেখ করে তার দুর্নাম করতে থাকো। এ হলো বাড়াবাড়ি। এভাবে কখনো শত্রুতায় এবং কখনো ভালবাসায় বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আকিদা বিকৃত হয়ে যায়। যেমন হাদিস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.-এর ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন–

'হে আলী! তোমার ব্যাপারে কিছু কিছু লোক ভালবাসার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কিছু কিছু লোক শত্রুতার কারণে ধ্বংস হবে।'

কিছু ব্যক্তিবর্গ অতি ভালবাসার কারণে হযরত আলী রা.কে খোদা পর্যন্ত বলেছে। তারা বলেছে, আলী রা. হলেন আল্লাহর প্রকাশমান সত্তা (নাউজুবিল্লাহ)। তাদের আকিদা এমন শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে আল্লাহর সামনে যেমন মাথানত করে, তার সামনেও তদ্রূপ করতে লাগল। এরা ভালবাসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং রাফেজি মতামতের উদ্ভব করেছে।

খারেজিরা আলী রা.-এর শত্রুতায় ধ্বংস হয়ে গেছে। তাকে তারা মুসলমান বলেও মানে না। তাকে অভিশাপ দেওয়া, লানত করাও শুরু করেছে। তো কেউ ভালবাসার ক্ষেত্রে এবং কেউ ঘৃণার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ধ্বংস হয়েছে।

অথবা যেমন হযরত ঈসা আ.। তাঁর বরকতময় সত্তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে নাসারারা ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা তাঁকে আল্লাহ বলেছে, আল্লাহর পুত্র বলেছে, সাকার খোদা বলেছে। অর্থাৎ খোদা হলো দু'জন।

একজন নিরাকার, একজন সাকার। নূরানী নিরাকার খোদা উপরে রয়েছেন কিন্তু দেহধারী খোদা রয়েছেন নীচে, যিনি হযরত ঈসা আ.। তারা তাঁকে ইলমে গায়েব ও কুদরাতের অধিকারী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেসকল গুণাবলি আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য তার সবগুলো তার জন্য সাবেত করেছে। এভাবে তারা মুহাব্বতের মধ্যে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আকিদাকে ধ্বংস করে ফেলেছে।

পক্ষান্তরে ইহুদীরা শত্রুতার মধ্যে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এমনকি তারা ঈসা, আ.কে জারজ সন্তান (ولد غيًا) পর্যন্ত বলেছে (নাউজুবিল্লাহ)। বলেছে, বাজারের লোক ইউসুফ নাজ্জারের ঔরসে তাঁর জন্ম। তারা হযরত মারিয়াম আ.-এর উপর অপবাদ আরোপ করেছে।

যাই হোক, অতি ভালবাসা ও অতি ঘৃণা– এই দুটি জিনিস আকিদার মধ্যে ত্রুটি তৈরি করে এবং কখনো কখনো বুদ্ধি বিবেচনা খাটাতে গিয়ে আকিদায় ত্রুটি তৈরি হয়। কেননা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত জিনিসের মধ্যে বুদ্ধি বিবেক দ্বারা ঘাটাঘাটির অবকাশ নেই।

উদাহরণ সরূপ, কুরআন ও হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, কবর আযাব সত্য এবং তা স্বস্থানেই হয়। এবার যদি কেউ বিবেক বুদ্ধির দাবি উত্থাপন করে যে, আমরা কবর খুঁড়ে দেখেছি, কোনো আযাব দৃষ্টিগোচর হয়নি, ওখানে তো একটি লাশ পড়েছিল। ওখানে না কোনো আগুন ছিল, না কোনো সাপ-বিচ্ছু ছিল। সুতরাং এ আকিদায় আমরা কেন বিশ্বাসী হব? দেখুন, বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে আকিদা বিকৃত হয়ে গেছে।

জ্ঞান-বুদ্ধির সীমা

কবরের জগৎ হলো ভিন্ন এক জগৎ। জ্ঞান-বুদ্ধির উর্ধ্ব জগৎ। লাশ পড়ে রয়েছে আর তার সাথে সবকিছুই করা হচ্ছে কিন্তু আপনার কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না– এমনটি হওয়া সম্ভব।

আপনি একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখলেন, যিনি স্বপ্ন দেখছেন যে, আমি বাদশা হয়ে গিয়েছি। শাহী সিংহাসনে বসে রয়েছি। আমার সামনে হাজারো গোলাম ও খাদেম দাঁড়িয়ে রয়েছে। সৈন্যবাহিনী সালাম দিচ্ছে। কিন্তু এসবের কিছুই আপনার চোখে পড়ছে না। আপনি শুধু দেখতে পাচ্ছেন যে, উক্ত ব্যক্তি পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। না সেখানে পাইক-পেয়াদা বা সৈন্য-সামন্ত রয়েছে, না অন্য কিছু রয়েছে, অথচ তিনি সবকিছুই দেখছেন কিন্তু আপনার চোখে তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কারণ হলো সে এক ভিন্ন জগতে অবস্থান করছে। 'আলমে মিসাল' এ

অবস্থান করছে। ঘুমের সময় রূহ বের হয়ে গিয়ে ঐ জগতে পৌঁছেছে আর সেখানেই এসব দেখছে। আপনার চোখ তা দেখতে পাচ্ছে না।

ঘুমন্ত ব্যক্তি যখন জাগ্রত হয়ে বর্ণনা করবে যে, আমি এসব দেখেছি তখন আপনি তা বিশ্বাস করবেন। তো স্বপ্নে উক্ত ব্যক্তি স্বাদ ও আনন্দ পেয়েছে, সম্মানও লাভ করেছে কিন্তু সেসবের কিছুই আপনার দৃষ্টিগোচর হয়নি, অথচ আপনি তা বিশ্বাস করেছেন।

হাদিস শরীফে এসেছে:

اَلنَّوْمُ اُخْتُ الْمَوْتِ

নিদ্রা মৃত্যুর বোন স্বরূপ।

যেমনিভাবে একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর দিয়ে ঘটে যাওয়া কোনো কিছুই আপনার দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ বিষয় মৃত ব্যক্তির বেলায়ও ঘটতে পারে। পার্থক্য শুধু এই, মৃত ব্যক্তি শায়িত রয়েছে কবরে, লাশ আপনার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কিন্তু তার উপর দিয়ে ঘটে যাওয়া কোনো কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

অথবা ধরুন, একটি খাটের উপর দুই ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে। একজন স্বপ্ন দেখছে, সে বাদশা হয়ে গিয়েছে, অপরজন স্বপ্ন দেখছে পুলিশ ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে তাকে জেলখানায় পুরেছে। একজন হাসছে, একজন কাঁদছে কিন্তু একজনের খবর অপরজনের কাছে নেই। প্রথমজনের ব্যাপারে দ্বিতীয়জন অবগত নয়, দ্বিতীয়জনের ব্যাপারে প্রথমজন অবগত নয়। অথচ দুজন মিলে একই খাটে ঘুমিয়ে রয়েছে। ঠিক এভাবেই যদি একই কবরে দুজন ব্যক্তিকে দাফন করা হয়, যাদের একজন আল্লাহর অনুগত বান্দা এবং অপরজন অপরাধী। একজন দেখতে পাচ্ছে যে, কবরে অসংখ্য নিয়ামতরাজি আমার সম্মুখে উপস্থিত রয়েছে। অপরজন দেখতে পাচ্ছে আমি ভয়াবহ আযাবে পতিত হয়ে রয়েছি। অপর ব্যক্তি সম্পর্কে এ ব্যক্তির কোনো খবর নেই, এ ব্যক্তি সম্পর্কে অপর ব্যক্তির কোনো খবর নেই। আর আপনি দেখতে পাবেন যে, দুটি লাশ পড়ে রয়েছে। কবরে না নিয়ামত রয়েছে, না আযাব রয়েছে।

পৃথিবীতে যখন আল্লাহ একটি নমুনা সৃষ্টি করে রেখেছেন, এতে যখন নিয়ামত ও মসিবত ফুটে ওঠে, তখন মৃত্যুর পর কবরে আরাম ও মসিবত অর্পিত হওয়া, আযাব ও সাওয়াব লাভ করাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? পৃথিবীতে তো এর নজির বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি এখানে বুদ্ধিভিত্তিক বিতর্কে জড়িয়ে

পড়েন তাহলে আকিদা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা এটা বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝার বিষয় নয়।

আকল-বুদ্ধি হলো আগুন-পানি ও বায়ু-মাটি নির্মিত এই ক্ষণস্থায়ী জগতের জন্য। এখানকার বিষয়াবলিতে বিবেক-বুদ্ধি কার্যকর। এ জগতের বুঝ ঐ জগতে অকার্যকর, অচল।

বিবেক-বুদ্ধি ও গায়েবী বিষয়াবলি

বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরকালীন বিষয়াবলি বোঝা সম্ভব নয়। এর হুবহু উদাহরণ হতে পারে তুলাদণ্ড। ছোট্ট পিতলের নিক্তি দ্বারা স্বর্ণ-রৌপ্য মাপা হয়। তার চেয়ে একটু বড় দাঁড়িপাল্লা দিয়ে চাল-ডাল মাপা হয়। এর চেয়ে বড়টি দিয়ে জ্বালানি কাঠ মাপা হয়। এ ছাড়া এমন বড় পরিমাপকও রয়েছে যার দ্বারা হাজারো টনের রেলগাড়ির বগি ওজন করা হয়। আবার দশ হাজার টনের জাহাজে এমন এক মেশিন লাগানো রয়েছে, কাটা বলে দিচ্ছে, জাহাজে এত টন ওজন আছে। এখন আপনি যদি জাহাজকে দাঁড়িপাল্লায় তুলে মাপতে চান তাহলে কি মাপা সম্ভব হবে? জ্বালানি কাঠ মাপার পাল্লায় যদি আপনি রেলের বগি তুলে মাপতে চান তাহলে কি তা মাপা সম্ভব হবে? অথচ এটাও পরিমাপযন্ত্র আর ওটাও পরিমাপযন্ত্র। কিন্তু একটি হলো স্বর্ণ মাপার, একটি গম-চাল মাপার, একটি কাঠ মাপার এবং একটি হলো রেলের বগি ওজন করার। প্রত্যেক পরিমাপক দ্বারা ঐ জিনিস মাপা হবে যার জন্য সেটি তৈরি করা হয়েছে। ছোট পরিমাপক দ্বারা বড় জিনিস মাপা সম্ভব নয়।

জ্ঞান-বুদ্ধিও এক ধরনের পরিমাপক, তবে এর দ্বারা অনুভবযোগ্য বিষয়াবলি পরিমাপ করা হয়। ওহীও এক প্রকারের পরিমাপক, এর দ্বারা গায়েব সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। অন্তরও এক প্রকারের পরিমাপক, এর দ্বারা কবরের আযাব ও সাওয়াব মাপা হয়। আপনি যদি এখন চোখ দ্বারা কবরের আযাব ও সাওয়াব মাপতে (দেখতে) চান তাহলে তা হবে এমন যেন স্বর্ণ মাপার নিক্তি দ্বারা রেলের বগি মাপতে শুরু করলেন। এভাবে ওজন করা সম্ভব তো হবেই না, উপরন্তু নিক্তিটিই শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং বুদ্ধি-বিবেকের উপর যদি গায়েবী বিষয়াবলির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে, ফয়সালা কী-করে করবে? তো আপনি দুনিয়ার পরিমাপক দ্বারা আখেরাতের বিষয়াবলি পরিমাপ করতে শুরু করলেন, এখানে আকল-বুদ্ধি কী কাজ করবে? এটা হলো এমন, যেমন স্বর্ণ মাপার নিক্তিতে আপনি লাকড়ি মাপতে শুরু

করলেন। এটা সম্ভব হবে না। মোটকথা, আকিদাগত বিষয়াবলি যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়।

অনুভূতির সীমা

পৃথিবীতে চোখের কাজ হলো রঙ, রূপ ও আকার-আকৃতি দেখা। আপনি ইচ্ছা করলে চোখ দ্বারা ঘ্রাণ নিতে পারবেন না। এটা নাকের কাজ। নাক দ্বারা গন্ধ শুঁকবেন। আপনি নাক দ্বারা কোনো কিছু দেখতে চাইলে কখনোই দেখতে পারবেন না। কানের কাজ হলো আওয়াজ শোনা। আপনি চাইলেন যে, কান দ্বারা রঙ দেখবেন, এটা সম্ভব হবে না। অথচ একই মুখমণ্ডলে এই সবকটি অঙ্গ একত্রে রয়েছে। চোখ, নাক, কান ও গলার মধ্যে মাত্র দু'এক ইঞ্চির ব্যবধান, কিন্তু এমনই কঠিন প্রাচীরের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যে, চোখের সীমার মধ্যে কান এবং কানের সীমারেখার মধ্যে নাক কোনোই কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে কার্যকর।

এমনিভাবে জ্ঞান-বুদ্ধিরও একটি গণ্ডি রয়েছে এবং অন্তরেরও একটি গণ্ডি রয়েছে। এখন যদি আমি গঙ্গার কিনারে বসে বুঝতে চাই যে, গঙ্গার মধ্যকার বরকত কী? তাহলে কি আমি তা পারবো? মাওলানা ইয়াকুব সাহেব ঠিকই জানতে পেরেছিলেন। কেননা তার অন্তরের চোখ খোলা ছিল বিধায় তার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল যে, প্রকৃতপক্ষেই এ পানিতে বরকতের কিছু নিদর্শন রয়েছে এবং সে বরকত পয়গম্বরদের সাথে সম্পর্কিত।

যা হোক, প্রত্যেক জিনিস দ্বারা তার গণ্ডিভূক্ত জিনিসকে পরিমাপ করা হয়। বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বিবেকী বিষয়, চোখ দ্বারা রঙ-রূপ, নাক দ্বারা সুগন্ধ-দুর্গন্ধ এবং কান দ্বারা আওয়াজ। এ ছাড়া প্রত্যেকের জন্যই আবার ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি রয়েছে। ঠিক এভাবেই আল্লাহর ওহীরও একটি গণ্ডি, একটি পরিমণ্ডল রয়েছে। ওহী বলতে পারে যে, কবর কেমন, জান্নাত ও দোজখ কেমন, পুলসীরাত কেমন, আমল মাপার মিযান কেমন প্রভৃতি। এগুলো যদি আপনি আকল বা বুদ্ধি বিবেক দ্বারা জানতে চান, বুঝবেন না। কেননা এগুলো তার উর্ধ্বের বিষয়, যা ওহী দ্বারা বুঝে আসবে। মোটকথা, প্রত্যেক জিনিসের একটি পরিমণ্ডল, একটি গণ্ডি রয়েছে।

আকিদার উৎস

কখনো কখনো জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির কারণে আকিদা বিকৃত হয়ে যায়। যুক্তি দ্বারা বোঝা সম্ভব নয় এমন বিষয়ের মধ্যে যদি যুক্তি খোঁজা শুরু করে তাহলে হয়তো সঠিক আকিদাকে অস্বীকার করবে, না হয় ভুল আকিদা তৈরি করে নেবে। এভাবে দীন বরবাদ হয়ে যাবে।

কখনো আবার বাড়াবাড়ি পর্যায়ের ভালবাসার কারণে আকিদার মধ্যে বিকৃতি ঘটে। অর্থাৎ নিজের পছন্দনীয় বুযুর্গের সাথে ভালবাসা এমন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায় যে, ব্যক্তি তার মধ্যে ফানা হয়ে যায়। উক্ত বুযুর্গ ব্যক্তি যা বলে তাকেই শরীয়ত মনে করে, সে যা বলে তাকেই আকিদা বানিয়ে নেয়। এভাবে আকিদার বিকৃতি ঘটে। আকিদা পয়গম্বর থেকে গ্রহণ করতে হবে, আউলিয়া থেকে গ্রহণ করা হবে না। ওলামাগণ আকিদা তৈরি করেন না। মাশায়েখগণ আকিদা কায়েমকারী নন। আল্লাহর রাসূল যে আকিদা বলে দিয়েছেন মাশায়েখগণ তা গ্রহণে বাধ্য, আলেমগণ বাধ্য। ওলামাদের কথায় আকিদা তৈরি হয় না। কিন্তু ভালবাসার কারণে তাদের প্রত্যেক কথা ও কাজকে মানুষ যদি আকিদারূপে গ্রহণ করে নেয় তাহলে ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, শরীয়ত ও দীনের মধ্যে ত্রুটি তৈরি হবে।

কখনো আবার শত্রুতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আকিদা বিকৃত হয়ে যায়। অর্থাৎ কোনো এক জামাত বা কোনো ব্যক্তির সাথে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেল কিংবা জেদাজেদি বাধলো। এখন উক্ত জামাত বা ব্যক্তি যত ভাল কথাই বলুক না কেন এ ব্যক্তি তাকে ভুল বলে আখ্যায়িত করবে। কেননা প্রথমেই খারাপ ধারণা তৈরি হয়ে রয়েছে। সঠিক আকিদাও যদি তারা বলে তবু তাকে ভুল বলবে। ফলাফল দাঁড়াবে এই, তারা ভুল আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সঠিক আকিদা হতে বঞ্চিত থাকবে। সুতরাং গায়েবী বিষয়ের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার মাধ্যমে কখনো কখনো জ্ঞান-বুদ্ধি ও আকিদাকে বিকৃত করে ফেলে।

সমতাবিধানের আবশ্যকতা

কখনো ভালবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে যায় আবার কখনো শত্রুতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। এ জন্য শরীয়ত সমতাবিধান করেছে। আরবিতে একটি কবিতা রয়েছে, যার তরজমা এমন–

কাউকে ভালবাসলে সে ভালবাসায় ভারসাম্য বজায় রেখ। বাড়াবাড়ি করো না। ভবিষ্যতে তার সাথে বিরোধ বাধারও সম্ভাবনা রয়েছে। আজ ভালবাসার আতিশয্যে তার কাছে সবকিছু প্রকাশ করে দিলে কাল যখন তার সাথে শত্রুতার সৃষ্টি হবে তখন সে তোমাকে যেভাবে ইচ্ছা বাজাবে। সুতরাং পরবর্তীতে যেন পস্তাতে না হয় সে ব্যবস্থা করো।

আরো বলা হয়েছে–

কারো সাথে বিরোধে জড়ালেও তাতে ভারসাম্য বজায় রেখ। কাল সে তোমার বন্ধুতেও পরিণত হতে পারে। বিরোধের সময়ে যদি বাড়াবাড়ি করে থাকো বন্ধুত্বের সময়ে তার জন্য লজ্জিত হতে হবে, তোমার চোখ নিম্নমুখী থাকবে, অতিরঞ্জনতার জন্য অনুশোচনা করতে হবে।

সুতরাং কেন বাড়াবাড়ি বা সংকীর্ণতার পথ অবলম্বন কর? ভালবাসার ক্ষেত্রেও সমতাবিধান করো, শত্রুতার ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন করো না। শত্রুতা কিংবা বন্ধুত্ব কোনোটাই যেন নফসের প্রেরণায় না হয়। কেননা এটাই ইসলামের শিক্ষা।

ঈমানের পূর্ণতা

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে:

مَنْ أَحَبَّ فِى اللهِ وَأَبْغَضَ للهِ، وَأَعْطٰى للهِ وَمَنَعَ للهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহরই জন্য ভালবাসলো, নফসের আবেগের জন্য নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভালবাসলো। কারো সাথে শত্রুতা করলেও তা আল্লাহরই জন্য করল। কেননা সে আল্লাহর দুশমন তাই আমারও দুশমন। আর যে আল্লাহর বন্ধু সে আমারও বন্ধু। তদ্রূপ কাউকে কোনো কিছু দান করলে তা আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্য করে, কাউকে কোনো কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকলে তা আল্লাহরই জন্য থাকে। সুতরাং দেওয়া, না দেওয়া, বন্ধুত্ব ও বিরোধ সবকিছুই আল্লাহর জন্য করল, এ ব্যক্তি তার ঈমানকে পূর্ণ করে নিল।

সুতরাং কামেল ঈমান হলো এই যে, ভালবাসা ও শত্রুতা হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। ব্যক্তিগত আবেগের কোনো স্থান তাতে থাকবে না।

লেনদেন হবে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এভাবে ব্যক্তিগত আবেগ থাকবে না যে, অমুকের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে তো সবকিছু তাকে দিয়ে দেব। পক্ষান্তরে অমুকের সাথে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে তো তাকে কিছুই দেব না। এমনটি না করে বরং দেখব যে, তাকে কিছু দেওয়া আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় কিনা? যদি দেওয়া পছন্দনীয় হয়, দিয়ে দেব, যদিও নফস দিতে না চায়। আর যদি দেওয়াটা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় না হয় তাহলে কখনো দেব না, যদিও নফস দিতে চায়। সুতারাং নিজের নফসের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে এক পাশে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দাও। তো ঈমানের মূল কথা হলো এই:

زندہ کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو

دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو

আপনি যদি জীবিত রাখেন সে আপনার অনুগ্রহ, আপনার বদান্যতা, আমি জীবিত থাকার জন্য প্রস্তুত। আর যদি আপনি মৃত্যু দেন, আমি আপনার জন্য নিজেকে উৎসর্গীকৃত হয়ে যাব। আমার অন্তর আপনাতে লিপ্ত হয়ে রয়েছে, আপনি যা করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট।

সুতরাং বান্দার কাজ হলো এই, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে বিভোর হয়ে থাকবে। এভাবে যে, আমার নিজের কোনো সন্তুষ্টি নেই, আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমার সন্তুষ্টি। আমার চাওয়া-পাওয়া, আমার লেনদেন, আমার বন্ধুতা ও শত্রুতা সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত।

অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা

এ অধিকারও আমার নেই যে, আমার নিজের নফস আমার অনুগত থাকবে। কোনো এক গোলামকে একজন বলেছিল, তুমি কী খাবে? গোলাম উত্তর করেছিল, 'মনিব যা খাওয়াবেন তাই খাব', কী পরিধান করবে? 'মনিব যা পরিধান করাবেন তাই পরবো'। কী কাজ করবে? 'মনিব যে কাজ করাবেন তাই করব'। উক্ত ব্যক্তি বললো, সবই তো মনিবের কথা বললে, তোমার নিজের কোনো মর্জি কি নেই? গোলাম বললো, 'আমার নিজের কোনো মর্জি যদি থাকত তাহলে তো আমি গোলাম হতাম না। আমি গোলাম হবার অর্থ এই যে, আমার মর্জি বা ইচ্ছাশক্তিও গোলাম, আমার স্বাদ-আহ্লাদও গোলাম। আমার আশা-স্বপ্নও গোলাম। যা কিছু হবে, মনিবের মর্জিমাফিক হবে। তিনি খাওয়ালে খাব,

না খাওয়ালে খাব না। তিনি কাজ করালে করব, কাজ না করিয়ে বসিয়ে রাখলে বসে থাকব। আমি আমার মনিবের সম্পূর্ণ অনুগত।'

সামান্য ইহসান বা অনুগ্রহের কারণে একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষের এমন অনুগত হয়ে যেতে পারে তাহলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত, যিনি সকল মুহসিনদের বহু ঊর্ধ্বের মুহসিন, যখন তাঁর বান্দা হয়ে যাবে তখন বন্দেগির অর্থ হবে সবকিছুতে তাঁর অনুগত হওয়া। না আমার নিজের কোনো মর্জি আছে, না সন্তুষ্টি আছে আর না নিজের কোনো ইচ্ছা আছে। যা কিছু রয়েছে তা সবই আপনার। কোনো ব্যক্তির অবস্থা যখন এমন হবে তখন বলা যাবে যে, তার মধ্যে বন্দেগি এসে গেছে, আবদিয়াত এসে গেছে।

আবদিয়াতের শান

যদি নিজস্ব ইচ্ছা থাকে, নিজস্ব মর্জি থাকে তাহলে বান্দা কী-করে হয়?

হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী রহ. তাঁর এক মুরিদকে খেলাফত দিয়ে দীনের প্রচারের জন্য এক এলাকায় পাঠালেন। বিদায়লগ্নে উক্ত মুরিদ আরজ করলেন, হযরত আমাকে কিছু নসিহত করুন। আব্দুল কাদির জিলানী রহ. বললে, তোমাকে দুটি নসিহত করছি– এক, খোদায়ী দাবি করো না। দুই, নবী হওয়ার দাবি করো না। উক্ত খলিফা হয়রান হয়ে গেলেন। বললেন, আমার ব্যাপারে কি হযরতের এই বিশ্বাস ছিল যে, আমি খোদায়ীর দাবি করব? আপনার মুরিদ এবং আপনার নায়েব হয়ে আমি খোদায়ী দাবি করব? তা ছাড়া আমার ব্যাপারে কি আপনার এই ধারণা ছিল যে আমি নবী হওয়ার দাবি করব? অতি সাধারণ একজন মুসলমানও তো এ দাবি করতে পারে না। অথচ আপনার মতো ব্যক্তিত্বের মুরিদ ও নায়েব হয়ে খোদায়ী ও নবুওয়াতের দাবি করব?

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রহ. বললেন, প্রথমে এ কথার অর্থ বুঝে নাও। খোদার অর্থ হলো তিন যা বলবেন তাই হবে, এটা অটল বিষয়, এর কোনো ব্যতিক্রম হতে পারবে না। যদি আল্লাহর কোনো বান্দা এ কথা বলে যে আমি যা চাই তাই হবে, সে যেন খোদায়ীর দাবি করছে। চাই সে মুখে সরাসরি না বলুক।

আর নবীর অর্থ এই যে, তিনি যা বলেন তা সত্য ও হক। নবী যা বলেছেন তা ভুল হওয়া সম্ভব নয়। তো যে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে এমন কথা বলে যে, এটাই সঠিক, এ ছাড়া অন্য সবকিছু ভুল। এ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নবুওয়াতের

দাবিদার। চাই সে মুখে না বলুক। এ জন্যই আমি বলেছি যে, না খোদায়ীর দাবি করবে, না নবুওয়াতের দাবি করবে।

মানুষ যদি এ দাবি করে যে আমি যা বলছি তা অটল ও অকাট্ট, এটাই হবে। তাহলে তা মূলত খোদায়ী দাবিরই নামান্তর। 'আমি যা বলছি তাই সঠিক' এমন কথা নবুওয়াত দাবিরই নামান্তর। তার বলা উচিত ছিল যে, আল্লাহ যা বলেছেন তাই সত্য, আমার কথা কিছুই না। আল্লাহর রাসূল যা বলেছেন তাই সত্য, আমার কথার কোনোই গুরুত্ব নেই। আল্লাহ যা চাইবেন তাই হবে, আমার চাওয়া পূর্ণ হবার নয়।

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ

আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তোমাদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছা নেই। [দাহর ৭৬ : ৩০]

কথা যদি এমন বলে তাহলে সে আল্লাহর বান্দা। আর যদি এমন বলে যে আমি যা চাই তাই হবে তাহলে তা খোদায়ী দবির নামান্তর। 'আমি যা বলছি তাই সঠিক, অন্য সবকিছু ভুল।' এটা নবুওয়াত দারি নামান্তর। এগুলো আবদিয়াত ও গোলামির পরিপন্থী। বন্দেগির অর্থ এই যে, যা কিছু বলা হবে বা করা হবে তা হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এমনকি প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি নড়াচড়া তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য হবে। মাওলানা রূমী যেমন বলেছেন:

> হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে ইলম দান করেন তাহলে আমরা আপনার প্রাসাদ ও কুঠুরীতে প্রবেশ করলাম। আর যদি আমাদেরকে জাহালাত বা অজ্ঞতার মধ্যে রাখেন তাহলে আমরা আপনার জেলখানায় রইলাম। আপনার বান্দাকে ইলমের আলোয় নিয়ে এলে সে আপনার মহলে প্রবেশ করল, আর মূর্খতায় নিমজ্জিত রাখলে সে জেলখানায় প্রবেশ করলো।

আপনি ঘুম পাড়িয়ে রাখলে আমরা অসমর্থ অক্ষম আর সজাগ রাখলে আমরা আপনার হাতে রয়েছি। না স্বপ্ন আমাদের, না জাগরণ আমাদের। আমাদেরকে দেয় যা কিছু রয়েছে তা সবই আপনার। সুতরাং বন্দেগির অর্থ এই যে, অপর পক্ষের ইচ্ছা ও চাহিদার তাঁবেদারী করবে। মানুষ যখন নিজের কথাকে কার্যকর করবে, নিজের বুঝকে প্রাধান্য দেবে কিংবা ভালবাসা বা শত্রুতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে তখন তার এ কর্মকাণ্ড খোদায়ী দাবি ও নবুওয়াত দাবির নামান্তর হবে। বান্দার কাজ হলো আল্লাহর ইচ্ছার সামনে অবনত হওয়া।

তাওহীদের অর্থই হলো এই, অন্তর দিয়েও আল্লাহকে সর্বময় একক শক্তির অধিকারী মেনে নেওয়া এবং কর্মকাণ্ডেও তা বাস্তবায়ন করা।

তাওহীদের প্রকার

অন্তরের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে সামাঞ্জস্য থাকতে হবে। এ কারণেই ইসলামী শরীয়ত বলেছে, তাওহীদ দুই প্রকার। একটি হলো তাওহীদে ইতেকাদী আরেকটি হলো তাওহীদে আমলী। তাওহীদে ইতেকাদী বা বিশ্বাসজনিত তাওহীদের অর্থ হলো এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক ও একক এবং তিনিই মাবুদ। তিনি সবকিছু জানেন এবং সবকিছুর খবর রাখেন। তিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। তিনিই মনিব, তিনিই মালিক। এমন আকিদা পোষণ করাই হলো তাওহীদে ইতেকাদী। তাওহীদে আমলী বা কর্মের মাধ্যমে একত্ববাদের স্বীকৃতি দেবার অর্থ হলো এই, জীবনের এমন কোনো বাঁক নেই, এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে আল্লাহর দিকে রুজু না হয়ে থাকা যাবে। আপনি ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় গেলেন, হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই দোয়া পড়ুন:

بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَ اَحْيٰى

হে আল্লাহ! তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং সকালবেলা তোমারই নামে জীবিত হব।

ঘুমও এক রূপক মৃত্যু। আল্লাহর নামেই জীবনের সমাপ্তি হওয়া উচিত। আপনি যখন জাগ্রত হবেন শরীয়ত তখনও আপনাকে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া শিক্ষা দিচ্ছে। বলুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ.

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি মৃত্যুর পর পুনরায় আমাকে জীবন দান করলেন। তাঁরই নিকট আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সূর্য উদিত হলে বলা হয়েছে আল্লাহর দিকে রুজু হও এবং এই দোয়া কর:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَلَّلَنَا الْيَوْمَ عَافِيَةً.

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সূর্যকে দীপ্তিত করেছেন, সূর্যের মাধ্যমে আমাদের কাজকে সহজ করে দিয়েছে।

যখন সূর্য অস্ত যায় তখন পুনরায় আল্লাহর দিকে রুজু হও এবং পড়:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَ إِدْبَارُ نَهَارِكَ وَ أَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِيْ.

হে আল্লাহ! এখন হলো সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় এবং তোমার রাত্রি আগমনের সময়। তোমার পথে আহ্বানকারী নামাজের আহ্বান জানাচ্ছেন। হে আল্লাহ! এমন মুহূর্তে তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও।

মোটকথা, জীবনের প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে ইসলামী শরীয়ত আমাদেরকে আল্লাহমুখী করে তুলেছে, যাতে করে তাওহীদের ব্যাপারে কোনো প্রকারের বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়। এমন যেন না হয় যে, তোমরা সূর্যকে নিজেদের হর্তাকর্তা মনে করে বস। দিনের আলোকে তোমরা যেন মনে না কর যে, সে তোমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এমন যেন না হয় যে তোমরা রাতকে মৃত্যুদাতা মনে করে বস। এভাবে যে, রাত এলো তো ঘুমিয়ে পড়লাম, মরে গেলাম। না দিন জীবন দান করে, না রাত জীবন দান করে। রাত ও দিনের যিনি স্রষ্টা তিনিই জীবন ও মৃত্যুর মালিক।

তেমনিভাবে খানা খাওয়া শেষ হবার সাথে সাথে দোয়া কর:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ كَفَانَا وَ أَوَانَا.

প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে আহার করালেন, আমাদেরকে পান করালেন এবং যিনি আমাদেরকে ঠিকানা ও আশ্রয় দিলেন।

খাওয়া শেষে এভাবেই আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া শেখালেন। এ জন্য যে, যাতে খাদ্যের মত এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে মানুষের মনে এমন সংশয় না জন্মে যে, খাদ্য আমাদেরকে জীবিত রাখছে। খাদ্যে এমন কী আছে? চরম নিঃস্ব ব্যক্তিও তো বেঁচে থাকে। জীবন কেবল ঐ এক সত্তার হাতে। রুটি-রুজির মধ্যে জীবনের নির্ভরতা নেই। সুতরাং রুটি-রুজির প্রতি কিসের রুজু হওয়া? কখনো যেন এমন না হয় যে, রুটিকে খোদা মনে করে বস, বরং তাঁকেই খোদা বলে মেনে নাও যিনি রুটির স্রষ্টা। সুতরাং খানার শুরুতে বল: بِسْمِ اللّٰهِ আল্লাহর নামে শুরু করছি। খানা খাওয়া শেষ করে বল: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا অজস্র প্রশংসা সেই পরোয়ারদেগারের জন্য যিনি আহার করালেন।

হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, কেউ যদি বিসমিল্লাহ বলে খানা খাওয়া শুরু করে এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا বলে শেষ করে غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه তার পূর্ব জীবনের

সকল ছোট গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। মোটকথা দাঁড়ালো এই, জীবনের এমন কোনো মোড় নেই যেখানে আল্লাহর প্রতি রুজু হওয়া নেই। ইস্তেঞ্জা করতে গেলে দোয়া শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে:

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ.

হে আল্লাহ! আমি নাপাক জিনিস হতে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। শয়তান হোক বা অন্য যা কিছু হোক, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইস্তেঞ্জা শেষ করে বের হয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। বলো:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْاَذٰى وَ عَافَانِىْ.

প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করেছেন। আমি তার ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হলাম। আমার অন্তরে প্রশান্তি এসেছে।

মানুষ যেন এ কথা চিন্তা না করে যে, মলমূত্র ত্যাগ করতে পারাই সুস্থতা। এগুলো যদি আটকে যায় তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বো। আটকে না গেলে অসুস্থ হব না। ইস্তেঞ্জা আটকে যাওয়া না যাওয়ার সাথে যেন আমার জীবন সংযুক্ত। সুতরাং মানুষের মনে যেন এ ধরনের ধারণার সৃষ্টি হতে না পারে তাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে যাও।

এভাবে নিদ্রা-জাগরণে, ইস্তেঞ্জা করণে, ইস্তেঞ্জা হতে ভারমুক্ত হওনে, সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে, দিনের আগমন-প্রস্থানে আল্লাহকে স্মরণ কর। তদ্রূপ ঘর হতে বাইরে বের হবার সময়ও আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া শিক্ষা রয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা কাজ-কর্মে বের হলে আল্লাহর প্রতি রুজু হও। বলো:

بِسْمِ اللهِ اٰمَنَّا بِاللهِ، تَوَكَّلْنَا عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি। আমি আল্লাহর উপর ঈমান গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি যে, যা কিছু আসবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েই আসবে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ আমার কোনো অনিষ্ঠ করতে পারবে না।

তদ্রূপ ঘরে প্রবেশ করার সময়ে বলো:

بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

> মহান আল্লাহ তায়ালারই নামে আমি ঘরে প্রবেশ করছি এবং আল্লাহরই নামে ঘর হতে বের হব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর আমাদের ভরসা রয়েছে। কোনো গাইরুল্লাহর উপর ভরসা নেই।

এ ব্যবস্থা এ জন্যে যে, 'ঘর মানুষকে প্রশান্তি দিতে সক্ষম'– এমন চিন্তা যেন কেউ না করে। ঘরবাড়ি মানুষের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আজ যে বিশাল জমি-জায়দাদের অধিকারী, কয়েকটি গ্রামের মালিক, কাল সে গরিব হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এ ঘর, এ জমি-জিরাত খোদা নয়। এগুলো কেবলই আসবাব।। মোটকথা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি স্তরে আল্লাহর দিকে রুজু করানো হয়েছে।

যাই হোক, তাওহীদের দুটি প্রকারের একটি হলো 'তাওহীদে ইতেকাদী' তথা অন্তরে দৃঢ়তার সাথে এ বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তায়ালা সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও একক। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই, কোনো সমতুল্য নেই। তাওহীদের দ্বিতীয় প্রকারটি হলো 'তাওহীদে আমলী'। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি বাঁকে একই সত্তার প্রতি রুজু করানো হয়েছে। শুধু নামাজের মধ্যেই নয়– লেনদেন, ওঠাবসা, চলাফেরা, গৃহে আসা-যাওয়া, মসজিদে গমনাগমন এবং সফরে যাওয়া-আসার ক্ষেত্রেও প্রতি পদে পদে আল্লাহর দিকে রুজু হও। এ হলো তাওহীদে আমলী। যেন তোমরা আমলের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি স্তর থেকে আল্লাহর দিকে পৌছে যাও। অন্য কারো কাছে না পৌছ।

ইসলামের গঠন-প্রকৃতি

যে দীন আমাদেরকে নিদ্রা-জাগরণ, ওঠাবসা ও চলাফেরায় এক সত্তামুখী করেছে সে দীন কি কখনো আমাদেরকে গাইরুল্লাহমুখী করতে পারে? কখনো কি চাইতে পারে যে, আমরা গাইরুল্লাহকে সিজদা করি, গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই কিংবা গাইরুল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করি? এ দীনের মেজাজ বা গঠন-প্রকৃতিই এমন নয়। এ প্রকৃতি দীনের নয়, বরং মানুষের মিস্তষ্কপ্রসূত। ভালবাসা কিংবা শত্রুতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে মানুষ এগুলো সৃষ্টি করেছে। একই কারণে আকিদার মধ্যেও বিকৃতি ঘটেছে। সুতরাং যখন আকিদার বিষয়াবলি আসবে তখন সবকিছু ছেড়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ভালবাসার দিকে রুজু হও। আল্লাহর নির্দেশাবলি ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশাবলির আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হব। আকিদার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জ্ঞান বা

স্বভাবজাত যোগ্যতা আমাদের নেই। সুতরাং কুরআনুল কারীম ও হাদিসে নববী হলো আকায়েদের উৎস। এখান থেকেই আকিদার উৎপত্তি।

সঠিক আকিদার পরিচয়

কুরআনুল কারীমের কোথাও যদি বুঝতে সমস্যা হয়, অস্পষ্ট মনে হয় তাহলে তার ব্যাখ্যার জন্য হাদিসের শরণাপন্ন হতে হবে। হাদিস বুঝতেও যদি অসুবিধা হয় তাহলে তার ব্যাখ্যা হলো সাহাবায়ে কেরামের আমল। সাহাবায়ে কেরাম যা কবুল করেছেন, যে বিষয়ে তাদের আমল জারি হয়েছে, তার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্য খুঁজে নেব। সুতরাং সর্বাগ্রে কুরআনুল কারীম, অতঃপর হাদিসে নববী, অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের আমল। হাদিস ও সাহাবাগণের আমলকে পাশ কাটিয়ে আমরা যদি শুধু কুরআনকে গ্রহণ করি, কুরআন নিয়ে মাথা ঘামাই, তাহলে তা হবে আমাদের নিজ বিবেকপ্রসূত আকিদা, আল্লাহ প্রেরিত আকিদা হবে না। আল্লাহ প্রেরিত আকিদা হলো সেটি, যা স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর রাসূল তার ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরাম আমল করে দেখিয়েছেন। সুতরাং সর্বাগ্রে আল্লাহর কিতাব, অতঃপর হাদিসে রাসূল, অতঃপর আমলে সাহাবার স্তর।

কখনো যদি সাহাবায়ে কেরামের আমল বুঝতে অসুবিধা হয়, অস্পষ্ট মনে হয় (সাধারণত এমন কখনো হয় না) তাহলে উম্মতের আমল দেখতে হবে। অর্থাৎ উম্মতের আলেম ও রব্বানীগণের আমল। এঁরা দীনকে সঠিকভাবে চিনতেন। দেখতে হবে এঁদের আমলের পদ্ধতি কী ছিল? দেখতে হবে যে, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও মুতাকাল্লিমীন প্রমুখ কিসের উপর আমল করেছেন? সুস্পষ্ট আকিদা এভাবে প্রকাশ পাবে।

কুরআন সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছে, হাদিস তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছে, ফিকাহ তার বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেছে, সাহাবায়ে কেরামের আমল তাকে মজবুত করেছে এবং উম্মতের উলামায়ে রব্বানীগণ তাঁকে আরো দৃঢ়তা প্রদান করেছেন। এসব কিছুর সমন্বয়েই আকিদা তৈরি হয়। এগুলোর একটিকেও যদি বাদ দেন, আকিদা সহি হবে না। এ জন্যই আকিদা ও আমল ঠিক হওয়া জরুরি।

কথা অনেক দূর চলে এসেছে। আমি বলতে চাচ্ছিলাম অন্য কথা, মাঝখানে এ কথাগুলো চলে এল।

বিশ্বজনীন দীনের আলামত

আমি আরজ করছিলাম যে, আম্বিয়া আ. একই আকিদা ও একই দীন নিয়ে আগমন করেছেন। এজন্যই কুরআন মাজিদ আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, সকল আম্বিয়া আ.-এর উপর ঈমান গ্রহণ কর। ইরশাদ হয়েছে–

قُولُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ اِلَى اِبْرٰهِيمَ وَاِسْمٰعِيلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ○

অর্থাৎ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে বলে দিন, তোমরা ঘোষণা করে দাও যে, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান গ্রহণ করলাম এবং আল্লাহ আমাদের উপর যা নাযিল করেছেন (কুরআন ও হাদিস) তার উপর ঈমান গ্রহণ করলাম। আর হযরত ইবরাহিম আ.-এর উপর যে সহিফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান গ্রহণ করলাম। এ মর্মে যে, তিনি স্বীয় জমানার সত্য নবী ছিলেন। তা ছাড়া হযরত ইসমাঈল আ., হযরত ইসহাক আ., হযরত ইয়াকুব আ. ও তাঁর বংশধরদের উপর ঈমান গ্রহণ করলাম। ইয়াকুব আ.-এর বংশধর দ্বারা বনী ইসরাইলের সকল পয়গম্বর এসে গেছে। আর হযরত মুসা আ. ও ঈসা আ.-এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্যান্য আম্বিয়া আ.-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, চাই তা যে দেশ বা এলাকাতেই হোক না কেন, আমরা সকলের উপর ঈমান গ্রহণ করলাম। আমরা এঁদের মধ্যে এমন পার্থক্য করি না যে, কারো উপর ঈমান গ্রহণ করব এবং কারো উপর করব না। সকলকেই আমরা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত মনে করি।

স্পষ্ট কথা, দ্বন্দ্ব তখনই দেখা দেয় যখন কোনো ব্যক্তিবিশেষকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যখন কেউ বলে, আমি যার অনুসারী আমি কেবল তাকেই মান্য করব, তুমি যার অনুসারী তাকে আমি মান্য করব না, তখনই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আর যখন সকলকে মান্য করা হবে তখন তো বিতর্কের কিছু থাকবে না। ইসলাম সকল নবী-রাসূলকে মান্য করা শিখিয়েছে। সুতরাং ইসলামই কেবল বিশ্বজনীন দীন হতে পারে। ইসলাম যদি এ কথা বলতো যে, আমি শুধু সেই পয়গম্বরগণকে স্বীকৃতি দেই যারা আরবে এসেছেন; সিরিয়া, হিজাজ, হিন্দুস্তান ও সিন্ধুতে যারা এসেছেন তাদেরকে স্বীকৃতি দেই না, তাহলে সেটা হতো গোঁড়ামি, বিশ্বজনীন দীনের আলামত এটা নয়। বিশ্বজনীন বা আন্তর্জাতিক দীনের আলামত হলো,

গোঁড়ামি ও দ্বন্দ্বসংঘাতের মূলোৎপাটন করা। ব্যক্তিসত্তাকে প্রাধান্য দেবার দ্বারা দন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আমরা যখন সকলের উপর ঈমান গ্রহণ করলাম তখন এও মেনে নিতে পারি যে, ভারত বা পাকিস্তানেও কোনো পয়গম্বর এসে থাকবেন। তাদের নাম আমাদের জানা থাক বা না থাক, ইজমালীভাবে তাদের উপর আমরা ঈমান রাখি। এমন হলে সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ের মধ্যকার ক্রোধ ও দ্বন্দ্ব দূরীভূত হবে। ক্রোধের উদ্রেক তো তখন হবে যখন আমরা কোনো পয়গম্বরকে খারাপ বলব। এ অবস্থায় তারা আমাদের সাথে সংঘাতে জড়াবে, আমাদের পয়গম্বরকে খারাপ বলবে এবং সেই সূত্র ধরে তাদের সাথে আমাদের লড়াই বাধবে। একজন যদি বলে, আমি অন্তর থেকে তোমাদের পয়গম্বরকে সত্য বলে মানি, তুমি আমাদের পয়গম্বরকে তদ্রূপ মেনে নাও, তাহলেই তো বিরোধ খতম হয়ে যায়। তো বিরোধের প্রথম উৎস হলো ব্যক্তিসত্তা। এ বিরোধকে ইসলাম নির্মূল করেছে। এটা ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক দীন হওয়ার আলামত। এ দীন সমগ্র পৃথিবীর জন্য আগমন করেছ। ইসলাম যদি অন্যান্য নবীর দীনের সমালোচনা করত তাহলে সমগ্র পৃথিবী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতো না। যদি বলতো অমুক জায়গার নবীদেরকে স্বীকৃতি দিও না, হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের নবীগণকে স্বীকৃতি দিও না, তাহলে এসব এলাকার লোকজন আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যেত। আমরা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তাম। আর যখন সকলকে মেনে নিলাম তখন কারো মনে আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকলো না। এ হলো বিশ্বজনীন দীনের আলামত। কেউ যদি এমন বলে যে, আমার পয়গম্বরকে মান্য কর এবং অমুক স্থানের পয়গম্বরকে মান্য কর না, তাহলে তা হবে গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও আঞ্চলিকতার আলামত।

এক ইহুদীর সাথে কথোপকথন

একবার আফ্রিকার সফরে থাকা অবস্থায় ওখান থেকে মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল। ইহরাম অবস্থায় যেহেতু অন্য কাপড় পরার সুযোগ নেই তাই ঘড়ি, মেসওয়াক প্রভৃতি রাখার জন্য ছোট্ট একটি ব্যাগের প্রয়োজন ছিল। আফ্রিকায় আমি যাদের কাছে ছিলাম, আমার সেই মেজবানরা বললো, এখানে এক ইহুদীর অনেক বড় একটি ব্যাগের ফ্যাক্টরি রয়েছে, ওখানে নানা ধরনের ব্যাগ পাওয়া যায়, ওখানে চলুন। সে মতে আমরা উক্ত ফ্যাক্টরিতে গেলাম। আমার মেজবান ওখানে গিয়ে উক্ত ইহুদীর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি ভারত থেকে গিয়েছি সে কথা বললেন, দেওবন্দের কথা উল্লেখ করলেন। আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ইহুদী বাইরে এগিয়ে এসেছিলেন। সাদরে সম্ভাষণ

জানিয়ে আমাদেরকে ফ্যাক্টরির ভেতরে নিয়ে গেলেন। যা হোক, তিনি বললেন, প্রথমে আপনারা ব্যাগ পছন্দ করুন, তারপর বসে কথাবার্তা বলা যাবে। আমরা ব্যাগ পছন্দ করলাম। যেহেতু ব্যাগ আমরা গলায় ঝুলিয়ে রাখব তাই হাতল ছোট হওয়ার ব্যাপারে মালিককে বললে তিনি বড় ফিতা লাগিয়ে আনার জন্য পাঠালেন। তিনি বললেন, ওগুলো আসতে আসতে চলুন আমরা কিছু আলাপ আলোচনা করি। আমাদের আলাপের এক পর্যায়ে তিনি বললেন, মাজহাবের ব্যাপারে কিছু বলুন। আমি বললাম, মাজহাব বা ধর্মের কথা আমি কী বলব? আপনি আপনার মাজহাব মানছেন, আমি আমার মাজহাব মানছি।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

আপনাদের কর্মফল আপনারা ভোগ করবেন, আমাদের কর্মফল আমরা বহন করব। [কাফিরুন ১০৯ : ৬]

তিনি বললেন, তবুও আপনি কিছু বলুন। আমি বললাম, আপনি খারাপ মনে করবেন না তো? তিনি বললেন, মোটেই না, আপনি বলুন। আমি বললাম, প্রথম কথা হলো এই, আপনি আমাদের শত্রু আর আমরা আপনার বন্ধু। তিনি বললেন, সেটা কিভাবে? আমি বললাম, আমরা তো আপনার বন্ধু। কেননা আপনার নবী হলেন মুসা আ. আর আমরা তাঁকে আমাদের নবী বলে মান্য করি। কেউ যদি হযরত মুসা আ.-এর ব্যাপারে সামান্যতম বেয়াদবি করে তাহলে সে ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যাবে। কেননা যিনি আপনার পয়গম্বর তিনি আমাদেরও পয়গম্বর। এ জন্যই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হযরত মুসা আ.-এর উপর ঈমান গ্রহণ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারবো না। আর আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত ইহুদী হতে পারবেন না যতক্ষণ না মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবেন এবং বলবেন যে, তিনি যা বলেছেন সব মিথ্যা (নাউজুবিল্লাহ)। সুতরাং দেখুন, আপনি তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ব্যতীত ইহুদী হতে পারবেন না আর আমরা সত্যায়ন করা ব্যতীত মুসলমান হতে পারি না। সুতরাং আমরা আপনার বন্ধু আর আপনি আমাদের শত্রু। এ কথা শুনে ইহুদী বেচারা চুপ হয়ে যান।

এরপর তিনি বললেন আরো কিছু বলুন। আমি বললাম, আমরা ঈমানদার আর আপনারা সম্পূর্ণ ঈমানহীন। বললেন, এটা কিভাবে? আমি বললাম, মান্য করার নাম হলো ঈমান। না-মানার নাম ঈমান নয়। আমরা সবাইকে মান্য করি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও মান্য করি, হযরত মুসা আ.কেও মান্য করি এবং অন্যসব পয়গম্বরকেও মান্য করি। আপনারা না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে মান্য করেন, না ঈসা আ.কে মান্য করেন। তো না-মানার নাম তো ঈমান নয়; মানার নাম ঈমান। এজন্যই আপনারা ঈমান বহির্ভূত আর আমরা ঈমানের অনুসারী।

ইহুদী বললেন, আরো কিছু বলুন। আমি বললাম বাদ দিন। তিনি বললেন, কিছু একটু বলুন না। আমি বললাম, আপনারা শত্রুতায় ভরপুর আর আমরা ভালবাসায় পূর্ণ। কেননা ঈমান হলো ভালবাসার নাম। ঈমান গ্রহণের সাথে সাথে সকল আম্বিয়া আ.কে আমরা মুহাব্বত করতে থাকি। আপনাদের ধর্মে না-মানার নাম ঈমান, যা শত্রুতার উৎস। এ কারণেই আপনারা শত্রুতায় পরিপূর্ণ আর আমরা ভালবাসায় পরিপূর্ণ।

তিনি বললেন, ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে। এর চেয়ে অধিক বলার প্রয়োজন নেই। যাই হোক, প্রকৃত কথা হলো মান্য করার নাম হলো ঈমান, মুহাব্বত করার নাম হলো ঈমান। মুমিন সেই ব্যক্তি যে সকল আল্লাহওয়ালাদেরকে মান্য করে। ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় যে কিছু কিছু আম্বিয়াকে মান্য করে এবং বাকিদেরকে মান্য করে না। মুমিন ঐ ব্যক্তি যিনি সকল আউলিয়ায়ে কেরামের নাম সম্মানের সাথে উচ্চারণ করে, তাঁদের ভালবাসাকে নিজ হৃদয়ে স্থান দেয়। যে ব্যক্তি কোনো কোনো আউলিয়াকে মেনে নেয় এবং কোনো কোনো আউলিয়াকে অমান্য করে, কাউকে কাফের আখ্যা দেয় এবং কাউকে মুমিন বলে মানে, প্রকৃত অর্থে এই ব্যক্তি মুহাব্বতশূন্য।

যাই হোক, মান্য করা ও মুহাব্বতের নাম হলো ঈমান। আবার তাওয়াক্কুল করা ও ভরসা করার নাম ঈমান। সুতরাং আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং আম্বিয়া আ.কে মান্য করা, তাঁদের আনুগত্যে উৎসাহী হওয়া আবশ্যক। আনুগত্যের ক্ষেত্রেও আকিদা সঠিক থাকতে হবে, একই সত্তাকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। আর আমলও শুদ্ধ থাকতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে একই আল্লাহর দিকে রুজু হতে হবে।

বিশ্বজনীন দীনের দ্বিতীয় আলামত

আমি যা কিছু আরজ করলাম, অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া, ঘর থেকে বের হতে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া, নামাজের সময় আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া– এগুলো সবই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই আমল। এসব দোয়া তাঁর থেকেই প্রমাণিত। ঘর থেকে বের হতে, ঘরে প্রবেশ করতে, মসজিদে প্রবেশ করতে তিনি নির্দিষ্ট দোয়া পড়তেন। এসব দ্বারা উদ্দেশ্য

একটিই– মানুষের অন্তরে একই সত্তার সাথে মুহাব্বত ও বন্ধন থাকা উচিত। ধ্যান ও মনোযোগ একই সত্তায় নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

একজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেমন সহজ, সম্মিলিতভাবেও অদ্রূপ সহজ। একই সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থেকে দুনিয়ার সকল মানুষ একই সারিতে আসতে পারে। ব্যক্তিত্ব, ভূখণ্ড, বর্ণ, বংশ প্রভৃতি সংযোগে সম্মিলিত একতা তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। এ-সবকে ভিত্তি ধরা হলে কখনোই সম্মিলিত একতা তৈরি হবে না এবং দীনও ভিন্ন ভিন্ন হতেই থাকবে। সুতরাং সে দীন আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে না। সেই দীনই কেবল আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে যেই দীন বর্ণ, বংশ, ব্যক্তিত্ব ও ভূখণ্ডের সীমাবদ্ধতাকে গুঁড়িয়ে দেয় এবং এসবের বহু ঊর্ধ্বের এমন এক মহান সত্তার সাথে মানুষকে সংযুক্ত করে দেয় যিনি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। আর এমন সত্তা কেবল আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সত্তাই হতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের প্রকৃত পরিচয় কেবল ইসলামই দেয়। সুতরাং কেবল ইসলামই আন্তর্জাতিক দীন হবার যোগ্যতা রাখে, অন্য কোনো দীনের এ যোগ্যতা নেই।

বিশ্বজনীন দীনের তৃতীয় আলামত

ইসলাম সকল পয়গম্বরকে মান্য করার নির্দেশ দেবার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছে। তেমনিভাবে ভৌগোলিক সীমারেখাজনিত দ্বন্দ্বেরও অবকাশ রাখেনি। যাতে করে সর্বদিক থেকে এ দীনের বিশ্বজনীনতা নিশ্চিৎ হয়। কোনো ধরনের আপত্তি উত্থাপনের যেন অবকাশ না থাকে। অনেক সময় ভূখণ্ড কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। একদল বলে আমার এলাকা ভাল, এখানে যে দীনের উদ্ভব হয়েছে সে দীন উন্নত। অপর দল নিজ ভূখণ্ডকে প্রাধান্য দিয়ে তার গুণাগুণ করতে থাকে। ইসলাম এ ধরনের দ্বন্দ্বের অবকাশ রাখেনি, কোনো নির্দষ্ট ভূখণ্ডের বিশেষ প্রশংসা করেনি। সকল ভূখণ্ডের পবিত্রতা বর্ণনা করেছে। হাদিসে আপনি দেখবেন, ইয়ামেন কিংবা সিরিয়ার প্রশংসা করা হয়েছে, হিজাজের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে, হিন্দুস্তানের স্বতন্ত্র প্রশংসা করা হয়েছে, হিন্দ কিংবা সিন্ধের ব্যাপারে প্রশংসা বাক্য বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা, প্রত্যেক ভূখণ্ডেরই যেন পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক দেশেরই সুনাম বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে ইসলাম আঞ্চলিকতার মূলোৎপাটন করেছে। অতীতে এই আঞ্চলিকতাই ধর্মের মধ্যে বিভাজন তৈরির কারণ হতো।

ইসলাম যেহেতু আলাদাভাবে কোনো ভূখণ্ডকে বিশেষিত করেনি, সব এলাকারই প্রশংসা করেছে, সেহেতু রূপরেখা দাঁড়িয়েছে এমন:

ہر ملک ماست کہ ملک خدائے ماست

সকল ভূখণ্ডই আমাদের, কেননা এগুলো আমাদের আল্লাহর ভূখণ্ড।

যেহেতু আল্লাহ আমাদের সকলের এক, সেহেতু পুরো পৃথিবীই আমাদের। সুতরাং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে কিভাবে? লড়াই বাধবে কিভাবে? তো ইসলাম যেহেতু নানা ভূখণ্ডের প্রশংসা করেছে, সেহেতু বোঝা গেল, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম, একটি আন্তর্জাতিক ধর্ম, ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকার উর্ধ্বের এক ধর্ম। তা না হলে বলা হতো– আরবের যে ফযিলত রয়েছে না তা হিন্দুস্তানের আছে, না ইয়ামেনের আছে আর না সিরিয়ার আছে। এসব এলাকার লোকজনের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

শ্রেষ্ঠত্বের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি

ইসলামের আবির্ভাব আরবে হলেও আরবকে শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য দেয়নি। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ভূখণ্ড নয়, অন্য কিছুকে নির্ধারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلاَّ بِدِيْنٍ وَ تَقْوٰى.

কোনো আরবই অনারব অপেক্ষা ফযিলতপূর্ণ নয়। তাকওয়া, পূণ্য ও পবিত্রতার মধ্যে ফযিলত নিহিত।

মুত্তাকী ব্যক্তি যেখানের অধিবাসী হন না কেন আল্লাহর কাছে তিনিই সম্মানিত, তিনিই মর্যদাশীল। যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে না, আল্লাহকে ভয় করবে না, পবিত্র ও পূণ্যবান হবে না আল্লাহর কাছে সে প্রিয় নয়। চাই সে আরবেরই অধিবাসী হোক না কেন। তো ইসলাম ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ হয়ে পড়েনি, সমগ্র পৃথিবীকে, সকল দেশকে নিজের দেশ বলেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম একটি আন্তর্জাতিক জীবন ব্যবস্থা, কোনো আঞ্চলিক ধর্ম নয় যে, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় উদ্ভব হয়ে সেখানকার লোকজনের জন্য সীমাবদ্ধ থেকেছে, অন্য এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করেনি। তো এভাবেই ব্যক্তিসত্তা বিষয়ক দ্বন্দ্ব এবং আঞ্চলিকতা বিষয়ক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছে।

বিশ্বজনীন দীনের চতুর্থ আলামত

কখনো বর্ণ নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত বাধে। যেমন আফ্রিকায় হচ্ছে। ওখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে অনেক কঠিন বিভাজন। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের ভিন্ন ভিন্ন গাড়ি। শ্বেতাঙ্গদের বাসে কৃষ্ণাঙ্গরা এবং কৃষ্ণাঙ্গদের বাসে শ্বেতাঙ্গরা বসতে পারে না। শ্বেতাঙ্গদের জন্য রয়েছে আলিশান স্টেশন আর কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য বানিয়ে রাখা হয়েছে অতি সাধারণ ওয়েটিং রুম। শ্বেতাঙ্গরা এদিকে আসতে পারে না এবং কৃষ্ণাঙ্গরা ওদিকে যেতে পারে না। বিমানবন্দরেও উন্নততর স্থানটি শ্বেতাঙ্গদের জন্য আর অতি সাধারণ মাণেরটি কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য। এসব পার্থক্যের কারণে ওখানে কঠোর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে রয়েছে, ফলে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের এবং শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। সুযোগ পেলে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদেরকে গুলি মেরে উড়িয়ে দেয় আবার শ্বেতাঙ্গরা সুযোগ পেলে কৃষ্ণাঙ্গদের খতম করে দেয়। দেখা যাচ্ছে, বর্ণের কারণে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এই বিভাজনকে নির্মূল করেছে। ইরশাদ হয়েছেঃ

بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ.

আমি কালো ও সাদা উভয়ের জন্য প্রেরিত হয়েছি।

কালোও আমার, ফর্সাও আমার। আমার প্রভুর হুকুম যে মেনে নিবে সেই আমার। চাই সে কালো বর্ণের হোক বা শুভ্র বর্ণের হোক। সুতরাং ইসলাম কালো ও সাদা রঙের পার্থক্যকে নির্মূল করেছে। অপরদিকে ব্যক্তিসত্তাজনিত সংঘাতকে দূর করেছে। এ দীন আন্তর্জাতিক হওয়ার এটাও একটি আলামত। যদি জমিনের বা ভূখণ্ডের সাথে নির্দিষ্ট হতো তাহলে তা হতো স্থান কেন্দ্রিক দীন। যদি ব্যক্তিসত্তার সাথে নির্দিষ্ট হতো তাহলে তাতো ব্যক্তি কেন্দ্রিক দীন। রঙের সাথে নির্দিষ্ট হলে হতো রঙিন দীন। কিন্তু এ দীন স্থান, ব্যক্তি ও বর্ণের উর্ধ্বে হওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এ দীন এসেছে সমগ্র পৃথিবীর জন্য। এ জন্য বলা হয়েছেঃ

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ... الخ

অর্থাৎ প্রথমে এ কথার স্বীকৃতি দাও যে, যত নবী-রাসূল রয়েছেন আমরা তাঁদের সবার উপর ঈমান গ্রহণ করলাম– যাঁদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে এবং যাঁদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। তাঁরা সকলেই স্বীয় জমানায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যদি তাঁদের কারো দীনের মধ্যে খারাব কিছু প্রবেশ করে থাকে তবে তা তাঁদের কওমের লোকজন তাঁদের অনুপস্থিতিতে করেছে। নবীগণ

এবং তাঁদের কিতাবসমূহ এসবের দায়ভার মুক্ত। পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটিয়েছে তাঁদের কওম।

পৃথিবীর সকল দেশেই নবী-রাসূলগণ আগমন করেছেন। যথা কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

প্রত্যেক কওমের জন্য আমি পথ-প্রদর্শক প্রেরণ করেছি। [রআদ ১৩ : ৭]

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ

প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। [ইউনুস ১০ : ৪৭]

যে নবী-রাসূলগণের উপর আমরা ঈমান গ্রহণ করলাম তাঁরা যখন সকল দেশ, সকল ভূখণ্ডে বিস্তৃত তখন সকল দেশ, সকল ভূখণ্ডই আমাদের কাছে পবিত্র। আমরা যেহেতু কোনো দেশকে খারাপ বলি না, কোনো দেশের দুর্নাম করি না, সব দেশের প্রতি আমাদের সু-ধারণা ও ভালবাসা রয়েছে, বোঝা গেল ইসলাম সকল দেশের জন্য আগমন করেছে, কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের জন্য নয়। এ দীন বনি আদমের প্রত্যেক সদস্যের জন্য। নির্দিষ্ট কোনো এক ব্যক্তির জন্য নয় কিংবা এক কওমের জন্য নয়। সকল বর্ণকে এ দীন নিজের বলে স্বীকৃতি দেয়। কালো-সাদার কোনো পার্থক্য এখানে নেই। যে দীন এ পার্থক্যকে দূর করেছে, জেনে নিও, সে দীন বিশ্বজনীন। আর যেখানে পার্থক্য বিদ্যমান, জানবে সেটা আঞ্চলিক। কোনো আঞ্চলিক ধর্মের অধিকার নেই অন্যের ভূখণ্ডে প্রবেশ করার। এ অধিকার কেবল আন্তর্জাতিক ধর্ম ইসলামেরই রয়েছে। সদর্পে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার অধিকার কেবল ইসলামই রাখে।

দীন আন্তর্জাতিক হওয়ার মাপকাঠি

উপরোক্ত কথাগুলো আরজ করার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এই, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে না জড়িয়ে এক আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করুন। অর্থাৎ এই চেষ্টা করুন যে, আল্লাহর সঠিক পয়গাম সনদের সাথে আমরা কোথায় পেতে পারি? কেননা দীন হলো একটি নকলী বিষয় (অর্থাৎ যা পর্যায়ক্রমে একজন হতে অন্যজনের কাছে বর্ণনা হয়ে আসে)। আর নকলের জন্য রেওয়ায়াতের আবশ্যকতা রয়েছে, রেওয়াতের জন্য সনদের প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং সনদ অনুসন্ধান করুন, দেখুন কোন দীন সনদের দিক থেকে এবং ঐতিহাসিকভাবে

পয়গম্বর পর্যন্ত পৌছেছে এবং মধ্যবর্তী সকল বর্ণনাকারীদেরকে আমরা এভাবে চিনতে পারি যে, এটির বর্ণনাকারী হলেন অমুক, ঐটির বর্ণনাকারী হলেন অমুক। তো সনদের মাধ্যমে যে দীন পয়গম্বর পর্যন্ত পৌছবে তার উপর বিশ্বাস করা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যার সনদ থাকবে না, শুধু গল্পকাহিনীরূপে চলে আসছে, সম্ভাবনা আছে তাতে ভুলত্রুটির অনুপ্রবেশ ঘটার। হতে পারে তাতে ভুল বা অন্যায় কিছু সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু যে জিনিস সনদের মাধ্যমে চলে আসছে তাতে খারাপ কিছু সংযুক্ত হতে পারে না। কুরআন বা হাদিসের দিকে দৃষ্টি দিন, দেখবেন এক একটি আয়াতের সনদ পয়গম্বর পর্যন্ত পৌছে গেছে। উদাহরণত, আমি বল্লাম, মরহুম হযরত কারী আব্দুল অহীদ খান সাহেবের কাছে আমি কুরআন মাজিদ হিফজ করেছি, তিনি মরহুম কারী আব্দুর রহমানের কাছ থেকে হিফজ করেছেন, তিনি করেছেন মরহুম কারী আব্দুল্লাহ সাহেবের নিকট থেকে। কারী আব্দুল্লাহ সাহেব কারী মাহমুদ মিসরীর কাছ থেকে এবং কারী মাহমুদ সাহেব স্বীয় উস্তাদের নিকট থেকে কুরআন মাজীদ ইয়াদ করেছেন। আর এভাবে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সনদ পৌছে গেছে। অপর দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কুরআন এসেছে হযরত জিব্রাঈল আ.কে মাধ্যম করে আর জিব্রাঈল আমিনের অন্তরে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এ কুরআনকে ঢেলে দিয়েছেন (ইলকা করেছেন)। একজন হাফেজের সনদ যেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পর্যন্ত পৌছে গেছে। আমার ধারণা, দুনিয়ার কোনো ধর্মই সম্ভবত এমন সনদ পেশ করতে পারবে না। ইঞ্জিল অনুসারীদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই ইঞ্জিল কোত্থেকে এলো? আপনার উস্তাদ কে? এমন প্রশ্নের উত্তরে সম্ভবত দু'একজন উস্তাদের নাম বলতে পারবে, এর পর শেষ।

ইহুদীদের কাছে যদি জানতে চান যে, তাওরাত নিয়ে কে আগমন করেছে? তাওরাতের রাবী বা বর্ণনাকারী কে কে? সংরক্ষণের কোনো ইতিহাস কি সংরক্ষিত আছে? যখন সনদ ও প্রমাণপত্র নেই তখন তাতে নানা হস্তক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সর্বাগ্রে দেখার বিষয় হলো ইতিহাস ও সনদে মুত্তাসিল তথা অকাট্য প্রমাণপত্র। যে সনদ আল্লাহ পর্যন্ত গিয়ে মিলিত হবে। ইনসাফপূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমরা বলব, কুরআন-হাদিস ছাড়া এমন সনদ আর কোথাও মিলবে না। এই সনদের ভিত্তিতে আমরা এ কথা বুঝতে পারি যে, ইঞ্জিলও সত্য। কুরআন বলে না দিলে আমরা বুঝতে পারতাম না যে, ইঞ্জিল সত্য না কি মিথ্যা। কুরআন বললো যে, তাওরাত সত্য; সুতরাং আমরা সহি সনদ দ্বারা অবগত হলাম যে, বাস্তবিকই তাওরাত সত্য। সনদে মুত্তাসিলের

সাথে ইসলাম আমাদেরকে আম্বিয়াগণ সম্পর্কে অবগত করিয়েছে, আমরা মেনে নিয়েছি, ঈমান গ্রহণ করেছি।

জানা গেল, ঈমান গ্রহণের মূল বিষয় হলো সনদ। মুসা আ.-এর পয়গম্বরী আজ যদি মানার যোগ্য হয় তাহলে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গম্বরী আরো অধিক উপযুক্ত। হাত বগল থেকে বের করে আনার পর সূর্যের ন্যায় আলোকিত হয়ে যাওয়া এবং হাত থেকে লাঠি ফেলে দেবার পর তা সাপে পরিণত হওয়া– আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁকে দেওয়া এই মুজেজাগুলো তাঁর নবুওয়াতের দলিল। তো এমন হাজারো মুজেজা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। তাঁর বরকতময় আঙুল হতে প্রবাহিত প্রস্রবণ দ্বারা চৌদ্দশত লোক তাদের পানির মশক ভরে নিয়েছেন; তাঁর আঙুলের ইশরায় চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে; মিরাজের জন্য তাঁকে আরশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে; পাথর তাঁকে সালাম করেছে; হিংস্র জন্তু তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিয়ে বলেছে–

أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلَ اللهِ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।

এ জাতীয় রেওয়ায়াতসমূহ সনদে মুত্তাসিল ও সহি বর্ণনার সাথে বিদ্যমান রয়েছে, যার ধারাবাহিক সনদ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মিলিয়ে দিতে পারি। যেই পঞ্চাশ হাজার বর্ণনাকারী হাদিস বর্ণনা করেছেন মুসলমানগণ তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন। তাঁদের বংশপরিচয় কী ছিল, তাঁদের সত্যবাদিতা বা মিথ্যাবাদিতার ধরন কেমন ছিল এসব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে লিখে রাখা হয়েছে। যেই সনদের ভিত্তিতে আজ আমরা রেওয়ায়াত বর্ণনা করে থাকি সে সনদের প্রত্যেক ব্যক্তির ইতিহাসও আমরা বর্ণনা করতে পারি। বলতে পারি যে, আমার উস্তাদ এমন ছিলেন, তাঁর শান এমন ছিল, তাঁর উস্তাদ ছিলেন এমন, তার কর্মকাণ্ড ছিল এমন, প্রভৃতি আমরা বলে দিতে পারি। একদিকে সনদের ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত রয়েছে অপর দিকে পঞ্চাশ হাজার বর্ণনাকারীর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এঁদের মাধ্যমে কুরআন ও হাদিস আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

নির্ভরতার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো সনদ ও রেওয়ায়াত। সে ক্ষেত্রে কুরআনের সনদের উর্ধ্বে (কিংবা সমকক্ষ) অন্য কোনো সনদ নেই। অন্যান্য কিতাবের কোনো সনদই আমরা খুঁজে পাই না। প্রত্যেক জমানায়, প্রত্যেক যুগে কুরআনুল কারীমের সনদের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি বিদ্যমান রয়েছেন যারা হিফজ

করার মাধ্যমে কুরআন সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ মাফ করুন, কেউ যদি সমস্ত কুরআন সমুদ্রে ফেলে দেয়, মিনিটের মধ্যে আবার লেখা হয়ে যাবে; লক্ষ লক্ষ হাফেজ বিদ্যমান রয়েছেন।

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ

এ আয়াতসমূহকে আল্লাহ তায়ালা আহলে ইলমের অন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। [আনকাবুত ২৯ : ৪৯]

কুরআনকে যদি সিন্ধুকে সংরক্ষণ করা হতো তাহলে সিন্ধুককে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হতো; যদি মাটিতে পুতে রাখা হতো, মাটি তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতো; যদি বাতাসে রাখা হতো, বাতাস কাগজ উড়িয়ে নিত। আল্লাহ তায়ালা এ কুরআনকে এমন জায়গায় হেফাযত করলেন– না সেখানে আগুন যেতে পারে, না পানি যেতে পারে আর না বাতাস বা মাটি যেতে পারে। আর সে স্থান হলো আহলে ইলমের কলব। এখানেই সংরক্ষিত রয়েছে কুরআন। শয়তান এবং জিনও এখানে পৌছতে পারে না। সুতরাং কুরআনের হেফাযত হলো এই, একই সময়ে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কুরআন বিদ্যমান রয়েছেন। হাদিসের হেফাযত হলো এই, এক একটি শব্দের সনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এত সনদযুক্ত কালাম গ্রহণযোগ্য হবে না তো যার কোনো সনদই নেই তা গ্রহণযোগ্য হবে? গ্রহণযোগ্যতা পেলে সর্বাগ্রে সনদযুক্তটাই পাবে। যদি মুসা ও ঈসা আ.-এর উপর ঈমান গ্রহণ করা জরুরি হয় তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান গ্রহণ তদাপেক্ষা আরো বেশি জরুরি। তাঁদের দীন অপেক্ষা বহুগুণ বর্ধিত দলিল এ দীনের রয়েছে বিধায় এর উপর ঈমান গ্রহণ করা উচিত।

পরকাল চিন্তা

এমন পরিপূর্ণ প্রমাণ সমৃদ্ধ দীন দেখার পর প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত নিজের মৃত্যু ও পরিণতির কথা ভেবে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করা। দীনের বৃহৎ কাজ হলো আখেরাত শুদ্ধ করা। কেননা আমাদের সবাইকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এ জগতের এই বিশাল কর্মযজ্ঞের এখানেই সমাপ্তি ঘটবে। না কোনো বৃদ্ধ বাকি থাকবে, না কোনো যুবক। শেষ পর্যন্ত সকলকেই সেই পরোয়ারদেগারের কাছে যেতে হবে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যেখান থেকে আমরা এসেছি।

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। [রূম ৩০ : ২৭]

তিনিই উদ্ভাবক এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন। সেখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছি এবং সেখানেই প্রত্যাবর্তন করব। যখন এমন একটা দিন আসছে যে দিনটিতে আমাদেরকে আল্লাহর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং এক একটি জিনিসের হিসাব দিতে হবে। এ অবস্থায় মানুষের উচিত সে জগতের জন্য কিছু সম্বল প্রস্তুত করা। অবশ্য সে জগতের সম্বল এই ভাত-রুটি নয়, দীনই হলো সেখানের জন্য একমাত্র সম্বল। আর সঠিক দীন হলো সেই দীন, যা সনদ দ্বারা প্রমাণিত, সনদে মুত্তাসিলের মাধ্যমে যার প্রমাণ পয়গম্বর পর্যন্ত সংযুক্ত। যেন মানুষ তাকে দীন বলে দৃঢ়-বিশ্বাসের সাথে মেনে নিতে পারে। মুসলমান হই বা হিন্দু হই, সবারই চিন্তাভাবনা করা কর্তব্য। প্রত্যেককেই তো তাঁর কাছে যেতে হবে, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।

তা ছাড়া মৃত্যুর সময় সম্পর্কে আমাদের তো জানা নেই। আল্লাহ জানেন কখন আসে মৃত্যু। এটা তো আল্লাহরই জ্ঞানে রয়েছে। মৃত্যুর ব্যাপারে অনেকের ভাবনা এমন– এখন তো যৌবনকাল, বার্ধক্য যখন আসবে তখন দেখা যাবে। আবার কেউ ভাবে– এখন তো শরীর সুস্থ রয়েছে, রোগব্যধী হলে তখন দেখা যাবে। কেননা মৃত্যু তো রোগের কারণে আসে। আমার বন্ধুগণ! মৃত্যুর জন্য না বার্ধক্য শর্ত, না রোগব্যধী শর্ত, আর না শৈশব শর্ত। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ– সকলেই মারা যায়। সুস্থ ব্যক্তিরাও মারা যায়, অসুস্থরাও মারা যায়। কেউ কেউ হার্টফেল করে মারা যায়, সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। যখন বার্ধক্য আসবে তখন তওবা করে নেব– এমন ভাবনা সম্পূর্ণ শয়তানী ধোঁকা। আবারও একটু ভাবুন, বার্ধক্য আসবে কি আসবে না তার কী নিশ্চয়তা রয়েছে? বরং আমি তো বলে থাকি যুবক অবস্থায়ই মানুষ বেশি মারা যায়, বৃদ্ধ হয়ে মারা যায় কম। এ কারণেই যে কোনো জনসমাবেশ, মাহফিল-মজমার প্রতি লক্ষ করলে দেখবেন, বৃদ্ধদের চোখে পড়ছে কম, যুবকদের দেখা যায় বেশি। এতে প্রমাণ হয়, যুবকরা মারা যায় বেশি। কেননা সবাই যদি বৃদ্ধ হয়ে মারা যেত তাহলে এসব সমাবেশে বৃদ্ধদের চোখে পড়তো বেশি। কিন্তু তা হয় না, যুবকদের বেশি দেখা যায়। বোঝা যাচ্ছে, বেশিরভাগ মানুষই বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছতেই পারে না, তারই পূর্বে শেষ হয়ে যায়।

মোট কথা, আপনি এমন ধোঁকায় পড়বেন না যে, যখন বার্ধক্য আসবে তখন ভাববো কিংবা যখন অসুস্থ হব তখন ভাববো অথবা মৃত্যুর আলামত যখন শুরু

হয়ে যাবে তখন সে বিষয়ে চিন্তা করব। মৃত্যু তো মুহূর্তের মধ্যে এসে যায়। দাঁড়ানো থেকে বসার অবকাশটুকু পর্যন্ত থাকে না।

সম্মুখের মঞ্জিল

তিনজন পয়গম্বর এমন রয়েছেন যাঁদের হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। হযরত দাউদ আ., হযরত সুলায়মান আ. ও হযরত ইউসুফ আ.। তিনজনের মৃত্যুই হয়েছে হঠাৎ করে। তো আম্বিয়া আ. যখন এই দুনিয়া থেকে হঠাৎ বিদায় নিতে পারেন তাহলে আমার আপনার অবস্থা কী দাঁড়ায়? কী নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি? মোটকথা, মৃত্যুর জন্য প্রকাশ্য আলামত জরুরি নয়। কত মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এমন হাজারো ঘটনা রয়েছে। এ কারণে যেহেতু সবারই মঞ্জিল সমাগত, সেহেতু সকলেরই এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং অন্তর দিয়ে ভাবা উচিত।

সত্যধর্মের সহজ পরিচয়

মানুষের অন্তর অত্যন্ত সৎ, অন্তর মুনাফেক হয় না। অন্তর মানুষকে সঠিক পরামর্শ দেয়। নানা দিকের বন্ধুরা নানা পরামর্শ দেয়, ভুল পরামর্শও দেয় কিন্তু অন্তর প্রশান্তি পায় না। যতক্ষণ না আপনি সঠিক বিষয়টি চিন্তাভাবনা করে নির্ধারণ করবেন, অন্তর শান্তি পাবে না। যেহেতু অন্তর আমাদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয় সেহেতু দীন গ্রহণের ব্যাপারেও অন্তর দিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে সঠিক দীন কোনটি? দেখতে হবে যে, রেওয়ায়াত ও সনদের ভিত্তিতে কোন দীনটি সঠিক। তালিমের দিকে দৃষ্টি দিন, দেখুন কোন দীনটির তালিম বিশুদ্ধ, পবিত্র ও সত্য-মিথ্যাকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশকারী। যখন সবকিছু বুঝে আসবে এবং অন্তরও সাক্ষ্য দেবে তখন চটজলদি তা গ্রহণ করা উচিত। আমার সম্প্রদায় কী বলবে, আমার আত্মীয়স্বজনরা কী বলবে এসব ভাবা চলবে না। পরপারে গিয়ে না আত্মীয়স্বজন কাজে আসবে, না গোষ্ঠী-জ্ঞাতি কাজে আসবে, ওখানে তো শুধুই নিজের দীন ও আমল কাজে আসবে এবং আল্লাহর কাছে কেবল একা গিয়ে পৌঁছবেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَّا
خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۚ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ

زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ○ الأنعام ٦: ٩٤

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আজ তুমি একাকী আমার কাছে এসে গেছ, যেমনিভাবে আমার নিকট থেকে একাকী গিয়েছিলে। কেননা তোমার সৃষ্টির ব্যাপারে কেউ শরিক ছিল না, আমি একা তোমাকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি এবং তুমি একা সেখানে গিয়ে পৌঁছেছ। যেভাবে তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে তুমি আমার কাছে এসেছ। যেসব জিনিসের উপর তুমি ভরসা করেছিলে আজ সেসব পেছনে ফেলে এসেছ, এদেরকে তুমি সুপারিশকারী বন্ধু মনে করেছিলে। আজ আমি তোমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী দেখছি না, কোনো সাহায্যকারী দেখছি না। যাদেরকে তোমরা আমার শরিকদার ভাবতে, মনে করতে যে, আল্লাহর সাথে মিলে এরা আমাদের জন্য নাজাতের ব্যবস্থা করবে, তোমাদের সেই সুপারিশকারীরা আজ কোথায়? তোমাদের সকল আশা নিষ্ফল হয়ে গেছে। তোমাদের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

এ কারণেই আমার পরামর্শ হলো এই– দীনের ব্যাপারে মানুষ তার অন্তর দিয়ে চিন্তাভাবনা করবে, নিজের মনের নিকট থেকে পরামর্শ নেবে। মৃত্যু ও পরকালকে সামনে রেখে চিন্তা করবে। চিন্তা করার সময় এ বিষয়গুলো সামনে রাখবে না যে, আমার মালামালের পরিমাণ কত? আমার উপদেষ্টা কয়জন? আমার প্রিয়জন কতজন? এগুলোর কোনোটাই নাজাতের ব্যবস্থা করবে না এবং সাথেও কেউ যাবে না। অন্তর সাথে যাবে, বিশ্বাসও যাবে। এ জন্যই এগুলোকে নিজের কাছে রাখুন।

হযরত হাতিম আসাম্মার ঘটনা

হযরত শাকিক বলখী রহ.-এর মুরিদ ও খলিফা হযরত হাতিম আসাম্মা রহ. ছিলেন একজন বড় বুযুর্গ। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর তিনি হযরত শাকিক বলখী রহ.-এর সান্নিধ্যে ছিলেন। এখানে থেকে তারবিয়াত ও আত্মশুদ্ধির তালিম লাভ করেছেন। তেত্রিশ বছর পর হযরত শাকিক বলখী রহ. জিজ্ঞেস করলেন, এই তেত্রিশ বছর আমার কাছে থেকে তুমি কী অর্জন করলে? হযরত হাতিম আরজ করলেন, আমি আটটি মাসয়ালা আয়ত্ত করেছি। জিজ্ঞেস করলেন– মোটে আটটি মাসয়ালা? তিনি আরজ করলেন, হ্যাঁ, মোট আটটি।

হযরত বলখী রহ. বললেন, আমারও সময় নষ্ট করেছ এবং তোমারও সময় নষ্ট করেছ। আরে আল্লাহর বান্দা! এই দীর্ঘ তেত্রিশ বছর বসে মাত্র আটটি মাসয়ালা শিখলে? তো সেই আটটি মাসয়ালা কী?

প্রেমাস্পদ নির্বাচন

প্রথম মাসয়ালা হলো এই, আমি দেখলাম যে, পৃথিবীতে প্রত্যেকেরই কারো না কারো সাথে মুহাব্বত রয়েছে। সে তার মাহবুবের চিন্তায় বিভোর থাকে। প্রত্যেকেই চায় আমার মাহবুব, আমার প্রেমাস্পদ আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক। আমি যেন তার সাথে মিলেমিশে থাকতে পারি, আমাদের মধ্যে যেন দূরত্ব ও বিচ্ছেদ না থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর এই সকল মাহবুব পৃথক হয়ে যায়। যাকে সে ভালবেসেছিল সে ব্যক্তি না সাথে কবরে যায় আর না হাত ধরে সঙ্গ দেয়। এ কারণেই আমি যখন কুরআনুল কারীমে দেখলাম যে, আমল মানুষের সাথে কবরে যায় তখন সৎকর্মের সাথে মুহাব্বত করলাম এবং অন্য সবার থেকে ভালবাসা ত্যাগ করলাম। যাতে করে আমার মাহবুব কবরেও আমার সঙ্গ দেয়, আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকে। তো আপনার সন্নিধ্যে থেকে আমি এই মাসয়ালাটি শিখলাম যে, সকল বন্ধুদেরকে ত্যাগ করে একমাত্র আমলে সালেহকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছি, এ জন্য যে, কোনো বন্ধু কবরে আমার সাথে যাবে না। না স্ত্রী, না বন্ধুবান্ধব আর না সন্তানসন্ততি। আমলই কেবল সঙ্গে যাবে। এ জন্যই তাকে বন্ধু বানিয়েছি এবং অন্যসব বন্ধুকে ত্যাগ করেছি।

শত্রু নির্ধারণ

দ্বিতীয় যে বিষয়টি শিখলাম তা হলো, আমি দেখলাম পৃথিবীতে প্রত্যেকেরই কারো না কারো সাথে সক্রতা রয়েছে এবং সে তার থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা ও চিন্তা করছে। অপরপক্ষ তাকে নিচু করে রাখার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। এভাবে দু'পক্ষ সংঘাতময় অবস্থায় থাকে। কিন্তু একদিন সকল শত্রু শেষ হয়ে যায় এবং সে একা হয়ে পড়ে। এখন কথা হলো মানুষ কার শত্রুতা হতে আত্মরক্ষা করবে? সৈন্য বাহিনী থেকে নিজেকে রক্ষা করবে? সিপাহীর শত্রুতা হতে নিজেকে রক্ষা করবে? নাকি সাপের শত্রুতা হতে? নাকি বিচ্ছুর শত্রুতা হতে? চারদিকে শুধু শত্রু আর শত্রু। হাজারটা শত্রু। বাঁচার জন্য মানুষ কোথায় কোথায় দৌড়াবে? তো আমি কুরআনুল কারীমের দিকে দৃষ্টি দিলাম। সেখানে পেলাম–

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا.

শয়তান তোমাদের শত্রু, তাকে শত্রুরূপেই জ্ঞান কর। [ফাতির ৩৫ : ৬]

এ শয়তান জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাদের সাথে শত্রুতা করবে। সুতরাং আমি এই এক শয়তানের সাথে শত্রুতা রেখে অন্য সবার থেকে শত্রুতা প্রত্যাহার করলাম। তো আমি এক শয়তানের সাথে লড়াই করছি। তার সাথে লড়ে জিততে পারলে সকল শত্রু শেষ হয়ে যাবে। সকল শত্রুতার ভিত্তি হলো শয়তান। সুতরাং শয়তান ছাড়া কারো সাথে আমার দুশমনী নেই, বিরোধ নেই। তো দ্বিতীয় মাসয়ালা আমি এই শিখলাম।

এক সত্তার উপর নির্ভরতা

তৃতীয় মাসয়ালা এই, আমি দেখলাম পৃথিবীতে প্রত্যেকেই কারো না কারো উপর নির্ভর হয়ে আছে। কেউ টাকা পয়সার উপর নির্ভর হয়ে রয়েছে এবং সে মনে করছে যে, আমার কাছে সম্পদ রয়েছে। আমি যা ইচ্ছা তাই করব। কেউ স্থাবর সম্পত্তির উপর নির্ভর হয়ে রয়েছে। কেউ কেউ শাসন ক্ষমতাকে, কেউ কেউ আত্মীয়তাকে নির্ভরতার আশ্রয় করে রেখেছে। আমি কুরআনুল কারীমে দৃষ্টি দিয়ে জানতে পারলাম, সকল আশ্রয় শেষ হয়ে যাবে, কেবল এক আল্লাহর আশ্রয় বাকি থাকবে।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। [আত-তালাক ৬৫ : ৩]

সুতরাং আমি এক আল্লাহকে আমার নির্ভরতার আশ্রয় নির্ধারণ করেছি এবং অন্যসব আশ্রয়কে ত্যাগ করেছি।

এভাবে তিনি অন্যান্য মাসয়ালাসমূহ বর্ণনা করলেন।

সারকথা হলো, একই সত্তাকে নিজের আশ্রয় নির্ধারণ করো, একজনকেই মাবুদ বানিয়ে নাও এবং তারই দিকে রুজু হও। পার্থিব শত্রুতাও পরিহার কর, পার্থিব ভালবাসাও পরিহার কর। যদি ভালবাস তাও একমাত্র আল্লাহর জন্য, যদি শত্রুতা পোষণ কর তাও একমাত্র আল্লাহরই জন্য। যার অর্থ হলো এই– তোমার মাহবুব, তোমার ভালবাসার পাত্র একজনই– আল্লাহ। আর তোমার ঘৃণার পাত্র

হলো শয়তান। আল্লাহ বলেছেন, সদা-সর্বদা শয়তানকে তোমার শত্রু জেনো। তার সাথে শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপন কর। আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব কর এবং নিজ অন্তর দ্বারা ফয়সালা কর। অর্থাৎ দীন এবং আখেরাতের ব্যাপারে মানুষকে একই চিন্তা করতে হবে। এ ব্যাপারে কারো উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। নিজের অন্তরের সহায়তায় নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। অন্তর দ্বারা চিন্তা কর এবং গভীরভাবে বিশ্লেষণ কর। সত্য যখন স্পষ্ট হয়ে যাবে তখন ঘোষণাসহকারে তাকে গ্রহণ কর। কে কী বলবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করো না। কে বলবে আর কী-ই বা বলবে? যারা বলার তারা বলতেই থাকে, তাদের কথাকে গুরুত্ব দেবেন না। নিজের অন্তরের ডাকে সাড়া দিন।

সমসাময়িক পয়গম্বরের আনুগত্যই নাজাতের ভিত্তি

কুরআনের বক্তব্য হলো তোমরা স্বীয় ঈমানকে দৃঢ় কর। ঈমানের ব্যাপারে কোনোরূপ পক্ষপাতিত্বের অবকাশ নেই। গোঁড়ামি ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবকাশ নেই। ব্যক্তিসত্তা, বর্ণ, ভূখণ্ড, দেশ ও সম্প্রদায় বিষয়ক পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্যের অবকাশ রেখ না। শুধু এক আল্লাহর উপর ভরসা কর, এক নবীর কথা মান্য কর। এ যুগে কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মান্য করার মধ্যেই নাজাত সীমাবদ্ধ। যুগ ও কাল যার হয়, নাজাতও তাকে মান্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এ যুগে কেউ যাদি বলে আমি মুসা আ.কে মান্য করি এবং এর দ্বারা আমি মুক্তি পেয়ে যাব, তাহলে তা ভুল হবে। যুগের নবী হলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ যুগ তাঁর যুগ। এখন তাঁকে মানার মধ্যে নাজাত নিহিত। অন্য কাউকে মানলে নাজাত জুটবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَه إِلاَّ إِتِّبَاعِىَ

আজ যদি হযরত মুসা আ.ও জীবিত হয়ে আসেন, আমার আনুগত্য ছাড়া তাঁর কোনো উপায় থাকবে না।

তাঁর নাজাতও আমার দীন মান্য করার মধ্যে নিহিত থাকবে। কেননা আমি হলাম এ সময়ের, এ যুগের নবী। এখন আমার নবুওয়াতের যুগ চলছে।

আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হলেন ফখরুদ্দিন আলী আহমদ। তার দস্তখতের মাধ্যমে ভারতে আইন জারি হচ্ছে। অতীতে যারা রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, এখন তারা আর রাষ্ট্রপ্রধান নন। তাদের কেউ যদি জীবিতও হয় এবং দাবি করে বসে যে,

আমি এ বিধান, এ আইন মানি না। আমি মানি ঐ বিধান যা পূর্বযুগে জারি হয়েছিল। এ রাষ্ট্রপ্রধানের আইন আমি মানি না। এমনটি বলা হলে তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী মনে করা হবে, তাকে ফাঁসী দেওয়া হবে। তাকে বলা হবে, আজ হলো ফখরুদ্দিন আলী আহমদ-এর যুগ। ইনি যা বলবেন, যে বিধান জারি করবেন তাতেই মুক্তি নিহিত। অন্য কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বিধান আজ চলবে না।

অথবা প্রাক্তন কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বললো, যেহেতু আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম সেহেতু এখনও আমার সে অবস্থান রয়েছে। কাউকে মান্য করা না করা আমার ইচ্ছা। আমি এ দেশের প্রেসিডেন্ট। তখন দেশের সরকার তার বিরুদ্ধে এই মর্মে মামলা করবে যে, দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হলেন ফখরুদ্দিন আলী আহমদ, আপনি নন। আপনাকে তার আনুগত্য করতে হবে। তিনি যে আইন করবেন আপনাকে তা মানতে হবে। এটা আপনার শাসনকাল নয়।

সুতরাং যিনি যুগের দায়িত্বশীল হন তার আনুগত্যের মধ্যে নাজাত নিহিত থাকে, সীমাবদ্ধ থাকে। যখন জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের বরকতময় যুগ এল এবং খাতামুন নাবিয়্যিন হিসেবে তিনি একটি শরীয়ত উপস্থাপন করলেন তখন তাকে মান্য করার মধ্যেই নাজাত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। তাঁকে মান্য করা ব্যতীত মুক্তির বিকল্প কোনো পথ নেই। আজ যদি কেউ বলে আমি তাওরাতকে মানি কিংবা ইঞ্জিলকে মানি, তাহলে নাজাত মিলবে না। এগুলোর যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন কুরআনের যুগ। এ কুরআনকে মান্য করার মধ্যেই নাজাত সীমাবদ্ধ।

যা হোক, অত্র আয়াত দ্বারা এ মাসয়ালা নির্গত হলো যে, নানারূপ কথা ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে ঈমান গ্রহণ করে নাও:

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

আমরা নবীগণের মধ্যে এমন পার্থক্য করি না যে, কাউকে মানবো এবং কাউকে মানবো না। আমরা সকলেরই আনুগত্য করি, সকলকেই মান্য করি। সকলের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করি। [বাকারা ২ : ১৩৬]

কুরআনকে অস্বীকার করা সকল কিতাবকে অস্বীকার করার নামান্তর

সকল নবীকে মেনে নেবার এই যে শিক্ষা, এ শিক্ষা আমরা কোথায় পেলাম? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই আমাদেরকে এ তালিম দিয়েছেন। তিনি সর্বাগ্রে মান্য করেছেন। তাঁর মানা মানে সবার মানা। কুরআনকে মানা হলে তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিলকে মানা হয়। কুরআনকে অস্বীকার করলে সবগুলোকে অস্বীকার করা হবে। কেননা কুরআনের তো সহি সনদ বিদ্যমান রয়েছে এবং তাওরাত-ইঞ্জিলের তা নেই। সুতরাং তাওরাত, যাবুর যে আসমানী কিতাব তা সঠিক দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত হয়। সে কারণেই কুরআনের মাধ্যমে এগুলোকে মান্য করব। এদিকে লক্ষ করেই কুরআনে বলা হয়েছে:

وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

(আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী) এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। [মায়েদাহ ৫ : ৪৮]

কুরআনুল কারীম সমগ্র আসমানী কিতাবের সংরক্ষক

কুরআনুল কারীম পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের সংরক্ষক। তাতে সঠিক তালিম যা ছিল কুরআন তা বলবৎ রেখেছে এবং পরবর্তীতে যা সংযোজন করা হয়েছে কুরআন তা ছুঁড়ে ফেলেছে। এ কারণেই কেউ যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন সে মুসলমান হবার সাথে সাথে খাঁটি ঈসায়ী (খ্রিস্টান)ও হয়ে যায়। এভাবে যে, সঠিক বিশ্বাসে হযরত ঈসা আ.-এর উপরও সে ঈমান আনলো। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি মুসলিম হলো সে সঠিক অর্থে ইহুদীও হল। কেননা সনদে মুত্তাসিলের সাথে সে মুসা আ.-এর উপর সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করলো। এভাবেই সে ইবরাহিমী হবে, আদমী হবে। অর্থাৎ ইবরাহিম ও আদম আ.-এর উপর ঈমান আনবে। পৃথিবীতে সনদে মুত্তাসিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মাত্র আসমানী কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। এ কিতাবই অন্যান্য কিতাবসমূহ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছে। এ কিতাবকে মেনে নেওয়া মানে সকল কিতাবকে মেনে নেওয়া। এ কিতাব আনীত দীনে প্রবেশ করা মানে সবকিছুকে নিজের সামনে নিয়ে আসা। এ কারণে আমাদের সকলের কর্তব্য হলো দীনের ব্যাপারে

সর্বপ্রকার সন্দেহ সংশয় পরিহার করা। দীনের ব্যাপারে অমুকে কী বললো, তমুকে কী বললো এসব পরিহার করুন। নিজের অন্তরের দিকে তাকান, অন্তর দিয়ে ভাবুন। যদি মানার মতো বিষয় হয় মেনে নিন এবং ঘোষণাসহকারে তা প্রকাশ করুন।

তিলাওয়াতকৃত আয়াতের আলোকে এ কথাগুলো আরজ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহ জানেন কামিয়াব হতে পারলাম কি না; এবং আয়াতের যে উদ্দেশ্যাবলি রয়েছে তা উপস্থাপিত হলো কি না? তবে আমি আমার যোগ্যতা ও সামর্থ্যের আলোকে কিছু বাক্য উপস্থাপন করলাম। আল্লাহ একে উপকারী করে তুলুন।

আপনি যখন আয়াতের মধ্যে চিন্তাভাবনা করবেন তখন এ কথাগুলো আপনার জেহেনে ভাস্বর হয়ে উঠবে। আপনি যতই চিন্তা করবেন ইনশা আল্লাহ এ থেকে ততই উপকৃত হবেন এবং উত্তম উত্তম ফলাফল লাভ করবেন। যা হোক, এই কটি কথা আমি আরজ করলাম। দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সামনে হককে হক এবং বাতিলকে বাতিলরূপে স্পষ্ট করে দিন।

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّ ارْزُقْنَا إِتِّبَاعًا، وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابًا – رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْلَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ – اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ– اَللّٰهُمَّ لاَ تَنْزِعْ مِنَّا صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنَا، رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِيْ أَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ. آمِيْنَ.

১৪ রবিউস সানী ১৪০৫ হিজরী।

বয়ান : ৪

মানব শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য

শূন্যে উড়ে বেড়ানোর কাজ আপনি যেমন করেন, পাখিরাও অদ্রূপ করে। আপনি যেমন কাপড় বুনে পোশাক বানান, শরীর আচ্ছাদিত করেন; পশুপাখি ও কীটপতঙ্গেরাও অদ্রূপ খোলস ও পর দ্বারা নিজের শরীরকে আচ্ছাদিত করে। আপনার পোশাক কৃত্রিম, তাদেরটা অকৃত্রিম ও কুদরতী। আপনি থাকার জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করেন, প্রাণীরাও তাদের উপযোগী ঘরবাড়ি বানায়। আপনি রুজির অন্বেষণে ঘরের বাইরে যান, মাঠে-জঙ্গলে যান, তারাও অদ্রূপ মাঠেঘাটে জঙ্গলে যায় এবং সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে বাড়ি ফেরে। আপনি জর্দা-পোলাও খান, তারা ঘাস-দানা খায়। গোশত খেতে হলে আপনাকে রান্না করে খেতে হয়, তারা এ ঝামেলা থেকে মুক্ত, তারা কাঁচাই খায়। তাদের ঘাস, দানাকে আপনি ঘৃণা করেন তো তারাও আপনার জর্দা-পোলাওকে ঘৃণা করে। মোটকথা, এমন কোনো স্বভাবসিদ্ধ কাজ নেই যাতে তারা আপনার সাথে সমকক্ষতার দাবি করতে না পারে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





আলোচ্য বয়ানটি সম্পর্কে কিছু কথা

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا

৭-৮ রবিউস সানী ১৩৭৮ হিজরী মোতাবেক ২১-২২ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে দারুল উলুম হক্কানিয়া, পাকিস্তান-এর বার্ষিক মাহফিল ও দস্তারবন্দি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাহ্যিকভাবেও এবং বরকতের দিক দিয়েও এ মাহফিলটি ছিল এক অনন্য মাহফিল। দারুল উলুমের ইতিহাসে নজির বিহীন এ মাহফিলটি ফায়দার দিক দিয়ে সদূর প্রসারী ফলাফলের ধারক হয়ে থাকবে। নিজস্ব দীপ্তি, মুসলমানদের অসীম আন্তরিকতা ও ভালবাসা, দেশ ও জাতির শীর্ষ আকাবির ও বুযুর্গগণের নির্মল সহমর্মিতা ও দোয়ার সাথে সাথে যুগের গর্ব হযরত হাকীমুল ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব সাহেব কাসেমী, মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ-এর বরকতময় অংশগ্রহণ মজলিসের শোভা, কল্যাণময়তা ও কামিয়াবীকে পূর্ণতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার অসীম নিয়ামত ও অনুগ্রহের ফলাফল এই যে, দারুল উলুম হক্কানিয়ার সূচনালগ্ন থেকেই আকাবিরে দেওবন্দ ও বুযুর্গ মাশায়েখগণের মোবারক দৃষ্টি ও নেক দোয়াসমূহ এদিকে বর্ষিত হয়ে আসছে। ইলম ও আমলের বিশ্বস্ত কেন্দ্র, ইসলামের সুদৃঢ় দূর্গ দারুল উলুম দেওবন্দ হলো অত্র দারুল উলুম হক্কানিয়ার ইলমের উৎসমূল– মাদারে ইলমী। দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক ও বন্ধনকে দারুল উলুম হক্কানিয়া তার সৌভাগ্য, কল্যাণ, সফলতা ও উন্নতির পরম পুঁজি মনে করে। এ বছর বার্ষিক মাহফিল ও দস্তারবন্দি সম্মেলনে হযরতুল মুয়াজ্জাম কারী সাহেবকে যখন দাওয়াত জানানো হলো তখন তিনি অনুগ্রহপরবশ পূর্বোল্লেখিত তারিখ নির্ধারণ করে দিয়ে ২০ অক্টোবর দারুল উলুমে তাশরিফ আনেন। ২১ অক্টোবর ফারেগিন ছাত্রদের দস্তারবন্দি করালেন এবং দারুল

উলুমের জামে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এ সম্মেলনে হযরত কারী সাহেব ছাড়াও পাকিস্তানের অধিকাংশ আকাবির উপস্থিত ছিলেন। যথা– শায়খুল হাদিস মাওলানা নাসির উদ্দিন গৌরগাশতী, হাফেজে হাদিস মাওলানা আব্দুল্লাহ্ দরখাস্তি, শায়খুল হাদিস ওয়াত-তাফসীর মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রিস কান্ধলবী, আল্লামা মাওলানা মামসুল হক আফগানী, মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ নাঈম লুধিয়ানবী, মাওলানা গোলাম গাউস হাজারভী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জালুন্ধরী, মাওলানা আব্দুল হান্নান হাজারভীসহ অসংখ্য আহলে ইলম ও আহলে ফজল। একুশ তারিখ দিবাগত রাতে মুহতামিম সাহেবের (দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম কারী তৈয়ব রহ.) এই প্রাজ্ঞাপূর্ণ জাদুকরী আলোচনাটি উপস্থাপিত হয়েছে। যা অসংখ্য আলেম-উলামা, জ্ঞানীগুণী ও চিন্তাবিদসহ হাজারো সাধারণ মুসলমানকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রতিটি বাক্যে হযরত হুজ্জাতুল ইসলাম, সাইয়েদুল ইমাম মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী রহ.-এর নূরের তাজাল্লির ঝলক এবং কাসেমী ইলম ও মারেফাতের যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ শান প্রদর্শিত হচ্ছিল। কাসেমী জ্যোতির প্রকাশক হযরত মুহতামিম সাহেব তাঁর এই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী আলোচনাটি এ সময় উপস্থাপন করেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে দার্শনিক সুলভ কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে বোধগম্য করে মানব-শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য উপস্থাপন করেছেন। সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের হাকিকত এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও উপকারিতা উপস্থাপন করার সাথে সাথে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলি উপস্থাপন করে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। উপস্থাপিত বিষয় কেন্দ্রিক অসংখ্য রহস্য ও হিকমত সম্পর্কে আলোকপাত করে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এক রাজপথ উন্মুক্ত করেছেন। নাস্তিকতা ও জড়বাদিতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবাদের এই প্রবল গতিশীল যুগে এমনই দলিল প্রমাণ, জোরালো আলোচনা ও অভিজ্ঞতাঋদ্ধ হাকিকত উপস্থাপনা দ্বারা পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় বিভ্রান্ত মস্তিষ্ককে চ্যালেঞ্জ করা যায়। যা দ্বারা পথহারা মানবতাকে স্বীয় হাকিকত, প্রকৃতি ও অবস্থানের স্বরূপ উপস্থাপন করা যায়। এই তুচ্ছ দুর্বল মাটির মানুষকে আল্লাহর খলিফা হওয়ার মতো দুর্লভ সম্মানিত স্থানে আরোহণ করানোর মতো অপার মহিমা উলুমে রব্বানী ছাড়া আর কার হতে পারে? নবুওয়াত ও রেসালাতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া এমন কী দ্যুতি আছে যা নিয়ে মানুষ হেদায়াত ও সৌভাগ্যের সুমহান স্তর 'নায়েবে নবী' তথা নবীর প্রতিনিধির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে?

এইসব হাকিকত ও জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে হযরত কারী তৈয়ব সাহেব আমাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছেন। বয়ানের হৃদয়গ্রাহিতা, আলোচনার আকর্ষণ,

বিষয়ের দ্যুতির্ময়তা এবং স্বয়ং হযরতের কামালাত ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ সমাবেশে كَأَنَّ عَلٰى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ (তাদের মাথায় যেন পাখি বসা ছিল)-এর দৃশ্য উপস্থাপন করেছিল।

মজলিস শেষ হবার কিছুদিন পরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত -দিগন্ত থেকে হযরতের আলোচনার প্রতিলিপি চাওয়া শুরু হয়ে যায়। খোদ দারুল উলুম হক্কানিয়াও ব্যাপক উপকার বিবেচনায় অত্র আলোচনাটি লিখে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যকীয় বলে মনে করে। বয়ান চলাকালে কিছু ওলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে দারুল উলুম হক্কানিয়ার সুযোগ্য উস্তাদ মুহতারাম মাওলানা শের আলী শাহ সাহেব যথাসম্ভব বয়ানটি লিখে রাখার চেষ্টা করেছেন। তথাপি বয়ান সংকলনের ব্যাপারে অস্পষ্টতা থাকাই স্বাভাবিক ছিল। যে কারণে সংকলিত তাকরিরের উপর হযরত কারী সাহেব কর্তৃক নজর বুলিয়ে দেওয়াকে জরুরি মনে করা হয়েছে। সে মতে তৈরিকৃত পাণ্ডুলিপি হযরতের নিকট দেওবন্দে পাঠিয়ে দেওয়া হল। হযরত কারী সাহেব তার দীর্ঘ সফরসূচি ও মাদরাসা পরিচালনাসহ নানারূপ ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করে পাণ্ডুলিপিতে নজর বুলালেন এবং তাতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযুক্ত করলেন। হযরতের নিজের ভাষায়– 'গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ব্যস্ততা সত্ত্বেও রাত-দিন খেটে তৈরি করলাম, পাণ্ডুলিপিটি যেন নিজেকেই আবার নতুন করে লিখতে হল।'

এ দিকটির বিবেচনায় বক্ষমান বয়ানটি রচনার পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে। যদিও কিছুটা দেরিতে প্রকাশ পাচ্ছে; কিন্তু মূল্যবান সংযুক্তি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কারণে আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর হয়ে উঠেছে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এই ইলমী ও তাবলিগী ইহসানের বিনিময়ে হযরত কারী সাহেবকে সমস্ত আহলে ইলম ও মুসলমানদের পক্ষ হতে মহান প্রতিদান নসিব করুন। شكر الله مساعيهم আর পাঠকদেরকে আল্লাহর ফরমান وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ (পৃথিবীতে তাদেরকে কালিমায়ে তাইয়েবার প্রতি হেদায়াত করা হয়েছিল)-এর অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

সম্মানিত ভাই মাওলানা সাইয়েদ শের আলী শাহ সাহেবের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। যার রাতদিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে পৌঁছতে যাচ্ছে।

বুঝতে সহজ হওয়া এবং বিষয়বস্তুকে বিন্যস্ত করণার্থে শিরোনাম সংযোজনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে তা সংযুক্ত করা হয়েছে। শিরোনামগুলো এই অধমের দেওয়া। সে কারণে শিরোনাম দ্বারা সঠিক বিষয়বস্তু যদি ফুটে না উঠে থাকে, সে

অক্ষমতার দায়ভার আমারই। কিতাবের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিবেচনায় এর বাহ্যিক দিকটিও যথাসাধ্য সুন্দর করার চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি অনভিজ্ঞতার কারণে পূর্ণ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় মুদ্রণে ইনশা আল্লাহ তার তদারকি করা হবে।

এ সংকলনটিকে হযরত কারী সাহেব কর্তৃক নির্বাচিত নাম انسانی فضیلت کا راز (মানব শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য) নামে নামকরণ করা হল। وَالكِتَابُ يُقْرَءُ مِنْ عُنْوَانِه কিতাবের পরিচয় তার নামে।

دادیم ترا زگنج مقصود نشان :: گر ما نرسیدیم شاید تو برسی

লক্ষ্যের ঠিকানা তোমায় দিয়ে দিলাম। আমি যদি নাও পৌঁছতে পারি, হয়তো তুমি পৌঁছে যাবে।

وَالْحَمْدُ لله أوَّلاً وأخرًا وَ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه.

মুহাম্মাদ সামিউল হক
দারুল উলুম হক্কানিয়া
আকরাখাটক, পাকিস্তান
৩ শাবান ১৩৭৮ হিজরী, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ।

দোয়া ও অভিনন্দন

نَحْمَدُه وَ نُصَلِّى عَلىٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلىٰ اٰلِه وَ صَحْبِه أَجْمَعِيْنَ.

আজ ৬ রবিউস সানী ১৩৭৮ হিজরী দারুল উলুম হক্কানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হক সাহেবের নিমন্ত্রণে অধম এখানে এসে পৌছেছি এবং দারুল উলুমেই অবস্থান করেছি। আট বছর পর এই ইলমী মারকাজে এটা আমার দ্বিতীয়বার আগমন। ১৯৫০ সালে আমি যখন উপস্থিত হয়েছিলাম তখন এখানে মাদরাসার জন্য না কোনো স্বতন্ত্র জায়গা ছিল, না ঘর ছিল। একটি মসজিদে গরিবী অবস্থায় উস্তাদ ও ছাত্রগণ তালিমী কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। কিন্তু আট বছর পর দারুল উলুমকে আজ এ অবস্থায় দেখছি যে, এখানে এখন শানদার ভবন রয়েছে, প্রশস্ত মাঠ রয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জন্য সুশৃঙ্খল বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। নির্মাণ ও উন্নয়ন বিভাগ স্বতন্ত্রভাবে নিজ কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের নানা উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্রসংখ্যাও অনেক। বিষয় ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষকও অনেক রয়েছেন। ২৬০ জন ফারেগিন ছাত্রের দস্তারবন্দি হল। যাদের মধ্যে পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার ছাত্র ছাড়াও কাবুল ও কান্দাহারের ছাত্রও রয়েছে। একটি শানদার মসজিদের ভিত্তিও স্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধিত রয়েছে। আস্থা রয়েছে। তারা পূর্ণ ভরসার সাথে পতঙ্গের মত এই ইলমী প্রদীপের চারপাশে ভিড় করছে। এমনকি মাদরাসার মাহফিলও এক আজিমুশ্‌শান ইলমী উৎসবের রূপ ধারণ করেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ প্রতিষ্ঠানটি অত্র প্রদেশের সবচে বড় প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসাগুলোর কেন্দ্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। মাত্র সাত বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এই উন্নতিকে মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের খুলুসিয়াত ও লিল্লাহিয়াতের ফল ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

এই মুখলেসগণের প্রধান মুখলেস হলেন হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেব। তার ইখলা ও পরহিতৈষিতা সম্পর্কে আমি তখন থেকে অবগত যখন তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের একজন দক্ষ উস্তাদ হিসেবে দেওবন্দে অবস্থান

করছিলেন। দেশ বিভাগের পর বাধ্য হয়ে তাকে এখানে স্থায়ী হতে হয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দ এখনও তার বিচ্ছেদে ব্যথাতুর। তার নির্মল-নিষ্কলঙ্ক ইখলাসপূর্ণ স্বভাব ও খেদমতের মানসিকতাই এই সাত বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি মকতবকে মাদরাসা এবং মাদরাসা থেকে দারুল উলুমে পরিণত করেছে। অত্র দারুল উলুমের গণ্ডির মধ্যে ঢুকলে দারুল উলুম দেওবন্দ বলে সন্দেহ হয় এবং শেষ পর্যন্ত এ সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হয়ে যায়– যখন দেখা যায় যে, এ প্রতিষ্ঠানটি তার আকৃতি ও প্রকৃতিতে দারুল উলুম দেওবন্দের আকৃতি ও প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে এবং সে দরুল উলুম দেওবন্দই হয়ে উঠেছে।

দোয়া করি আল্লাহ যেন এই ফায়েজের উৎস ও তার প্রতিষ্ঠাতাকে স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ার ছায়াতলে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য এ মাদরাসাটি যেন হেদায়াতের নূর ও জ্যোতির মিনার সাব্যস্ত হয়।

মুহাম্মাদ তৈয়ব
মুদীর, দারুল উলুম দেওবন্দ
০৬-০৪-১৩৭৮ হিজরী।



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِه وَصَحْبِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا.

اَمَّابَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ○ قَالَ يٰاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ ج فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ لا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لا وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ○ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ○ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

দারুল উলুমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এই সমাবেশ দারুল উলুম হক্কানিয়ার পক্ষ হতে আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে এখন আপনি আমি সমবেত হয়েছি। সবাই আমরা দারুল উলুমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত রয়েছি। তা হলো মুসলমানদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে বের করে আলোতে নিয়ে আসা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইলমকে আমার আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করাই হলো যৌক্তিক। পূর্ববর্তী বক্তাগণও এ পর্যন্ত তাই করেছেন। ইলম প্রসঙ্গেই আলোচনা হয়ে আসছে। যাতে করে ইলমের প্রয়োজনীয়তা, ফজিলত এবং কাঙ্ক্ষিত তালিমের প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। এরই ধারাবাহিকতায় আমি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি। যে আয়াতে উক্ত বিষয়াবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইলমের কাঙ্ক্ষিত প্রকারসমূহ ও গুরুত্ব বয়ান করেছেন। ইলমের পথে কোন্ ইলম কাম্য ও উপকারী এবং কী তার প্রভাব তাও স্পষ্ট করেছেন।

এখন আমি সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের সামনে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। আল্লাহ যেন আপনাদেরকে বোঝার তাওফিক দান করেন। আমার ভাষা উর্দু এবং কিছুটা তালিবে ইলমসুলভ। যে কারণে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা আরবী শব্দ এসে পড়বে, সম্ভাবনা আছে যে এই সীমান্ত প্রদেশের ভাইদের তা বুঝতে কিছুটা কষ্ট হবে। যথাসাধ্য সহজ শব্দ দ্বারা আমি আমার মনের কথাগুলো ব্যক্ত করব এবং কথাগুলো অন্তরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করব। আশা করি বিশেষ দু'একটি শব্দ বুঝে না এলেও বিষয়বস্তুটি অবশ্যই বুঝে আসবে। তাও যদি না হয় তাহলে অন্তত সাওয়াব তো জুটবে। সাওয়াব পাওয়ার জন্য অর্থ বোঝা জরুরি নয়, শোনা জরুরি।

ভূমিকা

আয়াতের তাফসীর সংক্রান্ত আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ সংক্ষিপ্ত কিছু কথা আলোচনা করা জরুরি মনে করছি। এতে আয়াতের উদ্দেশ্য বোঝা সহজ হয়ে যাবে। বিষয়টি হলো এই– এই বিশ্বজগতের মালিক বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে তাকে পরিপূর্ণরূপে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং তাকে সজ্জিতও করেছেন। এতে নানারকম প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করেছেন। জমিনকে বিছানারূপে তৈরি করেছেন। অবগত করানো হয়েছে:

جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا

তিনি জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানা করেছেন। [বাকারা ২ : ২২]

আর এই বিছানার উপরে স্থাপন করেছেন আকাশের তাঁবু এবং তাকে বানিয়েছেন এক সংরক্ষিত ছাদ। বর্ণিত হয়েছে:

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا

আমি আকাশকে সুরক্ষিত এক ছাদ করেছি। [আম্বিয়া ২১ : ৩২]

এই ছাদকে আবার আলোকিত করা হয়েছে, যাতে এ ঘরের সর্বত্র আলোকিত থাকে। ইরশাদ হয়েছে:

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا○

বরকতময় সেই সত্তা যিনি আসমানকে করেছেন কক্ষপথ বিশিষ্ট এবং তাতে স্থাপন করেছেন একটি প্রদীপ (রূপী সূর্য) ও একটি দীপ্তিময় চন্দ্র। [ফুরকান ২৫ : ৬১]

অতঃপর সেই ছাদের সৌন্দর্যবর্ধক উপকরণ হিসেবে নক্ষত্রসমূহ স্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে অবহিত করিয়েছেন এভাবে:

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ

দুনিয়ার আকাশকে আমি নক্ষত্রের সজ্জা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। [সফফাত ৩৭ : ৬]

শুধু তাই নয়। এরপর সেই মাটির বিছানাকে বিস্তৃত করে তাকে এক সুপ্রশস্ত দস্তরখানে পরিণত করেছেন। যা থেকে সর্বপ্রকার শস্য, তরিতরকারি, ফলমূল, খাদ্য ও ঔষধ উৎপন্ন হয়। টক, মিষ্টি ও নোনতাসহ নানা স্বাদের ফল ও দানা উৎপন্ন হয়ে আসছে। এ বিষয়ে তিনি এভাবে অবহিত করিয়েছেন:

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ۙ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ .

তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি।

খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে। এবং আঙুরের বাগান, জলপাই, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। [আনআম ৬ : ৯৯]

এই উদ্ভিদসমূহকে কার্যকর রাখতে ও বাঁচিয়ে রাখতে পানিপূর্ণ বাতাসের ব্যবস্থা রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। [হিজর ১৫ : ২২]

জমিনকে বিছানা ও নিয়ামতের উৎস বানানোর সাথে সাথে একে পথ বিশিষ্টও করেছেন। চলাফেরা করার জন্য স্থানে স্থানে রাস্তার ব্যবস্থা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ○ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا○

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিছানা। যাতে তোমরা প্রশস্ত পথে চলাচল করতে পার। [নূহ ৭১ : ১৯-২০]

বিশ্বজগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

এই বিশ্বজগৎকে একটি বিশাল বিল্ডিং এবং উন্নত শানদার এক অট্টালিকা পর্যায়ের করে তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে পানাহার, চলাফেরা, বসবাস, নিদ্রা-জাগরণ ও কাজকর্মের সকল উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। বিশ্বজগতের এই গঠন ও বিশেষ নির্মাণশৈলী যেন ডেকে ডেকে বলছে, জীবনঘনিষ্ঠ এই ভবনটি এমন কোনো বসবাসকারীর জন্যই তৈরি হয়েছে যাদের এসবের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ জগৎ নিজে কোনো উদ্দেশ্য নয়, অন্য কারো উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। শুধু ভবন নির্মাণই উদ্দেশ্য নয়। নিঃসন্দেহে এমন কোনো বসবাসকারী দ্বারা আবাদ করা উদ্দেশ্য যাদের এ উপকরণগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এগুলো ব্যবহারের যোগ্যতাও তাদের রয়েছে। যাতে এই বিশাল আয়োজনের সবকিছু কাজে লাগে, আবাদ থাকে এবং সৌন্দর্য বাড়ে। কেননা বসবাসকারীবিহীন বাড়ি বিরান, ভূতুড়ে ও শোভা-সৌন্দর্যহীন হয়ে যায়। সুতরাং এ জগতের ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ড ও ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার দেখে অনুমিত হয় যে, এ বিল্ডিং-এ বসবাসকারীকে অনুভূতিসম্পন্ন মাখলুক হতে হবে,

এরাই কেবল এগুলো ব্যবহার করতে সক্ষম। এমন অনুভূতিসম্পন্ন মাখলুক চার প্রকার।

অনুভূতিসম্পন্ন মাখলুকের চারটি প্রকার

একটি হলো প্রাণীকুল। যাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য প্রকার। ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, টিয়া, ময়না, বাঘ, সিংহ, সাপ, বিচ্ছু, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি এই দলভুক্ত। দ্বিতীয় হলো জিন জাতি। এদেরকে চোখ দ্বারা দেখা যয় না, নিদর্শন দ্বারা অনুভব করা যায়। বংশধারার দিক দিয়ে এরা বিভিন্ন গোত্র ও খান্দানে বিভক্ত। তৃতীয় হলো ফেরেশতাগণ। এরা নূরের তৈরি অতিশয় সূক্ষ্ম দেহধারী বিধায় এদেরকে দেখা যায় না। এরা নারী-পুরুষ হওয়া এবং বংশবিস্তার করা থেকে পবিত্র। চতুর্থ হলো মানব জাতি। এরা পৃথিবীর সর্বত্র নিজস্ব কর্মকাণ্ডে রত রয়েছে।

এই চার ধরনের মাখলুক নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি রাখে এবং এই বিশ্বভূবনের অধিবাসী হওয়ার যোগ্য। এই আসমান ও জমিনে এদের অধিকার রয়েছে। বিশ্বজগতের মালিকের পক্ষ থেকে তারা এ অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। এ অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার অধিকার কারোর নেই। খাদ্য, বাসস্থান, আত্মরক্ষা, জীবন-যাপন প্রভৃতিতে সবারই অধিকার রয়েছে। তাদের অধিকার রয়েছে বসবাসের জন্য জায়গা খুঁজে নেবার, খাদ্যের জন্য উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করার। এদের জায়েজ-হকের মধ্যে যে-ই প্রতিবন্ধক হবে, নিঃসন্দেহে সে-ই অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

প্রত্যেক প্রকারের স্বতন্ত্র অধিকার এবং ইসলামে তার হেফাযত

ইসলামী শরীয়ত যেভাবে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করেছে অদ্রূপ প্রাণীদের অধিকারও পুরোপুরিভাবে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে।

হাদিস শরীফে এসেছে, একবার একটি উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে কিছু একটা বলল। তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। উটটি এসেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়ে মাথা রেখে নিজের মতো করে কিছু একটা বলল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের মালিককে ডাকালেন। উপস্থিত হবার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার উট তোমার নামে এই অভিযোগ করেছে যে, তুমি তার দ্বারা শক্তি-সামর্থ্যের চেয়ে অধিক বোঝা বহন করাও। উক্ত ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অভিযোগ সত্য। বাস্তবিকই আমি এ অপরাধে অপরাধী। আমি তওবা করছি, সামনে আর এমন করব না।

রাসূলের দরবার থেকে উক্ত বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ

কোনো এক সাহাবী পাখির বাচ্চা ধরে আনলেন। মা পাখিটি হয়রান-পেরেশান হয়ে তার মাথার উপর উড়ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাচ্চাগুলো ছেড়ে দেওয়ালেন। বললেন, কেন এদের স্বাধীনতা হরণ করছ? কেন মাকে কষ্ট দিচ্ছ?

সাপ-বিচ্ছু ও বিভিন্ন সরীসৃপ মাটিতে গর্ত করে নিজেদের ঘর তৈরি করে। এ দিকটি বিবেচনা করে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে যে, কোনো গর্তকে লক্ষ্য করে তাতে প্রস্রাব করো না। এতে তোমাদের জন্য যেমন উপকারিতা রয়েছে যে তারা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে তোমাদেরকে কষ্ট না দেয়, তদ্রূপ ঐ জীবদেরও এ উপকারিতা রয়েছে যে, তাদের বসবাসের ঘরকে নষ্ট করে তাদেরকে ঘরহারা করলে না কিংবা তাদের আশ্রাস্থলকে নোংরা করলে না। এরূপ করার অধিকার তোমাদের নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মদীনার বাইরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। এক গ্রাম্য ব্যক্তির বাড়ির সামনে একটি হরণীকে বাঁধা দেখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেই হরিণীটি চিৎকার শুরু করে দিল (হরিণী তার ভাষায় যা বললো তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই) হে আল্লাহর রাসূল! এখানের এক কৃষক আমাকে ধরে এনেছে। ওদিকে পাহাড়ে আমার বাচ্চারা ক্ষুধায় ছটফট করছে। আপনি আমাকে অল্প একটু সময়ের জন্য ছেড়ে দিন, বাচ্চাদেরকে দুধপান করিয়ে আসি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ওয়াদাখেলাফ করবে না তো? হরিণী আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সত্য-ওয়াদা করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটিকে ছেড়ে দিলেন এবং ওয়াদামতো দুধ পান করিয়ে সেটি দ্রুত চলে এল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হরিণীটিকে আবার পূর্বের ন্যায় বেঁধে রাখলেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ব্যক্তির কাছে ঘটনাটি বলে হরিণীকে ছেড়ে দেবার জন্য সুপারিশ করলেন। লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরোধে ছেড়ে দিল। হরিণী রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দোয়া করলো। আনন্দে লাফাতে লাফাতে পাহাড়ে গিয়ে বাচ্চাদের সাথে মিলিত হল।

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের হক রক্ষা করেছেন। খুলে দেবার দ্বারা প্রাণীটির হক রক্ষিত হয়েছে। মাতৃ-মমতা রক্ষিত হয়েছে। বাচ্চাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মরতে দেখে তার মন যেন ব্যথিত না হয়। বাচ্চার হক রক্ষিত হয়েছে তার প্রাণ বাঁচাবার মাধ্যমে। মানুষের অধিকারও এভাবে রক্ষিত হয়েছে যে, হরিণী ফিরে আসার পর দ্বিতীয়বার তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঁধেছেন। এতে স্পষ্ট হলো, জবলি জানোয়ার ধরে তাকে পালন করা বা ব্যবহার করার অধিকার মানুষের রয়েছে। এতে বাধা দেওয়া যায় না। সাথে সাথে ওয়াদাপালনেরও তালিম রয়েছে। যখন জানোয়ারদের পর্যন্ত ওয়াদা পূরণ করা কর্তব্য, তখন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্য কেন কর্তব্য হবে না?

প্রাণীদের অধিকার

কুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, শহরের পোষাপ্রাণী এবং কাজকর্মে ব্যবহৃত প্রাণীদের জন্য শহরের পাশে এমন কিছু খালি জমি রাখা আবশ্যক যাতে কোনো চাষাবাদ হবে না। পশুরা এখানে চড়ে বেড়াবে এবং ঘাস-পানি খাবে। এভাবে তারা তাদের জায়েজ অধিকার ভোগ করবে এবং তাদের স্বাধীনতা বজায় থাকবে।

নেক-স্বভাব এবং পবিত্র আত্মার অধিকারী ব্যক্তিরা সর্বদা পশুপাখিদের অধিকার রক্ষা করেছেন। আমাদের দারুল উলুম দেওবন্দের মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মিয়া আসগর হুসাইন সাহেব খানা খাওয়ার পর রুটির ছোট ছোট টুকরা এবং উচ্ছিষ্টগুলো ছাদের উপর ফেলাতেন। এগুলোতে পাখিদের অধিকার রয়েছে। রুটি থেকে ছোট ছোট যেসব কণা নির্গত হতো সেগুলো পিঁপড়াদের গর্তের কাছে রাখতেন। এগুলোতে এসব ক্ষুদ্র ও দুর্বল প্রাণীদের অধিকার রয়েছে।

হাদিস থেকে জানা যায়, কোনো প্রাণীর অন্তরে দুঃখ দেওয়া এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া কখনোই জায়েজ নেই। এক নেককার ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে যে, সে একটি বিড়ালকে রুমে আটকে ক্ষুধা-পিপাসায় কষ্ট দিয়ে মেরেছে। পক্ষান্তরে অশ্লীল কর্মে লিপ্ত থাকা এক নারী শুধু এ কারণে জান্নাতে গিয়েছেন যে, তিনি একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছেন। হাদিসে এগুলোর বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ইসলামী শরীয়তে জানোয়ার জবেহ করার সময় অন্য জানোয়ারের সামনে জবেহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এতে উক্ত জানোয়ারটি কষ্ট পায় এবং চোখের সামনে এক স্বজাতীয় প্রাণীকে জবেহ হতে দেখে তার আত্মা শুকিয়ে যায়। মোটকথা, জীবজন্তুদের এ পৃথিবীতে বসবাস করা, পানাহার করা এবং নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা লাভের অধিকার রয়েছে। এ অধিকার রক্ষা করার নির্দেশ এবং ক্ষুণ্ন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

তবে হ্যাঁ, কোনো প্রাণী যদি কষ্টদায়ক হয় তাহলে তাকে মারার অধিকারও দেওয়া হয়েছে। এটা শুধু প্রাণীদের সাথেই নির্দিষ্ট নয়, মানুষের বেলায়ও হদ, কিসাস, জেল, কয়েদ, হত্যা প্রভৃতির বিধান রাখা হয়েছে। কষ্টদায়ক প্রাণী যেমন সাপ-বিচ্ছুকে হারাম শরীফের মধ্যেও নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। قَتْلُ الْمُؤْذِيْ قَبْلَ الْإِيْذَاءِ (কষ্টদায়ক প্রাণীকে কষ্ট দেবার পূর্বেই হত্যা করা)-এর বিধানও রাখা হয়েছে। কিন্তু এতে প্রাণীদের অধিকার রক্ষায় বিঘ্ন ঘটে না।

জিনদের অধিকার

জিন জাতিও এই জগতের অধিবাসী। তাদেরও অধিকার রয়েছে। তাদেরকে থাকার জায়গা, খাদ্য ও বসবাসের অধিকার দেওয়া হয়েছে। জিনদের অধিকার ক্ষুণ্ন করার অধিকার কারো নেই। মরুভূমি ও বিরান প্রান্তরে তারা যেমন বসবাস করে তেমনি তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে আমাদের ঘরেও বসবাস করার। হাদিস থেকে জানা যায়, প্রত্যেক ঘরেই জিনরা বসবাস করে। যেহেতু তারা তাদের কাজ করে এবং আমরা আমাদের কাজ করি সেহেতু আমরা জানতেও পারি না যে, কোন জিন আমাদের ঘরে বসবাস করছে। অবশ্য যেগুলো দুশ্চরিত্রের ও খারাপ প্রকৃতির, যারা আমাদেরকে কষ্ট দেয় সেগুলো যখন কোনো ঘরে অবস্থান নেয় তখন আমরা বলি যে অমুক ঘরে জিনের আছর আছে। তখন আমরা 'আমেল'-এর কাছে যাই। তারা বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে তাদেরকে বন্দি করে কিংবা জ্বালিয়ে দেয়। জিন যদি অন্যায় করে, খারাপ কাজ করে তখন তার মোকাবেলা করার, এমনকি হত্যা করারও অধিকার দেওয়া হয়েছে।

জিনদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম

নেককার ও মুমিন জিনদেরকে আমাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবার অধিকার আমাদের নেই। তাদের নেকী ও ইবাদত দ্বারা আমরাও উপকৃত হই। বাকি

থাকলো বদজিন ও কষ্টদায়ক জিন। এমন স্বভাবের মানুষদেরকেও তো রেহাই দেওয়া হয়নি, জিনরা তো আরো দূরের ব্যাপার। মোটকথা, বাস্তবতা হলো এই, জিনদের মধ্যে সব ধরনের চরিত্রই রয়েছে। নেককারও আছে, খারাপও আছে। মুসলমানও আছে, অমুসলিমও আছে। মুশরিকও আছে আবার ইহুদী-নাসারাও আছে। কুরআন মাজিদে এদিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বে জিনরা আসমানের দরোজা পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ পেত, ওখানে গিয়ে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনে ওহীর দু'একটি শব্দ চুপিসারে শুনে ফেলতো। এরপর তারা ওর সাথে নিজেদের পক্ষ হতে কিছু মিথ্যা সংযুক্ত করে তারা যেসব মানুষের অনুগত ছিল তাদেরকে জানাতো। যাদের পোষ্য জিন ছিল তারা এভাবে জিনদের থেকে অবগত হয়ে নিজেরা গায়েব জানার দাবি করে মানুষকে ফাঁদে ফেলতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের পর তাদের আসমানের দিকে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। জিনরা এতে পেরেশান হয়ে পড়ে। এমন কী দুর্ঘটনা ঘটলো যে আমাদের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল? কী এমন নতুন বিষয় যার কারণে আমাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ হল? পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ– সবদিকে তারা ছড়িয়ে পড়ল। এদেরই একটি দল যখন মক্কা অতিক্রম করছিল তখন দেখলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পাঠ করছেন। তিলাওয়াতকৃত কালামের ধরন, পদ্ধতি ও স্বতন্ত্র্যতা দেখে, তার হেদায়াত বাণী শুনে বুঝে নিল যে, এই বাণীকে আমাদের অনিষ্ট থেকে হেফাযত করার জন্যই এই নতুন ব্যবস্থা। এই সেই নতুন বিষয় যার কারণে আমাদের এবং আমাদের অনিষ্টকর কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা ফিরে গিয়ে তাদের স্বজাতিকে অবহিত করালো:

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًاO يَهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ط.

আমরা এক বিস্ময়কর কালাম পাঠ করতে শুনেছি, যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। [জিন ৭২ : ১-২]

এর দ্বারা বোঝা গেল, তাদের মধ্যে কাফেরও ছিল যারা পরবর্তীতে ঈমান গ্রহণ করেছিল। তো জিনদের মধ্যে কাফের ও মুমিন– এ উভয় প্রকারের সন্ধান পাওয়া গেল। সামনে বলা হয়েছে:

وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا.

আমরা এখন শির্ক করি না এবং ভবিষ্যতেও আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করব না। [জিন ৭২ : ২]

এর দ্বারা জানা গেল, তাদের মধ্যে একত্ববাদে বিশ্বাসীও ছিল আবার মুশরিকও ছিল। কিছু ছিল একত্ববাদে বিশ্বাসী, কিছু মুশরিক। এর পর বলা হয়েছেঃ

وَأَنَّـــهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ○

আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোনো পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোনো সন্তান নেই। [জিন ৭২ : ৩]

জানা গেল, তাদের মধ্যে কিছু খ্রিস্টানও ছিল, যারা আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান থাকার প্রবক্তা। অতঃপর বলা হয়েছেঃ

وَأَنَّـــهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ○

আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলতো। সীমাহীন মিথ্যা ও মনগড়া কথা বলতো। [জিন ৭২ : ৪]

জিনদের এ বক্তব্য থেকে জানা গেল, তাদের মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদীরাও ছিল। যারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও বোকামির কারণে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে বেদীনকে দীন বলে বিশ্বাস করায়। এরা আল্লাহর ওহীর নামে নিজেদের মনগড়া মতবাদ প্রচারে অভ্যস্ত ছিল।

যাই হোক, এসব আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, জিনদের মধ্যে বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন আকিদা বিশ্বাসের অধিকারীরা রয়েছে। তাদের আকিদা বিশ্বাস যেমনই হোক না কেন, তাতে তাদের আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার প্রাপ্তিতে কোনো প্রভাব পড়বে না। বেশির বেশি দুষ্কর্মকারীদের শাস্তি হতে পারে। যেমন মানুষেরও হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের অধিকার খর্ব করা যাবে না। অধিকার বঞ্চিত করা যাবে না।

জিনদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক

জিনদের বিভিন্ন প্রকারের অধিকার তো রয়েছেই, এমন কি বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করা যায়। ফোকাহায়ে কেরামের মধ্যে একটি বিতর্কের বিষয় এই যে, মুসলিম নারী-জিনদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কিনা?

কিছু সংখ্যক ফোকাহায়ে কেরাম একে জায়েজ বলেছেন এবং কিছু সংখ্যক নাজায়েজ বলেছেন। যারা এভাবে বিবেচনা করেছেন যে, বিবাহ হতে হয় স্বগোত্রীয়দের মধ্যে, স্বজাতির মধ্যে, তারা এ ধরনের বিয়েকে জায়েজ মনে করেন না। কেননা এ বিয়ে হবে এমন, যেমন মানুষ কোনো বকরী বা গাভীকে বিয়ে করল। জানোয়ার স্বজাতীয় নয় বিধায় তার মধ্যে বিয়ের উপযুক্ততাই নেই। এ কারণেই বিয়ে জায়েজ হবে না। পক্ষান্তরে যারা এভাবে বিবেচনা করেছেন যে, জিনদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে, শরীয়তের নির্দেশাবলি তাদের মধ্যে কার্যকর এবং ওরা মানুষের আকৃতিও ধারণ করতে পারে, তারা বিয়েকে জায়েজ বলেছেন।

যাই হোক, জিনদের নানা প্রকারের অধিকার রয়েছে। কিছুটা খাদ্যের অধিকার, কিছুটা বসবাসের স্থানের অধিকার, কিছুটা পরশী হওয়ার অধিকার এবং কিছুটা বৈবাহিক সম্পর্কেরও। এসব অধিকার রক্ষা করা আবশ্যক।

জিনদেরকে ওয়াজ ও তাবলিগ

হাদিস শরীফে এসেছে, একবার নাসিবাইন নামক এলাকা থেকে জিনদের একটি প্রতিনিধিদল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এসে আরজ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ভাইদের একটি দল অমুক স্থানে জড় হয়েছে। অনুগ্রহ করে সেখানে তাশরিফ নিয়ে তাদেরকে কিছু ওয়াজ-নসিহত এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত মাসয়ালা মাসায়িল আলোচনা করুন। তাদের কিছু প্রশ্নও রয়েছে যেগুলোর উত্তর তারা জানতে চায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সাথে ছিলেন। জিনরা যেখানে অবস্থান করছিল সেই পাহাড়ের পাদদেশে পৌছার পর খানিকটা জায়গায় বৃত্তাকারে সীমানা দিয়ে ইবনে মাসউদ রা.কে বললেন, তুমি এ সীমানার বাইরে বের হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, অদ্ভূত ধরনের লোকজনকে সীমানার বাইরে দিয়ে যেতে দেখলাম। সীমানার মধ্যে তারা আসতে পারছিল না। আমি তাদের আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিলাম। যাই হোক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সমাবেশ স্থলে গেলেন, তাদেরকে ওয়াজ-নসিহত করলেন এবং মাসয়ালা মাসায়িল বর্ণনা করলেন। জিনদের হক সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো মানুষ যেন হাড্ডি দ্বারা ইস্তেঞ্জা (কুলুখ হিসেবে ব্যবহার) না করে। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন:

فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

কেননা এগুলো তোমাদের জিন ভাইদের খাদ্য।

এ থেকে বোঝা গেল, তাদের খাদ্য-অধিকার হরণ করা জায়েজ নেই। হাদিসে আরো উল্লেখ আছে, মানুষ গোশত খেয়ে হাড্ডি ফেলে দেবার পর জিনরা তা 'গোশতপূর্ণ'রূপে পায়। এতে বোঝা যায়, প্রথমে লোকেরা হাড্ডি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করত। জিনরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নালিশ করলে তিনি হাড্ডি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করে দিলেন। ফলে জিনদের খাদ্য-অধিকার সংরক্ষণ করা প্রমাণিত হল। অর্থাৎ তাদের হক নষ্ট করার অধিকার আমাদের নেই। তেমনিভাবে ঘরবাড়ি থেকে অকারণে তাদেরকে বিতাড়িত করাও জায়েজ নেই। তবে কষ্ট দিতে শুরু করলে ভিন্ন কথা।

ফেরেশতাদের হক

ফেরেশতাদের ব্যাপারেও একই হুকুম। তারাও আমাদের ঘরবাড়ির বাসিন্দা। কিছু ফেরেশতা আসমানে থাকেন, কিছু পৃথিবীতে। তাদেরও অধিকার রয়েছে। হাদিসে এসেছে, আসমানসমূহে এমন চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা খালি নেই যেখানে ইবাদতে মশগুল ফেরেশতাগণ নেই। উর্ধ্ব-জগতের ফেরেশতা ভিন্ন এবং পার্থিব জগতের ফেরেশতা ভিন্ন। যারা যোখানে রয়েছেন তারা সেখানকার অধিবাসী। সেখান থেকে কষ্ট দিয়ে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া জায়েজ নেই। উদাহরণত ফেরেশতাদের পছন্দ হলো সুগন্ধি, দুর্গন্ধ তাদের অপছন্দ। এ কারণে যেসব স্থানে ফেরেরশতারা সমবেত হয় সেসব স্থানগুলোয় দুর্গন্ধ ছড়ানো জায়েজ নেই। মসজিদসমূহ ফেরেশতাদের সমবেত হওয়ার স্থান বিধায় মসজিদে সুগন্ধির ব্যবস্থা করা এবং দুর্গন্ধমুক্ত রাখা কাম্য। মসজিদসমূহে সুগন্ধির ব্যবস্থা করা, আগরবাতি জ্বালানোকে শরীয়ত কামনা করে। এতে ফেরেশতারা প্রশান্তি লাভ করে। পিয়াজ খেয়ে মুখ পরিষ্কার না করে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ। এতে ফেরেশতারা কষ্ট পায়। হাদিসে এসেছে, মসজিদে অবস্থানকারীদের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকেন– যতক্ষণ না তাদের বায়ু নির্গত হয় এবং অজু ছুটে যায়। এমনটি হলেই ইস্তেগফার বন্ধ হয়ে যায়। কেননা এর দ্বারা ফেরেশতাগণ কষ্ট পান এবং এমন মানুষদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। যেন দুর্গন্ধের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করছি, যে অধিকার আমাদের নেই।

ফেরেশতাগণ দুর্গন্ধ ও মিথ্যাকে ঘৃণা করেন

হাদিসে এসেছে, মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তার মুখ থেকে বিশেষ এক ধরনের দুর্গন্ধ নির্গত হয়। যার কারণে ফেরেশতাগণ সেখান থেকে চলে যান। এ যেন মিথ্যার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে তাদের নিকট থেকে তাদের আবাসস্থল ছিনে নেয়। তারা তাদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় বসে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছিল, এখান থেকে তাদেরকে উৎখাত করার এবং তাদের জায়গা ছিনে নেবার কী অধিকার আপনার আছে? অবশ্য যে নাপাক ব্যক্তির পাক জায়গায় আসার অধিকার নেই তাকে বের করে দিলে তা ইনসাফ হবে। যেমন হাদিসে এসেছে, যখন আজান দেওয়া হয় তখন শয়তান সেখান থেকে ভেগে যায়। তাকে ভাগিয়ে দেওয়াই উচিত। তেমনিভাবে ফেরেশতাদের খাদ্য হলো আল্লাহর জিকির। এই জিকির থেকে তাদেরকে বাধা দেওয়া মানে তাদের খাদ্য ছিনে নেওয়া। আগেই যেমন আলোচনা হয়েছে যে, দুর্গন্ধের বিস্তার ও অনর্থক কথাবার্তা বলা দ্বারা তারা বিরক্ত হয়, কষ্ট পায়।

যা হোক, জিন জাতি ও জীবজগতের মতো ফেরেশতাদেরও অধিকার রয়েছে। এ অধিকার হরণ করা জায়েজ নেই।

মানুষের অধিকার

বোধ ও অনুভূতিসম্পন্ন চতুর্থ প্রকার মাখলুক হলো মানুষ। আসমান-জমিনে এদেরও অধিকার রয়েছে। খাওয়ার অধিকার, পোশাক পরিধানের অধিকার, বসবাসের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, খাদ্যদ্রব্যের অধিকার, বাড়িঘরের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি। মানব জাতি দ্বারাও আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীকে আবাদ করেছেন। পৃথিবী এই চার প্রকার মাখলুকের– প্রাণীকুল, জিন, ফেরেশতা ও মানুষের আবাসভূমি। পৃথিবীতে এরা বসবাস করছে। এই চার প্রকার মাখলুকের সাথে আল্লাহ তায়ালার আচরণ, বিধিবিধান ও লেনদেন ভিন্ন ভিন্ন। প্রাণীদের সাথে যে আচরণ জিনদের সাথে সে আচরণ নয়। জিনদের সাথে যেমন আচরণ ফেরেশতাদের সাথে আচরণ তেমন নয়। জিন ও ফেরেশতাদের সাথে যে ধরনের আচরণ মানুষের সাথে সেরূপ নয়। উদাহরণত প্রাণীদের সাথে মুয়ামালা এই যে, তাদেরকে নির্দেশের উপযুক্ত মনে করা হয়নি এবং তাদেরকে কোনো আদেশ-নিষেধের আওতায়ও আনা হয়নি। নির্দেশমূলক কোনো বিধান তাদের জন্য আরোপিত হয়নি। বলা হয়নি যে, এটা কর, এটা করো না। কেননা নির্দেশ গ্রহণ বা বর্জনের যোগ্যতা তাদের মধ্যে রাখা হয়নি।

না তাদের বুদ্ধি আছে, না বুঝ আছে। আর যদি থেকেও থাকে তা এতই নগণ্য পর্যায়ের যে তা না থাকারই মত। যেটুকু আছে তাও কেবল নিজের স্বার্থ সংক্রান্ত। অর্থাৎ নিজের খাদ্য, আবাস এবং এ জাতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোই বোঝে এবং তার ব্যবস্থা করে।

প্রাণী সৃষ্টি সংক্রান্ত উদ্দেশ্য

প্রাণীদের নগণ্য পর্যায়ের যে বুদ্ধিমত্তা রয়েছে তা কেবল নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ সংক্রান্তই। সার্বিকভাবে স্বজাতি বা স্বগোত্রের জন্য কোনোই পদক্ষেপ নিতে পারে না।

এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে এই যে, তারা যদি জ্ঞান-বুদ্ধিপ্রাপ্ত হতো তাহলে ক্ষতি কী ছিল? এ প্রশ্নের জবাব হলো, যে উদ্দেশ্যে প্রাণীদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজনই নেই। থাকলে বরং তা প্রতিবন্ধক হতো, উদ্দিষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ হতো না। তাদেরকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ○ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ○

অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করেছি যাতে তোমাদের জন্য রয়েছে গরমের উপকরণ ও ঠাণ্ডা নিবারণের অবলম্বন। [নহল ১৬ : ৫-৬]

তোমরা এই প্রাণীদের পশম দ্বারা গরম কাপড়, চাদর, কম্বল প্রভৃতি তৈরি কর। এর চামড়া দ্বারা তোমরা নানারূপ উপকার লাভ কর। পরিধেয় তৈরি, বিছানা তৈরি, সৌন্দর্য বর্ধনের উপকরণ তৈরি, তাঁবু নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় নানা উপকরণ তৈরি করে থাক। وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ 'এবং এগুলো থেকে তোমরা আহারও কর'। অর্থাৎ এর গোশত তোমরা ভক্ষণ কর। وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ এ জানোয়ারদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ। অর্থাৎ এর দ্বারা তোমরা তোমাদের আভিজাত্য ও আড়ম্বরতা প্রতিষ্ঠা কর। সরকারী, জাতীয় ও পারিবারিক অনুষ্ঠান-উৎসবে তোমরা এর শোভাযাত্র বের কর। ঘোড়া, হাতি, উট, খচ্চর প্রভৃতির পিঠে অতি মূল্যবান জিন, দামী

হাওদা এবং সোনার কারুকাজ খচিত ঝুল টাঙিয়ে নিজের মর্যাদা ও আভিজাত্য প্রদর্শন কর। যা সর্বোচ্চ পর্যায়ের শোভা ও সৌন্দর্যের প্রকাশ।

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ.

আর এসব জন্তুদের মাধ্যমে তোমরা এক শহর থেকে অন্য শহরে বোঝা বহন করে নিয়ে যাও। এগুলো ব্যতীত এ কাজ করতে তোমাদের অনেক কষ্ট হতো। [নহল ১৬ : ৭]

প্রাণীদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি হতে বঞ্চিত রাখার হিকমত

প্রাণীকুল সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ করলে বোঝা যায়, তাদের জন্য জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল না। জ্ঞান-বুদ্ধি থাকলে বরং উদ্দেশ্য সফল হতে সমস্যা হতো। কেননা এগুলোর যদি বুদ্ধি থাকত তাহলে মানুষ যখন পিঠে আরোহণ করতে উদ্ধত হতো বা পিঠে জিন চড়াতে যেত কিংবা কোনো বোঝা তার পিঠে রাখতে যেত তখন জ্ঞানী পশু বলতো, জনাব, একটু অপেক্ষা করুন। প্রথমে প্রমাণ করুন যে, আমার পিঠে আরোহণ করার কিংবা আমাকে দিয়ে বোঝা বহন করাবার অধিকার আপনার আছে কিনা? আপনি তখন প্রমাণ উপস্থাপন করতেন এবং সে তার বুদ্ধি অনুযায়ী আপনার সাথে বিতর্ক করত। পিঠে আরোহণ করা বা বোঝা তোলার পরিবর্তে বিতর্ক জমজমাট হয়ে উঠত। বিতর্কে যদি কোনোক্রমে জানোয়ার জিতে যেত তাহলে আপনার অবস্থা কেমন হতো? এমনও সম্ভাবনা ছিল, ওরা আপনার উপর আরোহণ করত। বোঝাই যাচ্ছে, এগুলো অতি কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়াতো। প্রতিটি প্রাণী দ্বারা কাজ করাবার সময় এই বিতর্কের বাজার জমজমাট হয়ে উঠত। না বলদ লাঙ্গল বইতো, না ঘোড়া আরোহী বহন করত, না হালাল প্রাণীদের গোশত খাওয়া যেত। ব্যবসা-বাণিজ্য মুখ থুবড়ে পড়তো। প্রাণীকুলের সাথে বিতর্ক করা থেকে মানুষের অবসর মিলতো না। প্রাণীদের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রাপ্তি দ্বারা এতসব ঝামেলা তৈরি হতো। শুধু কি তাই? আপনাদের বিদ্যালয়গুলোতে প্রাণীরা জ্ঞানার্জনের জন্য জড়ো হতো। একই শ্রেণীকক্ষে ঘোড়া, গাধা, কুকুর এসে ভিড় করত। এমনকি জঙ্গলের বাঘ, সিংহ, শিয়াল জড়ো হতো। এভাবে ইলম শিক্ষা করা আপনাদের জন্য জীবন-মরণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো। মোটকথা ইলমী ও আমলী কর্মকাণ্ড সব এলোমেলো হয়ে পড়তো। সুতরাং শোকর আদায় করুন যে, আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেননি বিধায় আপনার সব কাজকর্ম চলমান রয়েছে।

নির্বুদ্ধিতাও নিয়ামত

উক্ত আলোচনা দ্বারা জানা গেল, জ্ঞান-বুদ্ধি যেমন নিয়ামত, নির্বুদ্ধিতাও তদ্রূপ নিয়ামত। প্রাণীদের নির্বুদ্ধিতা দ্বারাই মানুষ উপকৃত হয়। এমনকি যেসব মানুষ নির্বোধ ও মেধাহীন তারা জ্ঞানীদের আজ্ঞাবহ। যার দ্বারা লিডারদের নেতৃত্ব বজায় রয়েছে। নির্বোধরা না থাকলে লিডারদের খাবার জুটতো না। অবুঝরা না থাকলে লিডারদের ব্যবসা চলতো না। এভাবেই কখনো জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ামত, আবার কখনো নির্বুদ্ধিতা নিয়ামত। এ কারণেই জানোয়ারদের বুদ্ধি না থাকাই নিয়ামত। যে কারণে তাদের দ্বারা বিনা প্রতিবাদে ও বিনা বিতর্কে নানা ধরনের কাজ আদায় করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। অন্যথায় তাদের যদি বুদ্ধি থাকত তাহলে মানুষ তাদের দ্বারা যেসব উপকার লাভ করছে তা বরবাদ হয়ে যেত। মোটকথা, যে উদ্দেশ্যে প্রাণীদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল না বিধায় আবশ্যকীয়ভাবে তাদেরকে অবুঝ রাখা হয়েছে। যেন মানুষের আনুগত্য হতে তারা মুখ ফিরিয়ে না নেয়। আর তাদেরকে যখন বিবেক-বুদ্ধি দেওয়া হয়নি তখন তাদেরকে আদেশ নিষেধেরও বাইরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের জন্য কোনো শরয়ী বিধান রাখা হয়নি। ব্যাস, তাদের জন্য না আছে কোনো আদেশ, না নিষেধ। না কোনো শরীয়ত এসেছে, না কোনো শরয়ী বিধান; তাদের জন্য রয়েছে শুধু লাঠি আর ডাণ্ডা– যার দ্বারা তারা রাতদিন কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ পদ্ধতি

ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন ঠিকই কিন্তু সে নির্দেশে কঠোরতা নেই। অর্থাৎ অমুক কাজ করো, অমুক কাজ করো না– এমন ব্যাপার নেই। তারা সম্মানজনকভাবে সম্বোধিত হয়েছেন। বাদশা যখন কোনো নিকটজনের সাথে কথা বলে তখন তার দ্বারা উক্ত ব্যক্তির সম্মান বাড়ানো ও তাকে মর্যাদাশীল করা উদ্দেশ্য হয়, অনুগত বানানো উদ্দেশ্য হয় না। ফেরেশতাদের ব্যাপারেও এরূপই ঘটেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সম্বোধন করেছেন, কালাম করেছেন, কথোপকথন হয়েছে কিন্তু তাদের উপর কোনো শরীয়ত অবতীর্ণ করেননি। কেননা আহকাম দুই ধরনের হয়ে থাকে– করণীয় ও বর্জনীয়। করণীয়গুলো কল্যাণকর কাজ হয়ে থাকে। এর দ্বারা কল্যাণ লাভ করা উদ্দেশ্য হয়। বর্জনীয়গুলো খারাপ কাজ হয়ে থাকে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খারাবি ও অনিষ্ঠ দূর করা। যথা– দুষ্কর্ম, ধোঁকাবাজি, ঘুষ, দুর্নীতি, ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি, বিদ্রোহ, অহংকার প্রভৃতি।

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ফেরেশতাদের মধ্যে অন্যায় ও খারাবির প্রবণতাই রাখা হয়নি বিধায় তা থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজনই নেই। তারা খারাপ কাজ করতেই পারে না। এ ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং তাদেরকে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দেবার মানে হলো অক্ষমকে আদেশ করা। যা সুস্পষ্টরূপে হিকমত বা প্রজ্ঞা পরিপন্থী। আর আল্লাহ তায়ালা হলেন মহান প্রজ্ঞাময়, মহাহাকিম। তিনি হিকমতহীন কথা ও কার্ম হতে পবিত্র। বাকি থাকলো সৎকর্ম। তো সৎকর্ম হলো তাদের স্বভাবজাত বিষয়। তাদের স্বভাবই এমন যে সৎকর্ম করতে তারা বাধ্য। সর্বদা তারা আল্লাহর আনুগত্যে বিভোর থাকেন। তারা ইবাদতও করেন, সিজদাও করেন এবং নিজ পাক স্বভাব দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হন, সে কারণে শরীয়তের মাধ্যমে সান্নিধ্যপ্রাপ্তির প্রয়োজন তাদের নেই। ভাল কাজ করার জন্য কোনো নির্দেশ দ্বারা সতর্ক করার আবশ্যকতা নেই। এগুলো তাদের স্বভাবজাত বিষয়। যেমনিভাবে পানাহার বা নিদ্রা-জাগরণ আমাদের জন্য স্বভাবজাত বিষয়। কোনো শরীয়ত আসুক বা না আসুক মানুষ পানাহার করতে বাধ্য। এ কারণেই স্বভাবজাত কোনো কাজ করণে উদ্বুদ্ধ করতে শরীয়তের প্রয়োজন পড়ে না। পৃথিবীতে কোনো শরীয়ত যদি অবতীর্ণ নাও হতো তবু আমরা পিপাসার সময় পানি পান করতাম, ক্ষুধার সময় আহার করতাম। তো আমাদের বেলায় যেমন আহার করা, পান করা প্রভৃতি স্বভাবজাত বিষয় তেমনিভাবে ফেরেশতাদের বেলায় সর্বপ্রকার ভাল কাজ যথা ইবাদত, নেকী, স্বভাবের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, আত্মিক ও বাহ্যিক পরিশুদ্ধি প্রভৃতি স্বভাবজাত বিষয়। শরীয়ত নির্দেশ করুক বা না করুক তারা তাদের স্বভাবের প্রেরণায় সর্বদা নেকীর কাজই করবে। এ কারণেই ভাল কাজ করার জন্য কোনো শরয়ী নির্দেশ ও বিধান তাদের জন্য আবশ্যক ছিল না। যা হোক, ফেরেশতাদের জন্য না শরয়ী আদেশের আবশ্যকতা রয়েছে না নিষেধের আবশ্যকতা রয়েছে। এ কারণে তাদেরকে সম্বোধন করা হলেও কোনো আদেশ-নিষেধ আরোপ করা হয়নি।

জিনদেরকে যৌথ নির্দেশের আওতায় রাখা হয়েছে

থাকলো জিন জাতি। এদেরকে সম্বোধনও করা হয়েছে এবং আদেশ-নিষেধের আওতায়ও রাখা হয়েছে; কিন্তু তারা স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধিত হয়নি। অর্থাৎ তাদের উপর সরাসরি কোনো শরীয়ত অবতীর্ণ হয়নি এবং স্বতন্ত্র কোনো বিধান তাদেরকে দেওয়া হয়নি; বরং মানুষকে মাধ্যম করে তাদেরকে শরীয়তভুক্ত করা হয়েছে এবং দীনের ব্যাপারে মানুষের অনুগামী করা হয়েছে। যেমন তাদের

মধ্যে যারা ইহুদী রয়েছে তারা হযরত মুসা আ.-এর অনুসারী, ইঞ্জিলেও তাদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো বিধান নেই। যারা মুসলমান তাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। কুরআন সরাসরি তাদের উপর নাযিল হয়নি। যে শরীয়ত মানুষের জন্য এসেছে তাদের জন্যও সেই শরীয়ত। মানুষকে মাধ্যম করে তাদেরকে শরীয়তের অনুসারী করা হয়েছে।

জিনদের মধ্যে নবুওয়াত না রাখার কারণ

জিনদেরকে মানুষের অনুগামী করা এবং তাদের মধ্যে নবুওয়াতের ব্যবস্থা না রাখার কারণ হলো এই, ফেরেশতাদের মধ্যে যেমন ভালর প্রাধান্য রয়েছে এবং খারাবি না থাকারই মতো, জিনদের মধ্যে তার বিপরীত। তাদের মধ্যে খারাবির প্রাধান্য রয়েছে। ভাল না থাকার মতো। নবুওয়াতের ক্ষেত্রে ভাল বা খায়ের-এর প্রাধান্যও যথেষ্ট নয়– নিরেট খায়েব আবশ্যক (যা জিনদের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়)। অন্যথায় খারাপ বুঝ ও খারাপ আমলের কারণে শরীয়তের উপর আমল ও তার তাবলিগ– উভয়ই অনিরাপদ ও অরক্ষিত হয়ে যেত এবং অনুসারীদের নিকট সঠিক দীন পৌঁছতো না। এ কারণেই জিনদেরকে মানুষের অনুগামী করা হয়েছে, যাতে তাদের শরীয়তের অনুসরণ করে ত্রুটিমুক্ত ইলম ও আমল লাভ করতে পারে। এ দিকটি বিবেচনা করে মানুষের প্রতি প্রেরিত নবীগণের আনুগত্য তাদের জন্য আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে।

মোটকথা, প্রাণীদেরকে আল্লাহ তার সম্বোধনের আওতায় আনেন নি, ফেরেশতাদেরকে সম্বোধনের আওতাভুক্ত করলেও তাদের জন্য কোনো আদেশ-নিষেধ নেই। আর জিনদেরকে সম্বোধনও করা হয়েছে এবং আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্তও করা হয়েছে কিন্তু স্বতন্ত্র কোনো শরীয়ত দেওয়া হয়নি।

মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে শরয়ী সম্বোধনভুক্ত করা হয়েছে

মানুষকে সম্বোধনও করা হয়েছে, শরীয়তের আদেশ-নিষেধের আওতাভুক্তও করা হয়েছে এবং স্বতন্ত্রভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানুষের সাথে কথা বলেছেন। মানুষের মধ্য থেকে নবী-রাসূল করেছেন। কখনো সরাসরি নিজে কথা বলেছেন, যেমন তুর পাহাড়ে মুসা আ.-এর সাথে এবং মিরাজ রজনীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে। কখনো ফেরেশতাদেরকে মাধ্যম করে কথা বলেছেন। ফেরেশতাগণও

আবার কখনো স্ব-আকৃতিতে আগমন করেছেন এবং তাদের যবানে কথা বলেছেন, কখনো মানুষের আকৃতিতে আগমন করতেন। পবিত্র কুরআন মাজিদে যা এভাবে এসেছে:

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ ؕ .

কোনো মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোনো দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। [শুরা ৪২ : ৫১]

আয়াতে যে তিনটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তার প্রথমটি হলো ফেরেশতাগণ স্বরূপে থাকেন কিন্তু পয়গম্বরকে মানব প্রকৃতি হতে ফেরেশতা প্রকৃতিতে রূপান্তর হতে হয়। এ পদ্ধতিটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য অত্যন্ত ভারী ও কষ্টকর হতো। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো আল্লাহ কর্তৃক সরাসরি কালাম করা। এটা হতো পর্দার অন্তরাল হতে। অর্থাৎ দৃষ্টি আল্লাহর সত্তাকে দেখতে পেতো না কিন্তু কান তাঁর কালাম শুনতো। তৃতীয় পদ্ধতি হলো ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করে পয়গম্বরগণকে আল্লাহর কালাম শোনানো। এ ক্ষেত্রে পয়গম্বর স্বআকৃতি ও প্রকৃতিতে থাকতেন আর ফেরেশতাগণ মানব আকৃতি-প্রকৃতি ধারণ করতেন। এই তিন পদ্ধতিতেই ওহী প্রেরিত হতো।[১]

ইলমে এলাহির জন্য মানব জাতিকে নির্বাচন

আল্লাহর ওহী এবং নবুওয়াত ও শরীয়তের দৌলত দ্বারা আল্লাহ মানুষকে ধন্য করেছেন। এর জন্য মানব জাতি ছাড়া অন্য কাউকে নির্বাচন করেননি। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ইলম অবতরণের নামই হলো ওহী। ওহীর মাধ্যমে রাসূলগণকে তো ইলমই দান করা হয়েছে। অন্যভাবে বললে, ইলমে এলাহির নিয়ামত স্বতন্ত্রভাবে মানুষকেই দান করা হয়েছে। একে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য

---

[১] অত্র আয়াতে উল্লেখিত পদ্ধতিত্রয় ছাড়াও ওহী অবতরণের আরো কিছু পদ্ধতি রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য এ আয়াতের তাফসীর কিংবা বুখারী শরীফের এ সংক্রান্ত আলোচনা দেখা যেতে পারে। -অনুবাদক।

ও স্বতন্ত্র শান মনে করা উচিত। কেননা বৈশিষ্ট্য বলা হয় এমন জিনিসকে যা অন্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। এ কারণে আমরা বলতে পারি, মানুষের বিশেষত্ব, মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো ইলমে ওহী। আর সকলেরই এ কথা জানা আছে যে, কোনো কিছু থেকে যখন তার বিশেষত্বটুকু বের করে ফেলা হয় তখন সে জিনিস আর ঐ জিনিস থাকে না।

মনুষ্যত্বের জাওহার হলো ইলমে ওহী

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছলাম যে, মানুষের যদি ইলমে ওহী লাভ না হয় তাহলে সে মানুষ আর মানুষ থাকে না। কেননা মানুষের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে আসেনি বা থাকেনি। সে কেবল মানুষের আকৃতি ধারণ করে আছে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, গঠন ও আকৃতির নাম মানুষ নয় বরং তার জাওহার বা অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ ও নৈপুণ্যের নাম মানুষ। আর মানুষের জাওহার হলো এই ইলমে ওহী। এ কারণে যেসব মানুষ ইলমে ওহীর ধারক নন তারা উপরোক্ত প্রমাণের আলোকে মানুষ নন, মানুষের আকৃতি ধারণ করে আছেন মাত্র। আর যার মধ্যে কোনো হাকিকত নেই, শুধু সুরত ও আকৃতি আছে তার কোনো কদর নেই, মূল্য নেই। আমরা যদি হুবহু আসল ঘোড়ার মতো একটি ঘোড়ার মূর্তি বানাই, দেখতে যদি আসল ও নকলের মধ্যে সামান্যও পার্থক্য না থাকে, তাহলে কি আমরা তাকে ঘোড়া বলব? সেটি কি ঘোড়ার মতো সাওয়ারীর কাজ দেবে? এটার মূল্যও কি ঘোড়ার মতো পাঁচশ হাজার টাকা হয়ে যাবে? কখনোই নয়। কেননা তা ঘোড়া নয়, ঘোড়ার মূর্তি মাত্র। ঠিক তদ্রূপ, যদি মানুষের প্রকৃত আকৃতি থাকে কিন্তু তার মধ্যে মানুষের জাওহার ও বৈশিষ্ট্য (ইলম) না থাকে তাহলে তা মানুষের সুরত বা আকৃতি বটে কিন্তু মানুষ নয়। আর কদর ও মূল্য হয়ে থাকে মানুষের, মানুষের আকৃতির নয়। বাজারে কত সুন্দর সুন্দর প্লাস্টিকের মানবমূর্তি পাওয়া যায়। অল্প ক'টি টাকা দিয়ে এগুলো কিনে আনা সম্ভব। এখন কি আমরা মানুষকে বাদ দিয়ে এই প্লাস্টিকের মানুষ দ্বারা কাজ আদায় করব? আসল মানুষের আর প্রয়োজন পড়বে না? কিন্তু না, এমন হওয়া সম্ভব নয়। এ দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, পৃথিবীতে কদর ও মূল্য হলো মানুষের, মানুষের আকৃতির নয়। আর মানুষ বলা হয় মানুষের হাকিকতকে, সুরতকে নয়। কবি বলেছেন, আকৃতি ও গঠনের নাম যদি মানুষ হতো তাহলে আবু জাহল ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতো না।

گر بصورت آدمی انسان بدے احمدؐ و بو جہل ہم یکساں بدے

اینکہ می بینی خلاف آدم اند! نیستند آدم غلاف آدم اند!

از بروں چو گور کافر پر حلل واندروں قہر خدائے عزّ و جل

সর্বপ্রকারের ইলম মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়

এখানে একটিপ সূক্ষ্ম কথা মনে রাখতে হবে। তা হলো এই, সাধারণ ইলম মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। অর্থাৎ সর্বপ্রকারের ইলমকে মানুষের বৈশিষ্ট্য বলা হবে না। কেননা সাধারণ ইলম অর্থাৎ কোনো না কোনো প্রকারের ইলম কমবেশি সকল মাখলুকেরই রয়েছে। এমনকি প্রাণীরাও ইলম-শূন্য নয়। এ জন্যই সাধারণ ইলমকে মানুষের বৈশিষ্ট্য বলা যাবে না। আর সাধারণ ইলমের ভিত্তিতে মানুষের ফযিলত, সম্মান ও মাখলুকের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেতে পারে না। এগুলো তখনই প্রকাশ পাবে যখন তার এমন কোনো ইলম থাকবে যা অন্য কারোর নেই। বর্তমান পৃথিবীতে যত প্রকারের ইলম উদ্ভাবিত হয়েছে এবং প্রচলিত রয়েছে তার কোনোটাই মানুষের বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য নয়। সে ইলমের অংশবিশেষ প্রাণীদেরও রয়েছে। সে কারণেই যে ইলম একান্তই মানুষের নিজের নয়, নিজের বৈশিষ্ট্য নয় তা দ্বারা মাখলুকাতের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা মানুষের সাথে নির্দিষ্ট নয়

আজ যদি মানুষ এ যুক্তিতে নিজেকে সৃষ্টির সেরা দাবি করে যে, আমার ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জ্ঞান রয়েছে, উন্নত থেকে উন্নত ডিজাইনের কুঠুরী ও উঁচু উঁচু ভবন নির্মাণ করতে পারি। মানুষের এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা প্রাণীরা ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানহীন নয়। তারাও দাবি করতে পারে যে, আমরাও ইঞ্জিনিয়ার এবং আমরাও আমাদের উপযোগি আরামদার ঘর তৈরি করি।

ছোট্ট বাবুই পাখি নিজের জন্য অদ্ভূত ও বিস্ময়কর বাসা তৈরি করে। যার মধ্যে কয়েকটি কক্ষ থাকে। মা-বাবার জন্য আলাদা কক্ষ, বাচ্চাদের জন্য আলাদা কক্ষ, এমনকি বাসার মধ্যে বাচ্চাদের দোল খাওয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত থাকে। (বাসার দেয়ালের স্থানে স্থানে কাদামাটি দিয়ে তাতে জোনাকি পোকা গেঁথে রাখা হয়, যেন অন্ধকারে কিছুটা আলোকিত থাকে)। খেজুর পাতার আঁশ, খাস প্রভৃতি

দিয়ে এ বাসা তৈরি করা হয় (পাতার তন্তু দিয়ে অপূর্ব বুনন-শৈলীতে তৈরি হয় এ বাসা)। বাবলা, তাল প্রভৃতি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় বাসাগুলো নির্মিত হয়। আর তা এমনই মজবুত যে, আঁধি আসুক, ঝড়তুফান আসুক বাসার কোনো ক্ষতি হয় না। আপনার-আমার ঘর পড়ে যায় কিন্তু ওদের বাসা হেফাযত থাকে। এগুলো কি উন্নততর নির্মাণ শৈলী নয়? বলুন তো এ পাখি কেন দাবি করবে না যে, আমিও ইঞ্জিনিয়ার? অবশ্যই এমন দাবি সে করতে পারে। তো ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা মানুষের জন্য নির্দিষ্ট থাকলো কৈ? এই ছোট্ট বাবুই পাখির তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?

মৌমাছি মৌচাক তৈরি করে। তার মৌচাকের অষ্টঝালর বিশিষ্ট কুঠুরীগুলো এমনই সমানুপাতিক যে, আপনি কাটা-কম্পাসের সাহায্যেও এমন নিখুঁত কুঠুরী তৈরি করতে পারবেন না। শুধু কি তাই? এরপর চাকের মধ্যে রয়েছে নানা প্রকোষ্ঠ ও কলোনি। বাচ্চা থাকার ও লালন-পালনের কলোনি আলাদা, মধু রাখার কলোনি আলাদা। (রানী মাছি, কর্মী মাছি, সৈনিক মাছি, বাচ্চা লালনপালনের মাছি– প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক থাকার ব্যবস্থা)। এ মৌচাক না বৃষ্টিতে নষ্ট হয়, না ঝড়-তুফানে স্থানচ্যুৎ হয়। এগুলো কি ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি নয়? এগুলোকে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়, এবং নিঃসন্দেহে বলতেই হবে; তাহলে আপনি কী-করে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাকে স্বজাতির সাথে নির্দিষ্ট করে মৌমাছির উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন? এ অধিকার আপনার কোথায়?

সাপ মাটি দ্বারা বাসা বানায়। এগুলোর উপরিভাগ মিনার বিশিষ্ট গম্বুজের মতো হয়ে থাকে। এর ভেতরে অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পেঁচানো পেঁচানো নালা থাকে। সাপ ও তার বাচ্চারা এর মধ্যে গাড়াগড়ি খায়। এগুলোকে কি ইঞ্জিনিয়ারিং ও নির্মাণশিল্প বলবেন না? বাকি থাকলো এ বিষয়টি, আপনি হয়তো বলবেন– জনাব, আমরা অত্যন্ত আলিশান ভবন তৈরি করি, যার সৌন্দর্য ও কারুকাজ ঐসব বাসা ও ফালতু জিনিস অপেক্ষা কত উন্নত ও উর্ধ্বের। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রাণীদের ইঞ্জিনিয়ারিং কী-করে সমপর্যায়ের হয়? এমন কথার জওয়াব হলো এই, বাড়ি উন্নত হওয়া বসবাসকারীর প্রয়োজন ও আরাম বিবেচনায় হয়ে থাকে। প্রাণীরা তাদের প্রয়োজন বিবেচনা করে আর আপনি আপনার প্রয়োজন বিবেচনা করেন। প্রাণীরা যদি আপনার নির্মিত বাড়িঘরকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখতো তাহলে আপনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারতেন। কিন্তু তাদের ঘরবাড়ি দেখে আপনি যেমন অপছন্দ ও ঘৃনা প্রকাশ করেন, তারাও আপনার বাড়িঘর দেখে তাই করে। সাপ, মৌমাছি কিংবা বাবুই পাখিকে আপনি যদি আপনার ঘরে রাখতে চান, তারা তাতে কখনোই খুশি হবে না; বরং নিজের

মতো ঘর বানিয়ে থাকবে। এর দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, ঘর বানাবার ক্ষেত্রে উভয়ে সমান এবং নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণে উভয়ে দক্ষ। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করার কোনো অধিকার আপনার নেই।

মানুষ ও ডাক্তারি বিদ্যা

ডাক্তারি বিদ্যা একটি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। মানুষের যেমন এ বিদ্যা রয়েছে, প্রাণীদেরও তদ্রূপ রয়েছে। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ডাক্তারি বিদ্যা তাদের মধ্যেও পাওয়া যায়। আপনি এই দাবি করবেন যে, আমরাই শুধু ডাক্তার, কেবল আমাদেরই এ বিদ্যায় পারদর্শিতা রয়েছে, সুতরাং এ শাস্ত্রের আলোকে আমরা আশরাফুল মাখলুকাত– এ দাবি ভুল। প্রাণীরাও দাবি করতে পারে যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে আমাদেরও পারদর্শিতা রয়েছে। পার্থক্য যদি থেকে থাকে তবে তা কেবল এতটুকু যে, আপনাদের অসুখ-বিসুখ বেশি হয় বিধায় আপনারা অধিক প্রকারের ওষুধ সম্পর্কে অবগত। বেশি প্রকারের ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন। প্রাণীদের অসুখ-বিসুখ কম হয় বিধায় তাদের চিকিৎসা জ্ঞান সীমিত। কিন্তু এই কম-বেশির ভিত্তিতে চিকিৎসাবিদ্যা আপনার বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত হতে পারে না।

এ বিষয়ে আমার একটি ঘটনা মনে পড়েছে। আমি একবার রাজপোতানে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার কিছু প্রিয়ভাজন ব্যক্তি চাকরি করত। হিন্দুদের শাসন ছিল। বানর তাদের কাছে দেবতাতুল্য বিধায় তা মারা নিষেধ ছিল। বানরগুলো আমাদের খুব ক্ষতি করত। ঘরের দরোজা একটু খোলা থাকলেই কাপড়-চোপড়, থালাবাটি নিয়ে যেত। আর এ পাঁজিগুলো এমনই বিরক্তিকর জানোয়ার, নিয়ে যে ফেলে দেবে এমন নয়; মন্দিরের সামনে বসে দেখিয়ে দেখিয়ে সেগুলো ছিঁড়ে নষ্ট করবে। কষ্ট দেবার ক্ষমতা ছিল সেগুলোর আশ্চর্য ধরনের। চরম বিরক্তি লাগতো, গা জ্বলে যেত। যেন ইচ্ছা করেই ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইতো। মারতে নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে মারতেও পারছিলাম না। চুপে চুপে দশ বিশটা বানর অবশ্য মেরেছিলাম। কিন্তু ছিল তো হাজার হাজার। আমরা চাচ্ছিলাম, এক দেড়শ' বানর যাতে মারতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করতে। তা করতে পারলে হয়তো ওদের কিছুটা শিক্ষা হতো, আমাদেরকে একটু কম জ্বালাতন করত। এরপর আমরা কিছু বিষ কিনে আটার সাথে মিশিয়ে রুটি তৈরি করালাম। রুটিগুলো ছাদে ছড়িয়ে রাখলাম। আমাদের আশা ছিল, বানরগুলো এসেই খেতে শুরু করবে, আর মারা পড়বে। প্রতিশোধ নিতে পেরে আমরা খুব খুশি হব। কিন্তু বানরগুলো খুবই চালাক। খুবই সেয়ানা। কয়েকটি

বানর এসে রুটিগুলো দেখল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখে ওরা আশ্চর্য হল। একটি আরেকটির মুখের দিকে তাকায় আবার রুটির দিকে তাকায়। যেন একটি অপরটিকে জিজ্ঞেস করছে– ব্যাপার কী? এমন তো হবার কথা নয়। দুই চার মিনিট পরে তিন চারটি বানর চলে গেল। আমরা বুঝলাম, আমাদের পদ্ধতি ফেল হয়ে গেছে। সেগুলো গিয়ে তাদের সম্প্রদায় বা গোত্রের কাছে হয়তো খবর দিয়েছে। মোটাসোটা পনের বিশটি বানর এসে রুটির পাশে বসে পড়েছে। এগুলোও এসে পরস্পরের মুখের দিকে ও রুটির দিকে তাকাতে লাগলো। রুটিতে কেউ হাত দিল না। আমরা বুঝলাম, এরা ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে। এর কিছুক্ষণ পরে আমরা দেখলাম, এক দেড়শ' বানরের একটি বড় দল এসেছে। এ দলের মধ্যে কয়েকটি বেশ মোটাসোটা বানর ছিল। যেন দলপতি। সেগুলো এসে রুটির আশপাশে বসে পড়ল। যেন গোল মিটিংয়ে বসে গবেষণা হচ্ছিল, রুটি কেন পড়ে রয়েছে। বিষয়টা কী? সাধারণত এমনভাবে রুটি পড়ে থাকে না। এরপর একটি বানর এগিয়ে গিয়ে একটি রুটি ছিঁড়ে ঘ্রাণ নিল। তারপর আরেকটি এগিয়ে গিয়ে একই কাজ করলো। একই কাজ চার পাঁচটি বানর করলো। এরপর তারা ইশারায় কিছু একটা বলল হয়তো, সবগুলো সেখান থেকে ভেগে গেল। আমরা নিশ্চিত হলাম, আমরা ব্যর্থ হয়েছি। রুটিগুলো কী করা যায় ভাবছিলাম। মাটি চাপা দেওয়া ছাড়া কিছু তো করার নেই।

এরপর মিনিট দশেক সময় অতিবাহিত হবার পর দুই আড়াইশ' বানরের একটি দল দৌড়ে চলে এলো। সকলের হাতে হরহরে পাতার একটি করে ডাল। সবাই এসে রুটির পাশে বসে রুটিগুলো টুকরো করল। যতগুলো বানর ছিল আনুমানিক ততগুলো টুকরো করল। রুটি ছিল মোট পঞ্চাশটি। প্রত্যেকে যেন পেতে পারে সে ব্যবস্থা করলো। পুরো জামাতের মধ্যে যেন এ মূলনীতি বিবেচনাধীন ছিল–

نیم نانے گر خورد مردِ خدا :: بذلِ درویشاں کند نیمے دگر

কোনো আল্লাহওয়ালা-দরবেশ যদি অর্ধ-রুটি আহার করেন
তাহলে অপর-অর্ধেক অন্য দরবেশকে দান করেন।

'বানরের বণ্টন' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। প্রত্যেকে এক এক টুকরো করে খেলো। এর পর হাতে রাখা পাতা মুখে পুরে চিবালো। তারপর চলে গেল। কমবখ্তগুলো না টললো, না মরলো, না বেহুঁশ হল।

বানরগুলো ঠনঠন করে চলে গেল আর আমরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম, অর্থাৎ বেয়াকুফ হয়ে গেলাম– দুই টাকার আটাও গেল, বিষও গেল, আর কাপড় তো

আগেই গেছে। উপরন্তু অনেকখানি সময় অপচয় হল। পক্ষান্তরে হুঁশিয়ার এই বানরগুলো তাদের চাহিদার সবকিছুই পেল। আমরা কেবল এতটুকু ধারণা লাভ করলাম যে, তারা যে পাতাগুলো নিয়ে এসেছিল ওগুলো ছিল বিষ-নিরাময়ক, যা এ বানরেরা জানতো।

এরপরও যদি আপনি দাবি করেন যে, আমরাই শুধু ডাক্তার, আমরা ঔষধ ব্যবহার করতে জানি– তাহলে তা ভুল হবে। কেননা এ দাবি বানরেরাও করতে পারে। উপরন্তু তারা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আক্রান্ত হবার পূর্বেই ব্যাধিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। তো জানতে পারলাম যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান প্রাণীদের রয়েছে। এরপরও চিকিৎসা শাস্ত্রে জ্ঞান থাকার দাবি নিয়ে প্রাণীদের উপর আপনার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি অর্থহীন। এ শাস্ত্রে আপনি এবং বানর– উভয়ে সমপর্যায়ের; বৈশিষ্ট্যগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে মাত্র।

প্রাণীদের মধ্যে শাসনব্যবস্থাও রয়েছে

আপনি হয়তো বলবেন, চিকিৎসা শাস্ত্রে না হোক, শাসনব্যবস্থার ভিত্তিতে আমরা শ্রেষ্ঠ। আমরা শাসনব্যবস্থার জ্ঞান রাখি এবং এর ভিত্তিতে দেশ ও জাতিকে সুশৃঙ্খল রাখি। শাসনব্যবস্থা কায়েম করে সুন্দর সমাজ গঠন করি। সুতরাং এর ভিত্তিতে আমরা প্রাণীদের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারি। তো আমার দৃষ্টিতে এ ধারণাও ভুল। আমি বলি, রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থাও মানব বৈশিষ্ট্য নয়; বরং প্রাণীদের মধ্যেও এ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মৌমাছিও স্বজাতির শাসন ও শৃঙ্খলাবিধান করতে পারে।

মৌমাছিরা মৌচাক তৈরি করে। অপূর্ব নির্মাণশৈলীতে তারা চাক বাধে। তাতে থাকে বিস্ময়কর সুনিপুন কুঠুরী। যেন তারা একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করে। এর শৃঙ্খলাবিধান এভাবে বিন্যস্ত হয়– প্রথমে তারা তাদের নেতা নির্বাচন করে নেয়। যাকে আমরা রাণী বলে থাকি। এ রাণী সার্বক্ষণিক ঐ চাক নিয়ন্ত্রণ করে। সকল মাছি রাণীর আনুগত্য করে। রাষ্ট্রের (চাকের) অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাব্যবস্থা এমন– চাকের এক অংশে থাকে মধুর কলোনি, এক অংশে শিশুপালন কলোনি এবং এক অংশে থাকে প্রাপ্তবয়স্ক মাছিরা। রাণী এদের সকলের দেখাশোনা করে। এমনকি কোনো মাছির দ্বারা যদি জাতির বিরুদ্ধে কোনো গাদ্দারি হয়ে যায় তাহলে সে ঐ মাছিটির ঘাড় মটকে দেয়। আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন, মৌচাকের নীচে মাথা কাটা কিছু মাছি পড়ে থাকে। কোনোটার মাথা কাটা, কোনোটার কোমড় ভাঙ্গা। এর কারণ হলো এই– যদি কোনো মাছি বিষাক্ত

কোনো পাতা বা ফুলে বসে সেখান থেকে এমন নির্যাস নিয়ে আসে যা দ্বারা তৈরি মধুতে বিষের প্রভাব নিশ্চিত হয়ে যায়, তাহলে ঐ রাণী মাছি সাথে সাথে তা অনুভব কতে পারে এবং দ্রুত ঐ মাছিটিকে হত্যা করে। যাতে সে চাকের মধ্যে ঢুকতে না পারে এবং স্বজাতির অন্য সদস্যদের প্রাণ নষ্ট না হয়। সে বোঝে, একজনকে হত্যা করে পুরো জতির জীবন রক্ষা করা কোনো অপরাধ নয়। অর্থাৎ তার শাসনব্যবস্থা তাকে এ মূলনীতি শিক্ষা দেয় যে,

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰا اُولِى الْاَلْبَابِ.

হে বুদ্ধিমানগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে।
[বাকারা ২ : ১৭৯]

মৌমাছিদের মধ্যে কিসাসের বিধান ও অপরাধের শাস্তি

অর্থাৎ একজনের মৃত্যু দ্বারা যদি পুরো জাতির জীবন বেঁচে যায় তাহলে সে মৃত্যুতে কোনো ক্ষতি নেই। এই স্বজাতি হত্যার ব্যাপারে মাছিদের আনুগত্য এমন– না কোনো প্রতিবাদ হয়, না রাণীর বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ হয়। রাণী কর্তৃক এই হত্যাকাণ্ডকে চুপচাপ মেনে নেয়। কারো মধ্যে এমন পেরেশানি দেখা দেয় না যে, কেন এমন হল? বরং পুরো কওম অনুগতশিরে মেনে নেয়। এবার ভাবুনতো– প্রথমে নেতা নির্বাচন, তারপর তার আনুগত্য, তারপর সম্মিলিতভাবে চাক নির্মাণ এবং শৃঙ্খলা অনুযায়ী কলোনি বণ্টন, অতঃপর অন্যায় অপরাধের জন্য হত্যা– এগুলো শাসনব্যবস্থা নয় তো কী?

বিজনুর জেলার (ভারত) নাজিবাবাদে প্রচুর মধু পাওয়া যায়। এ এলাকায় মৌমাছি পালনের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানের লোকজনের মধ্যে একটি কথার প্রচলন দেখলাম– অমুকে মেয়েকে তিনটি মাছি যৌতুক দিয়েছে, অমুকে তার মেয়েকে চারটি মাছি যৌতুক দিয়েছে। আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগলো। যৌতুক হিসেবে খাট, পালং, সোফাসেট, অলংকার, কাপড় প্রভৃতি দেবার কথা জানতাম। এই মাছি যৌতুক দেবার অর্থ কী? অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, মৌমাছি পালন করতে গিয়ে তারা যখন নির্দিষ্ট কোনো স্থানে মৌচাক বাধতে চায় তখন রাণী মৌমাছি ধরে সে স্থানে বসিয়ে দেয়। সকল মৌমাছি এসে রাণীর পাশে জড়ো হয়ে সেখানে চাক বাধে এবং মধু তৈরি হয়। তো এ লক্ষ্যে তারা দু'চারটি রাণী মৌমাছি ধরে বাক্সের মধ্যে বন্দি করে উপঢৌকন হিসেবে মেয়ে-জামাইকে দিয়ে দেয়। জামাতারও মৌমাছি পালন-পদ্ধতি জানা থাকে বিধায় সে উপযুক্ত স্থানে মাছিগুলোকে বসিয়ে দেয়। তারা চাক তৈরি করে এবং মধু

উৎপাদন করতে থাকে। তো চারটি মৌমাছি যৌতুক দেবার অর্থ হয় চারটি মধুর উৎস দিয়ে দেওয়া। এ ঘটনার দ্বারা মৌমাছিদের আনুগত্য, চালচলন এবং শৃঙ্খলাপ্রিয়তা সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল।

মানুষের মধ্যেও ঠিক এই একই বিষয় রয়েছে। সুতরাং এই শৃঙ্খলাপ্রিয়তা এবং স্বজাতিকে সুশৃঙ্খলরূপে নিয়ন্ত্রণ করার এই উন্নততর শাসনব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আপনি অযথাই দাবি করছেন যে, শাসনব্যবস্থা কেবল মানুষই জানে। এই মাছিরাও দাবি করতে পারে যে, আমরাও শাসনপদ্ধতি জানি। আমরা যদি কোনো আমিরের নিয়ন্ত্রণে থেকে এভাবে আমাদের কর্মসমূহ বণ্টন করে নেই যে, কেউ খাদ্য উৎপাদন করব, কেউ জাতিকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব পালন করব, কেউ সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হয়ে দেশ রক্ষার দায়িত্ব পালন করব, তাহলে নিঃসন্দেহে তা ভাল কাজ এবং এর প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে কিন্তু এগুলো শুধু মানুষেরই বৈশিষ্ট্য নয়। মাছিরাও এমন কাজ করতে পারে। এ কারণে জাতির এই শৃঙ্খলাবিধান করা শ্রেষ্ঠত্বের কোনো কারণ নয় যে, তার ভিত্তিতে মানুষ প্রাণীদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাববে।

হাঁসদের মধ্যে শাসন ও শৃঙ্খলাব্যবস্থা

মৌমাছিদের মতো হাঁসদের মধ্যেও শাসনব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।[*] হাঁসের ঝাঁক যখন ঘুমায় তখন তাদের নেতা স্বাজাতির দেখভাল ও পাহারাদারি করে। সারারাত সে একপায়ে ঝিলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন কোনো রকমের বিপদাপদের আশংকা দেখা দেয় তখন সে আওয়াজ দিয়ে কওমকে বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। তার আওয়াজ শুনে সকলে জেগে উঠে প্রস্তুত হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়বার আওয়াজ দেবার সাথে সাথে উড়তে শুরু করে। ওড়ার ক্ষেত্রেও তারা এক বিশেষ শৃঙ্খলা বজায় রাখে। নেতা আগে আগে ওড়ে আর অন্য হাঁসেরা দুই সারিতে বিভক্ত হয়ে তার অনুসরণ করে। আমির যেদিকে যায়, হাঁসদের এই কাফেলাও সেদিকে যায়। কারো এ বিষয়ে আপত্তি থাকেনা যে, আমীর কেন এদিকে যাচ্ছে। অতঃপর আমির যেখানে অবতরণ করে সকল হাঁস

---

[*] গৃহপালিত হাঁসের মধ্যে বিষয়টি ততটা স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত না হলেও বিশেষ করে বুনোহাঁসদের মধ্যে দেখা যায়। শীত মৌসুমে শীতপ্রধান দেশ যেমন সাইবেরিয়া থেকে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে হাঁসজাতীয় যেসব অতিথি পাখি আমাদের দেশে আগমন করে তাদের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। –অনুবাদক।

সেখানে অবতরণ করে। একে আপনি শাসনব্যবস্থা বলবেন না তো কী বলবেন? এর চেয়ে সুন্দর শাসনব্যবস্থা আর কী হতে পারে যে, নিজের অনুগত ও প্রজাদেরকে সতর্ক করা ও রক্ষা করার জন্য আমির নিজে রাতভর জেগে থাকে, চৌকন্ন থাকে। এটা কি উৎকর্ষতায় পৌঁছে যাওয়া উন্নততর এক শাসনব্যবস্থা নয়?

এ সব কারণে আমরা বলতে পারি, রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা শুধু মানুষের সাথেই খাস নয়, রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে প্রাণীরাও মানুষের সমকক্ষতার দাবি করতে পারে। মৌমাছিরা বলবে আমরাও শাসনপদ্ধতি জানি। পার্থক্য হয়তো এটুকু যে, আপনাদের শাসনব্যবস্থার নানাবিধ শাখা-উপশাখা আছে, প্রাণীদের তা নেই। তারও কারণ আছে। মানব জাতির মধ্যে অপরাধ বেশি বিধায় তার প্রতিরোধব্যবস্থাও বেশি। মৌমাছি ও হাঁসের মধ্যে অপরাধের প্রকারও কম তাই প্রতিরোধব্যবস্থাও কম। সুতরাং শাসনব্যবস্থা জানার দোহাই দিয়ে প্রাণীদের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা আপনার ভুল হবে।

মাকড়সার কারিগরি

আপনি যদি বলেন আমরা তাঁতশিল্পে পারদর্শী, সুতরাং আমরা প্রাণীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহলে মাকড়সা এসে বলবে, এ কাজ তো আমিও জানি। আপনারা হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, মাকড়সা সাদা রঙের তাঁবু তৈরি করে। চতুর্দিকে সূতা টেনে মাঝখানে তাঁবু নির্মান করে। এগুলো এত সূক্ষ্ম, পরিচ্ছন্ন ও মোলায়েম হয় যে, মসলিন কাপড়ও এত পরিচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম নয়। এগুলো কিন্তু বেশ মজবুতও হয়ে থাকে। (মানুষ শক্তি প্রয়োগে ছিঁড়তে পারে তা ভিন্ন কথা, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে) ঝড়ো বাতাস কিংবা প্রবল বর্ষণে এগুলোর কিছুই হয় না, চারদিকে টানা তন্তু যেমন ছিল তেমনই থাকে। আপনারা তো সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করেন; কিন্তু আল্লাহ জানেন মাকড়সা কী দিয়ে তার ঘর বানায়। আপনার কাপড় ছিঁড়ে যায়, ফেঁটে যায় কিন্তু মাকড়সা-নির্মিত এ কাপড় ও তাঁবু ছেঁড়ে না। আপনার কাপড় ময়লা হবে, পানি দিয়ে ধোবেন, সাবান দিয়ে পরিষ্কার করবেন কিন্তু মাকড়সার এ কাপড় ধোয়া ও পরিষ্কার করারই প্রয়োজন হবে না।

আপনি হয়তো বলবেন, আমরা খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানি। পাখি আটকানোর জন্য জাল বা ফাঁদ ব্যবহার করি। মাছ ধরার জণ্য জাল বুনি। আমাদের মতো এমন পদ্ধতি আর কার জানা আছে? অন্য প্রজাতিকে আমরা কাবু করে ফেলি। কৌশল করে সুতার জাল দ্বারা মাছ, পাখিসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদেরকে

আটকে ফেলি। এভাবে আমরা রুজি সংগ্রহ করি। ভিন্ন প্রজাতিকে এভাবে নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসতে আর কে পারে? এ ক্ষেত্রেও মাকড়সা এগিয়ে এসে বলবে, আমি আপনাদের চেয়ে ভাল জাল বুনতে পারি। মাকড়সা শিকার ধরার জন্য যে জার টানিয়ে রাখে তাতে মাছি ও বিভিন্ন কীটপতঙ্গ এসে আটকা পড়ে। হাজারও চেষ্টা করে, চিল্লাচিল্লি করে কিন্তু এ জাল থেকে ছুটতে পারে না। এটা কি ভিন্ন প্রজাতিকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসা নয়? মাকড়সা এত সূক্ষ্ম তন্তু তৈরি করে যে আপনার সুতা অত সূক্ষ্ম হয় না।

মোটকথা, স্বভাবসিদ্ধ ও অবিজ্ঞতালব্ধ এমন কোনো বিষয় নেই যাকে আপনি নিজের বৈশিষ্ট্য বলে দাবি করতে পারেন। জীবনের প্রয়োজন পূরণের এমন কোনো বিষয় নেই যা প্রাণীদের মধ্যে নেই। প্রয়োজনীয় ও জীবনঘনিষ্ঠ যতগুলো বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান রয়েছে প্রাণীদেরও নিজ প্রয়োজন মাফিক বুঝ ও কারিগরি জ্ঞান রয়েছে।

জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান

এমনকি আপনি যদি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্যে ষোল হাজার ফুট উচ্চতায় উড়তে সক্ষম হন তাহলে তাতে আশ্চর্যের কী আছে? একটি শকুন, একটি চিলও নিজের অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞানশক্তির সাহায্যে নিজ পাখায় ভর করে সমউচ্চতায় উড়ে বেড়ায়। আপনি পিতল, তামা ও অন্যান্য পদার্থের সহায়তায় তৈরি কৃত্রিম পাখা তথা উড়োজাহাজে করে ওড়েন আর চিল কাক ও অন্যান্য পাখিরা তাদের অকৃত্রিম পাখা ও স্বাভাবিক সামর্থ্য দ্বারা ওড়ে। আপনাকে এই কৃত্রিম পাখা তৈরি করতে বিভিন্ন পদার্থের দ্বারস্থ হতে হয় এবং উড়োজাহাজ বানাতে গায়ের রক্ত পানি করতে হয়, বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তবে গিয়ে উড়তে পারেন। পক্ষান্তরে এ পাখিরা নিজেরাই এক একটি উড়োজাহাজ।

মোটকথা, আপনি ওড়েন তো পাখিরাও ওড়ে। অর্থাৎ শূন্যে উড়ে বেড়ানোর কাজ আপনি যেমন করেন, পাখিরাও তদ্রূপ করে। আপনি যেমন কাপড় বুনে পোশাক বানান, শরীর আচ্ছাদিত করেন; পশুপাখি ও কীটপতঙ্গেরাও তদ্রূপ খোলস ও পর দ্বারা নিজের শরীরকে আচ্ছাদিত করে। আপনার পোশাক কৃত্রিম, তাদেরটা অকৃত্রিম ও কুদরতী। আপনি থাকার জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করেন, প্রাণীরাও তাদের উপযোগী ঘরবাড়ি বানায়। আপনি রুজির অন্বেষণে ঘরের বাইরে যান, মাঠে-জঙ্গলে যান, তারাও তদ্রূপ মাঠেঘাটে জঙ্গলে যায় এবং

সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে বাড়ি ফেরে। আপনি জর্দা-পোলাও খান, তারা ঘাস-দানা খায়। গোশত খেতে হলে আপনাকে রান্না করে খেতে হয়, তারা এ ঝামেলা থেকে মুক্ত, তারা কাঁচাই খায়। তাদের ঘাস, দানাকে আপনি ঘৃণা করেন তো তারাও আপনার জর্দা-পোলাওকে ঘৃণা করে। মোটকথা, এমন কোনো স্বভাবসিদ্ধ কাজ নেই যাতে তারা আপনার সাথে সমকক্ষতার দাবি করতে না পারে।

আপনি রাষ্ট্রশাসন-ক্ষমতার দাবিদার হলে মৌমাছি ও হাঁস এসে এ দাবির পক্ষে আপনার বিশেষত্বকে নাকচ করে দেবে। আপনি কাপড় বোনা ও জাল বোনা দ্বারা বিশেষত্বের দাবি করলে মাকড়সা এসে বলবে এ কাজ আমিও পারি। আপনি ডাক্তারি বিদ্যায় দক্ষতার দাবি তুললে বানর সামনে এসে বাধা দিয়ে বলবে এ বিদ্যা আমারও কিছুটা আছে। আপনি উড্ডয়ন বিদ্যায় পারদর্শিতার আলোকে বিশেষত্ব দাবি করলে পাখিরা এসে বলবে এ ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক দক্ষ। আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাড়ি নির্মাণের দক্ষতার কথা তুললে সকল পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ এসে বলবে এ কাজ আমরা সবাই পারি। জীবন যাপনের নানা উপায়-উপকরণ, পোশাক-আশাক পরিধান, চিকিৎসা করণ, ঘরবাড়ি তৈরি এবং শৃঙ্খলাবিধানে প্রাণীদের মধ্যে মানুষের শরিকদার রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের আলোকে মানুষ প্রাণীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। শ্রেষ্ঠত্বের জন্য এমন কিছু বিশেষত্ব থাকতে হয় যা কেবল তার মধ্যে আছে এবং অন্য কারো মধ্যে নেই। প্রকৃত বিষয় হলো, যে ইলম কেবল মানুষের মধ্যে আছে এবং অন্য কারো মধ্যে নেই তা হলো ইলমে শরীয়ত এবং আল্লাহর আহকামের ইলম। যে ইলমের মধ্যে থাকে আল্লাহর মারেফাত। এ ইলমের মাধ্যমে মানুষ সৌভাগ্যের স্তরসমূহে আরোহণ করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের যোগ্য সাব্যস্ত হয়। এ ইলম মানুষভিন্ন অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। না ফেরেশতাদের মধ্যে এ ইলম বিদ্যমান আছে, না জিনরা এ ইলম দ্বারা ধন্য হয়েছে আর না প্রাণীরা এ বিষয়ে অবগত। জড়পদার্থ ও উদ্ভিদের এ ইলম থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। এ ইলম হলো মানুষের বৈশিষ্ট্য। ইলমে শরীয়ত লাভের সৌভাগ্য কেবল মানুষেরই হয়েছে। এরই ভিত্তিতে মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হলো, এই ইলম পয়গম্বর ছাড়া আসতে পারে না। কেননা এ ইলম হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি জানার ইলম। আর কারো সন্তুষ্টির বিষয়টি তিনি নিজে বলে দেওয়া ব্যতীত কখনোই অবগত হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর অভ্যন্তরীণ বিষয় যে-কারো কাছে ব্যক্ত করেন না। সুতরাং এর জন্য তিনি মানব জাতিকে নির্বাচন করেছেন। আর

এ মানব জাতির মধ্য থেকেও বিশেষভাবে নির্বাচিত হয়েছিল জনাব আম্বিয়া আ.দের জামাত। তাঁদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কথা অবহিত করেছেন। বলে দিয়েছেন– অমুক জিনিস করলে আমি খুশি হই, তোমরা তা কর আর অমুক জিনিসে আমি অসন্তুষ্ট হই, তোমরা তা কর না। অর্থাৎ তাঁর আদেশ-নিষেধ জানিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং এই আদেশ-নিষেধের বিধানকে শরীয়ত বলা হয়। এই শরীয়তের ইলমের জন্য নবুওয়াতের ব্যবস্থা রেখেছেন এবং নবুওয়াতকে মানব জাতির জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নবুওয়াতের ইলম শুধু মানুষকেই দান করেছেন।

মনুষ্যত্বের ভিত্তিই হলো ইলমে এলাহি

মানুষ, ফেরেশতা, জিন ও প্রাণীকুল– এই চারপ্রকারের মাখলুক, যাদের বোধশক্তি ও অনুভূতিশক্তি রয়েছে, তাদের মধ্য হতে ইলমে নবুওয়াত কেবল মানব জাতিকেই দান করা হয়েছে। অবশিষ্ট তিন প্রকার তথা ফেরেশতা, জিন ও প্রাণীদের এ ইলম লাভের সৌভাগ্য হয়নি; অথবা সামান্য পরিমাণে লাভ হলেও তা মানুষের সৌজন্যে মানুষের মাধ্যমে হয়েছে। সুতরাং এ সৃষ্টিকুলের মাঝে মানুষই হলো প্রধান। এ ক্ষেত্রে সমপর্যায়তা তো দূরের কথা কোনো মাখলুক অংশীদারিত্বের দাবিও করতে পারে না। এতে স্পষ্ট হলো যে, স্বভাবজাত জ্ঞান, কল্পনাপ্রসূত জ্ঞান, চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান ও বুদ্ধিজাত জ্ঞান ইত্যাদি মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। এসব জ্ঞান অন্যান্যদেরও রয়েছে। কেননা এ-সকল জ্ঞান নিজের অভ্যন্তরীণ শক্তি হতে উৎকর্ষিত এবং সকল জীবের মধ্যে এ শক্তি কম-বেশি রাখা হয়েছে। স্বভাব-প্রকৃতি, কল্পনাশক্তি, চিন্তাশক্তি কিংবা বোধশক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বকীয়তা রয়েছে। সুতরাং এগুলোর আলোকে জীবজগতের সদস্যরা যা-কিছুই করুক না কেন তাতে তার নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ও কামনা-বাসনা প্রকাশ পাবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ও কাম্য বিষয়াবলির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ তাঁর পক্ষ হতে আগত ইলম দ্বারাই বোঝা যেতে পারে। আর সে ইলম হলো ওহীর ইলম, যা নবুওয়াত ও রেসালাতের মাধ্যমে লাভ হয়। আর এটা শুধু মানুষকেই দান করা হয়েছে। এই আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টি ফুটে উঠল যে, স্বভাবজাত ইলম, কল্পনাপ্রসূত ইলম, বুদ্ধি ও চিন্তাপ্রসূত ইলম কিংবা শয়তানি ইলম মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো ইলমে এলাহি ও ইলমে রেসালাত। যা মানব জাতি ছাড়া অন্য কারো নসিব হয়নি। এ কারণে সকল সৃষ্টির উপর

মানুষই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ইলমে শরীয়তের ভিত্তিতে। অন্যভাবে বললে– ইলমে এলাহি দ্বারা মানুষের ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্বই শুধু প্রমাণ হয় না; বরং তার মনুষ্যত্বের ভিত্তিও এই ইলমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু এ ইলমই মানুষের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত হল; অর্থাৎ এ ইলম না থাকলে মানুষ ও প্রাণীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, সেহেতু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত 'মানুষ' হতে পারে না যতক্ষণ না তার এ ইলম অর্জিত হয়। কেননা কোনো কিছু থেকে যখন তার বৈশিষ্ট্য শেষ হয়ে যায় তখন তা আর ঐ জিনিস থাকে না। আপনার মধ্যে যদি আপনার বৈশিষ্ট্য না থাকে তাহলে আপনি আর আপনি থাকবেন না। মানবিক বৈশিষ্ট্য যদি মানুষের মধ্যে থাকে তবেই কেবল তাকে মানুষ বলা হবে, অন্যথায় মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পানাহার, ঘরবাড়ি নির্মাণ ও চিকিৎসা করণে তারা মানুষের সমপর্যায়ের।

সুতরাং মানুষের বৈশিষ্ট্য যেহেতু এই ইলমে এলাহি, যার দ্বারা সে আল্লাহর মর্জিসমূহ বুঝতে পারে সেহেতু যতক্ষণ এই ইলমে এলাহি তার মধ্যে থাকবে ততক্ষণ তার নাম মানুষ থাকবে। অন্যথায় সে এক পানাহারকারী প্রাণীরূপে থেকে যাবে। মানুষ তার নিজ জ্ঞান দ্বারা পানাহার সামগ্রি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাড়িঘরকে যতই সুশোভিত ও দৃষ্টিনন্দন করুক না কেন, সে প্রাণীই থেকে যাবে। কেননা এ জ্ঞান প্রাণীদেরও রয়েছে। যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত আলোচনায় এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, না পানাহার করা মনুষ্যবৈশিষ্ট্য, না বাড়িঘর নির্মাণ মনুষ্যবৈশিষ্ট্য আর না শাসন-শৃঙ্খলাবিধান মনুষ্যবৈশিষ্ট্য। কেউ যদি পঞ্চাশ তলা বিল্ডিংও নির্মাণ করে তবুও সে এর ভিত্তিতে প্রাণীর সীমা অতিক্রম করবে না। কেননা এ কাজ, অর্থাৎ বাড়িঘর নির্মাণ তার বৈশিষ্ট্য নয়; প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য। যদি সে নির্মাণশিল্প, বস্ত্রশিল্প কিংবা কারুশিল্পে জ্ঞান-বুদ্ধিকেও ব্যবহার করে, যা দ্বারা এগুলো সুশোভিত হয়, তাহলে সে যদিও বাহ্যিকভাবে প্রাণীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা সে আরো তুচ্ছ হয়ে গেল। কেননা জ্ঞানবুদ্ধির মতো পবিত্র এক রত্নকে সে নিজের স্বভাব-প্রকৃতির খাদেম ও গোলাম বানিয়ে ফেললো। আর সকলেরই জানা আছে যে, স্বভাব-প্রকৃতি হলো জ্ঞানহীন আর বিবেক-বুদ্ধি হলো জ্ঞানের উৎস। তো এক জ্ঞানহীনকে হুকুমদাতা সাব্যস্ত করে যেন এক মূর্খকে বাদশা ও জ্ঞানীকে গোলাম বানানো হল। এটা কী-করে বুদ্ধির পরিচয় হয়? বরং এতো চরম নির্বুদ্ধিতা। এমন বেহুদা বিষয় থেকে প্রাণীরা মুক্ত। এমনটি করে মানুষ উঁচু তো নয়ই বরং প্রাণীদের চেয়ে নিচু ও কমমর্যাদার হয়ে গেছে। কেননা জীবজন্তুরা

তাদের প্রাণীস্বভাবকে ব্যবহার করতে গিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে তাদের গোলাম বানায় না। অবশ্য তাদের মধ্য বিবেকবুদ্ধি মোটেও না থাকা কিংবা না-থাকার মতো অতিসামান্য পরিমাণে থাকার বিষয়টি ভিন্ন কথা। তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইলমে এলাহি বঞ্চিত মানুষেরা প্রাণীদের অপেক্ষা অধিক নির্বোধ সাব্যস্ত হয়।

স্বভাব-চাহিদার বিরুদ্ধাচরণেই স্বার্থকতা

স্বভাব-প্রকৃতির চাহিদাসমূহকে পূর্ণ করার মধ্যে কোনো স্বার্থকতা নেই, তার বিরোধিতা করণেই বরং স্বার্থকতা রয়েছে। কেউ যদি দাবি করে যে, আমি বড়মাপের এক স্বার্থক মানুষ, কেননা আমি পানাহার করি। তাহলে লোকজন বলবে, আরে আহাম্মাক! এর মধ্যে বিশেষত্বের কী আছে? প্রাণীরাও তো পানাহার করে। এটা হলো মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা। এতে না কষ্ট আছে, না পরিশ্রম আছে। আর এর দ্বারা না বীরত্ব প্রকাশ পায়, না অসাধ্য সাধন প্রকাশ পায়। যদি তাই হতো তাহলে সকল প্রাণী ফাযেল ও কামেল হয়ে যেত।

অথবা কেউ যদি এমন বলে যে, আমি অনেক বড় এক কামেল ব্যক্তি, কেননা আমি রাতভর ঘুমিয়ে থাকি। তাহলেও বলা হবে যে, এটা তো এমন এক স্বভাবজাত কাজ যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও করতে হয়। প্রাণীরাও এ কাজ করে। এতে কামালিয়াতের কী আছে?

স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করার নাম হলো কামালিয়াত বা স্বার্থকতা। এ ক্ষেত্রে মানুষকে অনেক পরিশ্রম, সহনশীলতা ও ধৈর্য-সহ্য প্রদর্শন করতে হয়। এ কারণে কারো ব্যাপারে যদি জানা যায় সে সে মাসভর কোনো আহার করেনি তাহলে লোকজন তাকে কামেল ব্যক্তি মনে করে তার পিছু নেয়। কেননা স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজে সফলতা লাভ করা প্রকৃতপক্ষেই কামালিয়াত। স্বভাব-প্রকৃতির গোলাম হয়ে তার চাহিদা মতো কাজ করার মধ্যে কোনো স্বার্থকতা বা কামালিয়াত নেই। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ল।

হযরত নানুতুবী রহ.-এর একটি ঘটনা

একটু পূর্বে আপনাদের সামনে যে বুযুর্গের প্রশংসাবাণী শুনানো হলো,* অর্থাৎ দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী রহ.। যাঁর ইলম ও ফযল এবং জাহেরি ও বাতেনি উৎকর্ষতা সুবিদিত। তিনি এবং পণ্ডিত দিয়ানন্দ সরস্বতী সমসাময়িক ছিলেন। সে ছিল হিন্দুদের উপদল 'আর্যসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা। একবার পণ্ডিত দিয়ানন্দ সরস্বতী উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার একটি ছোট শহরে এসে ইসলামের উপর নানা আপত্তি উপস্থাপন করতে লাগল। ওলামায়ে কেরাম সে-সবের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন এবং বললেন, সাহস থাকলে মাঠে এসে বহস (তর্কযুদ্ধ) কর। সে বললো, তোমরা আমার সমপর্যায়ের নও, আমি কেবল 'মৌলভী কাসেম'-এর সাথে বহস করতে প্রস্তুত। সে মতে সেখানকার ওলামায়ে কেরাম এলাকার পরিস্থিতি জানিয়ে তাঁর কাছে চিঠি লিখলেন। হযরত নানুতুবী রহ. শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও দীনের হেফাযত ও প্রচারের খাতিরে নিজের কয়েকজন শাগরিদকে সাথে করে সেখানে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব, মুহাদ্দিসে দেওবন্দ; মাওলানা আহমাদ হাসান সাহেব, মুহাদ্দিসে আমরুহী; মাওলানা হাকিম রহিমুল্লাহ সাহেব বিজনুরী এবং দেওবন্দের প্রসিদ্ধ আদিব মুন্সি নেহাল আহমাদ প্রমুখ। এঁরা ছিলেন হযরত নানুতুবী রহ.-এর খাস শাগরিদ। হযরত নানুতুবী রহ. বলতেন, দেওবন্দে দেড়জন মেধাবী রয়েছেন। পূর্ণ মেধাবী হলেন হাকিম মুশতাক আহমাদ সাহেব এবং আধা হলেন মুন্সি নেহাল আহমাদ সাহেব। এদের কেউ যখন আমার ওয়াজের মাহফিলে বসেন তখন আলোচনার বিষয়বস্তু শুধু আসতে থাকে। কেননা বোঝার লোক উপস্থিত রয়েছে।

হযরত নানুতুবী রহ. সেখানে পৌঁছে মুনাযারার শর্তাবলি সম্পাদন করার জন্য মুন্সি নেহাল আহমাদ সাহেবকে পণ্ডিত দিয়ানন্দের নিকট পাঠালেন। মুন্সি সাহেব গিয়ে জানতে পারলেন পণ্ডিতজি খাবার টেবিলে বসে গেছেন, খাওয়া শেষ করে কথাবার্তা বলবেন। তিনি দেখতে পেলেন, পণ্ডিতজি যে রুমে আছেন সেখানে খাবার ভর্তি একটি বিরাটকায় থালা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং এর মধ্যে হালুয়া,

---

* হযরত কারী সাহেবের বয়ানের পূর্বে মাওলানা সামিউল হক সাহেব একটি আরবী কাসিদা উপস্থাপন করেন। উক্ত কাসিদায় হযরতের আল্লাহপ্রদত্ত কামালাত ও গুণাবলি বর্ণনার সাথে সাথে দারুলউলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ.-এর মুকাদ্দাস আলোচনাও স্থান পায়। হযরত সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। –সংকলক।

পুরী, তরকারি ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়েছে। এতে দশ-পনের কেজি পরিমাণ ওজনের নানা জাতীয় খাবার ছিল, থালাটি পণ্ডিতজির নিকট নেওয়া হল।

পরিষ্কার কথা, এতসব জিনিস একজনের খাবার হতে পারে না। মুন্সি সাহেব মনে করলেন, হয়তো ভেতরে অন্য লোকজন রয়েছে। একজন মানুষ আর কী পরিমাণই বা খেতে পারে? পণ্ডিতজির আগমন উপলক্ষে হয়তো আরো লোকজনকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি বাইরে বসে অপেক্ষা করতে থাকলেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা পর যখন থালাটি বের করে আনা হল, তখন তাতে কিছুই ছিল না। তিনি এ ধারণাই করলেন, এক ব্যক্তি এতসব খেতে পারে না। নিশ্চয় ভেতরে কয়েকজন হবেন, সবাই মিলে খেয়েছেন। অতঃপর তাঁকে ভেতরে নেওয়া হল, গিয়ে দেখতে পেলেন পণ্ডিতজি একাই বসে আছেন। এই ভেবে তিনি পেরেশান হলেন যে, দশ-পনের কেজি পরিমাণ খাবার একা এক ব্যক্তি কেমন করে গলাধঃকরণ করতে পারে? মনে মনে ভাবলেন, হতে পারে রুমের অন্য কোনো দরোজা রয়েছে এবং অন্যরা খেয়ে ঐ দরোজা দিয়ে বের হয়ে গেছেন, কিন্তু লক্ষ করে দেখলেন, রুমে অন্য কোনো দরোজা নেই। একটিই দরোজা ছিল এবং তিনিও এ দরোজাটি দিয়েই প্রবেশ করেছিলেন। অতঃপর তিনি খাদেমের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, পণ্ডিতজির সাথে অন্য কেউ কি খাবার খেয়েছে? সে জানাল, অন্য কেউ ছিল না, পণ্ডিতজি একাই খেয়েছেন। এখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, একি মানুষ? না মানব রূপী অন্য কোনো জন্তু! এত অধিক জিনিস একাই ভক্ষণ করে ফেলল কেমন করে? যাই হোক, পণ্ডিতজির সাথে বহস সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শেষ করে নেহাল উদ্দিন সাহেব ফিরে এসে হযরতকে সবকিছু জানালেন।

যে উদ্দেশ্যে ঘটনাটি আমি বর্ণনা করলাম তা হল, মুন্সি নেহাল উদ্দিন সাহেব নানুতুবী রহ.-এর সাথে আলাপ আলোচনা শেষ করে বেরিয়ে এসে নিজের সতীর্থদের সাথে বললেন, আমি এক ভীষণ চিন্তা ও পেরেশানিতে আছি, কোনো সুরাহা দেখতে পাচ্ছি না। সকল সঙ্গী মনোযোগসহকারে শ্রবণ করে বললেন, বিষয় কী? খুলে বলুন। তিনি বললেন– পেরেশানি হল, যদি মাসয়ালা নিয়ে পণ্ডিতজির সাথে মুনাযারা হয় তাহলে বিশ্বাস আছে যে, আমাদের হযরত ইনশাআল্লাহ বিজয়ী হবেন, কারণ তিনি হকের উপর রয়েছেন। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, যদি পানাহারে মুনাযারা হয় তাহলে কী হবে? কেননা পণ্ডিতজি তো পনের কেজি খানা খেয়েও দমবেন না, আর আমাদের হযরত একটি চাপাতির অর্ধেক খেয়েই বসে থাকবেন। সুতরাং এ মুনাযারার অবস্থা কী হবে? এটি একটি হাসির কথা ছিল, সকলেই হাসলেন, আলাপের ইতি হয়ে গেল। কিন্তু এ

কথা হযরতের নিকটও পৌঁছল।

হযরত তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, মুন্সিজী! আপনি কী কথা বলেছেন? তিনি আতংকিত হয়ে পড়লেন এজন্য যে, হাসির কথা ছিল, বন্ধু-বান্ধবকে শুনিয়েছেন, এখন শায়খের সম্মুখে নিরব। কী বলবেন তাঁকে?

হযরত বললেন, তুমি যা বলেছ তা আমি শুনেছি, তোমার মুখে একটু শুনতে চাই যাতে তোমাকে উত্তর বলে দিতে পারি। এজন্য যে, তুমি বলেছ এ বিষয়টি খুব জটিল এবং এর সমাধান হওয়া উচিত। আমি এর সমাধান করে দেব। কিন্তু তুমি তোমার নিজের মুখে তা প্রকাশ কর। মুন্সি নেহাল উদ্দিন সাহেব কম্পিত কণ্ঠে তার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন।

হযরত বললেন, এর দু'টি উত্তর রয়েছে, একটি হল হাসি কৌতুকের, অন্যটি হল প্রকৃত। হাসির উত্তর হল, সকল মুনাযারার জন্য কেবল আমিই কেন, তোমরা কোন কাজের জন্য? যদি আহার গ্রহণে মুনাযারা হয় তবে তোমাদেরকে অগ্রসর করে দেব। তারপর বললেন, তোমাদের মনে এ চিন্তা কেন এল যে, যদি আহারে মুনাযারা হয় তবে কে জয়ী হবে? ভক্ষণ করা হল জীব-জানোয়ারের আলামত। মুনাযারা কি মূর্খতা ও হিংস্রতার মধ্যে হয়, নাকি ইলম ও জ্ঞানের মধ্যে হয়? যদি মূর্খতা ও পশুত্বে মুনাযারা হয়, তবে আমরা পণ্ডিতজির মোকাবেলায় হাতি, মহিষকে পেশ করব– খেতে থাকো, এদের বিপরীতে দেখি কত খেতে পার। তারপর বললেন, তোমাদের অন্তরে এ প্রশ্ন কেন উদিত হল না যে, যদি অনাহারে থাকার মধ্যে মুনাযারা হয় তবে কী হবে? আমি এজন্যও প্রস্তুত রয়েছি। পানাহার করিয়ে পণ্ডিতজিকে এক রুমে বন্ধ করে দেওয়া হোক এবং আমাকেও এক রুমে বন্ধ করে দেওয়া হোক এবং ছয়মাস পর দরোজা খোলা হোক। যে জীবিত থাকবে সেই হক বলে সাব্যস্ত হবে। পানাহার করা হল চতুষ্পদ জন্তুর কাজ, এদের স্বভাব, অভ্যাস এবং মূর্খতার উৎস। আর পানাহার না করা হল ফেরেশতাদের স্বভাব, যারা ইলম ও জ্ঞানের উৎস। মুনাযারা হয় ইলম ও জ্ঞানের দ্বারা, মূর্খতা ও অজ্ঞতা দ্বারা নয়। যদি মূর্খতা ও অজ্ঞতার মুনাযারা হয় তবে জীবজন্তুদেরকে মোকাবেলার জন্য পেশ করে দেব। আর যদি ইলমের হয়, জ্ঞানে হয় তবে আমরা করব।

আল্লাহওয়ালাগণের জীবনধারণের মাধ্যম

এ প্রসঙ্গে আমি আমার বুযুর্গগণের নিকট থেকে শুনেছি, হযরত নানুতুবী রহ. তাঁর ওফাতের কয়েক মাস পূর্বে বলেছেন– 'আলহামদুলিল্লাহ, জীবনধারণের

জন্য এখন আর আমার পানাহারের প্রয়োজন নেই। সুন্নাতের অনুসরণের জন্য পানাহার করে থাকি।' এর হাকিকত হলো এই, আল্লাহর জিকির যখন শিরা ও স্নায়ূতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে তখন তা জীবনধারণের মাধ্যম হয়ে যায়। এ রকমই ছিল নবী আ.গণের শান। তাঁরা আবদিয়াতের প্রকাশ এবং উম্মতের জন্য আমলী নমুনা পেশ করার লক্ষ্যে পানাহার করতেন। একেবারে সর্বনিম্ন পরিমাণে অতি সাধারণ আহার তাঁরা গ্রহণ করতেন। যেমন যব, গম প্রভৃতি। এই অতি সাধারণ, অতি সামান্য আহারও যে তাঁরা নিয়মিত গ্রহণ করতেন এমন নয়। অগণিত অনাহারী দিন তাঁরা পার করতেন। এ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, স্বভাবজাত চাহিদা পূরণের নাম কামাল বা উৎকর্ষতা নয়। যদি তাই হতো, তাহলে তাতো সকল জীবজন্তুর মধ্যেই রয়েছে, মানুষের বিশেষত্ব কোথায়?

ঠিক অদ্রূপভাবে স্বভাবজাত বিষয়ে অগ্রসর হওয়া এবং উন্নতি করার নাম ইলম ও কামালে ইলম নয়। কেননা এই স্বভাবগত ইলম প্রয়োজন অনুপাতে প্রাণীদের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। ইলমী কামাল হলো এই যে, আল্লাহর সাথে কথা বলে ইলম হাসিল করা হবে, যা স্বভাব-প্রকৃতির চাহিদার বহু উর্ধ্বের বিষয়। আর তা হলো ইলমে ওহী। যা কেবল পয়গম্বরের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। নফসের খেয়ালে সজ্জিত সুন্দর পদ্ধতিতে প্রকাশ করার দ্বারা তা লাভ হয় না। একে রূপক ইলম বলা হবে, প্রকৃত ইলম নয়।

যেহেতু এই ইলমে এলাহি-ই মানব জাতির বৈশিষ্ট্য সেহেতু মনুষ্যত্বের অর্থ দাঁড়াল ইলমে এলাহির ধারক হওয়া। এ কারণেই পোশাক পরিধান করা, বাড়িঘর বানিয়ে বসবাস করা ও পানাহার করার নাম মানুষ নয়। অদ্রূপ দুই কান, দুই চোখ ও এক নাক বিশিষ্ট নির্দিষ্ট শারীরিক গঠনের নামও মানুষ নয়। বরং মানুষ হলো সেই চারিত্রিক গঠনের নাম যা ইলমে এলাহি ও ইলমে লাদুনী দ্বারা গঠিত। মানুষ হলেন তিনি, যাঁর থেকে ইলম ও হিকমতের প্রস্রবণ নির্গত হয়, কিংবা সেই প্রস্রবণে যিনি স্নাত হন, অথবা যিনি তার পৃষ্ঠপোষক হন। এ কারণেই হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا، إِلاَّ عَالِمٌ اَوْ مُعَلِّمٌ...الخ

অর্থাৎ দুনিয়াও অভিশপ্ত এবং দুনিয়াতে যা-কিছু রয়েছে তাও অভিশপ্ত। ব্যতিক্রম কেবল তারা, যারা আলেম কিংবা যারা তালিবে ইলম কিংবা যারা ইলমের পৃষ্ঠপোষক অথবা যারা এদেরকে ভালবাসেন। আলেম বা তালিবে ইলমগণ যে ইলম শেখেন ও শিক্ষা দেন সে ইলম হলো কুরআন ও সুন্নাহর ইলম। যেমনটি হাদিসে এসেছেঃ

إِنَّمَا الْعِلْمُ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ.

নিশ্চয়ই ইলম হলো সুস্পষ্ট আয়াত (কুরআন), অথবা সুদৃঢ় সুন্নাত, অথবা সমতাপূর্ণ বিধান। অর্থাৎ কুরআন হাদিসের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ মুজতাহিদগণের কিয়াস।

এ ইলম শুধু আম্বিয়া আ.গণের মাধ্যমে লাভ হয়। বুদ্ধি, চিন্তা, স্বভাব-প্রকৃতি বা কল্পনা দ্বারা লাভ হয় না।

কেবল পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমেই ইলমে নববী লাভ হয়

যে ইলম কাঙ্ক্ষিত ও কাম্য সে ইলম লাভ করতে বহু পরিশ্রম করতে হয়। স্বভাব-প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে মুজাহাদা ও সাধনা করতে হয়। কেননা এ ইলম বুদ্ধি ও স্বভাবজাত ইলমের মতো সহজলভ্য নয় বলেই অন্যসব ইলম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা স্বভাবজাত কাজ মানুষের থেকে প্রকাশ পাওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যা তার মধ্যে নেই তা প্রকাশ পাওয়া আশ্চর্যের বিষয়। যেমনটি এক হাদিসে এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন– বলো তো কাদের ঈমান বিস্ময়কর? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন 'ফেরেশতাদের ঈমান'। আল্লাহর রাসূল বললেন, কী এমন কারণ থাকতে পারে যে, ফেরেশতারা ঈমান গ্রহণ করবে না? প্রতি মুহূর্তে তারা আল্লাহর তাজাল্লি প্রত্যক্ষ করছেন, জান্নাত ও দোজখ তাদের সামনে রয়েছে। তারা ঈমান গ্রহণ না করলে আর কারা করবে? অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'আম্বিয়া আ.দের ঈমান অধিক বিস্ময়ের'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আম্বিয়া আ. ঈমান গ্রহণ করবেন না তো কী করবেন? দিনরাত তাঁদের কাছে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন, আল্লাহর ওহী তাঁদের উপর নাযিল হয়, তাঁদের চোখের সম্মুখে আল্লাহর জালাল ও জামাল ভাস্বর, তাঁদের হাত দিয়ে মুজেজা প্রকাশ হতে থাকে। তাঁরা ঈমান গ্রহণ না করে কী করবেন?

এরপর সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঈমান হলো আমাদের ঈমান'। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ঈমান গ্রহণ না করার কী আছে? পয়গম্বর তোমাদের সামনে

হয়েছেন, স্বচক্ষে তোমরা মুজেজাসমূহ প্রত্যক্ষ করছ, তোমাদের চোখের সম্মুখে ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তোমরা ঈমান গ্রহণ না করলে আর কারা করবে? এবার সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন যে, কাদের ঈমান সবচেয়ে বিস্ময়ের'। আল্লাহর রাসূল তখন ইরশাদ করলেন, সবচেয়ে বিস্ময়কর ঈমান হবে সেইসকল ব্যক্তিবর্গের যারা তোমাদের পরবর্তীতে আগমন করবেন। না পয়গম্বর তাদের সামনে থাকবেন, না তারা মুজেজাসমূহ প্রত্যক্ষ করবেন; উপরন্তু তাদের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় ছড়িয়ে দেবার ভরপুর প্রচেষ্টা থাকবে। এতদসত্ত্বেও তারা ঈমান গ্রহণ করবেন এবং তাতে অটল থাকবেন। সুতরাং তাদের ঈমানই হবে সবচেয়ে বিস্ময়ের'। অত্র হাদিসের আলোকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, যে জিনিস বহু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে, বহু ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে অর্জন করা হয় তা অধিক বিস্ময়ের, অধিক আশ্চর্যের হয়ে থাকে। যে জিনিস সহজলভ্য এবং তার প্রতি আকৃষ্টকারী বহু উপকরণ বিদ্যমান থাকে আর তা লাভ করতে কোনো প্রতিবন্ধকতাও না থাকে, সে জিনিস অর্জন করাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে না। এ যুক্তির ভিত্তিতেই বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ ইবাদতে মশগুল থাকা আশ্চর্যের কিছু নয়। কেননা আল্লাহর জাল্লাহ সর্বদা সামনে রয়েছে এবং কোনো রকমের প্রতিবন্ধকতাও নেই। না আছে পানাহারের তাড়না, না আছে স্ত্রী-সন্তানের ধান্দা আর না আছে কাম-ক্রোধের উত্তেজনা। সুতরাং তাদের বেলায় ইবাদত হলো স্বভাবজাত কাজ। আর স্বভাবের চাহিদা পূর্ণ করা কষ্টকর কোনো বিষয় নয়। তার থেকে বিরত থাকা বরং কষ্টের ও বিস্ময়ের। অতএব, স্বভাবের চাহিদা হবার কারণে মানুষের জন্য যেমন পানাহার ও নিদ্রা-জাগরণ বিস্ময়ের কিছু নয়, ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ স্বভাবের চাহিদা পূরণ হেতু ইবাদত-বন্দেগিতে বিভোর থাকা বিস্ময়ের কিছু নয়। ইবাদত বিস্ময়ের হলে তা মানুষের বেলায়ই হবে। কেননা মানুষ তার নফস-প্রবৃত্তির সকল তাড়না ও স্বভাব-প্রকৃতির সকল চাহিদাকে পদদলিত করে, অন্য শব্দে বললে– নফসকে হত্যা করে তারপর রুকু-সিজদায় রত হয়।

ফেরেশতাদের ইবাদত অপেক্ষা মানুষের ইবাদত বহুগুণ শ্রেষ্ঠ

মানুষের মাত্র একটি সিজদা ফেরেশতাদের হাজার বছরের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা মানুষের ইবাদত নফস ও প্রবৃত্তির চাহিদাকে হত্যা করার উপর ভিত্তিশীল। নফসের প্রেরণায় সে শীতের সকালে গরম লেপ থেকে বের হয় না।

প্রবৃত্তির চাহিদার বিপরীতে শীতের মধ্যে পানি দ্বারা অজু করে। শুধু তাই নয়, নিজের ঘর ছেড়ে আল্লাহর ঘরের দিকে দৌড়ে যায়, মসজিদে গিয়ে ইবাদতে রত হয়। নফস তাকে ঘুমতে উৎসাহিত করে, কোমল বিছানা না ছাড়তে উৎসাহিত করে, অজুর পানি দ্বারা হাত-পা ঠাণ্ডা না করতে এবং ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মসজিদে না যেতে উৎসাহিত করে। কিন্তু এ ব্যক্তি স্বভাবজাত সকল চাহিদাকে লাথি মেরে একমাত্র স্বীয় মালিকের সন্তুষ্টির জন্য অগ্রসর হয় এবং মসজিদে গিয়ে মহান প্রভুর নির্দেশ মনপ্রাণ দিয়ে পালন করে। তো নফসের এই বিরুদ্ধাচরণ ফেরেশতাদের মধ্যে কোথায়? নফসের চাহিদাকে জলাঞ্জলি দেওয়া এবং নফসের সাথে যুদ্ধ করা তাদের মধ্যে কি পাওয়া যায়? তাদের মধ্যে না আছে নফসে আম্মারা, না আছে রিপুর তাড়না। হিজাদ করে কাকে পরাভূত করবে? এর অর্থ এই নয় যে, আমি ফেরেশতাদের হীন করছি। এমনটি করা তেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। তারা হলেন আল্লাহর পবিত্র বান্দা।

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দাএ [২১ : ২৬]।

আল্লাহর অনুগত বান্দা। যাদের থেকে কখনোই গুনাহ ও অপরাধ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়।

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

কখনোই তারা আল্লাহ নির্দেশের অবাধ্য হন না। তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তাই করেন। [তাহরীম ৬৬ : ৬]

তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা কুফরী এবং তাদের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব। এটা শুধু বাস্তব অবস্থার বর্ণনা যে, ইবাদত প্রশ্নে তাদেরকে নফসের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয় না।

মানুষের ইবাদত নফসের পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তিতে

মানুষকে ইবাদত করতে হয় তার নফসের পূর্ণ বিরোধিতা করে। উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাবের চাহিদা পূর্ণ করণে উৎকর্ষতা নেই। বিরোধিতা করণেই উৎকর্ষতা। ইলমের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। মানব-প্রকৃতি চায় না যে, তার মধ্যে ইলম আগমন করুক, তার চাহিদা বরং অজ্ঞতা। তার প্রাকৃতিক গঠনে অজ্ঞতা রয়েছে, ইলম নয়। কোনো মানুষ মাতৃগর্ভ হতে ইলম বা জ্ঞান নিয়ে আগমন

করে না। পরিশ্রম ও সাধানার দ্বারা নিজের মধ্যে জ্ঞান তৈরি করে। স্বভাব-প্রকৃতির বিরোধিতা করেই সে ইলম হাসিল করে। যা একদিকে যেমন বিস্ময়ের ব্যাপার অপর দিকে তেমন উৎকর্ষের বিষয়। উৎকর্ষের এ জন্য যে, সে তা মুজাহাদা ও চেষ্টা-সাধনা দ্বারা লাভ করেছে। যাতে তার অভ্যন্তরীণ শক্তির ক্ষমতা ও কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর বিস্ময়ের এ জন্য যে, যে মানুষটি এক ফোঁটা নাপাক পানি, নির্বোধ এক পদার্থ (বীর্য) দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে; তাও আবার না নূর (জ্যোতি) দ্বারা তৈরি, না নার (আগুন) দ্বারা তৈরি, বরং তুচ্ছ ও পদদলিত মাটি– যার মধ্যে বোধ ও অনুভূতির চিহ্ন পর্যন্ত নেই; সেই মানুষ এমনই বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ওঠে যে, পুরো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। নূরের তৈরি ফেরেশতাদের উপরও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগুনের তৈরি জিনের উপরও তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ শ্রেষ্ঠত্ব শুধুই ইলমের উৎকর্ষতার ভিত্তিতে।

মানুষ ও ফেরেশতার ইলমের পার্থক্য

জিন-ফেরেশতারা পবিত্র উৎস হতে তৈরি সূক্ষ্ম দেহধারী মাখলুক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অতিক্রম করে নোংরা উৎস হতে তৈরি স্থূল দেহের অধিকারী মানুষের মধ্যে ইলমের আগমন উৎকর্ষতা নয় তো কী? এই বিস্ময়কর ও দুর্লভ উৎকর্ষতার ভিত্তিতে সৃষ্টিরাজি হতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন ছিনে নেবার পরও সংশয়ের কী কারণ থাকতে পারে? ফেরেশতাদের ইলম তাদের স্বভাবজাত চাহিদার ভিত্তিতে প্রাপ্ত এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে তার সৃষ্টি এবং তা অভ্যন্তরেই থাকে। এ কারণেই তার বিস্তৃতি ঘটে না, যতটুকু আছে ততটুকুই থাকবে। পক্ষান্তরে মানুষ চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে ইলম অর্জন করে। এ ইলম তার অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বাহির থেকে সংগ্রহ করা। ইলম অর্জনের জন্য তাকে বহু কষ্ট, বহু চেষ্টা-সাধনার দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়। বহু ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করে ইলমের বহুবিধ স্তর ও ইলমী মাকামে পৌঁছে যায়। এ কারণেই তার ইলম বাড়তে থাকে, বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। তার সাথে নানা চিন্তাভাবনা ও গবেষণা সংযুক্ত হতে থাকে। যার কারণে একমণ ইলম দশমণরূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং ফেরেশতাদের ইলম হলো আরোপিত ধরনের ইলম, যার কোনো বিস্তার নেই। আর মানুষের ইলম হলো আহরিত, গবেষণালব্ধ। যার বিস্তার আছে, বিস্তৃতি আছে। অর্থাৎ ফেরেশতাদের যদি চারটি মাসয়ালা জানা থাকে, তবে তা চারটিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যদি চারটি মাসয়ালা জানতে পারে তাহলে সে তাতে গবেষণা ও ইজতেহাদ করে

আরো দশ-বিশটি মাসয়ালা বের করে আনে। নানা ইলমের সৃষ্টি করে এবং তাকে ভিত্তি ধরে নতুন নতুন ইলমের উদ্ভব ঘটায়। এ কারণেই আদম আ.-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে তারা স্পষ্ট স্বীকার করে নিয়েছিল তাদের অজ্ঞতার কথা:

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا

আপনার সত্তা পবিত্র! আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়ে দেন তা ব্যতীত কোনো কিছুই আমরা জানি না। [বাকারা ২ : ৩২]

মানব-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব

ফেরেশতাগণ তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন, যা পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মানুষের 'ইসতেম্বাত' বা উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও 'ইজতেহাদ' বা গবেষণা ও অনুসন্ধানী ক্ষমতার প্রশংসা আল্লাহ নিজেই করেছেন:

وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ط وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَه مِنْهُمْ ط. ـــ النساء ٤ : ٨٣

সুতরাং ইলমের দিক দিয়ে ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব দুইভাবে– এক. পরিমাণের দিক দিয়ে। কেননা সবকিছুর নামের তালিম মানুষকে দেওয়া হয়েছে, ফেরেশতাদের দেওয়া হয়নি। দুই. ইলমের কাইফিয়াত বা গুণগত মান বিচারে। কেননা ফেরেশতারা তাদের প্রদত্ত ইলম দ্বারা ইজতেহাদ বা গবেষণা-অনুসন্ধানের মাধ্যমে তার মধ্যে কোনোরূপ সংযোজন ঘটাতে পারে না। যা মানুষ পারে। সুতরাং একদিকে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ইলমও অধিক দিয়েছেন, অপরদিকে প্রদত্ত ইলমকে বর্ধিত করণের যোগ্যতাও তার মধ্যে রেখেছেন।

গবেষণা ও উন্নতিসাধন কেবল মানব জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে নিজ জ্ঞানকে বর্ধিতকরণ প্রকৃতপক্ষে শুধু মানব জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য সৃষ্টিকুলের মধ্যে এ বিষয়টি নেই।

এ কথা স্পষ্ট যে, জ্ঞানের পূর্ণতা হলো বাদশাহী শান। কেননা বাদশার কাজ দিনমজুরি করা নয়, বরং স্বীয় রাজত্বের, স্বীয় রাষ্ট্রের জ্ঞান রাখা। যেন নির্দেশ ও বিধান দিতে পারে। এ কারণেই মানুষকে যখন সবচেয়ে বেশি জ্ঞান দেওয়া হলো তখন স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব তারই প্রাপ্য ছিল এবং তা পেয়েও গেল। বিশ্বজগতের শৃঙ্খলাবিধানের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হল। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে জগতের উপর কর্তৃত্ব চালাবে, সৃষ্টিরাজি দ্বারা কাজ আদায় করে নেবে, ইচ্ছে মতো হস্তক্ষেপ করবে। এ কারণেই প্রাণীদের থেকে সে একধরনের প্রয়োজন পূরণ করে, বস্তুজগত থেকে আরেকধরনের প্রয়োজন পূরণ করে– জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত তার নানা পদক্ষেপ চলমান রয়েছে। এই বস্তুগত জগতে মানুষ তার ইলমী প্রভাব খাটিয়ে নানা নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে। এভাবে সে তার জ্ঞানের প্রশস্ততার প্রমাণ দেয়। ইলম দ্বারা এভাবে নতুন নতুন জ্ঞান ও বিষয় উদ্ভাবন এবং কার্যকর প্রযুক্তির আবিষ্কার না ফেরেশতাদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, না জিন বা প্রাণীদের দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

ইলমী যোগ্যতার উন্নতি

অনাদিকাল হতেই আল্লাহর অনুগ্রহ মানুষের উপর নিবদ্ধ রয়েছে। এ অনুগ্রহের ফলেই পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে তাকে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল বস্তুর নাম শেখানো। যদি নামই জানা না থাকে তাহলে তার দিকে মনোনিবেশই অসম্ভব হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রথম ছাত্র হযরত আদম আ.কে বস্তুনিচয়ের নাম শিক্ষা দিলেন। এ ছিল ইলমের প্রথম মঞ্জিল।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا

আল্লাহ তায়ালা আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। [বাকারা ২ : ৩১]

বস্তুর নাম জানার পর স্বাভাবিকভাবেই মানুষের সেগুলো দেখতে ইচ্ছা করে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এর পর আসমান জমিন ও তার মধ্যবর্তীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুকেই তার সামনে পেশ করলেন। এরপর এগুলোর বৈশিষ্ট্য, প্রভাব ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করালেন। অতঃপর এগুলোর উদ্দেশ্য বিষয়ে অবহিত করালেন। এরপর সেগুলো দ্বারা কিভাবে কাজ করতে হয় তা শেখালেন। এরপর শেখালেন উপকার লাভ করার পদ্ধতি। মোটকথা, পর্যায়ক্রমে মানুষের ইলম উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে রইল। একেরপর এক

নবীগণ শিক্ষকরূপে আসতে থাকলেন এবং ইলমের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তর শিক্ষা দিতে থাকলেন।

ইলমের পূর্ণতা ও খেলাফত

মানুষ যখন পরিপূর্ণ ইলম ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করল, যুগের পর যুগ চর্চা করার পর মানুষের যোগ্যতা যখন বর্তমান স্তরে উন্নীত হলো তখন সর্বশেষ শিক্ষক, খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন। যিনি আল্লাহর হাকিকতসমূহের তালিম দিলেন এবং ইলমকে পূর্ণতা দান করার নিমিত্তে তাঁর প্রতিটি নির্দেশের কার্যকারণ সম্পর্কে অবহিত করালেন। যার দ্বারা মানুষ হাকিকতে ইলমের সন্ধান লাভ করল এবং পূর্ণাঙ্গ ইলমের আধার কুরআন মাজিদ দ্বারা আলোকিত আত্মার অধিকারী হল। সুতরাং যেই খেলাফত হযরত আদম আ.-এর যুগে প্রথম মঞ্জিলে ছিল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এসে তা শেষ ও সর্বোচ্চ মঞ্জিলে পৌঁছে গেল। কেননা এর ভিত্তি ছিল ইলম, আর ইলমের সূচনা হয়েছিল 'ইলমুল আসমা' তথা বস্তুনিচয়ের নাম অবগত হওয়া দ্বারা। সুতরাং এ ইলমের উপর প্রতিষ্ঠিত খোলাফতও ছিল সূচনাকালীন খেলাফত। আতঃপর এই ইলম যখন উন্নতি লাভ করতে করতে সর্বোচ্চ পূর্ণতার সীমায় পৌঁছল, নতুন দীন ও শরীয়ত নিয়ে কোনো নবী আগমনের আর অবকাশ রইল না, তখন খেলাফতও তার সর্বোচ্চ পূর্ণতার সীমায় পৌঁছে গেল।

খেলাফত দুই ধরনের। খেলাফতে জাহেরি, খেলাফতে বাতেনি। খেলাফতে জাহেরি হলো জগতের হাকিকত আয়ত্বকরণ। যার দ্বারা চার মৌলিক উপাদান– আগুন, পানি, মাটি, বাতাস-এর রহস্য ও তত্ত্বাবলি প্রকাশ লাভ করে। আর খোলাফতে বাতেনি হলো হাকিকতে এলাহির ইলম অর্জন করণ। যার দ্বারা রূহানী রহস্য ও তত্ত্বাবলি উদ্ঘাটিত হয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের যুগে এসে এই উভয় প্রকারের খেলাফত পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়। একটি দ্বারা বস্তুগত উদ্ভাবনী চরমোৎকর্ষে পৌঁছে যাচ্ছে, যা জ্ঞানবুদ্ধির পূর্ণতার দলিল। আরেকটি দ্বারা ইলমী ও রূহানী ইজতেহাদসমূহ এক বিস্ময়কর চরমোৎকর্ষে পৌঁছেছে। যা ফিকহী পূর্ণতার দলিল। মোটকথা মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি ও রূহানী বুঝ-ব্যবস্থা– উভয়ই তার চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছে। কেননা সার্বিকভাবে পরিপূর্ণ ইলম পৃথিবীতে আগমন

করেছে, যার কারণে বাহ্যিক খোলাফতও পূর্ণতা লাভ করেছে এবং হাকিকী খেলাফতও পূর্ণতায় পৌঁছেছে।

খেলাফতের বিশেষত্ব

হাকিকতহীন বাহ্যিকতা একটি অর্থহীন ও অকার্যকর বিষয়। এ কারণে বাতেনি বা রূহানী খেলাফতহীন জাহেরি বা বস্তুগত খেলাফত প্রাণহীন দেহের মতো। যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। সে জন্য ইলমী খেলাফতকে প্রকৃত খেলাফত বলা হবে, যে খেলাফতের ভিত্তিতে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ভাস্বর হয়ে ওঠে। তথাপি উভয় খেলাফতই মানুষকেই দান করা হয়েছে। না ফেরেশতাদের ভাগ্যে এ খেলাফত জুটেছে, না জিন কিংবা প্রাণীদের জুটেছে। কেননা ইলমের এই মাকাম লাভের সৌভাগ্য কারো হয়নি।

মৌল-উপাদানের পারস্পরিক সংঘাতের ফলে মৌলিক উন্নতি সাধিত হয়

কেবল মানুষের মধ্যে কেন ইলমের উন্নতি সাধিত হলো এবং চতুষ্পদ জন্তু ও জিন-ফেরেশতাদের মধ্যে হলো না এবং তারা উভয়প্রকারের খেলাফতের যোগ্য বিবেচিত হলো না? এমনটি না হবার কারণ হলো, যে পদ্ধতিতে উন্নতি সাধিত হয় সে পদ্ধতি মানুষ-ভিন্ন অন্যদের থেকে পাওয়া যায় না।

ইলম হোক, আমল হোক বা শিল্প হোক কোনোটিতেই সংঘাত-সংঘর্ষ ব্যতীত উন্নতি সাধিত হয় না। বরং বলা যায়, সংঘাত সংঘর্ষের নামই হলো উন্নতি। ইলম ও শক্তির অপ্রকাশিত ভেদ ও রহস্য সংঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া প্রকাশ পায় না। কেননা একটি মৌলিক মূলনীতি হলো, যতক্ষণ না বিপরীত বিষয়ের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মূল উপাদানে উন্নতি সাধিত হয় না। যেমন আগুন। এর মূল উপাদানে কোনোই উন্নতি নেই। হাজার বছর পূর্বে যেমন ছিল, যেমন জ্বলতো, এখনও তেমনই আছে, সেভাবেই জ্বলে। এমন নয় যে হাজার বছর পর তার ধরন ও রঙের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, নতুন স্বভাব ও রঙ ধারণ করেছে। কোনো দিক দিয়েই এর মধ্যে কোনোরূপ সংযোজন ও উন্নতি সাধিত হয়নি। একইভাবে পানির মধ্যেও কোনো পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়নি। হাজার হাজার বছর পূর্বে সমুদ্র যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে– উত্তাল, তরঙ্গময়। না তার তরঙ্গরাশি কোনো নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে, না তার জোয়ার-

ভাটা। দশ হাজার বছর পূর্বেও যেমন ছিল, আজও তেমন আছে। তা ছাড়া সমুদ্রও তখনও যেখানে ছিল আজও সেখানে রয়েছে। গতিও পরিবর্তন হয়নি, ধারাও পরিবর্তন হয়নি। তদ্রূপ বাতাসের ক্ষেত্রেও কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বাতাস প্রথমেও যেমন প্রবাহিত হতো, আজও তেমনিভাবেই প্রবাহিত হয়। জমিনের ক্ষেত্রেও একই বিষয় ঘটেছে। শুরুতেও তা যেমন মাটির স্তূপ ছিল, আজও তাই রয়েছে। না তার মধ্যে কোনো নতুনত্ব এসেছে, না কোনো বিশেষত্ব সংযুক্ত হয়েছে আর না কোনো উন্নতি সাধিত হয়েছে। মোটকথা, সকল মৌলিক উপাদান একই অবস্থায় রয়েছে, তাতে কোনোরূপ উন্নতি আসেনি। কিন্তু যখন এসবের যে কোনো দুটির মধ্যে আপনি সংঘাত-সংঘর্ষ বাধিয়ে দেবেন তখনই উন্নতি শুরু হয়ে যাবে। যেমন– একটি পাত্রে পানি রেখে তার উপরে অন্তরাল তৈরি করে অপর দিক থেকে আগুন দ্বারা পানির সাথে সংঘাত বাধিয়ে দিন। আগুন চাইবে পানিকে উত্তপ্ত করতে, পানি চাইবে আগুনকে ঠাণ্ডা করতে। তো এই দুইয়ের সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে এক তৃতীয় জিনিস তৈরি হবে। যাকে আমরা বাষ্প বা স্টিম বলি। এ বাষ্প দ্বারা মেশিন ও ইঞ্জিন চলতে শুরু করবে। এভাবে মৌল উপাদানে উন্নতি সাধিত হবে। যদি পানির সাথে আগুনের সংঘাত বাধিয়ে দেওয়া না হতো তাহলে শুধু আগুন কিংবা শুধু পানি দ্বারা কোনো মেশিন বা ইঞ্জিন চলা সম্ভব হতো না। তো এই যে প্রাযুক্তিক উন্নয়ন ও বিপ্লব, তা সাধিত হয়েছ দুটি মৌলিক উপাদানের সংঘাত-সংঘর্ষের দ্বারা। একটি উপাদান দ্বারা তা কখনোই অর্জন করা সম্ভব হতো না।

তেমনিভাবে আগুন ও বাতাসের সাথে সংঘাতের দ্বারা অন্য এক শক্তির সৃষ্টি হয়। শূন্যমণ্ডলে সূর্য হতে উৎপন্ন উত্তাপের সাথে যখন বায়ুমণ্ডলের সংঘাত বাধে তখন তার দ্বারা 'শিহাবুন সাকিব' বা দীপ্তিময় জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হয়, উল্কা, বজ্র ও বজ্রনিনাদের সৃষ্টি হয়। যার দ্বারা শূন্যমণ্ডলের রহস্যরাজি প্রকাশ পায় এবং জ্যোতিষ্করাজির মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটে। যা শুধু উত্তাপ (আগুন) বা শুধু বাতাস দ্বারা হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

মাটির ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। উদাহরণত মাটির সাথে পানির সংঘাত সৃষ্টি করার বিষয়টি ধরুন। স্তূপিকৃত মাটির সাথে পানি মিশিয়ে দেওয়া হল। মাটি চাইবে পানির তরলতা ও প্রবাহমানতাকে ধ্বংস করে দিতে আর পানি চাইবে মাটির কাঠিন্যকে ধ্বংস করে তাকে গলিয়ে তরল করতে। তো এই উভয়ের সংঘাত-সংঘর্ষে খামিরা তৈরি হবে। এ খামিরা দ্বারা তৈরি হবে ইট। নির্মিত হবে ভবন, অট্টালিকা ও অন্যান্য স্থাপনা। খামিরা দ্বারা আরো তৈরি হবে হাঁড়ি-পাতিল ও অন্যান্য তৈজসপত্র। এভাবে সভ্যতার উন্নতি হবে। নতুন নতুন

ডিজাইনের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ও জীবন যাপনের নানা উপকরণ তৈরি হতে থাকবে। মাটি এবং পানি যদি নিজ নিজ জায়গায় একাকী অবস্থান করত তাহলে কখনোই এ উন্নতি সাধিত হতো না, উভয়ের মধ্যে লুকায়িত এই সম্ভাবনারাজি প্রকাশ পেতো না। এ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, সংঘাতের নামই হলো উন্নতি। সংঘাত না ঘটলে উন্নতি সাধিত হয় না।

এবার আসুন বস্তুগত জগত বাদ দিয়ে প্রতিভা ও যোগ্যতার দিকে তাকাই। উদাহরণত ধরুন, দুজন বীর পাহলোয়ান রয়েছে। প্রত্যেকেই মুষ্টিযুদ্ধে দক্ষ। কিন্তু যতক্ষণ এই দুজনের মধ্যে যুদ্ধ না বাধবে ততক্ষণ এ বিদ্যার কোনো উন্নতি সাধিত হবে না। দুজনের মধ্যে যখন লড়াই বাধবে তখন প্রত্যেকেই চেষ্টা করবে অপরকে পরাভূত করার কৌলশল আবিষ্কার করতে। এভাবে প্রত্যেকেই এ শাস্ত্রের নীতিমালা ঠিক রেখে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করবে। ফলে বিষয়ের অপ্রকাশিত রহস্য উন্মোচিত হতে থাকবে আর শাস্ত্রের উন্নতি ঘটতে থাকবে। পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করবে নতুন নতুন কৌশল।

জ্ঞান ও অজ্ঞতা এবং হক ও বাতিলের সংঘাতের হিকমত

একজন আলেম যত বড় জ্ঞানীই হন না কেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ইলমে কোনো উন্নতি সংযুক্ত হবে না। কিন্তু যদি এই আলেমের সাথে ইলমহীন কোনো ব্যক্তির সাথে বিতর্ক বাধিয়ে দেওয়া হয়, যে ব্যক্তি তার সাথে নানা আপত্তি উত্থাপন করবে, বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকবে, তাহলে দেখা যাবে, উত্তর দিতে গিয়ে তার ইলম দ্বারা নতুন নতুন দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে। এর দ্বারা তার ইলমের উন্নতি সাধিত হবে। ইলম ও জাহল-এর সংঘাত ব্যতীত এ উন্নতি সম্ভব হতো না। ইসলাম সত্য। তার ইলম ও বিধান সত্য। কিন্তু এর বিপরীতে যদি কুফর না থাকে এবং তার সাথে ইসলামের সংঘাত না বাধে তাহলে তার অপ্রকাশিত শক্তি ও হাকিকতের গোপন রহস্য কখনোই উন্মোচিত হবে না এবং তার শক্তিও প্রকাশ পাবে না। এ কারণেই মহান আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বিপরীতে কুফর, ইখলাসের বিপরীতে মুনাফেকী, সত্যের বিপরীতে মিথ্য, ইলমের বিপরীতে জাহ্‌ল, আমানতের বিপরীতে খেয়ানত, ফেরেশতার বিপরীতে শয়তান এবং নবীগণের বিপরীতে দাজ্জালের ব্যবস্থা রেখেছেন। যাতে করে এই বিপরীতশক্তির সাথে সংঘাতের ফলে সত্যের পবিত্র শক্তি প্রকাশ পায় এবং তার সত্যতা ভাস্বর হয়ে উঠতে থাকে।

জাতিগত বিরোধ হতে শিক্ষা লাভ

কোনো এক জাতিসত্তা যতই মর্যাদাশীল ও প্রতাপশালী হোক না কেন, যতক্ষণ না অন্য কোনো জাতির বিপরীতে তাকে দাঁড় করানো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সেই সুপ্ত নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে না যা কেবল পারস্পরিক বিরোধকালেই প্রকাশ পায়। এ কারণেই যখন দুটি জাতি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় তখন নতুন নতুন মতবাদ ও মতাদর্শ প্রকাশ পায়। যেন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও রূহানী ইলমের সাথে সম্পৃক্ত উন্নতিসমূহ যথাসময়ে প্রকাশ লাভ করে এবং প্রত্যেক জাতির মেধা ও মননের উৎকর্ষতা প্রকাশ পায়। যা পরবর্তী প্রজন্মের উন্নতির জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকে। বিরোধ ও প্রতিযোগিতা না থাকলে সকল জাতি-গোষ্ঠী স্থির পানির মতো পড়ে থেকে নিজেদের সুপ্তপ্রতিভা ও নৈপুণ্য হারিয়ে ফেলতো এবং এই নির্ভাবনার কারণে অলসতা, দুর্বলতা ও আরামপ্রিয়তার সৃষ্টি হতো। ফলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তো। এ কারণেই জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রেখে তাদেরকে উদ্দিপ্ত রাখা হয়েছে, যাতে নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত থেকে নিজেদের জন্মগত প্রতিভাকে ধ্বংস করে ফেলতে না পারে। এ কারণেই কুরআন মাজিদে জাতিগত বিরোধ ও প্রতিযোগিতাকে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলো না থাকলে না জগতের রহস্যাবলি উন্মোচিত হতো আর না জাতির মধ্যে সচেতনতা ও কার্যক্ষমতা তৈরি হতো, যা আল্লাহ তাদের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ○

আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। [বাকারা ২ : ২৫১]

ঠিক এভাবেই জানবেন যে, মানুষ ছাড়া বোধ ও চেতনাসম্পন্ন অন্য তিনটি মাখলুকের প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব রয়েছে। জীব-জন্তুর রয়েছে শুধুই পশুত্ব, জিনদের শুধুই শয়তানী এবং ফেরেশতাদের শুধুই পুণ্য। এ কারণেই এদের কারো মধ্যেই কোনো উন্নতি নেই। কেউ শুধুই আগুনের মতো, যেমন জিন জাতি। কেউ শুধুই তাবাসের মতো, যেমন ফেরেশতাগণ। কেউ শুধু মাটি বা পনির মতো, যেমন জীবজন্তু। সুতরাং না জিনদের মধ্যে কোনোরূপ উন্নতি

সাধিত হয়েছে, না ফেরেশতাদের মধ্যে আর না জীবজন্তুর মধ্যে। কোনো জিন আজ পর্যন্ত এমন কিছু উদ্ভাবন করেনি যার দ্বারা পৃথিবীতে কোনো শোভা-সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। কোনো ফেরেশতাও এমন কোনো ইজতেহাদ করেনি যার দ্বারা নতুন মতাদর্শ ও শরীয়ত সৃষ্টি হয়েছে। আর কোনো জীবজন্তুও আজ পর্যন্ত এমন কোনো পথ-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেনি যার দ্বারা পথনির্দেশ মেলে। জিন ও শয়তান হাজার বছর পূর্বে যেমন ছল-চাতুরী, ধোঁকাবাজি ও ফেতনা-ফাসাদ করত, আজও সেভাবেই একই জিনিস করছে। জীবজন্তুরা শুরুতে যেভাবে পানাহার করত, চরে বেড়াতো এবং বংশবৃদ্ধি করত আজও সেভাবেই ওসব করে যাচ্ছে। না গরু তার ঘাস খাওয়া ও জৈবিক চাহিদা পূরণে নতুন কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, না ফেরেশতারা নেকী করার কোনো নতুন পদ্ধতি বের করেছে, না শয়তানের ধোঁকাবাজিতায় কোনো নতুনত্ব সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার বছর পূর্বে তাদের এ স্বভাবজাত কর্মকাণ্ড যেমন ছিল আজও তেমনই রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোনোই উন্নতি সাধিত হয়নি। কেননা এরা সকলেই মাত্র একটি যোগ্যতার ধারক বিধায় সংঘাত সৃষ্টির অবকাশ নেই, যা ছিল উন্নতির বুনিয়াদ।

বিপরীতমুখী গুণাবলি দ্বারা উন্নতি

বোধ ও চেতনাসম্পন্ন মাখলুকের মধ্যে মানুষ হলো একমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি যার মধ্যে সর্বপ্রকার গুণাবলির সন্নিবেশ ঘটেছে। এদের মধ্যে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলিও রয়েছে, পশুত্বও রয়েছে এবং শয়তানীও রয়েছে। সুতরাং এই বিপরীতমুখী গুণাবলির সংঘাতের ফলে নতুন নতুন কর্মকাণ্ড প্রকাশ পাওয়া আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়। যা একমুখী শক্তি দ্বারা প্রকাশ পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। উদাহরণত পানাহার করা ও বংশবৃদ্ধি করা হলো জীবজন্তুসুলভ কাজ। এর সাথে যখন ফেরেশতাগুণ তথা ইবাদতের সংযোগ ঘটে তখন এক তৃতীয় শক্তির সৃষ্টি হয়। যাকে বলা হয় ইফফাত (পবিত্রতা)। এর দ্বারা জায়েজ-নাজায়েজজনিত অসংখ্য সুরত বেরিয়ে আসে। অমুক জিনিস খাওয়া জায়েজ, অমুক জিনিস নাজায়েজ; অমুক অমুক নারী গ্রহণ হালাল, অমুক অমুক হারাম; অমুক পানীয় পান করা জায়েজ, অমুক পানীয় নাজায়েজ। মোটকথা ইফফাত ও পবিত্রতা দ্বারা দীনের বহুবিধ বিষয় স্পষ্ট হয়, য দ্বারা দীন ও দীনদারীর উন্নতি সাধিত হয়। ইফফাত মূলত পশুস্বভাব ও ফেরেশতাস্বভাবের সংঘাতের ফল। যেমনিভাবে আগুন ও পানির সংঘাতের ফল ছিল বাষ্প; যার দ্বারা সভ্যতার উন্নতি হয়েছিল।

একইভাবে শয়তানের কাজ হলো ধোঁকা দেওয়া, প্রতারণা করা, দাগা দেওয়া ও ছল-চাতুরী করা। এ স্বভাব মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান। এর সাথে যখন ফেরেশতাসুলভ স্বভাবের সংঘাত বাধবে তখন চিন্তা-চেতনা তৈরি হবে। যার দ্বারা ধোঁকা ও প্রতারণার পরিবর্তে বিবেকপ্রসূত কার্যপ্রণালী প্রকাশ পাবে এবং এর সুফলস্বরূপ হামলা ও আত্মরক্ষার নতুন মতবাদ ও চিন্তাধারা সামনে আসতে থাকবে।

উৎকর্ষতার প্রকাশ এবং বস্তুগত ও রূহানী উন্নতি

হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে ক্রোধশক্তি। এ শক্তিই তাদের হিংস্রতার উৎস। কিন্তু এই শক্তির সাথে যদি ফেরেশতাদের গাম্ভীর্য ও ধৈর্যকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে তার দ্বারা সৃষ্টি হয় বীরত্বের। এ ক্ষেত্রে বিবেক-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সাথে উদ্যম প্রদর্শন করা হয় এবং বাহাদুরীর সাথে বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞাকে ব্যবহার করা হয়। মোটকথা– কাম, ক্রোধ এবং প্রতারণা ও কৌশলের সাথে যদি জ্ঞানশক্তিকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে তার দ্বারা পরিশুদ্ধ আখলাক তৈরি হয় এবং ইলমী, আখলাকী ও দীনি উন্নতির দরোজা খুলে যায়। যা কেবল মানুষের দ্বারাই সম্ভব। জিন, ফেরেশতা ও জন্তু-জানোয়ার দ্বারা সম্ভব নয়। কেননা বিপরীতমুখী শক্তির সন্নিবেশ কেবল মানুষের মধ্যেই রয়েছে। এ জন্য উন্নতির পথ কেবল মানুষের জন্যই উন্মুক্ত, অন্য তিন মাখলুকের জন্য নয়। যে কারণে নানা উদ্ভাবনী দ্বারা পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করলে মানুষই করেছে। ট্রেন, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, বাষ্প, জাহাজ, নৌকা, বাহন, বাড়িঘর, আসবাবপত্র, বাণিজ্য, শিল্প, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি মানুষ ছাড়া অন্য কেউ করে দেখায়নি। অপর দিকে ইজতেহাদ, ইসতেম্বাত, রেওয়ায়াত বর্ণনা, দীনের দলিল-প্রমাণ, শরীয়ত, মাজহাব, সম্প্রদায়, জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ, অভিজ্ঞতা, ইলম, মারেফাত, নৈকট্য, আনুগত্য, ইবাদত, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি মানুষ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে নেই। এমনকি পবিত্র আত্মার অধিকারী কোনো ফেরেশতাও এগুলো করে দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ মানুষ তার বিপরীতমুখীগুণাবলির সংঘাত দ্বারা সৃষ্ট উন্নতির বদৌলতে ফেরেশতাদের চেয়ে বহু উর্ধ্ব মর্যদায় পৌঁছে গেছে। জিবরাঈলের মতো ফেরেশতার সীমাকে অতিক্রম করে চলে গেছে সেখানে, যেখানে ফেরেশতাদের পাখা অচল হয়ে পড়ে। এটা হলো তার বিবেকশক্তির সাথে যৌনশক্তি, ক্রোধশক্তি ও পাশবিক শক্তির সংঘাত ও বিবেকশক্তির বিজয়ের ফল।

বিবেকশক্তির উপর দুষ্টশক্তির বিজয়ের ফলাফল

তবে হ্যাঁ, এই সংঘাতে যদি জ্ঞান ও বিবেকশক্তি পরাজিত হয় এবং অন্যান্য শক্তিসমূহ বিজয় লাভ করে, অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি ঐসমস্ত শক্তির সেবক হয়ে যায় এবং তাদের চাহিদা পূরণের গোলাম হয়ে যায় তাহলে মানুষ তখন এসব জানোয়ার হতে কয়েকধাপ অগ্রসর জানোয়ার, শয়তান হতে কয়েকগুণ উন্নত শয়তানে পরিণত হয়। যাদের থেকে জানোয়ার ও শয়তানরাও পানাহ চায়। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যদি পশুস্বভাব চরিতার্থে নিয়োজিত হয়ে যায় তাহলে সে ভোগ-লালসা ও দুষ্কর্মের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে যা পশুর পক্ষেও করা সম্ভব নয়। এরা জেনা-ব্যভিচারের এমন নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে, পশুতো পশু, পশুর বাপের পক্ষেও যার চিন্তা করা অসম্ভব। তারা যৌনতার আড্ডা তৈরি করবে। ব্যভিচারপল্লী তৈরি করবে। অশ্লীলতা একটি শাস্ত্র, একটি বিদ্যার রূপ লাভ করবে। তাদের অশ্লীল মস্তিষ্ক ও কামুক মন যে পশুত্ব আবিষ্কার করবে পশুরা স্বপ্নেও তা ভাবতে পারবে না।

তেমনিভাবে মানুষ যদি তার বুদ্ধি-বিবেক ও মেধাকে ধোঁকা ও প্রতারণাশক্তির গোলাম করে নেয় তাহলে সে এমন প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির উদ্ভব করবে, শতাব্দিভর চিন্তা করেও যা করা শয়তানের পক্ষে সম্ভব হবে না। মোটকথা, এই জন্মগত শক্তিসমূহের সংঘাতে বিবেকশক্তি যদি বিজয়ী থাকে তবেই কেবল সে 'আহসানে তাকবীম' (স্বভাব, মনন ও অবয়বের শ্রেষ্ঠত্ব)-এর প্রমাণ পেশ করবে। আর যদি কাম, ক্রোধ ও হিংস্রতা বিজয়ী হয় তাহলে সে 'আসফালাস সাফিলীন' (চরম নিকৃষ্ট ও অধঃপতিত)-এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। [মানুষের এই দুই অবস্থার কথা সূরা 'আত-ত্বীন'-এ বর্ণিত হয়েছে]।

আপনি চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, এইসব শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে হলে বিবেককে ইলমের হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে। ইলমহীন বিবেক শুধুই স্বভাবজাত বিবেক, যা নিঃসন্দেহে এইসব স্বভাবজাত শক্তিকে সঙ্গ দেবে, তাদের অনুগামী হবে। ফলে সে তার স্বগোত্রীয়দের স্বীয় কাজ করার জন্য নতুন নতুন পথ বাতলে দেবে। পক্ষান্তরে যে বিজ্ঞ বিবেককে ইলম সুশোভিত করেছে সে ঐসব শক্তিসমূহকে নিজ পথে পরিচালিত করবে। এতে জীবনের প্রতিটি স্তরে মানবিক উৎকর্ষতা একাশ পাবে। এ কারণে এই তিন প্রকার চেতনাসম্পন্ন মাখলুকের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু বিবেক দ্বারা প্রমাণিত হয় না, বরং ইলম দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর ইলমের ক্ষেত্রেও কেবল স্বভাবজাত ইলম হলে হবে না,

ইলমে রব্বানী হতে হবে। যে ইলম ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে আগমন করে এবং অন্তরসমূহকে আলোকিত করে। এ ইলম বিবেকসমূহকে মসৃণ করে, মেধাকে পরিশুদ্ধ করে এবং মস্তিষ্ককে সুদীপ্ত করে। অন্যভাবে বললে– মানুষকে 'মানুষ' করে তোলে। অন্যথায়–

آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا

মানুষের জন্যও 'মানুষ হওয়া' অবধারিত নয়।

এ কারণেই এই শরয়ী ও ঐশী ইলম অর্জন করা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যকীয়। যার সাথে জড়িত রয়েছে আমাদের আলোকবর্তিকা।

শরীয়তের শাসন

আমাদের জন্য আরো আবশ্যক হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উক্ত ইলম দ্বারা পথ-নির্দেশ গ্রহণ করা। অর্থাৎ নির্জনে ও জনসমক্ষে, ব্যক্তিগতভাবে ও সম্মিলিতভাবে, বন্ধুত্বে ও শত্রুতায়, স্বাধীনতায় ও পরাধীনতায়, আনন্দে ও বেদনায়, সুদিনে ও দুর্দিনে এবং জীবনে ও মরণে এই ইলম দ্বারা পথনির্দেশ গ্রহণ করা। যে ইলমের অপর নাম শরীয়ত। নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে এ ইলমের খাদেমরূপে সাথে রাখতে হবে। যে শক্তি অজ্ঞতায় পথ চলতো এখন তা ইলম দ্বারা পরিচালিত হবে। যেই পশুস্বভাব জাহালাত বা অজ্ঞতার নির্দেশে যৌন-উন্মত্ততা, অশ্লীলতা, দুষ্কর্ম ও ঈমানহীনতার দিকে নিয়ে যেত এখন তা শরীয়তের অনুগত হয়ে পবিত্রতা, নিষ্পাপতা, নির্মলতা ও সৎকর্মের দিকে নিয়ে আসবে। যেই শয়তানী শক্তি জাহেলী অবস্থায় ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও দুষ্কর্মের দিকে নিয়ে যেত এখন তা আল্লাহর নির্দেশের অনুগত হয়ে বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও পরিণামদর্শিতার দিকে নিয়ে আসবে। ভিন্ন শব্দে বললে– নফসানী স্বভাব থেকে বের করে রূহানী স্বভাবের দিকে নিয়ে আসবে। সুতরাং বস্তুসংক্ষেপ দাঁড়ালো এই– স্বভাবের উপরে বিবেকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং বিবেকের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে শরীয়ত ও ইলমে এলাহির শাসন।

ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম হওয়ার অর্থ

স্বভাব যদি বিবেক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বিবেক শরীয়ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবেই কেবল মানুষ পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত হয়ে উঠবে। আন্যথায় সে এক জন্তু অথবা শয়তান অথবা হিংস্র প্রাণী ছাড়া কিছুই নয়। অত্র আলোচনার

সারসংক্ষেপ দাঁড়ালো এই– মানুষের জন্মগত ও স্বভাবজাত কোনো বৈশিষ্ট্য ও গুণকে ধ্বংস করার জন্য শরীয়ত আসেনি বরং তা ব্যবহারের ক্ষেত্র নির্ধারণ করার জন্য শরীয়ত এসেছে। শরীয়ত মানুষের প্রতিটি শক্তিকে সঠিক জায়গায় ব্যবহারের পথনির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম স্বাভাবজাত ধর্ম হওয়ার অর্থ এটাই। অর্থাৎ মানুষের স্বভাবজাত সকল শক্তি, বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতাকে ব্যবহারের সঠিক ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে। কাম হোক বা ক্রোধ হোক, পশুত্ব হোক বা শয়তানী হোক– কোনোটাকেই নিষ্কর্ম-নিস্তেজ করে রাখেনি। এক বিশেষ প্রোগ্রামে তাকে পরিচালিত করেছে। সৎস্বভাব তো স্ব-স্থানে রয়েছেই, কোনো দুষ্প্রবৃত্তিকেও সাধারণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নির্মূল করা হয়নি, বরং যথাযথ ক্ষেত্রে তাকে পরিচালিত করেছে। উদাহরণত মিথ্যা একটি কবিরা গুনাহ। মানব স্বভাবের একটি বৈশিষ্ট্য হলো উত্তেজিত মুহূর্তে বাড়াবাড়ি ও বাস্তবতা বর্জিত কথাবার্তা বলে ফেলা। শরীয়ত একে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেনি বরং ক্ষেত্রবিশেষ এমনটি করতে উৎসাহিত করেছে। বলেছে– বিবাদমান দুই ভাইয়ের মধ্যে মিথ্যা বলে হলেও যদি মিলিয়ে দেওয়া যায় তবে তা কেবল জায়েজই নয় বরং তাতে সাওয়াবও মিলবে। যেমন সাওয়াব মেলে নামাজ-রোজা দ্বারা। দুই ভাই পরস্পরে কলহে জড়িয়ে পড়ল। আপনি এক ভাইয়ের কাছে গিয়ে বললেন– আরে মিয়া, তুমি কার সাথে কলহ করছ? তোমার বিচ্ছেদে সে তো সীমাহীন দুঃখ যাতনায় পুড়ছে। রাতের বেলায় সে তো তোমার ভূয়সী প্রশংসা করছিল আর এই বলে কাঁদছিল যে, হায়, আমার ভাই আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল! এভাবে আপনি অপর ভাইয়ের কাছেও গেলেন এবং তার সাথেও একই কথা বললেন। এতে দুজনের মনই নরম হয়ে গেল এবং মীমাংসায় উপনীত হতে আগ্রহী হয়ে উঠল। সকালবেলা দু'ভাই কোলাকুলি করে বিবাদ মিটিয়ে ফেললো।

স্বভাবজাত দুষ্প্রবৃত্তিকে শরীয়ত কল্যাণকর পথে পরিচালিত করেছে

যেই 'সত্য' মিলেমিশে থাকা দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে ফেতনার বীজ বপণ করল, তেমন সত্যের বেলায় এ জাতীয় মিথ্যা দ্বারা অবশ্যই সাওয়াব মিলবে। এতে স্পষ্ট হলো, মিথ্যার মতো বিষয়কেও শরীয়ত উৎখাত করেনি বরং তাকে নিজ ইশারা মাফিক পরিচালিত করেছে। যেন গুনাহের কাজও ইবাদতে পরিণত হল। শরীয়তের ইশারা মাফিক হলে গুনাহের কাজও এভাবে

ইবাদত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সত্যকেও যদি শরীয়তবিরুদ্ধভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে তা অপরাধে পরিণত হয়। সত্যকথা বলাকে গীবত বলা হয়। অর্থাৎ বাস্তব দোষকে ব্যক্তির পশ্চাতে বলার নাম হলো গীবত। এ ধরনের সত্য বলাকে শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে এবং একে হারাম সাব্যস্ত করেছে। সত্য বলার নামই গীবত, মিথ্যা হলে তাকে বলা হয় 'ইফতেরা'; গীবত নয়। তো এই ধরনের সত্য বলা হারাম। আল্লাহ ইরশাদ করেন:

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করাকে পছন্দ করবে? নিশ্চয় তোমরা একে ঘৃণা করবে। [হুজুরাত ৪৯ : ১২]

অর্থাৎ গীবত করা এমনই নিকৃষ্ট কাজ, যেন নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খামচে খামচে খাওয়া। ফলাফল দাঁড়ালো এই– না সত্য বলা ইবাদত, না মিথ্যা বলা ইবাদত, বরং নির্দেশ মান্য করার নাম ইবাদত এবং অমান্য করার নাম পাপ। নামাজের মতো ইবাদতও তিন সময়ে করা হারাম– সূর্যোদয়ের সময়ে, দ্বি-প্রহরের সময়ে এবং সূর্যাস্তের সময়ে। এসব সময়ে যদি নামাজ পড়া হয় তাহলে গুনাহগার হবে। বোঝা গেল, না নামাজ পড়া ইবাদত, না না-পড়া ইবাদত– নির্দেশ মানার নাম ইবাদত।

ইবাদতের হাকিকত হলো আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি

রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ। কোনো শরীয়ত সমর্থিত কারণ ছাড়া যদি রোজা না রাখা হয় তাহলে গুনাহগার হবে এবং শাস্তির যোগ্য হবে। কিন্তু এই রোজাই যদি আবার ঈদের দিনে রাখা হয় তাহলে তা হারাম হবে এবং ব্যক্তি গুনাহগার হবে। এর দ্বারা স্পষ্ট হলো, না রোজা রাখা ইবাদত, না না-রাখা ইবাদত; নির্দেশ মান্য করা ইবাদত। অর্থাৎ আমি যখন বলব রোজা রাখ, তখন রাখবে; যখন বলব রেখ না তখন রাখবে না। নিজের মতামতকে প্রশ্রয় দিও না। এইসব নামাজ রোজা হলো ইবাদতের আকার-আকৃতি মাত্র। ইবাদতের হাকিকত হলো আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি।

আত্মহত্যা হারাম এবং অতিবড় অপরাধ ও গুনাহের কাজ। অথচ জিহাদের ময়দানে নিজেকে হত্যার জন্য পেশ করা এবং অস্ত্রধারণ করে ঝাঁপিয়ে পড়া সবচেয়ে বড় ইবাদত। এর দ্বারা বোঝা গেল, না প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ইবাদত,

না প্রাণ রক্ষা করা ইবাদত। নির্দেশ মান্য করা এবং যথাসময়ে পালন করা ইবাদত। এই একই আত্মহনন যদি নিজের নফসের জন্য করা হয় তাহলে তা অপরাধ এবং ইবাদত পরিপন্থী। আর যদি দীনের হেফাযতের জন্য এবং আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য করা হয় তাহলে তা শাহাদাত, দীন এবং বিদয়াত। কেননা এই দেহ ও জীবন আপনার মালিকানাধীন নয়– সরকারী মেশিন। আপনি নিজের মর্জিতে একে ধ্বংস করতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, মালিকের নির্দেশে একে রক্ষা করতেও পারেন এবং ধ্বংস করতেও পারেন। তিনি বাঁচাতে চাইলে বাঁচিয়ে রাখা ইবাদত, তিনি ধ্বংস করতে চাইলে ধ্বংস করা ইবাদত।

না লুটপাট ও অরাজকতা সৃষ্টি করা অপরাধ, না তা থেকে বেঁচে থাকা ইবাদত; নির্দেশ মানা ইবাদত। যদি নির্দেশ মাফিক লুটপাটও করা হয় তবে তা ইবাদত বলে গণ্য হয় এবং নির্দেশ-বহির্ভূতভাবে কাউকে নিরাপত্তা দেওয়াও অপরাধ।

মাটিতে পা দাপিয়ে সিনা টান করে মাথা হেলেদুলে চলা আত্ম-অহংকার। কুরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে। ইরশাদ হয়েছে:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ○

> আল্লাহর জমিনে তুমি গর্বভরে চলাচল করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনোই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। [বনী ইসরাইল ১৭ : ৩৭]

তবে এ কথাও ঠিক, যখন গর্বভরে, বুক টান করে চলার নির্দেশ দেওয়া হবে তখন আমরা তেমন করেই চলব। যেমন হজের বেলায় যে তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা হয় তার শুরুর চার চক্করে গর্বভরে, বুক টান করে চলা ওয়াজিব এবং ইবাদতের অংশ। এর দ্বারা বোঝা গেল, না গর্বভরে চলা গুনাহ, না বিনীত পদক্ষেপ ইবাদত; বরং নির্দেশ মান্য করা ইবাদত। সুতরাং মূল জিনিস সাব্যস্ত হলো আনুগত্য। আনুগত্যের বিপরীত হলে নামাজ-রোজাও অপরাধ বলে গণ্য হয়। আর যদি নির্দেশ মতো হয় তাহলে মিথ্যা, লুটতরাজ, অহংকারী পদক্ষেপ ও অরাজকতাও ইবাদত হয়ে যায়। ঠিক এমনিভাবে প্রকৃতিগত সকল শক্তি ও যোগ্যতাকে শরীয়ত অনুযায়ী ব্যবহার করা হলে তা

ইবাদত হয়ে যায় এবং নির্দেশ পরিপন্থীভাবে ব্যবহার করলে তা গুনাহ বলে সাব্যস্ত হয়। এ আলোচনার আলোকে ইবাদতের প্রকার সাব্যস্ত হলো দুটি– একটি হলো উত্তম ও কল্যাণকর, যা করা আবশ্যক। আরেকটি হলো গুনাহের কাজ, যা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

সৎকর্ম ও তাকওয়া

উপরোল্লেখিত দুইপ্রকার ইবাদতের প্রথম প্রকারকে বলা হয় 'বির' বা সৎকর্ম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ – الأيـــة – البقرة ٢ : ١٧٧

আর দ্বিতীয় প্রকারকে বলা হয় 'তাকওয়া'। যার মাধ্যমে গুনাহ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইবাদতের এই প্রকারদ্বয়কে বিবেচনায় রেখে যদি চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, মানুষ ফেরেশতাদের থেকে ইলমের দিক থেকেই কেবল শ্রেষ্ঠ নয়; ইবাদতের দিক দিয়েও অগ্রগামী। কেননা তাদের তাকওয়া বিষয়ক ইবাদতের অস্তিত্বই নেই। কারণ তাকওয়া বলা হয় দুষ্কর্ম হতে বেঁচে থাকাকে। আর বেঁচে থাকার প্রশ্ন তখনই আসে যখন তা করা সম্ভবপর থাকে। ফেরেশতাদের মধ্যে খারাপ কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতাই রাখা হয়নি বিধায় তারা তা করতেও পারে না। সুতরাং তাদেরকে দুষ্টকর্ম হতে বেঁচে থাকতে বলাও যায় না। পক্ষান্তরে মানুষ এ জাতীয় কাজ করতেও পারে এবং তা থেকে বেঁচেও থাকতে পারে। এ কারণে দুষ্কর্ম সম্পাদন করতে মানুষকে নিষেধ করাও সম্ভব হয় এবং এই নিষেধাজ্ঞা মান্য করাকে ইবাদতও সাব্যস্ত করা যায়। কেননা মানুষ স্বেচ্ছায় বিরত থাকে। ফেরেশতাদের মধ্যে খারাপ কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতাই নেই বলে স্বেচ্ছায় বিরত থাকার প্রশ্ন তাদের বেলায় আসে না। সুতরাং তাকওয়া-জাতীয় ইবাদত ফেরেশতাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এগুলো শুধু মানুষের জন্যই নির্দিষ্ট। তো তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষ ফেরেশতাদের চেয়ে এগিয়ে গেল। এ গেল বর্জন-জাতীয় ইবাদত। এবার আসুন করণীয় পর্যায়ের ইবাদতের দিকে লক্ষ করি। এ জাতীয় ইবাদতের মধ্য থেকে মুয়াশারাত ও মুয়ামালাত তথা সামাজিতা ও লেনদেন কিংবা পানাহার জাতীয় ইবাদতও ফেরেশতাদের জন্য নয়। কেননা তাদের মধ্যে বংশবিস্তারের বালাই নেই বলে নিকটাত্মীয় ও প্রিয়জন সৃষ্টির অবকাশ নেই। সামাজিকতা, লেনদেন, সন্ধি-মৈত্রী ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা

ইত্যাদির সুযোগ নেই। এ কারণে 'বির'-এর দুটি স্বতন্ত্র অংশ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট সাব্যস্ত হল। বাকি থাকলো 'ইতিকাদ' বা বিশ্বাসমূলক ইবাদত। এ বিষয়টিও মানুষের সাথেই নির্দিষ্ট। কেননা ইতিকাদের মূল হলো ঈমান, আর ঈমানের অর্থ হলো 'ঈমান বিল গাইব' তথা না দেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। ফেরেশতাদের কাছে কোনো কিছুই অদৃশ্য নয়, সবই তারা প্রত্যক্ষ করছেন (জান্নাত, জাহান্নাম, আল্লাহর নূরের তাজাল্লি প্রভৃতি) বিধায় এ দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় না। এ কারণে ইতিকাদের বিষয়টিও মানুষের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে রইল।

এরপরও যদি কিছু বাকি থেকে থাকে তা হলো দিয়ানাত। অর্থাৎ নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি। যাকাতের সম্পর্ক মালের সাথে আর মালের প্রয়োজনীয়তা মুয়াশারাতের জন্য। ফেরেশতাদের মধ্যে বংশবিস্তার নেই বিধায় তাদের জন্য মুয়াশারাত প্রযোজ্য নয় এবং লেনদেনের প্রশ্নও আসে না। সুতরাং এ ইবাদতটিও মানুষের সাথেই নির্দিষ্ট। রোজার বিষয়টিও একান্তই মানুষের সাথে নির্দিষ্ট। কেননা রোজার অর্থ হলো স্বেচ্ছায় নিয়তের সাথে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাকা। ফেরেশতাদের না আছে স্ত্রী, না আছে পানাহারের প্রয়োজন। তাদের বেলায় এ ইবাদতের কোনোই অর্থ নেই। বাকি থাকলো শুধু নামাজের বিষয়টি। এ প্রসঙ্গে আমি আগেই আলোচনা করে এসেছি যে, এগুলো ফেরেশতাদের স্বভাবজাত বিষয়। আর স্বভাবের চাহিদায় কোনো কাজ করায় বিশেষত্বের কিছু নেই। মানুষ কর্তৃক আদায়কৃত স্বভাব বিরুদ্ধ এক একটি সিজদা ফেরেশতাদের হাজার বছর ইবাদত অপেক্ষা ওজনদার। বিশ্লেষণের ফলাফল দাঁড়ালো এই– দিয়ানত ও ইবাদতেও মানুষই ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

মোটকথা হলো, মানুষের মধ্যে যে শয়তানী ও পশুশক্তি রয়েছে, যার বদৌলতে তাকওয়া সৃষ্টি হয়– ফেরেশতাদের মধ্যে এই উভয় শক্তিই অনুপস্থিত। এ কারণে তারা দীনের দুই-তৃতীয়াংশ হতে পৃথক হয়ে রয়েছেন। তদুপরি মানুষের মধ্যে রয়েছে জ্ঞান ও বিবেক-শক্তি। যদিও তা ফেরেশতাদের মধ্যেও রয়েছে কিন্তু বিবেকের যে হাজারো ক্ষেত্র রয়েছে, যার দ্বারা বিবেক-শক্তির বিশদ বিস্তারিত বিষয়াবলি উন্মুক্ত হয়, তা কেবল মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান, ফেরেশতাদের নেই। এ কারণে তারা ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যেও সেইসব ধরন ও প্রকার উপস্থাপন করতে পারে না যা মানুষ পারে। অর্থাৎ ইবাদতের এমন অসংখ্য স্তর রয়েছে যা ফেরেশতাদের জন্য বন্ধ এবং মানুষের জন্য উন্মুক্ত। ইসলামের অর্থ হলো জীবনের সকল স্তর ও ক্ষেত্রকে আল্লাহর বিধানের

আওতায় পরিচালিত করা। সুতরাং যে পরিপূর্ণ জীবন মানুষের লাভ হয়েছে তা অন্য কারো লাভ হয়নি। এ কারণে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম এবং পপিূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি লাভ করা মানব জাতির পক্ষেই সম্ভব, অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইবরাহিম আ.কে যখন এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হলো যে,

اِذْ قَالَ لَه رَبُّهُ اَسْلِمْ

হে ইবরাহিম! তুমি মুসলিম হয়ে যাও।

তখন তার অর্থ এই ছিল না যে, কুফরী থেকে ইসলামে প্রবেশ কর; বরং উদ্দেশ্য এই ছিল যে, নিজেকে আল্লাহতে সমর্পণ করে দাও এবং মাথা অবনত কর।

তিনি তখন আরজ করলেন:

قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِينَ

আমি মুসলিম হয়ে গেলাম– বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের অনুগত হলাম। [বাকারা ২ : ১৩১]

আল্লাহ তখন ইরশাদ করলেন, ঘোষণা কর যে,

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ○

لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ○

আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার নামাজ, আমার ইবাদত– সবকিছুই আল্লাহরই জন্য নিবেদিত। আমার নফসের সন্তুষ্টির জন্য নয়। এ বিষয়ে আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং মুসলিমগণের মধ্যে আমি প্রথম। [আনআম ৬ : ১৬২]

এই সমর্পণ ও আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বেঁচে থাকবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মৃত্যুবরণ করবে। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সন্ধি করবে, তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করবে। তাঁরই জন্য ভালবাসবে, তাঁরই জন্য শত্রুতা পোষণ করবে। তাঁরই জন্য দান করবে, তাঁরই জন্য বিরত থাকবে। যেমনটি বলেছেন আল্লাহর রাসূল:

مَنْ أَحَبَّ فِى اللهِ وَ أَبْغَضَ للهِ وَ أَعْطٰى للهِ وَ مَنَعَ للهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ

> যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসে এবং তাঁরই খাতিরে শত্রুতা পোষণ করে, তাঁরই সন্তুষ্টি কামনায় কাউকে কিছু দান করে এবং দান করা থেকে বিরত থাকে– সে ব্যক্তি তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল।

স্পষ্ট কথা, এসব কাজ ফেরেশতাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কেননা তাদের মধ্যে না আছে কামশক্তি, না আছে শয়তানী, না আছে অলসতা আর না আছে গর্ব-অহংকার। এ কারণে যে আনুগত্য মানুষের পক্ষে করা সম্ভব তা ফেরেশতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা যেসব প্রবৃত্তি দমনের দ্বারা ইবাদতের অজস্র ধরন প্রকাশ পায় সেসব প্রবৃত্তির অস্তিত্বই ফেরেশতাদের মধ্যে অনুপস্থিত। এ কারণে ঐসব ইলমেরই আবশ্যকতা ফেরেশতাদের ছিল না– যা ছিল মানুষের। কেননা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে যেসব প্রতিবন্ধকতা মানুষকে তাড়া করে, সেগুলোর প্রতিরোধপদ্ধিতির জ্ঞান মানুষের জন্য আবশ্যক ছিল।

খেলাফতের ভিত্তি

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, ফেরেশতাদের তুলনায় মানুষের ইলমও পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ এবং আমলও পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ। আর প্রতিরোধব্যবস্থা প্রয়োগের কারণে মানুষের ইবাদত যতটা মজবুত হয় ফেরেশতাদের তা হয় না। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যেহেতু মানুষের ইলম পরিপূর্ণ সেহেতু সমগ্র সৃষ্টির মাঝে মানুষই কেবল আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য ছিল। কেননা আল্লাহর কামালাত সীমাহীন হওয়া সত্ত্বেও নীতিগতভাবে তা দুটি প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটি হলো কামালাতে ইলম বা ইলমের পূর্ণতা, আরেকটি হলো কামালাতে আমল বা আমলের পূর্ণতা। আর এই দুই প্রকারের কামালাতের ক্ষেত্রে মানব জাতি সকল মাখলুক, এমনকি ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হল। সুতরাং এ শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব মানুষেরই প্রাপ্য ছিল। আর আমল যেহেতু ইলমের অনুগামী সেহেতু খেলাফতের মূল বুনিয়াদ সাব্যস্ত হয় ইলম। সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণ ইলমের অধিকারী মানুষ হওয়ার কারণে তাকে আল্লাহর প্রতনিধি নিযুক্ত করা হয়েছে।

মানুষের খেলাফত প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের আপত্তি

আল্লাহর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে মানব জাতিকে পৃথিবীতে প্রেরণের প্রসঙ্গ যখন উঠল তখন ফেরেশতারা এমর্মে আপত্তি উথাপন করলো যে, আমাদেরকে কেন

প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হবে না? আমাদের চেয়ে আপনার অধিক পবিত্রতা ঘোষণাকারী ও তাসবীহ পাঠকারী আর কে আছে? আল্লাহ তখন প্রথমে শাসকসুলভ জওয়াব দিলেন যে, এ প্রসঙ্গে আমি যা জানি তোমরা তা জান না। এতে ফেরেশতাগণ চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি বিজ্ঞতাসুলভ জওয়াব দিলেন। এভাবে যে, আদম আ.কে বস্তুরাজির নামের তালিম দিয়ে ফেরেশতাদের চ্যালেঞ্জ করলেন– বিশ্বজগতে বিদ্যমান সকল বস্তুর নাম বলো তো! তারা বলতে পালেন না। এবার তিনি আদম আ.কে নাম বলতে বললে তিনি ফরফর করে বলে দিলেন। ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলা হল– ইলমের সূচনাস্তর হলো বস্তুর নাম জ্ঞাত হওয়া। এ বিষয়েই তো তোমরা মানুষের সাথে জিততে পারলে না। নামের পরে রয়েছে তার গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, অতঃপর তার বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া, অতঃপর হাকিকত জানা– এসব বিষয়ে তোমরা কবে মানুষের সাথে জিততে পারবে? সুতরাং মানুষই খেলাফতের যোগ্য। বোঝা গেল, খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের মূল ভিত্তি হলো ইলম।

আল্লাহর দরবার হতে কথা ও কর্ম দ্বারা জবাব

ফেরেশতাদের সামনে ইলমের দিক দিয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তায়ালা প্রমাণ করে দিলেন। থাকলো আমলের ব্যাপারটি। এ ক্ষেত্রে ফেরেশতারা এই বলে মানুষের নিন্দা করেছিল যে, এরা হত্যাবিগ্রহ করবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। আমলের ব্যাপারে তাদের এই আপত্তির জবাব আল্লাহ তায়ালা কদমে কদমে আমল দ্বারাই দিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমত নেক বান্দাদের আমলসমূহ আল্লাহ ফেরেশতাদের দ্বারাই লিপিবদ্ধ করান। যাতে কেয়ামতের দিন তাদের উক্ত সন্দেহের আমলী জবাব তারা পেয়ে যায় এবং মানুষের সৎকর্মের তারা সাক্ষী হতে থাকে।

হাদিসে আরো এসেছে, কোথাও যখন কোনো দীনি মজলিস, ওয়াজ-নসিহতের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় তখন হাজারো ফেরেশতা সেখানে নাযিল হয়, যাদেরকে এ কাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। যথা আমাদের আজকের এই মজলিস, যেখানে আপনি-আমি সমবেত হয়ে দীনি আলোচনা শুনছি, নিঃসন্দেহে এখানে কোটি ফেরেশতা তাশরিফ এনেছেন। এই শুভ মসলিসের যখন সমাপ্তি হয় তখন তারা উর্ধ্ব জগতে চলে যান এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হন। আল্লাহ তখন জানতে চান– তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? তারা আরজ করেন, আপনার বান্দাদের মজলিসে গিয়েছিলাম। আল্লাহ বলেন– তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায়

দেখেছ? তারা আরজ করেন– তাদেরকে আপনার স্মরণে বিভোর, আপনার ইবাদতে নিয়োজিত দেখেছি। তারা আপনার জান্নাত অন্বেষণ করছে এবং জাহান্নামকে ভয় করছে। আল্লাহ তখন বলেন– তারা কি জান্নাত ও দোজখ দেখেছে? ফেরেশতারা বলেন– না, তারা এগুলো দেখেনি, নবীগণের থেকে শুনে ইমান গ্রহণ করেছে। আল্লাহ বলেন– তারা যদি জান্নাত ও দোজখ দেখতে পেত তাহলে কী করত? ফেরেশতাগণ বলেন– যদি দেখতে পেত তাহলে জান্নাত কামনা করা এবং দোজখ হতে মুক্তি চাওয়া ব্যতীত তাদের আর কোনো কাজই থাকত না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন– তোমরা সাক্ষী হয়ে যাও, ঐ মজলিসে যারা উপস্থিত ছিল আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, উদ্দেশ্য ছিল জান্নাত দান করা কিন্তু এই অসংখ্য ফেরেশতা প্রেরণ, তাদেরকে আসমানে নিয়ে গিয়ে তাদের কাছে জানতে চাওয়া এবং তাদেরকে সাক্ষী সাব্যস্ত করে মাগফেরাতের ঘোষণা করার কী প্রয়োজন ছিল? এসব করা ব্যতীতও তো মাগফেরাত করা যেত। তা ছাড়া মজলিসও শুধু এই একটি নয়। এখানকার মতো পৃথিবীতে কতশত দীনি মজলিসই তো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সর্বত্র ফেরেশতাদের অবতরণ করা এবং ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে সাক্ষী বানানোর কী প্রয়োজন ছিল? এর হাকিকত হলো এই, এসব দ্বারা ফেরেশতাদের আমলী জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে তোমরা বলেছিলে যে,

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ.

আপনি কি পৃথিবীতে এমন একটি জাতি প্রেরণ করবেন যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? [বাকারা ২ : ৩০]

তোমরা দেখলে তো সেই জাতি আজ কেমন পর্যায়ের সৎকর্ম ও তাকওয়ায় নিজের রয়েছে? কোন পর্যায়ের সৎকর্মশীল হয়ে দীনের বিস্তার ঘটাচ্ছে এবং নিজে দীনের উপর অটল থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছে? এগুলো কি বিশৃঙ্খলা? এগুলো কি রক্তপাত ঘটানো?

মানুষের আমলের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সাক্ষ্যের হিকমত

একদিকে যেমন ইলমের ক্ষেত্রে মানুষকে ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করছেন অপর দিকে তেমন ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাকে ফেরেশতাদের চেয়ে উন্নত প্রমাণ করেছেন। সাথে সাথে স্বয়ং ফেরেশতাদেরকেই এই সৎকর্মের

সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন। যাতে মানুষের রক্তপাত ঘটানো ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিজনিত ধারণা ফেরেশতাদের মস্তিষ্ক হতে দূর হয়ে যায় এবং তারা আন্তরিকভাবে মানুষের প্রতিনিধিত্বের স্বীকারোক্তিকারক হয়ে যায়। সে কারণে সাধারণ সব আমলের ক্ষেত্রে তাদেরকে সাক্ষী করা হচ্ছে। হাদিস শরীফে এসেছে, হাজী সাহেবগণ যখন ইহরাম বেঁধে হজ ও যিয়ারত করে, তাওয়াফ ও সায়ীর সময়ে দৌড়ায়, মিনা ও আরাফায় অবস্থান নেয়, আল্লাহ তখন ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলেন– এই লোকগুলো বড়িঘর ছেড়ে, স্ত্রী-সন্তানদের থেকে মুখ ফিরিয়ে, কাফনের পোশাক পরিধান করে স্বীয় আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে এখানে কেন এসেছে? এরা আমারই খুশি ও সন্তুষ্টির জন্য এসেছ এবং পতঙ্গের মতো ছুটোছুটি করছে। হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থেকো যে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের সেই আপত্তির আমলী জবাব যা তারা প্রথমে করেছিল–

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ.

তথায় কি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের প্রেরণ করবেন?

দেখ, তারা স্বাদ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে স্বীয় রবের প্রতি নিবেদিত হয়ে কিভাবে ইবাদত ও আনুগত্যে বিভোর হয়ে রয়েছে। হাদিস শরীফে এসেছে, দিনের আমল ও রাতের আমল লিপিবদ্ধ করার জন্য পৃথক পৃথক ফেরেশতাগণ রয়েছেন। দিনের ফেরেশতাগণ আসরের নামাজের সময়ে ঊর্ধ্বগমন করে এবং রাতের ফেরেশতাগণের হাতে আমলনামা অর্পণ করে যান। রাতের ফেরেশতাগণ ফজরের নামাজের সময়ে দিনের ফেরেশতাদের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বারোহণ করেন। অর্থাৎ উভয় প্রকার ফেরেশতাদের আগমন-প্রস্থানের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ফজর ও আসরের নামাজের সময়কে। তাদের ঊর্ধ্বারোহণের পর আল্লাহ যখন জানতে চান যে, আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় দেখে এসেছ? তখন তারা জওয়াব দেয়–

تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، وَ اَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ.

> আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে আসছিলাম তখনও তারা নামাজে মশগুল ছিল, আর যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা নামাজে মশগুল ছিল।

এই হলো তোমাদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও রক্তপাতজনিত আপত্তির আমলী হওয়াব। দেখ, কিভাবে তারা দিনরাত ইবাদতে নিয়োজিত রয়েছে। প্রতিদিন সকাল-

সন্ধ্যায় এ বিষয়গুলো ঘটতেই থাকে। যেন প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় ফেরেশতাদেরকে আমলী জওয়াব দিয়ে মানুষের শ্রেষ্টত্বের জ্ঞানান দেওয়া হচ্ছে। যেন প্রতিদিন তারা আমলী জওয়াব পেয়ে যায় এবং মানুষের ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিদাতা হয়ে যায়।

আত্মিক উৎকর্ষতায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

কেবল ইলম ও আমলের দিক দিয়েই মানুষ ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং আত্মিক উৎকর্ষতা ও কাইফিয়াতের দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া হয়, যা আল্লাহর নৈকট্য দ্বারা তাদের অর্জিত হয়– সেই আত্মিক অবস্থা বিচারেও মানুষ ফেরেশতাদের অপেক্ষা উন্নততর। আম্বিয়া আ. ও আউলিয়াগণ আত্মিক উন্নয়নের যে বিশেষ অবস্থায় উপনীত হন সে অবস্থা লাভ করা ফেরেশতাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা ফেরশতাগণ না পারেন ইলম ও আমলের সেই ময়দানে বিচরণ করতে যে ময়দানে মানুষ বিচরণ করে, আর না পারেন ইশ্‌ক ও মুহাব্বাতের সেই কাইফিয়াত অর্জন করতে যা মানুষ করে।

ইলম, আমল, আত্মিক অবস্থা– সব দিক থেকেই যখন মানুষ ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তখন প্রতিনিধিত্বের নিয়ামত দ্বারা সজ্জিত হওয়া তারই হক ছিল। কেননা খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিই ছিল এই দুই জিনিস– ইলমে এলাহী ও আখলাকে এলাহী। এই উভয়টি যখন মানুষের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় থাকা প্রমাণিত হলো তখন পূর্ণমাত্রার খেলাফতও তার মধ্যে আসা সম্ভবপর ছিল। অবশ্য একবারে পরিপূর্ণ খেলাফত দুনিয়ায় সম্ভব নয়, এটা হবে পরকালে। এর কারণ হলো, যেই কামেল ইলম ও কামের আমল খেলাফতের ভিত্তি সেই ইলম ও আমল যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্তরে না পৌছবে– যে স্তর রয়েছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ইলমী ও আমলী খেলাফত পূর্ণতা পেতে পারে না।

খেলাফতের পূর্ণতাপ্রাপ্তি পরকালে ঘটবে

এ কথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালার ইলম, আমল ও সৃষ্টিপদ্ধতির শান এমন যে, এগুলো কোনো মাধ্যম অবলম্বন ও উপায় উপকরণের মুখাপেক্ষী নয়। তার ইলমও মাধ্যম অবলম্বন থেকে মুক্ত, আমল বা কর্মও মাধ্যম অবলম্বন হতে মুক্ত। এমন নয় যে, আল্লাহ তায়ালা কোনো কিতাব পাঠ করে এ ইলম অর্জন করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। তাঁর সত্তাই হলো ইলমের উৎস। অর্থাৎ তাঁর বরকতময় সত্তা

হতে ইলম প্রকাশ পায়। কোনো কিছু সৃষ্টির ব্যাপারেও তিনি অদ্রূপ কোনো মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন। যখন কোনো জিনিস তৈরির ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'কুন' বা হয়ে যাও, সাথে সাথে হয়ে যায়। এ কারণে তিনি নিমেষের মধ্যে জগৎ তৈরি করেন। তাঁর ইচ্ছা দ্বারা এইসব জিনিস নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করে।

اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ○

তাঁর কর্মপদ্ধতি হলো, কোনোকিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করলে বলেন 'হয়ে যাও'; তখন তা হয়ে যায়। [ইয়াসিন ৩৬ : ৮২]

এই বাস্তবতার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এমন অবস্থা মানুষের অর্জিত হবে জান্নাতে প্রবেশ করার পর। যথা– তার ইলমের অবস্থা এমন হবে যে, সকল কর্মকাণ্ড তার ইচ্ছার অনুগামী হয়ে যাবে। প্রচেষ্টা, মেহনত ও আসবাব গ্রহণের প্রয়োজন পড়বে না। মন যা চাইবে, ইচ্ছা করার সাথে সাথে তা সামনে এসে যাবে। এ বিষয়টি কুরআনে এভাবে এসেছে:

اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ○ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ○ الأيــية

অর্থাৎ অতীত-ভবিষ্যৎ সবকিছু উজ্জ্বলরূপে তার ইলমে ভাস্বর হয়ে উঠবে। পূর্বাপরেকৃত সকল আমল তার সামনে এসে যাবে। এ ইলম স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্জিত হবে। না কোনো উস্তাদ থাকবে, না কোনো কিতাব; বরং মানুষের নফসই এ প্রতিভার ধারক হবে। আর সকল আমলের কাইফিয়াত হবে এমন যে, সবকিছু তার ইচ্ছাশক্তির অনুগত হয়ে যাবে। কর্মসম্পাদন, পরিশ্রম ও মাধ্যম অবলম্বনের প্রয়োজন পড়বে না। যে জিনিস যতটুকু পেতে, যেভাবে পেতে মন চাইবে, ইচ্ছা করার সাথে সাথে তা সামনে উপস্থিত হবে। পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছ:

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ○

সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছ যা তোমরা দাবি কর। [হা-মিম সিজদাহ ৪১ : ৩১]

যেন كُنْ فَيَكُوْنُ (হতে বলার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাওয়া)-এর শক্তি তৈরি হয়ে যাবে। যা চাইবে তাই হয়ে যাবে। না আসবাবের প্রয়োজন হবে, না উসিলা লাগবে। মানুষের ইলম তখন মাধ্যম অবলম্বনের মুখাপেক্ষী থাকবে না, কর্ম-সম্পাদন ও চেষ্টা-সাধনার মুখাপেক্ষী থাকবে না, কেবল ইচ্ছাশক্তির অনুগত হয়ে

যাবে। অন্যভাষায়– আল্লাহ তায়ালার ইলম ও কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য হয়ে যাবে। সুতরাং এ সময় মানুষের ইলমী ও আমলী খেলাফত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে– যে খেলাফতের তারা নায়েব। মানুষ তাঁর ইলম ও আমলের নায়েব। এ সময় মানুষের ইলম ও আমল আল্লাহর ইলম ও আমলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। আর যেহেতু খেলাফতের ভিত্তিও ছিল ইলম ও আমল, যা আল্লাহর ইলম ও আমলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো সেহেতু খেলাফতও তখন সঠিক অর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হবে। তবে জান্নাতে এই খেলাফত প্রতিষ্ঠা কেবল তখনই হবে যখন পৃথিবীতে ইলম ও আমলের উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে তাকে স্বীয় আত্মার অংশ সাব্যস্ত করতে প্রচেষ্টা করে থাকবে। অন্যথায়, এখানের অকৃতকার্যতা ওখানেও তদ্রূপই থাকবে। এখানে যারা বঞ্চিত থাকবে সেখানেও তারা বঞ্চিতই থাকবে।

পরকালে মানুষ আল্লাহর কামেল খলিফার মর্যাদায় ভূষিত হবে বলেই তখন আল্লাহ তায়ালা সেই লকব ও সম্বোধন দ্বারা তাদেরকে স্মরণ করবেন– যে লকব ও সম্বোধন স্বয়ং তাঁর ছিল। হাদিস শরীফে এসেছে– আল্লাহ তায়ালা জান্নাতিদেরকে প্রফুল্লকরণার্থে তাদের নামে পত্র প্রেরণ করবেন। ফেরেশতাগণ চিঠি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করবেন। সেই পত্রাবলির খামের উপর ঠিকানা লেখা থাকবে এভাবে–

مِنَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ إِلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ

আজিজুর রহীম (দয়ালু বন্ধু)-এর পক্ষ হতে এই চিঠি আজিজুর রহীমকে দেওয়া হল।

অর্থাৎ সেই লকবই তাদেরকে দিয়ে দেবেন যা স্বয়ং তাঁরই 'সরকারী' সম্বোধন। এই জগতে মানুষ আল্লাহর রূপক খলিফা এবং খেলাফতের রাস্তায় অবস্থানরত। পরকালে গিয়ে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর খলিফায় রূপান্তরিত হবে। কিন্তু এ মর্যাদা কেবল তখনই লাভ হবে যখন পৃথিবীতে সে এ পথ গ্রহণ করবে। এখানে যদি খেলাফতের এই বাহ্যিকরূপ গ্রহণ না করে– যা ইবাদত ও আনুগত্যে লাভ হয়, তাহলে ওখানে গিয়ে কিসের পূর্ণতা অর্জিত হবে? কিভাবে হবে? যাই হোক, এ আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, জিন, ফেরেশতা ও প্রাণীদের মধ্য হতে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণের জন্য কাউকেই কার্যকরভাবে নির্বাচন করা হয়নি। এ দায়িত্ব একমাত্র মানুষকেই অর্পণ করা হয়েছে।

ع قرعۂ فال بنام من دیوانہ زدند

এদের মধ্যে প্রাণীজগত সম্বোধনের যোগ্য ছিল না বিধায় তারা আলোচনাযোগ্যও ছিল না। উল্লেখযোগ্য ছিল ফেরেশতাগণ, জিন জাতি ও মানব জাতি। সুতরাং আমি শুরুতে যে আয়াত তিলাওয়াত করে এসেছি তাতে আল্লাহ তায়ালা এদের কথা উল্লেখ করে প্রত্যেকের অবস্থা ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ করে তাদের ইলমী দুর্বলতার প্রতি আলোকপাত করেছেন। ইলমের ময়দানে তারা মানুষের মোকাবেলায় হেরে গেছে। জিনদের গোত্রভূক্ত শয়তানের কথা উল্লেখ করে তার বুঝ ও আমলের সংকীর্ণতার প্রতি আলোকপাত করেছন। সে আল্লাহর নির্দেশের উপর আপত্তি উত্থাপন করেছে এবং অহংকারী হয়ে উঠেছে, যা ছিল তার নির্বুদ্ধিতা ও দুরভিসন্ধি। সুতরাং না স্বল্প জ্ঞানের অধিকারীদের পক্ষে খলিফা হওয়া সম্ভবপর ছিল, আর না দুর্বুদ্ধি ও দুরভিসন্ধির অধিকারীর পক্ষে খলিফা হওয়া সম্ভবপর ছিল। জান্নাতে বসবাসের নির্দেশ দেওয়া হলে মানুষ তার ইলমের প্রমাণ দিয়ে তথায় গিয়ে প্রবেশ করল এবং বস্তুর নাম জানার যে ইলম তার ছিল তা উন্নতি লাভ করল। যাতে তার জীবন পূর্ণতা পেল এবং ঐ নামসমূহের মাধ্যমে জীবন-ঘনিষ্ঠ সকল বিষয়াবলি তার আয়ত্বাধীন হল। বিশ্বজগৎ তার অনুগত হয়ে গেল। ফেরেশতাদেরকে তার খেদমতে নিয়োজিত করা হল। শয়তানকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করে তার পেছনে লাগিয়ে দেওয়া হল। যাতে সে সতর্ক থাকতে পারে এবং তার মোকাবেলা করে স্বীয় সুপ্ত ইলমী ও আমলী শক্তিসমূহের প্রমাণ দিতে পারে। এভাবে তার খেলাফত দিন দিন চমৎকৃত হতে থাকল। এ ইলম আম্বিয়া আ.কে দান করা হলো এবং তাঁরা খেলাফতের ভিত্তি এই ইলম স্বজাতিকে শিক্ষা দিলেন। নবীগণ হলেন আল্লাহর শিষ্য এবং বিশ্বজগতের শিক্ষক ও মুরব্বি। আল্লাহ তায়ালা কম-বেশি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পবিত্র শিক্ষকের একটি জামাত প্রেরণ করলেন। পৃথিবীকে নির্দেশ দিলেন– তাঁদের থেকে ইলম শিক্ষা কর এবং তাদের সামনে আদবের হাঁটু ভাঁজ কর, শিষ্টাচারে বিনীত থাক। বিষয়টি এভাবে বুঝে নিন– এই পুরো পৃথিবীটা একটা মাদরাসা। জমিন যার বিছানা। আসমান যার ছাদ। নক্ষত্র দ্বারা একে আলোকিত করা হয়েছে। মানুষ ও জিন এই মাদরাসার শিক্ষার্থী। নবীগণ শিক্ষক। ফেরেশতাগণ মাদরাসার খাদেম, তত্ত্বাবধায়ক ও শৃঙ্খলা বিধায়ক। শিক্ষার্থীদের জন্য রুজি রোজগারের প্রয়োজন ছিল বিধায় জমিনকে দস্তারখান বানিয়ে দিলেন। যেন শিক্ষার্থীরা তাদের রুজি ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং আপাদমস্তক ইলমের পূর্ণতায় নিয়োজিত থেকে খেলাফতের দায়িত্বকে পরিপূর্ণ করে। এভাবে অপর তিন চেতনাসম্পন্ন মাখলুকের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ভাস্বর হয়ে উঠল। যার ভিত্তি হলো ইলম।

নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব

মানুষের ইলমী ও আমলী খেলাফত কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। প্রথম পর্যায়ে নবীগণ হলেন আল্লাহর খলিফা। এর পরবর্তীতে খলিফা হলেন নবীগণের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীগণ। এরা হলেন ওলামায়ে রব্বানীগণ। এদের ধারা কেয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকবে। হাদিস শরীফে এসেছেঃ

يَحْمِلُ هٰذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُه، يُنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ.

প্রত্যেক অগ্রগামীর পর অনুগামী সৃষ্টি হতে থাকবে, যারা হবেন এ ইলমের ধারক-বাহক। এঁরা এঁদের এই জ্ঞান দ্বারা বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মনগড়া মিথ্যার পর্দা উন্মোচন করতেই থাকবেন। ইলমের ফায়েজের মাধ্যমে বাতিলের অসারতা প্রমাণ করতেই থাকবেন এবং জাহেলদের বিভ্রান্তিকর ঠুনকো তাবিলের পর্দা উন্মুক্ত করতেই থাকবেন। ইলম তার উজ্জ্বল দ্যুতি নিয়ে সামনে আসতেই থাকবে এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য হতেই থাকবে।

অতঃপর প্রতি শতাব্দিতে মুজাদ্দিদগণের ওয়াদা করা হয়েছে। এরা হবেন ওলামায়ে রাসেখ। ইলম ও দীনের ক্ষেত্রে সুদৃঢ়, অনড় ও আপোষহীন। এই ওলামাগণ ইলমে এলাহীর মধ্যে বাড়াবাড়িকারকদের মিথ্যা সংযোজন-বিয়োজন, বাতিলদের মিথ্যাবাদিতা এবং জাহেলদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তাবিলসমূহের পর্দা উন্মোচন করতে থাকবেন। বক্রহৃদয় ও বাতিলপন্থীরা এই দীনের মধ্যে যেসব সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করবে, এই আহলে ইলমগণ সেগুলো দূর করে দুধকে দুধ এবং পানিকে পানিরূপে পৃথক করতে থাকবেন। সুতরাং এ উম্মত বেওয়ারিশ কোনো উম্মত নয় যে, যার ইচ্ছা এই দীন ও ইলমের আকৃতি বিগড়ে দেবে। উপরন্তু এই চেষ্টায় যে নিয়োজিত হবে সে নিজেই বিগড়ে যাবে। কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও প্রতারকের হস্তক্ষেপ এই দীনে স্থান পাবে না। হাদিস শরীফে আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেনঃ

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوَّلُهَا وَالْمَسِيْحُ اٰخِرُهَا وَالْمَهْدِى وَسَطُهَا.

সেই উম্মত কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে যার অগ্রভাগে রয়েছি আমি, শেষভাগে রয়েছেন হযরত ঈসা আ. এবং মধ্যভাগে রয়েছেন হযরত মাহদী আ.।

আল্লাহর রসূল আরো বলেছেন:

لَا تَجْمَعُ أُمَّتِيْ عَلَى الضَّلَالَةِ

আমার উম্মত কখনোই সম্মিলিতভাবে গোমরাহীতে পতিত হবে না।

নবুওয়াতের উত্তরাধিকার

আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করেছেন:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَاذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ.

এ উম্মতের মধ্যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দল সবসময় বিদ্যমান থাকবে, যারা আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, অপদস্থকারীরা তাদেরকে অপদস্থ করতে পারবে না। এ অবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যে উম্মতের মধ্যে এত প্রকারের সুপথগামী উত্তরসূরীর ওয়াদা করা হয়েছে সে উম্মত বেওয়ারিশ উম্মত হতে পারে না। সে উম্মতের সার্বিক নিরাপত্তাবিধান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে বজায় থাকবে। যেমনিভাবে এ পর্যন্ত থেকেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَثَلُ أُمَّتِيْ كَمَثَلِ الْمَطَرِ، لَا يُدْرٰى أَوَّلُهَا خَيْرٌ أَمْ آخِرُهَا.

আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মতো। কারো জানা নেই যে, এর কল্যাণ সূচনা অংশে না সমাপ্তি অংশে।

সুতরাং এ উম্মত যতক্ষণ তার রূহানী সংযোগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সংযুক্ত রাখবে ততক্ষণ আম্বিয়া আ.গণের সম্পদের উত্তরাধিকার তাদের প্রাপ্তি হতে থাকবে। আর সে সম্পদও হলো ইলম। কেননা নবীগণ ওয়ারিশি সম্পত্তিরূপে স্থাবর সম্পদ ও সিংহাসন রেখে যান না, বরং ইলম ও মারেফাত রেখে যান। এই ইলম ও মারেফাত দ্বারা মানুষ 'মানুষ' হয়ে

ওঠে। মনুষ্যত্বও এই ইলমের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীতে যদি নবী আ.গণ আগমন না করতেন তাহলে মানুষ জন্তুজানোয়ারের একটি পাল হয়ে থাকতো। যারা ফেরেশতাদের ভাষ্যমতো রক্তপাত ঘটানো ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো কাজ জানতো না।

মানবীয় উন্নতি

বস্তুবাদি শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যদিও উন্নত উন্নত আসবাব ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পারে, কিন্তু উন্নত মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল নবী আ.গণ কর্তৃক আনীত শিক্ষার মাধ্যমেই উন্নত মানুষ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞান দ্বারা বহির্জগৎ আলোকিত হলেও ভেতরজগৎ অন্ধকার হয়ে যায়। না হয় বহির্গত তাকওয়া, না হয় অভ্যন্তরীণ তাকওয়া। বাহ্যিকভাবে বস্তুগত উন্নতি সাধিত হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভ্যন্তরীণ জওহার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মানুষ নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীতে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করেছে এবং তার মুখাপেক্ষিতা বেড়ে গিয়েছে। সে উড়তে চাইলে তাকে লোহালক্কর ও পিতলের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে, দূরে কোথাও সংবাদ পৌছাতে চাইলে টেলিফোন বা ওয়্যারলেসের মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে; দূর-দূরান্তের কোনো স্থানে পৌছতে চাইলে রেল বা মোটরগাড়ির মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে। অর্থাৎ নিজ সত্তার অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা এ কাজ সে করত পারে না, বরং এইসব উপকরণ ও মাধ্যমের হাতে বন্দি। প্রকৃত মানুষ ছিলেন তারা, যারা স্বীয় সত্তার ভেতরে এমন শক্তি তৈরি করেছিলেন যে, কোনো মাধ্যম অবলম্বন ছাড়া হাজার মাইল দূরত্বে সংবাদ পৌছিয়েছিলেন। যেমন হযরত ইব্রাহিম আ.। কাবাঘর নির্মাণ শেষে ঐ ঘরের হজ করার জন্য তিনি মানুষকে আহ্বান জানালেন। তাঁর সে আহ্বান ধ্বনি পৃথিবীর সর্বত্র হতে শোনা গেল। তেমনিভাবে হযরত ওমর ফারুক রা. মসজিদে নববীতে বসে সতর্ক সংকেত দিলে আড়াইশ মাইল দূরে বসে হযরত সারিয়া রা. তা রেডিও ছাড়া শুনতে পেলেন।

যাঁরা নিজ আত্মার শক্তি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা এমনসব উর্ধ্বারোহণের নজির স্থাপন করেছেন যা করতে পৃথিবী চির অক্ষম। এ উর্ধ্বারোহণে তাঁরা কোনো উড়োজাহাজের মুখাপেক্ষী হননি। হযরত ঈসা আ. চতুর্থ আসমানে পৌছে গিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম আসমান অতিক্রম করে 'মুস্তাওয়া' পর্যন্ত পৌছে গেছেন (স্বয়ং আল্লাহ যেখানে সমাসীন রয়েছেন)। তাঁদের এ উন্নতি একান্তই নিজস্ব রূহানী

শক্তি দ্বারা সাধিত হয়েছে, বস্তুগত কোনো মাধ্যম অবলম্বন দ্বারা নয়। সে জন্যই নিজের ভেতরে জওহার তৈরি করুন, লোহা-পিতলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবেন না। আসবাবপত্রের বান্দা না হয়ে এগুলোর প্রভুর বান্দা হোন।

আজকের এই উন্নতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের মুখাপেক্ষিতার উন্নতি। অথচ মানুষের 'মানবীয় উন্নতি' হলো মুখাপেক্ষহীনতার উন্নতি। লোহা, পিতল ও অন্যান্য বস্তুর গোলাম হয়ে যাওয়ার নাম উন্নতি নয়, বরং এগুলোকে নিজের গোলামি করতে বাধ্য করার নাম উন্নতি। বর্তমান পৃথিবীর মানুষের কামালিয়াত ও উৎকর্ষতা কেবল সেখানে যেখানে মেশিন আছে, বিদ্যুৎ আছে কিংবা পাওয়ারহাউজ বা পেট্রোল আছে। এগুলো যেখানে নেই সেখানে সে অক্ষম, অপারগ ও অথর্ব। কামেল ব্যক্তি হলের তিনি, যিনি মাটির উপরেও সফল এবং মাটির নীচেও সফল।

কলবের নূর

শায়েখ শিহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দি একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা মাওলানা রূমী তার লেখায় উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হল, একবার রোমান ও চীনাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। রোমানদের দাবি হল, হস্তশিল্প, কলাকৌশল ও কারুকার্যে আমরা শ্রেষ্ঠ, চীনারা দাবি করল তারা শ্রেষ্ঠ। তর্ক-বিতর্ক এ পর্যায়ে পৌঁছল যে, শেষ পর্যন্ত মোকদ্দমা বাদশার নিকট উত্থাপিত হল। বাদশাহ বললেন, তোমরা নিজ নিজ শিল্প ও কারুকার্য উপস্থাপন কর। আমরা তুলনা করে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করব। বাদশাহ বিরাট একটি হল রূম তৈরি করলেন এবং মধ্যভাগে একটি পাটিশন দিয়ে দিলেন। তারপর রোমানগণকে বললেন, অর্ধেকে তোমরা তোমাদের শিল্প ও কারুকার্যের নমুনা প্রস্তুত কর। চীনাদেরকে বললেন, বাকি অর্ধেকে তোমরা তোমাদের কারুকার্যের নমুনা প্রস্তুত কর। কথা অনুযায়ী হলের একপ্রান্তে রোমানগণ তাদের শিল্প ও কারুকার্য তৈরি করতে শুরু করল এবং অন্য প্রান্তে চীনাগণ কাজ আরম্ভ করল। চীনাগণ দেয়ালের উপর প্লাস্টার করে এতে নানা রঙের ফুল ও লতাপাতা এভাবে তৈরি করল, দেখলে মনে হয় যেন সদা বসন্তময় একটি বাগান। সারা বিশ্বের সকল বাগান, সকল পুষ্পোদ্যান যেন এ দেয়ালে এসে পড়েছে।

এদিকে রোমানগণ দেয়ালের উপর প্লাস্টার করে তাতে একটিও ফুল বা করুকার্য অংকন করল না, বরং তাকে ঘষে ঘষে শাণিত করে তুলল। ঘষা-মাজার কারণে দেয়ালগুলো এমনই পরিষ্কার ও চমকদার হয়ে উঠল যে, দেয়ালটি যেন একটি

উন্নত আয়নার রূপ ধারণ করল। আয়নার মতো এতে প্রতিচ্ছবি ও প্রতিবিম্ব ফুটে উঠতে লাগল।

যখন উভয়পক্ষ কাজ শেষ করে বাদশাকে অবহিত করল, বাদশা এসে মধ্যখানের দেয়ালটি সরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন, যা পাটিশন হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। পাটিশন সরিয়ে দেয়ার সাথে সাথে চীনাদের সকল কারুকার্য রোমানদের দেয়ালে ভেসে উঠল। কেননা দেয়ালকে ঘষেমেজে আয়নার ন্যায় পরিষ্কার করা হয়েছিল। বাদশা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন যে, ফুল লতাপাতা এদিকে তৈরি করা হয়েছে নাকি ঐ দিকে করা হয়েছে। এ দিকে যে রং দেওয়া হয়েছে তা ঐদিকে দেখা যাচ্ছে, অধিকন্তু ঐদিকে অধিক উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। কারণ দেয়ালে চমক ছিল বলে দেয়ালের লতাপাতার প্রতিচ্ছবিও চমকাচ্ছিল। বাদশা রায় প্রদান করলেন, রোমানগণ তাদের নিজেদের শিল্পকার্যও দেখালো এবং চীনাদের শিল্পকার্য ছিনিয়ে নিজেদের করে নিল। সুতরাং তারাই শ্রেষ্ঠ।

মাওলানা রূমী রহ. এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, প্রিয় বন্ধুরা! তোমরা নিজের অন্তরের উপর রুমীদের কারুকার্য তৈরি কর। অর্থাৎ রিয়াজাত ও মুজাহাদার মাধ্যমে স্বীয় আত্মাকে ঘষেমেজে এমন পরিষ্কার কর যে, ঘরে বসেই যেন বিশ্বের সকল শিল্প-কারুকার্য নিজ হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

ستم است اگر ہوست کشد کہ بر یر سر دو چمن در آ

تو ز غنچہ کم نہ دمیدۂ در دل کشا بچمن در آ

অর্থাৎ তুমি স্বীয় অন্তরের জানালাগুলো খুলে দাও, ভেতরের সকল ময়লা-আবর্জনা বাইরে নিক্ষেপ কর এবং ইলমে এলাহির দ্যুতি দ্বারা তাকে আলোকিত করে তোল। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল হাকিকত ঘরে বসেই তোমার দৃষ্টিগোচর হতে থাকবে।

بینی اندر خود علوم انبیاء :: بے کتاب و بے معید او ستا

এমন পরিচ্ছন্ন আত্মার উপর উস্তাদ ও কিতাব ছাড়াই আল্লাহর ইলমের ফায়েজ সরাসরি পতিত হয় এবং ব্যক্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

আমলের বরকত

এ শান কোনো বস্তুগত ইলমের শান নয়, কেবল রূহানী ও শরয়ী ইলমের শান। যখন তার উপর আমল করা হবে তখন এ অবস্থা লাভ করা যাবে। হাদিস শরীফে এসেছে:

> আমলের বরকত দ্বারা কলবের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সেইসব ইলম ঢেলে দেন যা পূর্বে তার মধ্যে ছিল না।

এ কারণে মানুষ যদি 'মনুষ্যত্ব' কামনা করে তাহলে সর্বাগ্রে সে যেন আলেম (ইলমের অধিকারী) হয়, অতঃপর আমলকারী হয়। তাহলে পরিণতিতে সে ইলমে লাদুনীর (আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান) ওয়ারিশ হয়ে যায়। সুতরাং প্রথম পর্যায়ের ইলম হলো অধ্যয়নের ইলম, আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইলম হলো ইলমে লাদুনীর ওয়ারিশি ইলম। অধ্যয়নের ইলম হলো কিতাবপত্রের দরস ও মুতালায়ার ইলম। ওয়ারিশি ইলম সম্পর্কে বলা হয়েছে:

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

যে ব্যক্তি তার ইলম অনুযায়ী আমল করেন আল্লাহ তাকে অজানা ইলমের ওয়ারিশ করে নেন।

ইনসানিয়াতের ফ্যাক্টরি

দরসি ইলমের আমল দ্বারা সৃষ্ট অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর ইলম হলো ওয়ারিশি ইলম। ওয়ারিশি ইলম দরসি ইলম দ্বারাই নসিব হয়। সুতরাং এই দীনি মাদরাসাগুলো দরসি ইলম শিক্ষা দেয় এবং ওয়ারিশি ইলমের রাস্তা পরিষ্কার করে। এই দীনি মাদরাসাগুলো না থাকলে না দরসি ইলম জুটবে, না ওয়ারিশি ইলম। কাজেই এই মাদরাসাগুলো এজন্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে যে, যে ইলম আমরা নবীগণ থেকে ওয়ারিশি সূত্রে লাভ করেছি সে ইলম যেন মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে মানুষকে 'মানুষ' বানানো যায়।

এই মাদরাসাগুলো যেন যথার্থ মানুষ বানানোর এক একটি ফ্যাক্টরি। বিজ্ঞান আবিষ্কৃত ফ্যাক্টরি ও মেশিনারিজ আসবাবপত্র উৎপাদন করে আর এই মাদরাসা ফ্যাক্টরি মানুষ উৎপাদন করে। যাদের জাহের ও বাতেন নবীগণের ইলম দ্বারা আলোকিত। বস্তুগত বিদ্যা কেবল বাহ্যিক চাকচিক্য ও বিলাসিতা শিক্ষা দেয়। পক্ষান্তরে এই প্রকৃত ইলম (ইলমে শরীয়ত) বাতেনকে সুসজ্জিত ও সুগঠিত করা

শিক্ষা দেয়। বস্তুগত বিদ্যা সুরত বা আকৃতিকে সুশোভিত করে আর রূহানী ইলম সীরাত বা চরিত্রকে শোভা দান করে।

সুরাত ও সীরাতের মধ্যে পার্থক্য

সুরাতের সৌন্দর্য একটি ক্ষণস্থায়ী ও আরোপিত সৌন্দর্য, যা আগমন-প্রস্থান করতে থাকে। এমনকি একদিন তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। দু'চার দিনের জ্বরই এই বাহ্যিক ও শারীরিক সৌন্দর্যকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। সকল রূপ-লাবণ্য খতম হয়ে যেতে পারে। যদি কোনো কিছু নাও হয় তবে বার্ধক্য এসে এই বাহ্যিক সৌন্দর্যের সবকিছু নিঃশেষ করে দেবে। বার্ধক্যও যদি না আসে, মৃত্যু তো রয়েছে। মৃত্যু সকল সৌন্দর্য ও আকৃতি-প্রকৃতিকে নিঃশেষ করে দেবে। পক্ষান্তরে সীরাত বা চারিত্রিক সৌন্দর্যের উপর কারো কর্তৃত্ব চলে না। দুনিয়ায় যে সীরাত গঠিত হবে মৃত্যু তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। কবর, হাশর এবং তার পরবর্তী সর্বস্থানে এ সীরাত বজায় থাকবে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

تُحْشَرُوْنَ كَمَا تَمُوْتُوْنَ، وَتَمُوْتُوْنَ كَمَا تُحْيَوْنَ.

তোমাদের হাশর হবে সেই অবস্থায় যে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু হয়েছে। আর তোমাদের মৃত্যু হবে ঐ অবস্থায় যে অবস্থায় তোমরা জীবন-যাপন করেছ।

আজকাল যুবক-যুবতীরা সৌন্দর্যচর্চা ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রয়াসে নিয়োজিত। যা তৈরিই হয় ধ্বংসের জন্য তা করে কী লাভ? (সৌন্দর্যচর্চা ও সাজসজ্জা ক্ষণস্থায়ী বিষয়। রূপচর্চার ধ্বংস অনিবার্য। সকালের সাজসজ্জা দুপুরের আগেই নষ্ট হয়ে যায়)।

একবার আমি হযরত মাওলানা মুফতি নাঈম সাহেবের ওখানে লুধিয়ানে গিয়েছিলাম (অত্র আলোচনা মজলিসে মুফতি নাঈম সাহেব উপস্থিত ছিলেন)। তাদের মসজিদে একটি শিলালিপি দেখেছিলাম, যার বাক্য ছিল এমন–

مرد وہ ہے جسے دیکھ کر رعب طاری ہو

مرد وہ نہیں ہے جسے دیکھ کر شہوت اُبھرے

পুরুষ ঐ ব্যক্তি যাকে দেখে অন্তরে ভক্তি জাগে, ঐ ব্যক্তি পুরুষ নয় যাকে দেখে কাম-স্পৃহার উদ্রেক হয়।

অর্থাৎ শুধু সৌন্দর্যপ্রদর্শন হলো কামুকতা, আর চারিত্রিক উৎকর্ষতা হলো পৌরষতা। সুতরাং যে রূপ-সৌন্দর্য কেবল নষ্টই হতে থাকবে তাকে আপনি আর কত সজ্জিত করবেন? কত যত্নে আর নির্মাণ করবেন? সেই জিনিস তৈরি করা আবশ্যক যা তৈরি হয়ে আর ধ্বংস হবে না। তা হলো সীরাত, উত্তম আখলাক, ইলম ও কামালাত।

উৎকর্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি হলো সীরাত

সুরত বা শারীরিক সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য পৃথিবীতে ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর সীরাত দ্বারা ইজ্জত-সম্মান লাভ হয়। হযরত ইউসুফ আ. কেনানের কূপে নিক্ষিপ্ত হলেন, তুচ্ছ অর্থমূল্যে মিসরের বাজারের পণ্য হলেন, জুলায়খার গোলাম হলেন, অতঃপর জেলখানার কয়েদী হলেন। এতসব ফেতনার সৃষ্টি করেছে তার শারীরিক সৌন্দর্য। কিন্তু যখন মিসরের রাজত্ব লাভের সময় এল তখন ঐ সৌন্দর্য কাজে আসেনি, সীরাত কাজে এসেছে। যথা– হুকুমাতের প্রত্যাশী হয়ে তিনি এ কথা বলেন নি–

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَسِيْنٌ جَمِيْلٌ

আমাকে খাদ্যভাণ্ডার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করুন। কারণ আমি হলাম সুদর্শন ও সুশ্রী।

বরং বলেছেন:

اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

আমি হলাম হেফাযতকারী, জ্ঞানী।

অর্থাৎ তিনি ইলমী ও আমলী সীরাত পেশ করেছিলেন, যার দ্বারা হুকুমত লাভ হয়েছিল। সুরত বা রূপ-লাবণ্য পেশ করেননি, যার দ্বারা গোলামি, জেলের কয়েদ ও বন্দিত্ব জুটেছিল। সুতরাং সুরতের সৌন্দর্য ফেতনা সৃষ্টি করে আর সীরাতের সৌন্দর্য ইজ্জত, মর্যাদা ও মাহাত্ম্য তৈরি করে। নবী আ.গণ এই সীরাতকে সুশোভিত করার জন্য পৃথিবীতে আগমন করেছেন। সুরতকে সজ্জিত করতে আগমন করেননি।

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ، وَلٰكِنَّ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ

আল্লাহ তোমাদের অবয়ব ও ধন-সম্পদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না, তার নজর তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি।

আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড এমন নয় যে, যিনি ধনবান ও সুদর্শন তাকে কবুল করা হবে এবং নিস্ব ও কদার্য ব্যক্তি প্রত্যাখ্যাত হবে। নবী আ.গণের মানদণ্ডও এমনই ছিল। তাঁরা মানুষকে গ্রহণ ও বর্জন শারীরিক সৌন্দর্যের ভিত্তিতে করতেন না, চারিত্রিক সৌন্দর্যের ভিত্তিতে করতেন। দুনিয়াদারদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি হলো দৈহিক সৌন্দর্য ও সম্পদ।

হযরত বেলাল হাবশী রা.-এর শারীরিক সৌন্দর্য ছিল না। তিনি ছিলেন হাবশা (ইথিওপিয়া) থেকে আগত কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাস। অথচ হযরত ওমর রা. তাঁকে هُوَ سَيِّدُنَا وَ مَوْلَانَا তথা 'তিনি আমাদের নেতা, আমাদের অভিভাবক' বলে অবহিত করতেন। হযরত বেলাল রা.-এর সামনে সাহাবায়ে কেরামের গর্দান ঝুঁকে যেত। এই মর্যাদা, এই শ্রেষ্ঠত্ব শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে নয়, এ সৌন্দর্য তো তাঁর ছিলই না। বরং এ সম্মান ছিল তাঁর সীরাতের সৌন্দর্যের কারণে, যা পূর্ণমাত্রায় তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. বলতেন:

مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ

আমি আতা ইবনে আবি রবাহ রহ.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে দেখিনি।

অথচ তিনি ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ। এ প্রশংসা সুরাতের সৌন্দর্যের কারণে ছিল না, সীরাতের কারণে ছিল। যে সৌন্দর্য কৃষ্ণাঙ্গকে শ্বেতাঙ্গের বাদশা করেছে। দুটি জিনিসের মাধ্যমে সীরাত গঠিত হয়– ইলমের শক্তি ও আখলাকের শক্তি (অর্থাৎ আমলের শক্তি)। এই দুই প্রকারের শক্তি দ্বারাই মানুষ অন্যান্য মাখলুকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে, খেলাফত লাভ করে এবং আল্লাহর নৈকট্য নসীব হয়। পক্ষান্তরে সুরাত গঠিত হয় দুইটি জিনিস দ্বারা– ধনদৌলত দ্বারা ও জাহালাত বা অজ্ঞতা দ্বারা।

দীনি মাদরাসাগুলো সীরাত গঠনের মানসে প্রতিষ্ঠিত

মানুষের এই দুই শক্তি– ইলমী শক্তি ও আখলাকী শক্তি তৈরি করার জন্য দীনি মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাদরাসাগুলো না থাকলে দুনিয়া থেকে ইনসানিয়াত শেষ হয়ে যেত। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কোটি কোটি টাকা খরচ

হয় কিন্তু সেখানে ইনসানিয়াত শেখানো হয় না, মনুষ্যত্ব ও মানবতার তালিম দেওয়া হয় না। কেবল মানুষের সুরত তৈরি করা হয়।

নির্মোহতা ও স্বল্পতুষ্টিতা

জীর্ণশীর্ণ অবকাঠামোর এই ঘরগুলো, যার নাম মাদরাসা ও খানকা, এগুলোই প্রকৃত ইনসানিয়াতের পথ প্রদর্শন করে এবং আম্বিয়া আ.-এর নির্মোহতা ও স্বল্পতুষ্টিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করা, এমনকি দারিদ্র্য ও অনাহারের মাধ্যমে ইনসানিয়াত অর্জনের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ইলমের বদৌলতে পার্থিব জগতের প্রতি নির্মোহতা ও স্বল্পতুষ্টিতা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এই উলামাগণ পঞ্চাশ, একশ টাকা বেতন নিয়ে স্বাচ্ছন্দে কাজ করে যাচ্ছেন। অন্যথায় আজকাল একশ টাকার কী মূল্য আছে? এ হলো সেই সীরাতেরই সৌন্দর্যের উৎকর্ষতা। এই ব্যক্তিবর্গ সামান্য প্রাপ্তিটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট ও ভাবনামুক্ত।

হযরত মাওলানা থানভী রহ. বারবার এই শেরটি পড়তেন এবং আগ্রহ নিয়ে পড়াতেন:

ما ہیچ نداریم غم ہیچ نداریم :: دستار نداریم غم پیچ نداریم

(আমরা নিঃস্ব বিধায় কোনো কিছুর চিন্তাও আমাদের নেই।
পাগড়ি নেই বলে তা পেঁচানোর ভাবনাও নেই।)

কখনো কখনো বলতেন:

لنگے زیر و لنگے بالا :: نے غم دزدونے غم کالا

কখনো আবার বলতেন:

کس نیاید بہ خانۂ درویش :: کہ خراج زمین و باغ بدہ

এ যাবত আমরা শুধু শরীয়তের তালিম উপস্থাপনের মাধ্যমে সম্পদের মোহত্যাগ ও অল্পেতুষ্টির ফযিলত বর্ণনা করে আসছিলাম, কিন্তু আজ সময় পাল্টে গেছে। এগুলোর উপকারিতা পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করছে। হাজার মণ শস্যের অধিকারী ব্যক্তি ভাবনামুক্ত সুখী জীবন-যাপন করতে পারছে না। লক্ষ কোটি টাকার অধিকারী ব্যক্তি নানা পেরেশানিতে ডুবে রয়েছে। সর্বক্ষণ তাদেরকে 'মার্শাল-ল'-এর শাসন-বন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে যাদের নিকট সম্পদের ভাণ্ডার নেই, জরুরি প্রয়োজনীয় উপকরণটুকু কেবল বিদ্যমান রয়েছে, তারা

ভাবনামুক্ত জীবন-যাপন করছে। সুতরাং পার্থিব সম্পদের আধিক্য ও ধনাঢ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব নেই, শ্রেষ্ঠত্ব হলো তাকওয়ায়।

بقدر ضرورت بسارے بود :: کند کار ار مردِ کارے بود

প্রয়োজন পূরণের মতো সম্পদ একদিকে যেমন উপকারী হয়ে থাকে, অপরদিকে তেমন ব্যক্তিকে কর্মক্ষম ও কার্যকর রাখে। অন্যথায় পার্থিব সম্পদের আধিক্যের অবস্থা তো এই– যখন আসে, মসিবত নিয়ে আসে, যখন যায়, মসিবত রেখে যায়।

إِذَا أَدْبَرَتْ كَانَتْ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةً :: وَإِنْ أَقْبَلَتْ كَانَتْ كَثِيْرًا هُمُوْمُهَا.

> পার্থিব সম্পদ যখন চলে যায় তখন আফসোস ও আক্ষেপ রেখে যায়, আর যখন আসে তখন হাজারো পেরেশানি সাথে করে নিয়ে আসে।

যাই হোক, দুনিয়া লাভের প্রচেষ্টার স্থলে আপনি যদি আপনার সীরাত গঠনের প্রচেষ্টায় রত হন তাহলে দুনিয়াও হাতছাড়া হবে না এবং আখেরাতও ঠিক হয়ে যাবে। এটা ঐসব মাদরাসাগুলো দ্বারাই কেবল সম্ভব। এই মাদরাসাগুলোকে আপনি যদি সহায়তা করেন তাহলে তা মাদরাসার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করা হবে না। কেননা এই চাঁদা প্রদান করা মূলত কর্জ দেওয়া, যা সুদসহ আপনি ফেরত পাবেন। দুনিয়াতে তো কর্জ দিয়ে মুনাফা নেওয়া সুদ, যা হারাম, কিন্তু আখেরাতে সুদ জায়েজ এবং তা সেখানে পাওয়াও যাবে। একটির বদলে সাতশতটি এবং তার চেয়েও বেশি পাওয়া যাবে। সুতরাং এই মাদরাসাগুলোয় আপনি চাঁদা দিলেন তো আল্লাহর ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয় করলেন। আপনার চাঁদার দ্বারা যদি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং তার মাধ্যমে মানুষ 'মানুষ' হতে থাকে তাহলে তারাতো আপনারই কওম হবে।

মহান ইহসান

এই দীনি মাদরাসাগুলো শুধু ইলমই শিক্ষা দেয় না বরং রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবিধান করে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে। এই মাদরাসার বদৌলতে যদি বিশ্বস্ত, সৎ ও আল্লাহভীরু মানুষ তৈরি হয় তাহলে না ডাকাতি হবে, না চুরি হবে, না যেনা-ব্যভিচার সংঘটিত হবে, আর না মদ্যপান থাকবে। সুতরাং নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর পেছনে সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই

নিজের 'পুলিশম্যান' হয়ে যাবে। কাজেই এই মাদরাসাগুলো শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছে এবং দেশের সত্যিকারের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। এরা হচ্ছে পুরো দেশের জন্য ইহসানকারী। এই মাদরাসাগুলোর টিকে থাকার উপর আপনার টিকে থাকা নির্ভরশীল। এ জন্যই আমি এই আয়াতগুলোর আলোচনা উপস্থাপন করলাম।

পরিশিষ্ট

আমার তিলাওয়াতকৃত আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, একমাত্র ইলমের ভিত্তিতেই মানুষ অন্যান্য মাখলুকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে। এই ইলমের কারণেই অন্য তিন চেতনাশীল মাখলুককে টপকে গিয়েছে। এ কারণে এই শ্রেষ্ঠত্বকে নিজের ভেতর ধারণ করুন এবং বিনামূল্যে আল্লাহ তায়ালা যে মর্যাদা দান করেছেন তা হেফাযতের প্রচেষ্টা করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইলম অর্জন করা এবং তদনুযয়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْلَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ. اَللّٰهُمَّ أَعِذْنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اَللّٰهُمَّ أَعِذْنَا مِنَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. آمين.

বয়ান : ৫

নিয়ামত ও মসিবতের উদ্দেশ্য

আমাদের রূহের ভেতরে যখন গুনাহের ফোড়া-পাঁচড়া ও দুষ্কর্মের টিউমার তৈরি হয় আল্লাহ তায়ালা তখন অপারেশন করেন, অস্ত্রোপচার করেন। এই মসিবতরাজি মূলত অপারেশন। এর দ্বারা গুনাহের দুষিত মূল উৎপাটন করা হয়। এ কারণেই মানুষ যখন মসিবতে পতিত হয় তখন তার চরিত্র শুদ্ধ হয়ে যায়। যখন আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-ফুর্তির আধিক্য হয় তখন মানুষের মধ্যে অমুখাপেক্ষিতা চলে আসে এবং ঐশ্বর্য-হেতু অহংকার বেড়ে যায়। এর চিকিৎসারস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা কিছু নিয়ামত ছিনে নিয়ে তাকে সতর্ক করেন। যদি জ্ঞানী হয় তবে দ্রুত সতর্ক হয়ে তওবা করে নেয়।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةِ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِه وَصَحْبِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ○ اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ○ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ○ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

পরীক্ষাকেন্দ্র

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আমরা আজ যে পৃথিবীতে বসবাস করছি এর পুরোটাই একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। আল্লাহ তায়ালা এখানে আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য প্রেরণ করেছেন। এখানে পরীক্ষার উদ্দেশ্য এই নয় যে, নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ জানেন না যে, এরা কেমন– ভাল না মন্দ? দৃঢ় প্রকৃতির না দুর্বল প্রকৃতির? সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর ইলম অনাদি ও অনন্ত।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, মানব-মনে আল্লাহ তায়ালা যে বিশেষত্ব সৃষ্টি করে রেখেছেন তাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং প্রকাশ করা। অর্থাৎ সকল কিছুর বিশেষত্ব প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। কেউ যদি সুদৃঢ় আত্মার অধিকারী হন তবে তাকে মসিবতে নিপতিত করেন, যেন তার অন্তরের দৃঢ়তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর যদি সে দুর্বল আত্মার অধিকারী হয় তবে তার দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পরীক্ষা নেবার অর্থ হলো 'ইসতিলাম' অর্থাৎ ইলম অর্জন করা। এমন নয় যে, প্রথমে তাঁর ইলম ছিল না বরং কোনো ব্যক্তির ব্যাপার তাঁর ইলমে যা রয়েছে তাকে দৃশ্যমান করতে চাচ্ছেন, প্রকাশ করতে চাচ্ছেন। যাতে করে পৃথিবীবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অমুক জিনিসে এই প্রভাব ছিল এবং অমুক ব্যক্তির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ছিল। এ কারণেই পৃথিবীতে যারই আগমন ঘটেছে, প্রকৃতপক্ষে সে পরীক্ষার জন্য এসেছে। অর্থাৎ তার মধ্যে যে রহস্য ও তত্ত্ব রক্ষিত রয়েছে তা প্রকাশ করা হবে।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য

পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে দুটি পদ্ধতি স্থির করেছেন। একটি হলো নিয়ামত, অপরটি হলো মসিবত। উভয়টি দ্বারাই মানুষকে পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য। নিয়ামত দিয়ে এ জন্য পরীক্ষা করেন যে, নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে এ ব্যক্তি নিয়ামতদাতাকে স্মরণ রাখে নাকি শুধু নিয়ামতের মধ্যেই নিমজ্জিত হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তি যদি নিজ নিয়ামতরাজি ও আরাম আয়েশে বিভোর হয়ে থাকে এবং এ কথা স্মরণ না থাকে যে, এ নিয়ামত তাকে কে দিয়েছে? তাহলে বলা যাবে যে, এ ব্যক্তির কলবে নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার আবেগ লুকায়িত ছিল, তা উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো, প্রকাশ করে দেওয়া হল। পরবর্তিতে যদি এর জন্য কোনো বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয় তখন তার এ কথা বলার অবকাশ

থাকবে না যে, আমাকে পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়নি। বরং নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ পরীক্ষায় আমি কী প্রমাণ দিয়েছি। এভাবেই পৃথিবীতে নিয়ামত একটি স্বতন্ত্র পরীক্ষার বস্তু। চাই তা সম্পদ হোক বা সম্মান হোক।

নিয়ামতের পদ্ধতিতে পরীক্ষা

সর্বপ্রকার নিয়ামতের উদ্দেশ্য হলো এই পরীক্ষা করণ যে, তুমি কোন ধরনের দায়িত্ব আদায় করছ। তুমি নিয়ামতদাতাকে গুরুত্ব দিচ্ছ নাকি নিয়ামতকে গুরুত্ব দিচ্ছ। তোমার দৃষ্টি নিয়ামতদাতার প্রতি নাকি স্বয়ং নিয়ামতের প্রতি। যদি নিয়ামতদাতার প্রতি নজর থাকে তবে ব্যক্তির মুখ থেকে অযাচিতভাবেই শোকরের বাক্য বেরিয়ে আসবে এবং বলবে– হে নিয়ামতদাতা! এ তোমার অনুগ্রহ যে, তুমি আমাকে এই নিয়ামতরাজি দান করেছ। না আমি এ নিয়ামত পাওয়ার যোগ্য ছিলাম আর না এর জন্য উপযুক্ত ছিলাম। এগুলো শুধুই তোমার অনুগ্রহ ও পুরস্কার। এ অবস্থায় বান্দা তার পরীক্ষায় সফলতা লাভ করে নিল। নিয়ামত দেওয়া হয়েছিল, সে তার হক আদায় করেছে। সুতরাং নিয়ামতের হক শুধু এই নয় যে, মানুষ নিয়ামতরাজি ব্যবহার করবে, বরং নিয়ামতের ব্যবহারের সাথে সাথে নিয়ামতদাতার প্রতি মনোনিবেশ, তাঁর দীন মান্য করা, তাঁর নিয়ামতরাজির শোকর আদায় করা– এগুলোও তার হক। নিয়ামত দেবার পর মানুষকে দুইভাবে পরীক্ষা করা হয়। একটি হলো এই যে, ঐ নিয়ামতকে ন্যায়ানুগভাবে ব্যবহার করবে। দ্বিতীয় হলো এই যে, ঐ নিয়ামতের ব্যাপারে নিয়ামতদাতার শোকর আদায় করবে, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করবে। কেননা যিনি দিতে পারেন তিনি ছিনেও নিতে পারেন। দান করা যার পক্ষে সম্ভব, ফেরত নেয়াও তার পক্ষে সম্ভব। মোটকথা তিনি এভাবে পরীক্ষা নেন যে, যদি দাতার প্রতি মনোনিবেশ কর এবং শোকর আদায় কর তবে তার ভাণ্ডার অফুরন্ত। তিনি নিয়ামতরাজি বিস্তার করতে থাকবেন। ব্যক্তি যদি নিয়ামতের প্রতি না-শোকরির পথ গ্রহণ করে তবে বোঝা যাবে যে, নিয়ামতের কদর করার যোগ্যতা তার নেই। তিনি স্বীয় নিয়ামত প্রত্যাহার করে নিবেন। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিয়ামতরাজি দান করা মূলত পরীক্ষা করণ ও তত্ত্ব উন্মোচনের জন্য হয়ে থাকে।

মসিবতের পদ্ধতিতে পরীক্ষা

কখনো কখনো বান্দাকে মসিবত দ্বারাও পরীক্ষা করা হয়। মসিবত দ্বারা পরীক্ষা এভাবে হয় যে, বিপদাপদ ও মসিবতে পতিত হয়ে ঐ ব্যক্তি কি মসিবত নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকে– আফসোস, শোক-মাতম ও পেরেশানি-ই প্রকাশ করতে থাকে? নাকি তার দৃষ্টি মসিবত প্রেরণকারীর প্রতি নিপতিত হয়? এ মর্মে যে, হয়তো আমার কোনো কল্যাণ বিবেচনা করেই তিনি এ বিপদ দিয়েছেন। যদি মসিবত প্রেরণকারীর প্রতি মনোযোগ না থাকে, মসিবতই মুখ্য বিবেচ্য হয় তবে তার ফল এই দাঁড়াবে যে, ব্যক্তির বে-সবরি বা অধৈর্যতা স্পষ্ট হয়ে যাবে, আল্লাহ তায়ালার সমালোচনা প্রকাশ পেতে থাকবে। এভাবে যে– পরীক্ষা করার জন্য শুধু কি আমিই ছিলাম? মসিবতে ফেলার জন্য শুধু কি আমাকেই পেল? কিন্তু যদি বিপদে পতিত হয়ে অবিচল থাকে এবং এই বিবেচনা করে যে, নিঃসন্দেহে মসিবত তো অনেক কঠিন কিন্তু যিনি এ বিপদ দিয়েছেন তিনি পিতা-মাতা অপেক্ষা অধিক দয়ার্দ্র, সুতরাং এ বিপদ আমাকে কষ্ট দেবার জন্য দেওয়া হয়নি, আমার ঈমানকে পরখ করার জন্য দেওয়া হয়েছে, অতঃপর বান্দা সবর করবে এবং পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করবে।

সুতরাং নিয়ামত দ্বারা মানুষের শোকরগোজারি ও কৃতজ্ঞতাবোধের পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং মসিবত দ্বারা সবর ও অবিচলতার পরীক্ষা নেওয়া হয়। যাচাই করা হয় যে, কোন বান্দা অটল-অবিচল এবং কে দুর্বল কলবের অধিকারী। যে ব্যক্তি নিয়ামত ও মসিবতের পরীক্ষায় সফল প্রমাণিত হবেন তিনিই হবে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা। আর যে ব্যক্তি সফল হবে না সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বান্দা নয়। হয়তো সে নিয়ামতের বান্দা, না-হয় মসিবতের বান্দা। এই দুইয়ের প্রতিই তো তারা ঝুঁকেছে।

মনুষ্যত্বের উচ্চস্তর

ভারতের শেষ সম্রাট জাফর শাহ (সর্বশেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর) উপরোক্ত বিষয়ের হাকিকত বর্ণনায় চমৎকার একটি শের বলেছিলেন। এমনিতেই তিনি ছিলেন সুফী মানসিকতার অধিকারী, পরবর্তীতে বাহ্যিক অবস্থা তাকে দরবেশে পরিণত করেছিল। যার রাজত্ব ছিনে নেওয়া হয় তিনিই কেবল জানেন তার অন্তরে কেমন ঝড় বয়ে যায়। যাই হোক, তিনি একটি শের বলেছিলেন এবং তাতে চমৎকারভাবেই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেন:

ظفر آدمی اُسکو نہ جانیے گا :: گو ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا

جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی :: جسے طیش میں خوفِ خدا نہ رہا

হে জাফর! সুখের সময়ে যার আল্লাহর কথা স্মরণ থাকে না এবং দুঃখের সময়ে যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে না সে যতই জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার হোক, তুমি তাকে মানুষ মনে করো না।

যাই হোক, প্রকৃত মানুষ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিয়ামত ও মসিবতের কথাকে স্মরণ রাখেন। না সুখ-সমৃদ্ধি তাকে আল্লাহ হতে গাফেল রাখে, না দুঃখ-যাতনা তাকে আল্লাহ হতে গাফেল রাখে। এক অবস্থায় আল্লাহর ভয় অন্তরে বিরাজমান থাকে, আরেক অবস্থায় সন্তুষ্টি, আশা ও শোকরগোজারি বিবেচ্য থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য দুটি ধারা বজায় রেখেছেন। একটি হলো নিয়ামতের ধারা, আরেকটি হলো মসিবতের ধারা।

পরীক্ষার পরিমাপ

উপরোক্ত ব্যবস্থার সাথে সাথে আল্লাহ আরো একটি বিষয় রেখেছেন যে, যার নিয়ামত যত অধিক তার পরীক্ষার পরিমাপও তত অধিক। যার উপর অধিক মসিবত অর্পিত হয় তার কলবকে অধিকতর পরীক্ষা করা হয়। ছোটখাটো মসিবতকে মানুষ সামলে নিতে পারে, ধৈর্যধারণ করতে পারে; কিন্তু যখন বড় মসিবত অর্পিত হয় তখন যদি অবিচল থাকতে পারে তবে বলা হবে যে, তার ঈমানও মজবুত এবং কলবও মজবুত। তদ্রূপ কাউকে যখন ব্যাপকভিত্তিতে নিয়ামত দান করা হয় এবং এ নিয়ামত পেয়ে সে অবিচল থাকে, নিয়ামতদাতাকে স্মরণ রাখে তখন বলা যাবে যে, এ বান্দার কলব অত্যন্ত মজবুত এবং পরীক্ষায় সে কামিয়াব হয়েছে।

পরীক্ষার সাধারণ পদ্ধতি

মানুষকে পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে মসিবত দ্বারাই অধিক পরীক্ষা করা হয়, নিয়ামত দ্বারা অতটা হয় না। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য মসিবত রেখেছেন এবং নিয়ামতের পরিমাণ কম রেখেছেন।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা মাটি দ্বারা হযরত আদম আ.-এর কায়া নির্মাণ করার পর চল্লিশদিন পর্যন্ত তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। বর্ণনায় রয়েছে, উক্ত মাটির উপর ঊনচল্লিশ দিন পর্যন্ত পেরেশানির বৃষ্টি বর্ষণ করলেন এবং একদিন বর্ষণ করলেন খুশির বৃষ্টি। এ কারণেই পৃথিবীতে খুশি কম এবং মসিবত অধিক। অধিকাংশ সময়ই মানুষ পেরেশানিতে লিপ্ত থাকে। অধিকাংশ সময় আনন্দ-ফুর্তি ও নিশ্চিন্ত থাকা সচরাচর ঘটে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ

আমি মানুষকে মসিবত-নির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। [বালাদ ৯০ : ৪]

সুতরাং মানুষের উপর অধিকতর মসিবত অর্পিত হয়ে থাকে বিধায় মসিবতের মাধ্যমেই পরীক্ষা বেশি করা হয়। মানবজীবনের শুরু হতে শেষ অবধি মসিবতের একটি ধারা বিদ্যমান। জন্মমুহূর্ত হতেই মানুষ মসিবতে নিমজ্জিত। ক্রন্দনরত অবস্থায় মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে, চিৎকাররত অবস্থায় আগমন করে। কোনো শিশুই হাসতে হাসতে পৃথিবীতে আগমন করে না। যার অর্থ এই যে, এ শিশু কোনো এক মসিবতে রয়েছে। সে একটা-কিছু চাচ্ছে, যা মিলছে না। এই পেরেশানিতে সে চিৎকার করছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর যদি মুখে দুধ দেওয়া হয় তাহলে চুপ হয়ে যায়। বোঝা যাচ্ছে তার কোনো শূন্যতা বা অভাব ছিল। কোনো নিয়ামত হতে শূন্য হওয়া পেরেশানির কারণ হয়ে থাকে। যাই হোক, মানুষ পেরেশানি নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছে। এরপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার পেরেশানির ধারাও বাড়তে থাকে।

মানুষের আশা ও স্বপ্ন অসীম। শত আশার মধ্য হতে মাত্র একটি পূর্ণ হয়, বাকি নিরানব্বইটিই অপূর্ণ থেকে যায়। এই নিরানব্বইটির মধ্যে যে অপূর্ণতা এটাই হলো তার জন্য মসিবত। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার বিপরীত হওয়াটাই সবচেয়ে বড় মসিবত। আর এটা মানুষের জন্য অবধারিত।

নিয়ামত ও মসিবতের উদ্দেশ্য

এই পৃথিবীকে আল্লাহ তায়ালা না শুধু সুখ-শান্তির স্থান করেছেন, না শুধু মসিবতের স্থান করেছেন। এখানে সুখ-শান্তিও রয়েছে, মসিবতও রয়েছে। যদিও সুখ-শান্তি অপেক্ষা মসিবত প্রবল। যেখানে শুধুই সুখ আর সুখ, দুঃখ-কষ্টের নাম-গন্ধও নেই সে জগৎকে আমরা জান্নাত বলে থাকি। আর যে জগৎ

শুধুই মসিবত আর দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ, সুখ-শান্তির নাম-গন্ধও নেই তাকে আমরা দোজখ বলে থাকি। যেখানে কোনো প্রকারের সুখের চিন্তাও কেউ করতে পারে না। সুতরাং সুখ ও দুঃখ– এই উভয়ের সমন্বয়ে পৃথিবীকে তৈরি করা হয়েছে। এখানে সুখ-শান্তি আছে, দুঃখ-যাতনাও আছে। অর্থাৎ জান্নাতের কিছু নমুনাও আছে এবং দোজখের কিছু নমুনাও আছে। এ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এ কারণে যে, এ পৃথিবীতে থাকাকালীন মানুষ যেন মৃত্যুপরবর্তী-জগৎ সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারে। যদি আরাম-আয়েশ তার পছন্দ হয় তবে যেন সেই জগতের জন্য পুঁজি সঞ্চয় করে। মসিবত যদি অপন্দনীয় হয় তবে অবশ্যই ঐ জগতের মসিবতকে ভয় করবে এবং তা হতে রক্ষা পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

যাই হোক, পৃথিবীতে সুখ-শান্তি ও দুঃখ-যাতনা এ কারণে রাখা হয়েছে যে, যেন পরিণতির প্রতি নজর থাকে। সুখের স্থানের অন্বেষণে থাকে এবং মসিবতের স্থান হতে বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত করে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা উভয় ধারার প্রচলন করেছেন।

জীবন ও মৃত্যুর লড়াই

মৃত্যু দ্বারা মসিবতের সমাপ্তি ঘটে আর জীবন হলো নিয়ামত। জীবন হলো নিয়ামতের শুভ পরিণতি আর মৃত্যু হলো মসিবতের শেষ পরিণাম। প্রকৃত অর্থে মৃত্যু হলো জীবন হরণ, অর্থাৎ জীবনকে ছিনিয়ে নেওয়া। এটাই মৃত্যু। সুতরাং আরাম-আয়েশকে যদি ছিনিয়ে নেওয়া হয় তবে এটা হবে আরাম-আয়েশের জন্য মসিবত। এটাও মৃত্যু। সুস্থতাকে যদি ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং রোগব্যাধি এসে যায় তবে তা হলো সুস্থতার মৃত্যু। মানুষের সত্তার উপর যেভাবে মৃত্যুর আগমন ঘটে সেভাবে তার বিভিন্ন অবস্থার উপরও মৃত্যুর আগমন ঘটে। একটি অবস্থার সমাপনান্তে আরেকটি অবস্থার আগমন ঘটে। যে অবস্থাটি চলে যায় তার মৃত্যু ঘটে এবং যে অবস্থাটির আগমন ঘটে সেটি জীবন লাভ করে। সুস্থতা চলে গেল তো তার মৃত্যু হলো, আরাম-আয়েশ চলে গেল তো আরাম-আয়েশের মৃত্যু হল। এভাবেই মানুষ প্রতি কদমে জীবন ও মৃত্যুর টানাপড়েনে বিভোর রয়েছে। নিয়ামতের আগমন ঘটতে থাকে আবার চলেও যায়। অতঃপর একটি সময় এমন আসে যখন স্বয়ং জীবনই চলে যায়। ইতোপূর্বে প্রতিদিন তার বিভিন্ন অবস্থার উপর মৃত্যুর ছায়া নেমে আসতো, তার সত্তার উপর আসতো না। শেষ

নিঃশ্বাসটি হলো তার সত্তার মৃত্যু। সেটিও শেষ পর্যন্ত চলে যায়। সুতরাং সমগ্র পৃথিবী মৃত্যু ও জীবনের টানাপড়েনের মধ্যে রত রয়েছে।

পরীক্ষার মাধ্যমসমূহ

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আমি মসিবত ও বিপদাপদ দ্বারা মানুষের পরীক্ষা নেব, তাদের সবর ও ধৈর্যের পরীক্ষা নেব। আল্লাহ বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী অত্র আয়াতে অনেকগুলো তাকিদ রয়েছে। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ এর মধ্যে প্রথমে 'ওয়াও' নেওয়া হয়েছ, যা তাকিদ বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে। (তাকিদ দ্বারা অবশ্যম্ভাবিতা, দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা বুঝানো হয়)। এরপর 'লাম' বর্ণটি নেওয়া হয়েছে, এটিও তাকিদ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃদ হয়। অতঃপর একবচনের স্থানে বহুবচনের শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, যা স্বয়ং একটি তাকিদ। এরপর নেওয়া হয়েছে 'নূনে-সাকিলাহ' যা শুধুই তাকিদ বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়। অতঃপর একে 'জমিরে খিতাব' অর্থাৎ كُمْ এর দিকে মানসুব করা হয়েছে, এতেও তাকিদ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই– অবশ্য, অবশ্য, অবশ্য, অবশ্য, অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করতে থাকব। এ খেয়াল কর না যে, নিয়ামত দিয়ে আমি তোমাদেরকে কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ছাড়াই ছেড়ে দেব, অতি আবশ্যকীয়ভাবেই তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। তাকিদের শব্দ এ জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে যে, যাতে মানুষ একে সম্ভাবনার বিষয় বলে মনে না করে; পরীক্ষা অবশ্যই নেওয়া হবে।

পরীক্ষার প্রথম মাধ্যম ভয়

কিভাবে মানুষের পরীক্ষা নেওয়া হবে? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন: بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ভীতির মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হবে। কখনো আমি দুশমনের ভয় সৃষ্টি করে দেব। চতুর্দিক থেকে শুধু ভয় আর শঙ্কা ঘিরে রাখবে। এভাবে যে, এদিক থেকে না প্রাণ চলে যায়, ওদিক থেকে না কেউ হামলা করে, ওপাশ থেকে না কেউ তীর ছুঁড়ে মারে, না জানি কোনো শত্রু এসে পড়ল! সবসময় এমন এক আশঙ্কা লেগেই থাকে।

ভীতি দ্বারা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন সতর্ক থাকতে পারে। মানুষের মধ্যে যে কৌশলগ্রহণের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে তা যেন অর্থহীন হয়ে না পড়ে। যদি মানুষ ভীতিমুক্ত হয়ে বসে থাকে তবে তার মধ্যে আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বনের যে গুণ রাখা হয়েছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই মানুষের জন্য ভীতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে সতর্ক ও সচেতনতার সাথে মানুষ কাজ করতে পারে এবং ঐসমস্ত কৌশল অবলম্বন করে যা দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়। এতে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ প্রকাশ পাবে। জানা যাবে যে, লোকটি কত বিচক্ষণ ও কৌশলী।

পরীক্ষার দ্বিতীয় মাধ্যম অনাহার

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ

আর কখনো আমি ক্ষুধা দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি।

কখনো এভাবে পরীক্ষা করা হয় যে, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্ধারণ করা হয়। ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া এবং কলবের শক্তি যাচাই করা মঞ্জুর হয়েছে বিধায় কখনো ভীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, ভয় ও ভীতিকর অবস্থায় মানুষ আমার নাম স্মরণ করে নাকি শুধুই অবস্থার শিকার হয়ে অথর্ব হয়ে থাকে। যদি আমার নাম স্মরণ করে, তবে আল্লাহ বলেন, আমি তার সাহায্যের জন্য তৈরি রয়েছি, আমি তার সাহায্যে এগিয়ে আসব।

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। [মুহাম্মাদ ৪৭ : ৭]

আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ হলো তাঁর দীনের সাহায্য করা। আর দীনের সর্বপ্রথম সাহায্য হলো এই যে, ব্যক্তি নিজে দীনের উপর অটল থাকা। দীন তো কোনো আকৃতি-বিশিষ্ট বা দেহধারী বিষয় নয় যে, তার সাহায্য করা হবে। দীনের সাহায্যের অর্থ এই যে, দীনকে নিজের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করা, সর্বাবস্থায় দীনকে অগ্রগণ্য রাখা। এটাই দীনকে সাহায্য করা এবং আল্লাহকে সাহায্য করা।

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ

তোমরা যদি আমাকে স্মরণ রাখ তবে আমি তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো।

তোমরা যদি আমাকে ভুলে যাও তবে আমিও তোমাদেরকে ভুলে যাব।

সমর্পিত ও সন্তুষ্ট বান্দা

মোটকথা মানুষকে কখনো কখনো ভীতি দ্বারা পরীক্ষা করা হয় এবং কখনো কখনো দারিদ্র্য ও অনাহার দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য দিয়ে যখন পরীক্ষা করা হয় তখন আল্লাহর খাঁটি বান্দা যারা তারা অভাব থাকা সত্ত্বেও বলেন– হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে অবস্থায় রেখেছেন তা নিয়েই আমি আপনার শুকরিয়া আদায় করছি। আমি তো আপনার বান্দা। বন্দেগির অর্থ হলো এই যে, যে অবস্থাই আসুক না কেন বান্দা শোকরগোজার ও ধৈর্যশীল থাকবে। সমর্থন ও সন্তুষ্টির সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে দেবে। যদি নিজের মতামত পেশ করতে শুরু করে যে, আপনি আমাকে মসিবতে ফেলেছেন, আপনার তো উচিত ছিল আমাকে সুখে রাখা। আপনি আমার জন্য কেন ভীতি নির্ধারণ করেছেন? আপনার তো উচিত ছিল আমাকে নিশ্চিন্ত রাখা। এই হলো নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করার স্বরূপ। বান্দার আগমন হয়েছে বন্দেগি করার জন্য। বন্দেগির অর্থ হচ্ছে নিজেকে সমর্পণ করা। অর্থাৎ যে অবস্থায় আপনি রাখেন না কেন আমি সন্তুষ্ট রয়েছি। এর প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের মতামত উপস্থাপন করা ছেড়ে দেবে। নিজের জন্য নিজে কোনো সিদ্ধান্ত দেবে না। আল্লাহর পক্ষ হতে যা আসবে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করেন যে, নিজেকে সমর্পণ করার মানসিকতা তার মধ্যে আছে– নাকি নিজের মতামত ব্যক্তকরণ ও নিজস্ব রায় প্রদান করার মানসিকতা তার কলবে রয়েছে। নিজস্ব রায় প্রদানের মানসিকতা যদি থাকে তবে তা বন্দেগির বিপরীত। নিজস্ব রায়কে যদি বর্জন করা হয় তবে তা বন্দেগি। তার মানসিকতা থাকবে এমন যে, আল্লাহ যা চাইবেন আমি তাতে সন্তুষ্ট। ব্যক্তির অবস্থা যেন গোসলদাতার হাতে শবদেহের অবস্থার অনুরূপ হয়ে যায়। যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে উল্টিয়ে দেয়। যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে পাশ ফেরায়। শবদেহ এ কথা বলে না যে, এদিকে কেন আমায় ফেরালে? ওদিকে কেন ফেরালে না? পরিপূর্ণভাবে গোসলদাতার ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। প্রভুর হাতে বান্দারও এ অবস্থাই হওয়া আবশ্যক। তাঁর পক্ষ হতে যে ব্যবস্থাই আসুক না কেন তাকে মেনে নেওয়া এবং এ কথা বলা উচিত যে, হে আল্লাহ! তোমার শুকরিয়া আদায় করছি,

তোমার দেওয়া বিষয়ের উপর আমি সন্তুষ্ট। যদি ভীতির আগমন ঘটে তবুও তাতে সন্তুষ্ট থাকে। যদিও তাঁর কাছে প্রশান্তিই কামনা করে থাকে কিন্তু যা কিছুই সামনে আসুক তাতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এরই নাম বন্দেগি।

কোনো এক কৃতদাসের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, তুমি কী খাবে? সে উত্তর করেছিল, 'মনিব যা খাওয়াবেন তাই খাব', কী পরিধান করবে? 'মনিব যা পরিধান করাবেন তাই পরবো'। কী কাজ করবে? 'মনিব যে কাজ করাবেন তাই করব'। শেষে তার কাছে জানতে চাওয়া হল– তোমার নিজের কোনো মর্জি কি নেই? গোলাম বললো, 'আমার নিজের কোনো মর্জি যদি থাকত তাহলে তো আমি গোলাম হতাম না। আমি গোলাম হওয়ার অর্থ এই যে, আমার মর্জি বা ইচ্ছাশক্তিও গোলাম, আমার স্বাদ-আহ্লাদও গোলাম। আমার আশা-স্বপ্নও গোলাম। যা কিছু হবে, মনিবের মর্জিমাফিক হবে। তিনি খাওয়ালে খাব, না খাওয়ালে খাব না। তিনি কাজ করালে করব, কাজ না করিয়ে বসিয়ে রাখলে বসে থাকব। আমি আমার মনিবের সম্পূর্ণ অনুগত। মর্জি যা রয়েছে তা আমার মনিবের, কোনো ইচ্ছা থাকলে তা মনিবের আছে।' তো একজন মানুষ যখন অন্য একজন মানুষের খাদেম ও গোলাম হয়ে যেতে পারে, অথচ ঐ মনিব তাকে সৃষ্টি করেনি, তার জীবন, নিয়ামত ও মসিবত মনিবের হাতে নেই, কিন্তু নাম তো তার গোলামের খাতায় লিখিত হয়েছে। তো মানুষ যখন অপর একজন মানুষের কাছে এ পর্যায়ে নিজেকে সমর্পণ করে দেয় যে, সে বলে আমার না কোনো মর্জি আছে, না কোনো চাহিদা বা ইচ্ছা আছে; তাহলে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের বান্দা– যাঁর হাতে তার জীবনও রয়েছে, যাঁর হাতে তার ঈমানও রয়েছে এবং যাঁর হাতে তার ইজ্জত-সম্মানও রয়েছে তাঁর সামনে কেউ নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করবে এবং দাবি করবে যে, আমি বান্দা, তাহলে এ দাবি ভুল দাবি হবে। বন্দেগির অর্থ এই যে, আপনি যা চাচ্ছেন তাই ঠিক আছে এবং এতেই আমি সন্তুষ্ট। সুতরাং মান্যতা ও সন্তুষ্টি সৃষ্টি হওয়া এবং সন্তুষ্ট বান্দায় পরিণত হওয়া– এটাই প্রকৃত বন্দেগি।

কলবের পরীক্ষা

বান্দার অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় তুমি কি আল্লাহর বান্দা? তোমার বান্দা হওয়ার অর্থ কী? সে বলবে, যদি তিনি সুখে রাখেন তবু আমি তাঁর বান্দা, যদি তিনি মসিবতে রাখেন তবু আমি তাঁর বান্দা। যদি তিনি চিন্তামুক্ততা ও প্রশান্তি দেন তবুও আমি তাঁর বান্দা, আর যদি তিনি আমাকে

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রাখেন তবুও আমি তাঁর বান্দা। এমনটি হলেই কেবল বন্দেগি হবে। আর যদি সে এমন বলে যে, যদি নিয়ামত প্রাপ্ত হই তবে তো আমি আল্লাহর বান্দা কিন্তু যদি নিয়ামত ছিনে নেওয়া হয় তবে আমি বান্দা নই; তখন আমি অভিযোগ উত্থাপন করব। যার প্রকৃতি এমন হবে সে আল্লাহর বান্দা নয়– সে নিয়ামতের বান্দা, নিয়ামত তার মাবুদ। যদি নিয়ামত জোটে তবে সে সন্তুষ্ট, যদি চলে যায় তাহলে সে নারাজ হয়ে যায়। এই পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ তায়ালার বন্দেগি করার জন্যে আগমন করেছে, নিয়ামতের বন্দেগি করার জন্যে নয়।

এ জন্যই আল্লাহ বলেন, আমি মানুষের অন্তরের অবস্থা যাচাই করি যে, কোন সীমা পর্যন্ত সে আমার বান্দা। মসিবত হোক বা নিয়ামত হোক– কোন সীমা পর্যন্ত সে আমার দিকে রুজু হয়। এ জন্যই নিয়ামত ও মসিবতের এই ধারা কায়েম করেছি।

রূহের পবিত্রতা

হাদিস শরীফে এসেছে, কোনো বান্দার যদি গুনাহ অধিক হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তার উচ্চমর্যাদা ও সম্মানজনক অবস্থান কামনা করেন তাহলে তাকে ঐ মর্যাদার যোগ্য বানাবার জন্য আল্লাহ তাকে রোগব্যাধি দেন। অসুখ বাড়তে থাকার সাথে সাথে সে সবর করতে থাকে এবং বলে– হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে অবস্থায় রেখেছেন আমি তাতেই সন্তুষ্ট। ঐ অসুখের মসিবত দ্বারা তার গুনাহের কাফফারা হতে থাকে এবং 'মাকামে কারীম'-এর নিকটবর্তী হতে থাকে। যদি গুনাহ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মর্যাদার ঐ স্তরে পৌঁছে যায় তো ভাল; কিন্তু যদি তাতেও গুনাহ শেষ না হয়, আরো বাকি থাকে, তাহলে অসুখের সাথে সাথে আমি তার জন্য অসহায়ত্ব নির্ধারণ করি। প্রথমে শুধু অসুস্থতা ছিল, এবার নিঃস্ব হয়ে গেল। হাতে টাকা পয়সা নেই যে, ওষুধ কিনবে, পথ্য কিনবে। তো অসুখ রয়েছে কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, তথাপি এ অবস্থায়ও দীনের উপর অটল রয়েছে। বলছে– হে আল্লাহ! তুমি যে অবস্থায় রেখেছ তাতেই আমি সন্তুষ্ট। আল্লাহ বলেন, এর দ্বারা তার গুনাহসমূহের কাফফারা হচ্ছে। তার কলবে গুনাহের যে ময়লা-আবর্জনা জমেছিল এখন তা মিটে যাচ্ছে। যদি সকল গুনাহ মিটে যায় তো ভাল, যদি তাতেও গুনাহ শেষ না হয় সে-ক্ষেত্রে বলেন যে, তার জন্য মৃত্যুর ছায়া ফেলি। এভাবে যে, তার কোনো প্রিয়জনকে আমি ছিনিয়ে নেই। প্রথমে ছিল অসুস্থতা, অতঃপর তার সাথে অসহায়ত্ব সংযুক্ত হয়েছে,

অতঃপর প্রিয়জনের মৃত্যু যাতনা। এগুলোও তার গুনাহসমূহের বাফফারার জন্য। যতই দুঃখ-শোক তাকে আচ্ছন্ন করবে ততই তার গুনাহের কাফফারা হবে, ততই তার আল্লাহর নৈকট্য নসিব হবে এবং ততোধিক প্রতিদান মিলবে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোনো ব্যক্তির যদি একটি কাঁটাও ফোটে এবং তাতে সে ব্যথা অনুভব করে তবে এ কাঁটা ফোটা দ্বারাও তার আমলনামায় একটি নেকী লেখা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যদি দশবার কাঁটা ফোটে তাহলে দশটি নেকী মেলে এবং দশটি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এ হলো একটি সামান্য মসিবত। এবার অনুমান করুন যে, যদি বড় ধরনের মসিবত অর্পিত হয় তবে নেকীও দেওয়া হবে তদ্রূপ বড় এবং কাফফারাও হবে বড় ধরনের কোনো গুনাহের। সুতরাং মসিবতের এ ধারা কাফফারার জন্য। এভাবে যে, গুনাহ মাফ হবে, সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে, মর্যদা উন্নত হবে এবং মাকামে কারীমের যোগ্য হয়ে উঠবে।

এভাবে যদি গুনাহসমূহ মিটে যায় এবং কলবের ময়লা-কালিমা দূরীভূত হয় এবং কলব পরিশুদ্ধ হয় তো ভাল; কিন্তু যদি তাতেও অন্তর পরিশুদ্ধ না হয় তবে সে-ক্ষেত্রে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি তার 'জান কবজ' কঠিন করে দেই। তার মৃত্যু যাতনা কঠিন হয়। যদিও এটা মানুষের জন্য একটি স্বতন্ত্র মুজাহাদা, কিন্তু এ অবস্থায়ও সে ধৈর্যশীল ও শোকরগোজার বান্দা হয়ে থাকে। সে জানে যে, আমি এক পরাক্রমশালী-প্রতাপান্বিতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছি। সন্তুষ্ট থাকা আমার কর্তব্য। তিনিই তো আমার মালিক। এর দ্বারা যদি গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায় এবং কাফফারা হয়ে যায় তো ভাল; কিন্তু যদি এতে না হয় তবে কবরের মধ্যে কিছু ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্মুখে আসে। এ হলো কবরের মসিবত। মুনকার-নাকিরের আগমন, সাওয়াল-জওয়াব, পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই– এগুলোও মূলত কাফফারার জন্য। এখানেও যদি পাপমুক্তি না ঘটে তবে হাশরের ময়দানের ভয়ঙ্কর অবস্থা অতিক্রম করতে হবে। সূর্যতাপ প্রখর হবে, হয়রানি-পেরেশানি হবে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার এক ভয়াল অবস্থা আসবে। এখান থেকে যদি গুনাহের পরিসমাপ্তি হয়ে যায় তো ভাল, অন্যথায় এরপর রয়েছে পুলসিরাত। এটিও একটি মসিবত।

হাদিস শরীফে এসেছে, জাহান্নামের উপর যে পুল স্থাপন করা হবে তা পনের হাজার বছরের পথ। পাঁচ হাজার বছর আরোহণের, পাঁচ হাজার বছর সমান্তরাল এগিয়ে যাওয়ার আর পাঁচ হাজার বছর অবতরণের। এর উপর দিয়ে মানুষকে পার করানো হবে। এটি একটি স্বতন্ত্র মসিবতরূপে আবির্ভূত হবে। এটাও মূলত গুনাহের কাফফারার জন্য থাকবে। রূহের মধ্যে যে কালিমা থাকবে তা হতে

পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে। এতেও যদি গুনাহের সমাপ্তি না ঘটে এবং আরো মসিবত বাকি থাকে তাহলে ঐ পুল থেকে কেটে মানুষ গিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। মুমিন বান্দাকে গুনাহের কাফফারার জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। কাফেরকে তো জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ইন্ধনরূপে। মুমিনকে জাহান্নামে ফেলা হবে তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য। যেমন স্বর্ণকারের চুল্লি, স্বর্ণকার তার চুল্লিতে কয়লাও দেয় এবং স্বর্ণও দেয়। কয়লা দেওয়া হয় উত্তমরূপে আগুন জ্বালাবার জন্য, আর স্বর্ণ দেওয়া হয় ময়লা আবর্জনা পুড়ে গিয়ে খাঁটি সোনা বেরিয়ে আসার জন্য। মুমিনের ঈমানের মধ্যে গুনাহের যে ধুলো-ময়লা ও রূহের মধ্যে যে ময়লা-আবর্জনা অবশিষ্ট ছিল তা পরিষ্কার করার জন্য মুমিনকে জাহান্নামে ফেলা হবে। যেন সে খাঁটি ও পরিশুদ্ধ হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং সেই সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে যা তার জন্য স্থির করা হয়েছে। মোটকথা, ঐ অবস্থানে পৌছার জন্য মসিবতের একটি ধারা বিদ্যমান রয়েছে। জন্মলগ্ন হতে যৌবনকাল পর্যন্ত, যৌবনকাল হতে বার্ধক্য পর্যন্ত, বার্ধক্য হতে মৃত্যু পর্যন্ত, মৃত্যু হতে কবর পর্যন্ত, কবর হতে হাশর পর্যন্ত এবং হাশর হতে পুলসিরাত পর্যন্ত এক ধারাবাহিক মসিবত রয়েছে। এই পূর্ণ ধারাবাহিকতা এ জন্য যে, মানুষ যেন ঘাত-প্রতিঘাত সয়ে সয়ে খাঁটি হয়ে ওঠে। তার মধ্যে যে মালিন্য ও কালিমা রয়েছে, খারাপ আমল ও গুণাহের যে অপবিত্রতা রয়েছে তার সবকিছু যেন জ্বলে পুড়ে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে কোনো-এক উন্নত মর্যাদার যোগ্য হয়।

মসিবত হলো গুনাহের কাফফারা

মানব জীবনের উপর আবর্তিত উপরোক্ত দীর্ঘ ধারাবাহিক মসিবতের হুবহু দৃষ্টান্ত হলো এমন– যেমন আপনি খুব উন্নত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি পোশাক পরিধান করলেন। ধীরে ধীরে তাতে ময়লা-আবর্জনা লাগতে শুরু করল। সপ্তাহান্তে তা এমন ময়লা হলো যে, তা খারাপ মনে হতে লাগল। তখন আপনি বিরক্তির সাথে তা খুলে ধোয়ার জন্য ফেলে রাখেন। তাতে হাত লাগাবার উপযুক্তও আপনি মনে করেন না বরং ঘৃণাভরে সেটির দিকে তাকান। ঘরে যদি ময়লা কাপড় আপনার সামনে রাখা হয়, যদিও তা আপনারই কাপড়, তবু আপনি বাড়ির লোকজনকে বলবেন, এ কেমন বেয়াকুবি! নোংরা-ময়লা জিনিস সামনে রেখেছে, এগুলোকে কোনো এক কর্ণারে রেখে দাও। তো আপনার নিজের কাপড়চোপড়ের ব্যাপারে আপনার নিজেরই ঘৃণা লাগছে, কারণ এগুলোতে ময়লা ধরেছে। কাপড় তো সেই একই কাপড়, মূল্যও তো সেই

একই মূল্য, পার্থক্য কেবল এই– এতে ময়লা লেগেছে, দুর্গন্ধ আসছে, আপনার ঘৃণা লাগছে।

এখন ধোপা এই কাপড়েরর সাথে কেমন আচরণ করবে? প্রথমে একে কোনো নদী বা দিঘির পাড়ে নিয়ে গিয়ে একটি কাঠের ফলক বিছিয়ে জোরে জোরে তাতে আঘাত করতে শুরু করবে। কাপড়টির এমনই শাস্তি জুটেছে যে, তাকে আঘাতের পর আঘাত করে মারা হচ্ছে। কাপড়টির যদি বাকশক্তি থাকতো তবে সে ধোপাকে বলতো– হে অত্যাচারী জালিম! আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি? এভাবে তুমি কেন আমাকে আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছ? তোমার কি একটুও দয়া হয় না? তাহলে ধোপা বলতো– হে আহম্মক! তোমার উপকারের জন্যই আমি তোমাকে এমন বেদম প্রহার করছি। তোমাকে এমন বেদম প্রহার করা ব্যতীত তোমার ময়লা বের করা যায় না। তো এভাবে কাঠের উপর আঘাত করে করে তাকে পূর্ণ শস্তি দেওয়া হল।

এই করেই ধোপা ক্ষান্ত হয়নি। তাকে একটি পাত্রে পুরে উনানের উপর রেখে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। আগুনের উত্তাপে পাত্রের পানি টগবগ করতে লাগল। রূপক যবানে কাপড় যেন চিৎকার করে বলছে– আমি এ কোন মসিবতে পতিত হলাম! এতক্ষণ তো আমাকে আছড়ে-পাছড়ে মারা হয়েছিল, এখন আমাকে চুলোর আগুনের মধ্যে রাখা হল! এভাবে সে জ্বলতে রইল। এক পর্যায়ে চুলা থেকে নামিয়ে তাকে নিংড়ানো হল। তার মধ্য হতে প্রচুর ময়লা বেরিয়ে এল। এ-টুকু করেই ধোপা সন্তুষ্ট হয় না। এরপর ইস্ত্রি করে। একটি লোহা বা স্টিলের ভারী বস্তুকে উত্তপ্ত করে কাপড়টিকে ঘষতে থাকে– যেন তার কুঞ্চন দূর হয়ে তা মসৃণ হয়ে যায়। এরপর তাতে 'আব' মিশিয়ে দেওয়া হয় যেন চমক তৈরি হয়। এভাবে কাপড়টিকে ফুলের মত করে মালিকের কাছে নিয়ে আসে। মালিক কিন্তু এখন বলবে না যে, এটিকে দূরে নিক্ষেপ কর; বরং যদি পাগড়ি হয় তবে সম্মানের সাথে মাথায় স্থান দেবে, যদি জামা হয় তবে গলায় জড়িয়ে নেবে।

এ পোশাক পরিধান করে মালিক যে মজলিসে বসবে সেখানে এর প্রশংসা হবে যে, অতি চমৎকার কাপড়, এর মূল্য কত? লোকজন জানতে চাইবে– কোত্থেকে আনিয়েছেন? আপনি আনন্দচিত্তে বলবেন, অমুক কারখানার তৈরি, এর এমন গুণ, তেমন গুণ, ব্যবহারে এমন আরাম প্রভৃতি। তো লোকসমাজে এর প্রশংসা বর্ণিত হচ্ছে, এর গুণকীর্তন করা হচ্ছে। মালিকের মাথায় তার স্থান হয়েছে এবং পাগড়ি হয়ে মাথায় উঠেছে। এটা কিসের ফল ছিল? এটা এজন্য সম্ভব হয়েছে যে, এর মধ্য হতে ময়লা বেরিয়ে গিয়েছে। ময়লা বের করার জন্য এক

ধারাবাহিক মসিবতের উপর দিয়ে যেতে হয়েছে। আছড়ে-পাছড়ে আঘাত করা হয়েছে, আগুনে জ্বাল দেওয়া হয়েছে, রোদে তাপ দেওয়া হয়েছে, উত্তপ্ত ইস্ত্রি দ্বারা ঘষা হয়েছে। এই মসিবতসমূহ অতিক্রম করার পর সে সম্মানের স্থানে পৌঁছেছে এবং তার প্রশংসা বর্ণিত হচ্ছে।

এবার ভেবে দেখুন, ঐ কাপড়টির যদি জ্ঞান বুদ্ধি থাকতো তাহলে কি সে এই স্থলে ধোপার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত না যে, তুমি আমাকে এই মসিবতের পথ অতিক্রম করিয়ে আমার খুব খয়েরখাহী করেছ। ঐ মসিবতগুলো যদি আমার উপর না আসতো তবে আমি এই সম্মানজনক স্থান পেতাম না।

মানুষের ক্ষেত্রেও হুবহু এই একই অবস্থা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নির্মল পবিত্র করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন।

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

প্রত্যেক মানুষ পরিচ্ছন্ন ও সহি ফিতরাত নিয়ে জন্মলাভ করে।

গুনাহগার হয়ে কেউ পৃথিবীতে আগমন করে না। কিন্তু যখন যৌবনে পদার্পণ করে এবং আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার উপকরণ তৈরি হয়ে যায় তখন গুনাহ ও নফসানি আবেগে লিপ্ত হয়ে পড়ে। নফসের চাহিদা পূর্ণ করতে থাকে। ভুলেও এ খেয়াল আসে না যে, এ নিয়ামত আমাকে কে দিয়েছিল? কে আমাকে এই অনুগ্রহ করেছে? একজন দরিদ্র ব্যক্তি যদি একটি সিজদা করে তাহলে আমাকে আল্লাহ যে এত নিয়ামত দিয়েছেন এর জন্য আমার হাজারটা সিজদা করা আবশ্যক। যার যত নিয়ামত রয়েছে তার তত শুকরিয়া আদায় করা উচিত। কিন্তু তার এ খেয়াল হয় না। অপরাধ ও গুনাহের ময়লা আবর্জনায় তার রূহ পূর্ণ রয়েছে।

মালিকুল মুলক মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সে সতর্ক হচ্ছে না। ধোপা যেমন কাপড়কে ধারাবাহিক মসিবতের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তায়ালাও তদ্রূপ তাকে ধারাবাহিক মসিবতে ফেলেন। কাপড়কে কষ্ট দেওয়া ধোপার উদ্দেশ্য ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা। তদ্রূপ এইসব মসিবতে ফেলে বান্দাকে উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা আল্লাহর উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে তাকে মসিবতের পর মসিবতে ফেলতে থাকেন। কখনো অসহায়ত্ব নির্ধারণ করে, কখনো শত্রুর ভয় নির্ধারণ করে, কখনো দারিদ্র্য ও অনাহার নির্ধারণ করে, কখনো দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি নির্ধারণ করে, কখনো প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়ে এবং কখনো মৃত্যু নির্ধারণ করে। এই-সকল বিষয় এজন্য যে, তার অন্তরে যে ময়লা-আবর্জনা রয়েছে তা দূরীভূত করা

এবং কলবে আল্লাহমুখিতা ও নূর সৃষ্টি করা। এগুলো যখন হয়ে যাবে তখন মাকামে কারীমে পৌঁছে দেওয়া হবে।

যাই হোক, আমার আলোচনার সার-নির্যাস এই যে, নিয়ামত হোক বা মসিবত হোক উভয় ধারাই মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। আর পরীক্ষা এজন্য নয় যে, ইতোপূর্বে সে বিষয়ে আল্লাহর ইলম ছিল না (নাউজুবিল্লাহ)। অবশ্যই পূর্ব হতে সবকিছুই আল্লাহর ইলমে ছিল। আল্লাহর ইলমে থাকা বিষয়গুলো প্রকাশ করার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, আমি কী করেছিলাম এবং আল্লাহ আমার সাথে কী করেছেন। মসিবত ও বিপদাপদ দেখে মানুষ মনে করে হয়তো আমার সাথে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে; কিন্তু তার অন্তরে যদি সঠিক চিন্তা ও মস্তিষ্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকে তবে সে বলতে বাধ্য হবে যে, আমার সাথে অন্যায় আচরণ নয় বরং আমার মল্যাণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমাকে সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য বিধায় আমাকে মসিবতের গহ্বরে ফেলেছেন।

একজন সার্জনের কাজ

উপরোক্ত বিষয়ের হুবহু উদাহরণ হলো এমন– ধরুন একটি শিশুর ফোড়া-পাঁচড়া হল। আপনি ডাক্তার ডেকে তার চিকিৎসা করালেন। কিছু ওষুধপত্র ব্যবহার করায় সামান্য এ রোগ ভাল হয়ে গেল। কিন্তু রোগটি যদি সাম্য ফোড়া-পাঁচড়া না হয়ে টিউমার হতো তাহলে ডাক্তার সাহেব বলতেন যে, অপারেশন করতে হবে। আপনি তাকে অপারেশন করতে বলতেন। ডাক্তার অস্ত্রোপচার শুরু করল। শিশুটি কান্না শুরু করে দিল এবং ধারণা করতে লাগল– হয়তো বাবার সাথে আমার সক্রতার সৃষ্টি হয়েছে, জলজ্যান্ত আমার চামড়া কাটাচ্ছে! ওদিকে পিতা ডাক্তারকে বলছেন, ডাক্তার সাহেব! একটু গভীর পর্যন্ত কেটে সমূলে উৎপাটন করুন, দুদিন পরে আবার যেন না হয়। এমন অপারেশন করুন যেন একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। ডাক্তার গভীর পর্যন্ত কেটে ক্ষতিগ্রস্ত সকল গোশত সরিয়ে ফেলতে লাগলো আর শিশুটি চিৎকার করতে লাগলো যে, বাবা তো কসাই হয়ে গেছে, তার মধ্যে আর কোনো দয়ামায়া অবশিষ্ট নেই। কিন্তু পিতা সন্তানের কোনো ফরিয়াদে কর্ণপাত করছে না।

অপারেশন শেষে পিতা ডাক্তারকে ফিও দেয় এবং তার শুকরিয়াও আদায় করে। শিশুটি এতে আরো অসন্তুষ্ট হয়। আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করে কষ্ট দিল তারপরও আবার তার শুকরিয়া আদায় করা হচ্ছে।

কিন্তু জখম যখন ভাল হয়ে যায় এবং শিশুটির জ্ঞানবুদ্ধি হয় তখন সে পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। বলে, আপনি যদি অপারেশন না করাতেন তাহলে জীবন নিয়ে আশঙ্কা থাকত। যদি অপারেশন করে মূল উৎপাটন করা না হতো তবে তা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়তো। মূল থেকে শাখা-প্রশাখা ছড়াতে ছড়াতে সারা দেহে ছড়িয়ে গিয়ে মৃত্যুর কারণ হতো। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অপারেশন ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

ঠিক অদ্রূপ আমাদের রূহের ভেতরে যখন গুনাহের ফোড়া-পাঁচড়া ও দুষ্কর্মের টিউমার তৈরি হয় আল্লাহ তায়ালা তখন অপারেশন করেন, অস্ত্রোপচার করেন। এই মসিবতরাজি মূলত অপারেশন। এর দ্বারা গুনাহের দুষিত মূল উৎপাটন করা হয়।

মসিবতের মাধ্যমে চরিত্র সংশোধন

বালা-মসিবতের মাধ্যমে রূহের মধ্যে প্রোথিত গুনাহের মূল উৎপাটন করা হয়। এ কারণেই মানুষ যখন মসিবতে পতিত হয় তখন তার চরিত্র শুদ্ধ হয়ে যায়। যখন আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-ফুর্তির আধিক্য হয় তখন মানুষের মধ্যে অমুখাপেক্ষিতা চলে আসে এবং ঐশ্বর্য-হেতু অহংকার বেড়ে যায়। এর চিকিৎসারস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা কিছু নিয়ামত ছিনে নিয়ে তাকে সতর্ক করেন। যদি জ্ঞানী হয় তবে দ্রুত সতর্ক হয়ে তওবা করে নেয়। সতর্ক করার উদ্দেশ্য ছিল তাকে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা, উদ্দেশ্য যখন সফল হয়ে যায় তখন আল্লাহ তায়ালা পুনরায় সে নিয়ামত তাকে ফিরিয়ে দেন। তবে ব্যক্তি যদি আল্লাহর দিকে রুজু না হয় তবে তার জন্য অন্য মসিবত এসে উপস্থিত হয়। এই সকল মসিবত মূলত বান্দার জন্য অপারেশন। শুভ পরিণতির বিবেচনায় এ মসিবতরাজি কল্যাণকর। মসিবতের অপারেশন দ্বারা আল্লাহ তায়ালা দুষিত মূলসমূহ অপসারণ করেন।

এ আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল– যদি মসিবত আসে; আর মসিবতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মসিবত হলো প্রিয়জনের মৃত্যু; এ মসিবত যদি কারো ঘরে আসে তবে মানুষ যেন এ কথা মনে না করে যে, এর দ্বারা আমাকে কষ্ট দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে কল্যাণ ও বরকতের বিষয় এবং সতর্কীকরণ ও উপদেশ প্রদানের উপকরণ।

আপনি চিন্তা করে দেখুন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, ঘরে কেউ মারা গেলে অন্তরে এমন আল্লাহমুখিতা তৈরি হয় যে, পৃথিবীর অসারতা ও

ক্ষণস্থায়িত্ব সকলের সামনে ভাস্বর হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেরই উপলব্ধি আসে যে, এসব কিছুই আমার জন্যও আসছে। এ পথ আমাকেও অতিক্রম করতে হবে। যে নিশ্চিন্ত মনোভাব ও অহঙ্কার-অহমিকা ছিল তা আপনা আপনি হ্রাস পায়। দীর্ঘদিন মুজাহাদা করার দ্বারাও অন্তরের ঐ অবস্থা তৈরি হয় না যা একটি জানাজা সামনে নিয়ে হয়।

আল্লাহ তায়ালা জীবন ও মৃত্যুর ব্যবস্থা এ জন্য রেখেছেন যে, যাতে করে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার গুণ তৈরি হয় এবং অন্তরের উদাসীনতা দূর হয়।

মৃত্যুর উদ্দেশ্য

প্রিয়জনের মৃত্যুর পর কেউ যদি কান্নাকাটি করতে লেগে যায় এবং মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করে দিনরাত কাঁদে, তাতে না মৃত ব্যক্তির কোনো উপকার হবে, না তার নিজের কোনো উপকার হবে। মৃত্যুর ব্যবস্থা এজন্য করা হয়েছিল যে, তা দেখে মানুষ নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, এমন নয় যে, অন্যের মৃত্যু দেখে তাই নিয়ে বিভোর হয়ে থকবে। সুতরাং মৃত্যুর মুল উদ্দেশ্য এই যে, এর দ্বারা মানুষ শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে এবং নিজের শেষ সময়ের কথা চিন্তা করে এমন উপকরণ প্রস্তুত করবে যা আমাদের জন্যও উপকারী হবে এবং মৃত ব্যক্তির জন্যও উপকারী হবে। যথা কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। কুরআন তিলাওয়াত করার দ্বারা মৃত ব্যক্তিরও উপকার হবে এবং আপনার কলবও প্রশান্তি পাবে। আর তার জন্য উত্তমতর ব্যবস্থা হলো এই দোয়া যা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ.

> অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কখনো শত্রুদের ভয় সৃষ্টি করে, কখনো ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নির্ধারণ করে, কখনো সম্পদ ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে এবং কখনো জীবনকে কমিয়ে দেবার মাধ্যমে অর্থাৎ মৃত্যু নির্ধারণ করে। [বাকারা ২ : ১৫৫]

জানা গেল, আল্লাহ তায়ালা নানাভাবে মানুষকে পরীক্ষা করবেন।

সান্ত্বনা লাভের দোয়া

নানা ধরনের মসিবতের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন, এইসব মসিবতের পর যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে তার জন্য রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহ বলেনঃ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ আপনি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দান করুন।

ধৈর্যশীল হলেন তারা, যাদের উপর মসিবত অর্পিত হওয়ার পর সান্ত্বনা লাভের দোয়া পড়েন। সে দোয়া হলো এইঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহরই সান্নিধ্যে চলে যাব। [বাকারা ২ : ১৫৬]

বিবেকজাত সান্ত্বনা

'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' দোয়ার মধ্যে কিভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে? আমরা লক্ষ করলে দেখব, আয়াতে দুটি বাক্য রয়েছে। একটি হলো 'ইন্না লিল্লাহি' আরেকটি 'ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। প্রথম বাক্য 'ইন্না লিল্লাহ'-এর অর্থ হলো আমরা সবাই আল্লাহর জন্য। অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের মালিক। এ ধারণা যখন অন্তরে বদ্ধমূল হবে তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, অধীনের উপর মালিক যে-কোনো রকমের হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখেন। মালিক যদি নিজের জিনিসকে উপরে রাখতে চান সে অধিকার তার রয়েছে, যদি চান যে নীচের কক্ষে রেখে দেবেন সে অধিকারও তার রয়েছে। আর যদি চান যে, আমার জিনিস আমি মাটির নীচে রেখে দেব তবে সে অধিকারও তার রয়েছে। যখন আল্লাহ আমাদের মালিক এবং আমরা তাঁর অধীন, তখন তিনি আমাদেরকে জমিনের উপর রাখতে চাইলে সে অধিকারও তাঁর রয়েছে এবং জমিনের নীচে কবরে পৌছাতে চাইলে সে অধিকারও তাঁর রয়েছে। কবরের পরে অন্য কোনো জগতে প্রেরণ করতে চাইলে সে অধিকারও তিনি সংরক্ষণ করেন।

সুতরাং প্রথম অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর 'মালিক' হওয়ার ধারণা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ তিনি মালিক আর আমরা তাঁর অধীন, তিনি মনিব আর আমরা তাঁর গোলাম। আর মালিকের অধিকার রয়েছে তাঁর অধীনের উপর যে-কোনো রকমের হস্তক্ষেপ করার। এ বিশ্বাস অর্জনের পর বিবেকজাত ধৈর্য মানুষের মধ্যে এসে গেল। বিবেক বুঝিয়ে দিল যে, তুমি যেহেতু তাঁর অধীন সেহেতু হা-হুতাশ

করার কী মানে থাকতে পারে? তিনি মালিক। অধীনের উপর হস্তক্ষেপ তিনি করতেই পারেন। সুতরাং এভাবে বিবেকজাত সবর অর্জিত হল।

স্বভাবজাত সান্ত্বনা

বিবেকজাত সান্ত্বনা অর্জিত হবার পরও স্বভাবজাত দুঃখ থেকে যায়। বিবেক মেনে নেয় যে, এ ব্যক্তি যেহেতু আল্লাহর অধীন ছিল সেহেতু মালিক তার অধীনের উপর হস্তক্ষেপ করেছেন, বান্দাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। তবে স্বভাবজাত কারণে কান্নার আবেগ এখনও বিদ্যমান। এ আবেগ নিরসনকল্পে পরবর্তী বাক্যটি রাখা হয়েছে– 'ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। অর্থাৎ আমরা সকলেই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তনশীল। এর মধ্যে এ কথা বলা হয়েছে যে, সে যেখানে গিয়েছে তোমরাও সেখানে গিয়ে পৌছবে। এতে বিমর্ষ হবার কী আছে? এতো কয়েকদিনের বিচ্ছেদ মাত্র। এরপর তোমরা উভয়ে একই জায়গায় অবস্থান করবে।

যদি আমাদের কোনো প্রিয়জন সফরে যায় কিংবা চাকরির কারণে হাজার মাইল দূরে চলে যায়; কখনো এমনও হয় যে, দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত দেখা-সাক্ষাৎ হয় না– এতেও কিন্তু আমরা শোক-মাতম করার মতো বিমর্ষ হয়ে পড়ি না। কারণ, আমরা জানি যে, সময় হলে চলে আসবে। সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এই সম্ভাবনার কারণে বিচ্ছেদ বেদনা হালকা হয়ে যায়। আর মৃত্যুর ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্ভাবনার নয় বরং দৃঢ় নিশ্চয়তার। এটা সুনিশ্চিৎ যে, সে যেখানে গিয়েছে আমরাও সেখানে যাব। সম্ভাবনার দ্বারা যদি সবুর এসে যায় তবে দৃঢ়নিশ্চয়তা দ্বারা কেন আসবে না? সুতরাং 'ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' দ্বারা স্বভাবজাত দুঃখ বেদনা লাঘব হয়। বিবেক ও স্বভাব উভয়ে বলে দেয় যে, পেরেশান হবার প্রয়োজন নেই। যা ঘটেছে তা তোমার বেলায়ও ঘটবে। সুতরাং এই পবিত্র আয়াত ও দোয়াটি আমাদের জন্য এক মহান শিক্ষা উপস্থাপন করেছে।

এ কারণেই হাদিস শরীফে এসেছে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, যদি সামান্য কোনো মসিবতও অর্পিত হয় তবে সাথে সাথে বল– اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ সুতরাং কারো মৃত্যুর বেলায়ই কেবল এ দোয়া পড়া হয় না বরং মাত্র এক পয়সা হারিয়ে গেলেও এ দোয়া পড়বে, কোনো পোশাক হারিয়ে গেলেও এ দোয়া পড়।

সান্ত্বনার দোয়াটির প্রভাবঃ হযরত জাবের রা.-এর ঘটনা

এই দোয়াটির বরকতে ধৈর্যও অর্জিত হয়, মালিকের প্রতি মনোযোগও আসে এবং বিনিময়ও লাভ হয়। এ বিনিময় নিয়ামতের বিনিময়। এই হলো অত্র দোয়াটির বৈশিষ্ট্য।

মোটকথা, বিপদাপদ ও মসিবতে পড়ে হা-হুতাশ ও শোক-মাতম করার দ্বারা কিছুই হাসিল হয় না, ধৈর্যধারণ করার দ্বারা নিজেও উপকৃত হয়, অন্যরাও উপকৃত হয়।

সাহাবী হযরত জাবের রা.-এর আট নয় বছরের একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি খুব সুশ্রী, সুগঠিত ও আকর্ষণীয় ছিল। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, সন্তানকে ঘিরেই বাবামার আশা ও স্বপ্ন থাকে। তাদের জীবনের নির্ভরতা ও আশ্রয় হয়ে থাকে সন্তান। মোটকথা, হযরত জাবের রা. ও তাঁর স্ত্রী মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাকে নিয়ে তাদের অনেক স্বপ্ন ও আশা ছিল। এই মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত জাবের রা. সে যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসা করলেন, কিন্তু অসুখ বাড়তে রইল। এ অবস্থায় জরুরি এক প্রয়োজনে হযরত জাবের রা.-এর দু'এক দিনের জন্য সফরে যেতে হল। অত্যন্ত জরুরি ছিল বিধায় অসুস্থ মেয়েকে রেখে সফরে যেতে বাধ্য হলেন। স্ত্রীকে বলে গেলেন, মেয়েটির পরিপূর্ণরূপে যত্ন নেবে এবং চিকিৎসায় কোনো প্রকার ত্রুটি করবে না, পরশু নাগাদ আমি চলে আসব ইনশা আল্লাহ। হযরত জাবের রা. বেরিয়ে গেলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে; যেদিন তাঁর ফিরে আসার দিন ছিল, সেদিনই মেয়েটির ইন্তেকাল হয়ে গেল। তাঁর স্ত্রীও সাহাবী ছিলেন, আউলিয়াদের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত নারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সন্তানের মৃতদেহ একটি কক্ষে চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে বাইরে এসে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত জাবের রা. ফিরে এলেন। আরবদের প্রথা অনুযায়ী স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে স্বামীকে বরণ করলেন, মুসাফাহা করে হযরত জাবের রা.-এর হাতে চুম্বন করলেন। প্রথমেই হযরত জাবের রা. জানতে চাইলেন, মেয়ে কেমন আছে? তাঁর স্ত্রী উত্তরে বললেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِعَافِيَةٍ وَ خَيْرٍ

অর্থাৎ আল্লাহর শুকরিয়া, সে অত্যন্ত নিরাপদ ও ভাল আছে। ভয়ের কিছু নেই। এ কথা শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। স্ত্রী তাকে খাবার পরিবেশন করলেন।

খাবার পরিবেশনরত অবস্থায় তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনার কাছে আমার শরীয়তের একটি মাসয়ালা জানার আছে। সে মাসয়ালা এই যে, কেউ যদি আমাদের কাছে আমানত রাখে এবং সময়কাল নির্ধারণ করে দেয় যে, এত বছর বা এত দিন পর

জিনিস বা টাকা পয়সা সে ফেরত নেবে, তখন আমাদের কী করণীয়? হযরত জাবের রা. বললেন, নির্ধারিত দিনে সে আমানত ফিরিয়ে দেওয়া কর্তব্য। স্ত্রী বললেন, যদি আমরা দিতে দেরি করি এবং নানা বাহানা শুরু করি? জাবের রা. বললেন, এমন করার অধিকার আমাদের নেই। এমন করা হলে তা হবে আমানতদারীর পরিপন্থী, আমানতের খেয়ানত।

হযরত জাবের রা.-এর স্ত্রী পুনরায় বললেন, মনে করুন আমরা সময় মতো তার আমানত ফিরিয়ে দিলাম, কিন্তু মনে মনে আক্ষেপ করতে লাগলাম– কেন ফিরিয়ে দিলাম! যদি রেখে দিতাম!

উত্তরে জাবের রা. বললেন, আক্ষেপ করার কী অধিকার তোমার আছে? সে জিনিস তো তোমার নয়। নিজের জিনিস নিয়ে মানুষ আক্ষেপ করে থাকে। অন্যের জিনিসের ব্যাপারে আক্ষেপ করার অধিকার তোমার কোথায়? বরং শুকরিয়া আদায় করা উচিত যে সঠিক সময়ে আমানত হতে দায়মুক্ত হতে পেরেছ, আমানতের কোনো খেয়ানত হয়নি, যার জিনিস তার হাতে পৌঁছেছে।

স্ত্রী বললেন, এই কি শরীয়তের মাসয়ালা? তিনি বললেন, হ্যাঁ, মাসয়ালা এমনই। এরপর হযরত জাবের রা.-এর স্ত্রী বললেনঃ 'আমাদের মেয়েটি আমাদের কাছে আল্লাহর আমানত ছিল। তিনি ঠিক আট বছর দুই মাসের জন্য আমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। যখন নির্ধারিত সময়কাল পূর্ণ হলো তখন দূত এল এবং বললো, আমার আমানত আমাকে ফিরিয়ে দাও। আমরা ফিরিয়ে দিলাম, এখন কি আমাদের বসে বসে আক্ষেপ করা উচিত? আমাদের কি শোকে বিহ্বল হয়ে পড়া উচিত?'

হযরত জাবের রা. স্ত্রীর হাতে চুম্বন করে বললেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তুমি আমার অন্তরে এমন ধৈর্য তৈরি করিয়েছ যে, এখন আমার শোকের বদলে এই ভেবে খুশি লাগছে যে, আমানত রক্ষকের কাছে আমানত পরিশোধ করা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ে আমরা দায়িত্বমুক্ত হয়েছি এবং মালিকের কাছে আমানত পৌঁছে দিয়েছি।

প্রকৃত বাস্তবতা এই যে, আল্লাহ যখন কাউকে তুলে নেন তখন স্বাভাবিকভাবে দুঃখ ও কষ্ট অবশ্যই হয়। কিন্তু বিবেক ও স্বভাব– উভয়েই একে সাধারণ বিষয় বলে মেনে নিতে প্রস্তুত। বিবেক বলে, নিজের অধীনের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার মালিকের ছিল; স্বভাব বলে, এ তো অল্প ক'দিনের বিচ্ছেদ, তার পর আমরাও ওখানে গিয়ে মিলিত হব। এর দ্বারা মানুষের মধ্যে ধৈর্য ও সান্ত্বনা সৃষ্টি হয়।

সবরের প্রতিদান

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন দোয়াটি আমল করার দ্বারা সবর ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ হওয়ার সাথে সাথে তার জন্য সাওয়াব প্রদানও শুরু হয়ে যায়। সুতরাং দুনিয়াও অর্জিত হলো, আখেরাতও অর্জিত হল। এ কারণেই কারো মৃত্যুর পর আক্ষেপ করতে থাকা কিংবা শোক-মাতম করা অথবা শোককে তাজা রাখার মানসে মৃতব্যক্তির প্রসঙ্গে আলোচনা করা এসবকিছুই শরীয়ত পরিপন্থী। আমাদের জন্য করণীয় হলো মৃত ব্যক্তির অনুপস্থিতিজনিত দুঃখবোধ যখনই আমাদের শোকাভিভূত করবে তখনই ঐসব কাজ করা যা দ্বারা আমরাও উপকৃত হই এবং মৃতব্যক্তিও উপকৃত হয়। সে ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হলো উক্ত দোয়াটি পড়া। দ্বিতীয়ত ইসালে সাওয়াব করা। এ উদ্দেশ্যে কেউ যখন কুরআন তিলাওয়াত করে তখন তিনটি স্বতন্ত্র বিষয় ঘটে– অন্তরে প্রশান্তি আসে, মৃতব্যক্তির জন্য সাওয়াব পৌছে আর তার মর্যাদা উন্নত হয়।

হাদিস শরীফে রয়েছে, মৃতব্যক্তি কবর জগতে গিয়ে সকল আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন ও ছেড়ে যাওয়া ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কে তার জন্য কী করে অধীর আশা নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির সাথে, এক-একটি খড়কুটাকে আশ্রয় করে যে বেঁচে যাওয়ার আশা করতে থাকে। মৃতব্যক্তিরও এমন অবস্থাই হয়ে থাকে। প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয়দের দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে যে, কেউ আমায় স্মরণ করে কি না, কেউ কোনো সাওয়াব পৌছায় কি না!

কবর জগতে নিয়ামতের প্রভাব

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কবর জগতে মৃতব্যক্তিদেরকে সম্মিলিত হওয়ার কিছুটা সময় দেওয়া হয়। যাদের কাছে বেশি বেশি সাওয়াব পৌছে তারা এ সমাবেশে গর্ব করে বেড়ায় যে, আমার প্রিয়জনেরা আমাকে স্মরণ করছে। এ দেখে অন্যেরা আফসোস করতে থাকে– যদি এমন প্রিয়জন আমার থাকত তবে তারা আমাকে স্মরণ করত! সে লজ্জিত হয়, শরমেন্দা হয়। আর অধিক সাওয়াব পাওয়া ব্যক্তির মাথা উঁচু হয়ে যায়। পৃথিবীতে যেমন অধিক নিয়ামত পাওয়া ব্যক্তির মাথা উঁচু থাকে, মসিবতগ্রস্তের থাকে নিচু, কবর জগতেও একই অবস্থা বিদ্যমান। পার্থক্য শুধু এই, ওখানে নিয়ামত বা মসিবত কামাই করার সুযোগ নেই, এখান থেকে পাঠাতে হয় কিংবা এখানের কর্মফল সাথ থাকে। যাই হোক,

মৃতব্যক্তির জন্য কেউ যদি সাওয়াব পৌছাবার ব্যবস্থা করে তাহলে গর্বে তার মাথা উঁচু হয়ে যায় এবং সে অন্যদেরকে বলতে থাকে যে, তোমাদের প্রিয়জনরা তো কিছুই পাঠাচ্ছে না। সুতরাং এই হলো সেই জিনিস যা দ্বারা নিজের আত্মায়ও প্রশান্তি আসে এবং মৃত ব্যক্তিও উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে শুধু কান্নাকাটি করা কিংবা শোকে বিহ্বল হয়ে থাকা আমাদের জন্যও কষ্টদায়ক এবং মৃতব্যক্তির জন্যও কষ্টদায়ক। না তার জন্য উপকারী না আমাদের জন্য উপকারী।

মৃতব্যক্তি ও স্বজনদের পারস্পরিক উপকার

এ কথাগুলো আমি এ কারণে আরজ করলাম যে, অত্র পরিবারে এক বছরে দুটি শোকের ঘটনা ঘটেছে। একটি হলো মরহুম বাওয়ানী সাহেবের উন্তেকাল, আরেকটি হলো তার জামাতা ভাই সাত্তার সাহেবের ইন্তেকাল❖। প্রকৃতপক্ষে এ এক কঠিন শোক, একই বছরে দুই ঘরের দুই প্রধান ব্যক্তির চলে যাওয়া কম কষ্টের বিষয় নয়; কিন্তু শোক ও দুঃখ যাতনা যত অধিক হয় মানুষ ইচ্ছা করলে তার দ্বারা ততোধিক আখেরাত কামাই করে নিতে পারে। যত ব্যাপক শোক ও দুঃখ-যাতনায় অন্তর জর্জরিত হবে, সবরও তত ব্যাপক হবে এবং সাওয়াবও তত অধিক হবে।

সবরের সময়

ধৈর্যধারণ বা সবর করা সঠিক সময়ে হতে হবে। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তো প্রত্যেকের মধ্যেই সবর এসে যায়। এ সবর বিনিময় বা সাওয়াবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। ঐ সবরই কেবল বিনিময়ের যোগ্য বিবেচিত হয় যা মসিবতের বিপরীতে স্বেচ্ছায় করা হয়।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এক বৃদ্ধার যুবক ছেলের ইন্তেকাল হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে যাচ্ছিলেন। বৃদ্ধা বিলাপ করছিল আর চিৎকার করে কাঁদছিল। পুত্রশোকে আত্মনিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধাকে সম্মানের সাথে সম্বোধন করে বললেন, ধৈর্যধারণ করুন, এটাই আল্লাহ তায়ালা মঞ্জুর করেছিলেন, সবর করুন।

❖ যাদের ইন্তেকাল উপলক্ষে হযরত এ বয়ান রেখেছিলেন।

আবেগের বশবর্তী হয়ে বৃদ্ধা বলল, 'আপনার উপর এমন মসিবত এলে আপনি বুঝতে পারতেন। আমার কষ্ট আমি বুঝি। আমার তরতাজা যুবক ছেলেটি মারা গেছে আর আপনি আমাকে সবর করতে বলছেন।' ইনিই যে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ঐ বৃদ্ধা জানতো না। সে তার মতো করে জবাব দিয়ে দিল এবং জানিয়ে দিল যে, আমার দ্বারা সবর সম্ভব নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছা কর, এই বলে তিনি তাঁর পথে চলে গেলেন।

পরবর্তীতে বৃদ্ধা যখন জানতে পাল যে, তাকে যিনি সবর করার কথা বলেছিলেন তিনি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন সে লজ্জিত ও পেরেশান হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করতে ছুটল। মসজিদে নববীতে গিয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বুঝতে পারিনি যে আপনি আমাকে সবরের তালিম দিচ্ছিলেন। এখন আমি সবর করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى

দুঃখ-যাতনার সূচনালগ্নের সবরই হলো প্রকৃত সবর।

সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যে সবর করা হয় তাতো অপারগতা হেতু বাধ্যতামূলক সবর। এর জন্য বিনিময় ও সাওয়াব থাকে না। মানুষ যখন শোক, দুঃখ ও মসিবতে নিমজ্জিত হয় তখন যদি ধৈর্যধারণ করে এবং স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি রুজু হয় তবেই তা সবর বলে গণ্য হয়।

যাই হোক, অত্র পরিবারের উপর অর্পিত এত বড় এই আঘাতের শোকও নিশ্চয়ই অনেক বেশি। এই শোকে যত অধিক সবর করা যাবে বিনিময় ও সাওয়াবও তত অধিক মিলবে।

সম্মিলিত শোক

এখানে আরেকটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য যে, যখন বড় কোনো ব্যক্তিত্বের ইন্তেকাল হয় তখন তা কেবল একটি পরিবারের শোকের বিষয় হয় না, হাজারোজনের বিষয় হয়ে থাকে। মরহুম বাওয়ানী সাহেবের তো বাস্তব অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি বহু লোকের অভিভাবকে পরিণত হয়েছিলেন। বহুজনের পিতায় পরিণত হয়েছিলেন। হাজারো লোক তার দ্বারা উপকৃত হতো। এ কারণেই শুনেছি যে, তার জানাজায় লোকের ঢল নেমেছিল। জানাজায় এমন

লোকসমাগম খুব কমই হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, প্রত্যেকেই তার অনুগ্রহে আবদ্ধ ছিল। কেউ আখলাকের, কেউ সম্পদের, কেউ পুরস্কারের কিংবা কেউ সাহায্য-সহযোগিতার অনুগ্রহে আবদ্ধ ছিল। তো এমন ব্যক্তির জন্য যে শোক তা কোনো একটি খান্দানের বা একটি পরিবারের শোক নয়, পুরো দেশের শোক হয়ে থাকে, পুরো শহরের শোক হয়ে থাকে।

সুতরাং শোকের জন্য যখন বহু লোক থাকে তখন দু'চার পরিবারের জন্য আবশ্যক নয় যে, তারা শোকে নিমজ্জিত হয়ে থাকবে। তারা বলবে, আমাদের শোক তো সকলে ভাগ করে নিয়েছে, সবাই মিলে দূর করে দিয়েছে। সুতরাং বাস্তবতা হলো এই যে, সবাই শোকাভিভূত।

উত্তম মানুষ

যে ধরনের ব্যক্তিবর্গ দ্বারা অন্য মানুষ উপকৃত হয় তাদেরকে উত্তম সৃষ্টি ও উত্তম মানুষ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

خير الناس من ينفع الناس

উত্তম মানুষ হলো ঐ ব্যক্তি যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়।

আরো বর্ণিত হয়েছে, উত্তমতর মানুষ হলো ঐ ব্যক্তি যিনি مِفْتَاحٌ لِلْخَيْرِ এবং مِغْلَاقٌ لِلشَّرِّ অর্থাৎ তার দ্বারা কল্যাণকর বিষয়ের দরোজা উন্মুক্ত হয় এবং অকল্যাণকর বিষয়ের দরোজা বন্ধ হয়। তারা পৃথিবীতে খারাপ ও অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করেন এবং ভাল ও কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে এরা সমগ্র পৃথিবীর অভিভাবক হয়ে যান। এ কারণেই তাদের শোকে পুরো পৃথিবী শোকাতুর হয়ে পড়ে।

যা হোক, মরহুম বাওয়ানী সাহেব ও মরহুম সাত্তার ভাই সাহেব মূলত এমন লোক ছিলেন, যাদের সম্পদ দ্বারাও লোকজন উপকৃত হতো এবং দীন দ্বারাও লোকজন উপকৃত হতো। সাত্তার ভাইকে আমি দিনরাত তাবলিগের কাজে মগ্ন থাকতে দেখেছি; কখনো ঢাকায় যাচ্ছেন, কখনো এদিক যাচ্ছে, কখনো সেদিক যাচ্ছেন; দীনের প্রচারের জন্য তার অন্তরে যেন সার্বক্ষণিক এক জযবা বিদ্যমান ছিল। তার আওয়াজ যে পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেখানের লোকজন তার দীন দ্বারা উপকৃত হয়েছে। সুতরাং একজন তার দীনদারী দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেছেন, অন্যজন সম্পদ দ্বারা উপকৃত করেছেন। উভয়ে 'খায়রুন নাস' বা সর্বোত্তম মানুষ-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমন ব্যক্তিদের চলে যাওয়া দ্বারা কষ্টও নিশ্চয়ই

অধিক হয়ে থাকে। তবে এ ধরনের শোকমুহূর্তে যত অধিক ধৈর্য ও সহ্যের পরিচয় দেওয়া যাবে তার জন্য প্রতিদানও তত বৃহৎ হবে। কোনো এক কবি বলেছেন:

یاد داری وقت زادن تو ہمہ خنداں تو گریاں

آنچنان زی کہ وقتِ مردنِ تو ہمہ گریاں تو خنداں

প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে,
কেঁদেছিলে তুমি একা হেসেছিল সবে।
এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

কান্নার হাকিকত

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ হাসতে হাসতে বিদায় নেন। তার আপনজনেরা কাঁদেন। কিন্তু এ কান্না প্রকৃতপক্ষে তার মৃত্যুর জন্য নয়; বরং তার থেকে যে উপকার সাধিত হতো তা হতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য। মৃত ব্যক্তি তো উন্নততর অবস্থানে পৌঁছে যান, আর উন্নত অবস্থানে পৌঁছানো তো শোকের বিষয় নয়। এ কারণেই কারো ইন্তেকাল যখন কোনো পবিত্র সময়ে হয়, যেমন রমজান মাসে ইন্তেকাল হলো, তখন এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয় যে, দুঃখ করার কী আছে, বরং খুশি হওয়া উচিত যে, মৃত্যুর জন্য অতি সুন্দর এক সময় নসিব হয়েছে। কারো উনতেকাল যদি কোনো পবিত্র স্থানে যথা মক্কা মুকার্‌রমা বা মদিনা মুনাওয়ারায় হয় (زاد هما الله شرفا وكرامة) তাহলে লোকজন তার পরিবারকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, দুঃখ করার কিছু নেই বরং খুশি হও যে পবিত্র স্থানে মৃত্যু নসিব হয়েছে, পবিত্র মদিনার জমিন তাকে কবুল করেছে।

বোঝা গেল, মৃত্যু শোকের বিষয় নয়। মৃত্যুর জন্য কেউ দুঃখ করে না বা কাঁদে না। কাঁদে তার বিচ্ছেদের কারণে, আমাদের থেকে তিনি হারিয়ে যাওয়ার কারণে। মরহুম বাওয়ানী সাহেব আজ আমাদের মাঝে নেই, তার ইন্তেকাল হয়েছে। মৃত্যু আমাদেরও আসবে, এখানে যারা আছি সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে, এর জন্য কান্নার কী আছে? বরং এ কারণে খুশি হওয়া উচিত যে এক অতি উত্তম জীবন-যাপন করে ইনশাআল্লাহ এক উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এটা আমাদের জন্য খুশির বিষয়। এই যে শোক ও কান্নাকাটি তা

তার বিচ্ছেদের জন্য। আমাদের একজন প্রিয়জন আমাদের থেকে চির আড়াল হয়ে গেলেন। প্রকৃত কথা হলো মানুষ নিজের স্বার্থ ও নিজের উপকার সাধন হতে বঞ্চিত হওয়ার কথা বিবেচনা করেই কাঁদে। মৃতব্যক্তির পরিণাম দেখে খুশি হয়, সুন্দরভাবে একটি জীবনের সমাপ্তি হয়েছে।

হঠাৎ মৃত্যু

আমি শুনেছি, মরহুম বাওয়ানী সাহেবের হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে, তিনি হার্টফেল করেছেন। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

مَوْتُ الْفُجَاءَةِ... الخ

হঠাৎ মৃত্যু কাফেরের জন্য আযাবস্বরূপ আর মুমিনের জন্য রহমতস্বরূপ।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণী দ্বারা নিশ্চিং বোঝা যাচ্ছে যে, তার উপর রহমত বর্ষিত হয়েছে। কারণ, আলহামদুলিল্লাহ তিনি মুমিন ও মুসলিম ছিলেন। আর মুসলিমের উপর যখন হঠাৎ মৃত্যু আপতিত হয় তখন তা রহমত হয়ে থাকে। সুতরাং রহমত যখন তাকে কবুল করে নিয়েছে তখন এ মৃত্যু তো খুশির মৃত্যু প্রমাণিত হল। তবে তিনি আমাদের আড়ালে চলে গেছেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন বলে আমাদের কষ্ট হচ্ছে। এ বিচ্ছেদের সময়ে আমাদের করণীয় হলো তার জন্য ইসালে সাওয়াব করা। তাকে যদি আমরা স্মরণ করি তবে তিনি আমাদের কাছে থাকবেন এবং আমরাও তার কাছে থাকব। কখনো কখনো আমরা তার কবর যিয়ারত করব।

কবর যিয়ারতের আদব

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কবর যিয়ারতের আদবসমূহের মধ্য হতে একটি আদব এই যে, যিয়ারতকারী কিবলার দিকে পিঠ রেখে মাইয়েতের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। এ কারণে যে, মৃতব্যক্তি তাকে দেখে এবং চিনতে পারে। পৃথিবীর চেনা-পরিচয় বরযখেও থাকে। অতীতের ইলম নিঃশেষ হয়ে যায় না বা ছিনে নেওয়া হয় না। যে আবেগ-ঘনিষ্ঠতা ও জানাপরিচয় পৃথিবীতে ছিল তা সেখানেও বলবৎ থাকে। যার সাথে যেমন সম্পর্ক ছিল, যেমন জানাশোনা ও পরিচয় ছিল তা তেমনই থাকে। এ সম্পর্ককে বজায় রাখা ও সম্পর্কের দায়িত্ব আদায় করার পদ্ধতি হলো এই– নিজের দোয়ার মধ্যে স্বীয় প্রিয়জন, আপনজনকে স্মরণ করতে হবে এবং ইসালে সাওয়াবের জায়েজ পদ্ধতি

অবলম্বন করে তাদের উপকার সাধন করতে হবে। এতে মৃতব্যক্তিও উপকৃত হবে এবং জীবিত ব্যক্তিগণও সান্ত্বনা লাভ করবে।

আজ এ পর্যন্তই আলোচনার সমাপ্তি টানছি। আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন এবং সকলের জন্য উপকারী করুন। আমিন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْلَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَافِيَتَنَا فِى الْأُمُوْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الأٰخِرَةِ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

বয়ান : ৬

ইফাদাতে বুখারী– এক

ইমাম বুখারী রহ.-এর সংকলন পদ্ধতি বাস্তবিকই অতি স্বতন্ত্র ও অভিনব। তাঁর অন্তর ও কলব যে স্তরে উপনীত হয়েছে অন্যরা সেথায় পৌঁছতে সক্ষম হননি। ইমাম বুখারী রহ.-এর জালালী শান ও কামালাতের দাবিই ছিল এই যে, তাঁর কিতাবও তদ্রূপ কামালাত দ্বারা পরিপূর্ণ হবে, আর হয়েছেও তাই।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا. صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِه وَصَحْبِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. اَمَّابَعْدُ، فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

বাবসমূহের মধ্যে সংযোগ-সম্পর্ক

[كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمَانِ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ.]

এ হাদিসখানা বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদিস। ইমাম হুমাম রহ. অত্র হাদিসখানার মাধ্যমে স্বীয় কিতাব সমাপ্ত করেছেন। প্রথমে ইমাম সাহেবের

সংকলন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ করুন, চমৎকার এক পদ্ধতিতে সূচনা করেছেন এবং সামাপ্তও করেছেন চমৎকারভাবে। মুহাদ্দিসীনে কেরামের সাধারণ রীতি হলো, তাঁরা যখন জামে* [হাদিস গ্রন্থের একটি প্রকার] সংকলন করেন তখন তাঁরা 'কিতাবুল ঈমান' দ্বারা শুরু করেন এবং তারপর অন্যান্য বাব সংকলন করেন। আর যখন সুনান [হাদিস গ্রন্থের একটি প্রকার] সংকলন করেন তখন 'কিতাবুত ত্বহারাত' দ্বারা শুরু করেন, অতঃপর নামাজ, যাকাত, হজ প্রভৃতি অধ্যায় নিয়ে আসেন। সুতরাং 'জামে'-এর একটি সংকলন পদ্ধতি রয়েছে এবং সুনানেরও একটি সংকলন পদ্ধতি রয়েছে।

ওহী দ্বারা সূচনা করার কারণ

[যেহেতু বুখারী শরীফ হাদিস গ্রন্থের শ্রেণী অনুযায়ী 'জামে' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু মুহাদ্দিসীনে কেরামের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এর সূচনা 'কিতাবুল ঈমান' দ্বারা হওয়া উচিত ছিল] কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. 'কিতাবুল ঈমান' দ্বারা শুরু করার পরিবর্তে بَابُ بَدْءِ الْوَحِيْ অর্থাৎ জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কিভাবে ওহী অবতরণ শুরু হয়েছে তার আলোচনা দ্বারা কিতাব শুরু করেছেন। এর কারণ এই যে, দীনের যত বিষয়াবলি রয়েছে প্রকৃতপক্ষে তার মূল ভিত্তি হলো ওহী। শরীয়তের ভিত্তি হলো ওহী। এই ভিত্তির নানা শাখা রয়েছে। কোনো শাখা কিতাবুল ঈমান, কোনো শাখা কিতাবুস সালাত এবং কোনো শাখা হলো কিতাবুয যাকাত। সুতরাং এ-সবকিছুর মধ্যেই ওহী দেদীপ্যমান। ওহী হলো 'কদরে মুশতারিক' বা যৌগমূল, যার স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। সেই একই ওহী কখনো নামাজরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, কখনো হজ্জরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, আবার সেই ওহীই অনান্য অধ্যায়ে সন্নিবেসিত হয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। মোটকথা, আল্লাহ-প্রদত্ত শরীয়তের মূল ভিত্তি হলো ওহী। এ কারণেই ইমাম বুখারী রহ. সর্বাগ্রে শরীয়তের মূল ভিত্তিকে উপস্থাপন করেছেন, অতঃপর তার শাখা-প্রশাখা উল্লেখ করেছেন।

---

* জামে, সুনান, কিতাব, বাব প্রভৃতি শব্দাবলি হাদিস শাস্ত্রের বিভিন্ন পরিভাষা। যেহেতু অত্র বয়ান খতমে বুখারীর অনুষ্ঠানে আলেম-ওলামা ও ছাত্রদের সামনে প্রদত্ত হয়েছে তাই হাদিসের অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পরিভাষাগুলোর অনুবাদ করা হয়নি। আশা করি এতে সাধারণ পাঠকদের খুব বেশি অসুবিধা হবে না। –অনুবাদক

আমলের ভিত্তি হলো ঈমান

ইমাম বুখারী রহ. সর্বাগ্রে কিতাবুল ঈমানের আলোচনা নিয়ে আসার কারণ এই যে, সমস্ত আমল কবুল হওয়া ঈমানের উপর নির্ভরশীল। ঈমান ছাড়া কোনো আমল কবুল হতে পারে না। ঈমানের উপর সকল আমল নির্ভরশীল বিধায় সর্বপ্রথম কিতাবুল ঈমানকে নিয়ে আসা হয়েছে। এভাবে মানুষের ঈমান অর্জিত হল। ইতিকাদ অর্জিত হল। আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নিল, সবকিছুতে একিন অর্জিত হল।

ইলমের প্রয়োজনীয়তা

একিন অর্জিত হওয়ার পর ইলমের আবশ্যকতা দেখা দেয়। এভাবে যে, যার উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম তা কিভাবে আঞ্জাম দেব? এ কথা স্পষ্ট যে, এর জন্য ইলমের আবশ্যকতা রয়েছে। জাহালাত বা মূর্খতা দ্বারা কোনোকিছু আঞ্জাম দেওয়া যায় না। সুতরাং ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুল ঈমানের পরে কিতাবুল ইলম নিয়ে এসেছেন, যেন ইলমের মাহাত্ম্য ও অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যায়। যেন ব্যক্তির মধ্যে এখন ঈমানও রয়েছে এবং ঈলমও অর্জিত হল।

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

উপরোক্ত দুটি বিষয়ের আলোচনা শেষে ইমাম বুখারী রহ. ইবাদতের আলোচনা শুরু করেছেন, যা মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি মানব ও জিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। [জারিয়াত ৫১ : ৫৬]

সুতরাং মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ইবাদত করবে। ইবাদতের অর্থ হলো আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন। বান্দার সাথে মাবুদের সম্পর্ক কী? ঐ সম্পর্ককে ইবাদত বলা হয় যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করা যায়, আল্লাহ তায়ালার সাথে নৈকট্যশীলতা সৃষ্টি হয়।

ইবাদতের পর মুয়ামালাত

আল্লাহ ও বান্দার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাওয়ার পর বান্দার সাথে বান্দার কী সম্পর্ক সে বিষয়টি এসে যায়। সুতরাং মুয়ামালাতের (লেনদেন) অধ্যায় নিয়ে আসা হয়েছে। যার মধ্যে বিয়েশাদী, ক্রয়-বিক্রয়, দান, মিরাস, ওয়াকফ প্রভৃতি রয়েছে। এসব মুয়ামালাতের বিষয়াবলির পর যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো এই– লেনদেনের এসব বিষয়াবলিকে ফেতনা থেকে রক্ষা করার উপায় কী? সবকিছুই সামনে রয়েছে; কিন্তু ফেতনা এমন প্রবল যে, ওগুলোর উপর আমল করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

জিহাদের আবশ্যকতা

শরীয়ত পালনের পথে যে প্রতিবন্ধকতা ও ফিতনা আরোতি হয় তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করা আবশ্যক হয়। এ কারণেই পূর্বোক্ত আলোচনার পর কিতাবুল মাগাযি নিয়ে আসা হয়েছে। মুজাহিদদের ধরন কেমন হওয়া উচিত তা বুঝানোর জন্য কিতাবুল মাগাযির পর হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর সীরাত আলোচনা করেছেন। এ কারণে যে, এঁরাই ছিলেন প্রকৃত মুজাহিদ, এঁদের অনুকরণে অন্যরা জিহাদ করবে।

আমলের পদ্ধতি

ইলমের উপর আমল করার পদ্ধতি কেমন হবে? স্পষ্ট কথা যে, এ পদ্ধতি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম আদর্শের অনুকরণ। এ কারণেই উপরোক্ত বিষয়াবলির আলোচনা শেষে ইত্তেবায়ে সুন্নাত বা সুন্নাতের অনুকরণের অধ্যায় নিয়ে আসা হয়েছে। কেবল সুন্নাতের অনুকরণের মাধ্যমেই ইলমের উপর আমল করার সৌভাগ্য হবে। ইলমের উপর আমল করা তখনই নসিব হবে যখন ঈমান নসিব হবে। সুতরাং প্রথমে কিতাবুল ঈমান, অতঃপর কিতাবুল ইলম, অতঃপর কিতাবু ইত্তেবায়ে সুন্নাহ নিয়ে আসা হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব

উপরোক্ত সকল বাব ও অধ্যায়াবলিকে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত করে সমাপ্ত করেছেন এবং সবশেষে অত্র হাদিসখানা নিয়ে এসেছেন, যা এখন আপনারা (বুখারী সমাপনকারী ছাত্রগণ) তিলাওয়াত করলেন। মোটকথা, বুখারী রহ.

পার্থিব বিষয়াবলি দ্বারা কিতাব শুরু করে আখেরাতের বিষয়াবলিতে গিয়ে সমাপ্ত করেছেন।

সনদের শ্রেষ্ঠত্ব

পৃথিবীতে মানুষের প্রথম দায়িত্ব ছিল ঈমান গ্রহণ। অতঃপর ইসলাম কবুল করণ, অতঃপর আমল করণ, অতঃপর মুয়ামালাতের যাবতীয় বিষয় আঞ্জাম দেওয়া। এরপর এ প্রশ্ন আসতে পারে যে, ভাই, এতে লাভ কী হবে? এর ফলাফল কী হবে? আমাদের কি কোনো প্রতিদান মিলবে? কোনো বিনিময় কি পাব? এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদানের মানসে অত্র হাদিস দ্বারা কিতাবের সমাপ্তি টেনে দেখিয়েছেন যে, তাসবীহ ও তাহলিল দ্বারা কী ফলাফল লাভ হয় এবং বান্দা কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যায়। সুতরাং পার্থিব জীবন দ্বারা কিতাবের সূচনা করে পরকালের আলোচনার মাধ্যমে সমাপ্ত করেছেন। এ এক অপূর্ব ও দুর্লভ সনদ হলো, যার সূচনায় আল্লাহর নাম; সমাপ্তিতে কেয়ামত, হাশর ও তার ফলাফল এবং মধ্যখানে ইসলামী সকল মুয়ামালাত ও পুরো জিন্দেগীর বয়ান।

সংশ্লিষ্ট হাদিসের বৈশিষ্ট্য

বুখারী শরীফের সর্বশেষ হাদিস, যা একটু আগে তিলাওয়াত করা হলো, যাতে বলা হয়েছে:

كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

এতে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আজিম' তাসবীহ'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসটির মধ্যে এ তাসবীহর তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যার একটি হলো অনুভবযোগ্য, যা কান দ্বারা শোনা যায় এবং মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে। আরেকটি হলো মর্মগত বিষয় এবং অপরটি হলো পরকালীন বিষয়। তো এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

অনুভবযোগ্য প্রথম বৈশিষ্ট্য

প্রথম বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে: خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ অর্থাৎ এ কালিমা দুটি মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ। কালিমা দুটি পাঠ করা কঠিন কিছু নয়। উচ্চারণ

করতে গেলে মুখে কোনো জড়তার সৃষ্টি হয় না। بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ আরবী ভাষা অতি সহজ ও স্পষ্ট। একদিকে বাক্য দুটি আরবী ভাষার মতো অতি সহজ একটি ভাষার বাক্য, অপর দিকে স্বতন্ত্রভাবে বাক্য দুটিও অতিশয় সহজ বাক্য। যা উচ্চারণ করা খুবই সহজ। মুখে কোনো ধরনের জড়তার সৃষ্টি হয় না। অতিশয় মসৃণ দুটি বাক্য:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

আরবী ভাষার ফযিলত

শব্দ দুটি সহজ হওয়ার কারণ এই যে, স্বয়ং আরবী ভাষাই হলো অতি সহজ একটি ভাষা। এ ভাষার শব্দাবলি যেসব সূক্ষ্ম অর্থ ধারণ করে তা এ ভাষার শব্দ প্রয়োগ ব্যতীত প্রকাশ করা যায় না। অন্য ভাষার শব্দাবলি দ্বারা এ ভাষার শব্দের পূর্ণ হাকিকত প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং এ ভাষা অতি পবিত্র ও অতি সূক্ষ্ম। উপরন্তু ইহা আল্লাহর ভাষা। এ ভাষাতেই আল্লাহ তায়ালা কথা বলেন। স্বীয় মুজেজা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা এ ভাষাকে মনোনীত করেছেন। কুরআন এমন এক মুজেজা যে, আল্লাহ ব্যতীত এমন কালাম কেউ বলতে পারে না। সুতরাং এই মুজেজার শান অন্য কোনো ভাষা ধারণ করতে পারে না। না ইংরেজি, না তুর্কি, না পাঞ্জাবি। মুজেজাকে ধারণ করার সামর্থ্য যদি কোনো ভাষার থেকে থাকে তবে তা একমাত্র আরবী ভাষারই রয়েছে। অত্র বাক্য দুটি অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু এর মধ্যে ব্যাপক হাকিকতকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সুতরাং ভাষাগত দিক দিয়ে অতি সহজ ও সূক্ষ্ম এবং মুজেজাকে ধারণকারী। এ ভাষায় আল্লাহ তায়ালা কথা বলেছেন। এ জন্যই বলা হয়েছে:

لِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ

জান্নাতবাসীদের ভাষা আরবী।

বরযখবাসীর ভাষা

বরযখ তথা মৃত্যু-পরবর্তী সময় থেকে হাশর পূর্ববর্তী জগতের ভাষা হলো সুরিয়ানী। বরযখ জীবনে মৃতব্যক্তি যে ভাষায় কথা বলবে এবং ফেরেশতাগণ যে ভাষায় তাদের সম্বোধন করবেন সে ভাষা হলো সুরিয়ানী ভাষা। হাশর ময়দান থেকে যে ভাষায় কথা বলা শুরু হবে তা হবে আরবী ভাষা। অতঃপর জান্নাতে এ

ভাষাই থাকবে এবং অনন্তকাল এই আরবী ভাষাতেই মানুষ কথা বলবে। যাই হোক, কুরআনের ভাষা আরবী, আল্লাহ তায়ালার কালাম আরবী, জান্নাতবাসীর ভাষা আররী। সুতরাং আরবী ভাষার ফযিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব এবং তা সহজ ও সাবলীল হওয়া দলিল দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ভাষা

শুরুর দিকে আল্লাহ তায়ালার কিতাবসমূহ ইবরানী ও সুরিয়ানী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবরানী কঠিন একটি ভাষা। যখন তাকে হালকা ও সহজ করা হলো তখন তা আরবীর রূপ নিল। অন্যথায় প্রথমে তা অতি কঠিন ছিল। যেমন তাওরাত কিতাব ইবরানী ভাষায় নাযিল হয়েছিল। তাওরাতের একটি আয়াত শুনুন, দেখুন তা কেমন কঠিন ও খটমটে ছিল। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পৃথিবীতে আগমনের সংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাওরাতে বলেন:

نابى بخوبخا ماخوخا ياخيم لخا يخوخا دجسمهم.

এখানে শুধু খা (خ) ছাড়া কিছুই বুঝে আসছে না। যখন একে আরবীতে রূপান্তর করা হলো, অর্থগত রূপান্তর নয়, শাব্দিক রূপান্তর, তখন তার রূপ দাঁড়ালো এমন– نابى হয়ে গেল نَبِيّ অর্থাৎ নবী, بخوبخا থেকে من قربك অর্থাৎ আপনার নিকটজন, ماخوخا হয়ে গেল من أخيك আপনার ভাইদের থেকে, ياخيم لخا হয়ে গেল يقيم لك অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত করবে, يخوخا دجسمهم হয়ে গেল إلهك فتسمون অর্থাৎ তোমাদের ইলাহকে, অতএব তোমরা তার কথা শোনো।

হযরত মুসা আ.-এর কাছে ভবিষ্যৎবাণী করা হল– একজন নবী আগমন করবেন, তিনি হবেন আপনার নিকটজন। আপনি হলেন বনি ইসরাইল আর তিনি হবে বনি ইসমাইল, আপনার চাচাতো ভাই। যাই হোক, তাওরাতে বর্ণিত হল– نابى بخوبخا ماخوخا ياخيم لخا يخوخا যার আরবী হয়ে গেল نَبِيّ من قربك من أخيك يقيم لك إلهك অর্থাৎ আপনার ভ্রাতৃ-সম্পর্কীয়দের ভেতর থেকে একজন নবী আগমন করবেন, তিনি আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে (প্রভুত্ব) প্রতিষ্ঠিত করবেন।

এই উভয় ভাষার মধ্যে সূক্ষ্মতার পার্থক্য রয়েছে। একটির উচ্চারণে জিভের জড়তা অনুভূত হয়, অন্যটি কোমল। এমনিতেই ভাষা হিসেবে আরবী অতি কোমল ও সহজ, তদুপরি অত্র বাক্য দুটি আরো সহজ, আরো কোমল। সুতরাং

আল্লাহর রাসূল বলেন: خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ এই বাক্য দুটি মুখে উচ্চারণ করা মোটেই কষ্টকর নয়, অতি হালকা, অতি সহজ। উচ্চারণ করতে না কোনো সময় লাগে, না কোনো জড়তা অনুভূত হয়। বরং পলকের মধ্যে বাক্য দুটি পাঠ করা যায়। যাই হোক, অত্র বাক্য দুটির একটি বৈশিষ্ট্য এই বর্ণিত হলো যে, এগুলো মুখে উচ্চারণ করা অতিশয় সহজ। এ বৈশিষ্ট্যটি একটি অনুভবযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ যখন আপনি শুনবেন তখন কান অনুভব করবে যে অতি সহজ ও হালকা একটি জিনিস।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: আমলের পরিমাপ

বাক্য দুটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ অর্থাৎ বাক্য দুটি মুখে উচ্চারণ করা যদিও সহজ কিন্তু আমল পরিমাপক মিযানে অতি ভারী, অতি ওজনদার। আর এর প্রতিদান এমন যে, মানুষ যা-কিছুই পড়ুক না কেন, এর সমতুল্য প্রতিদান কোনো কিছুতেই মিলবে না। সুতরাং মিযানের পাল্লায় অতিশয় ভারী, অতিশয় ওজনদার।

আমল পরিমাপের স্বরূপ

ওজন দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো বস্তুগত ওজন, আরেকটি হলো অর্থগত ওজন। বস্তুগত ওজন হলো এই যে, এক সেরের চেয়ে দুই সেরের ওজন বেশি। তিন সেরের ওজন আরো বেশি, মণ-এর ওজর তার চেয়েও বেশি। যাই হোক, একটি হলো বস্তুগত বা পদার্থগত ওজন, যা পদার্থের সাথে সম্পৃক্ত। বস্তু যত ভারী হবে, বড় হবে তার ওজন তত বাড়তে থাকবে। আর অপর একটি ওজন হলো অর্থগত ওজন, মর্মগত ওজন। সুতরাং উক্ত কালিমা দুটিতে যে ওজন রয়েছে তা হলো অর্থগত ওজন। পাল্লা দিয়ে যদি পরিমাপ করতে যান তবে তাতে কিছুই পাওয়া যাবে না; কিন্তু তার অর্থের মধ্যে যদি চিন্তা ভাবনা করেন তবে দেখবেন যে, অতি বড়, অতি মহান অর্থ ধারণ করে আছে, যা অত্যন্ত ভারী। ওজন কেবল বস্তুরই হয় না, রূহানী ওজনও রয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, অমুক আলেমের আগমনে আমার অন্তরে ভার পড়েছে। তার আগমনে কিসের বোঝা? বিষয়টি কি এমন যে, পাঁচ সেরের ওজন তার উপর রাখা হয়েছে? বিষয়টি তা নয়; বরং বিষয়টি হলো এই যে, তার আযমত, তার সম্মান ও বড়ত্বের বোঝা অন্তরে পড়েছে। তার ভিতরে যে রূহানী শক্তি রয়েছে সেই শক্তির ভয় ও প্রভাব আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে

এবং অন্তর তার সম্মানকে মেনে নিয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার যে আযমত মানুষের অন্তরে রয়েছে তা অর্থগত একটি বিষয়। আল্লাহ তায়ালার সম্মান, তাঁর আযমত অতি ওজনদার বিষয় কিন্তু এ ওজন বস্তুগত ওজন নয়; অর্থগত ওজন। আল্লাহ দেহ ও বস্তুগত বিষয় হতে পবিত্র, তাঁর কালামও তেমনিভাবে পবিত্র। এর মধ্যে রয়েছে রূহানিয়াত ও সূক্ষ্মতা, যার বোঝা অন্তরে অনভূত হয়। যদি কোনো মূর্খ ব্যক্তি আলোচনা করে তবে তা আপনার কাছে গুরুত্ব পাবে না। আপনি বলবেন, এও কি শোনার মতো কোনো জিনিস! কিন্তু যদি কোনো আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তি আলোচনা করে তাহলে আপনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আপনি বলবেন, অতি মূল্যবান, অতি ওজনদার কথা। আরেকটু বলুন, আবার একটু বলুন, ভাল করে বুঝে নেই।

হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. যখন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর নিকট তাশরিফ নিয়ে গেলেন তখন তিনি বললেন, তার আগমনে আমি আমার অন্তরে তার আযমতের বোঝা অনুভব করছি। এ বোঝা কোনো বস্তুগত বোঝা ছিল না, এ ছিল রূহানী বোঝা। যা আযমতপূর্ণ, যা শ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত তার প্রভাব অন্তরে পড়ে, রূহের ভেতর পড়ে। কাগজের উপর আপনি এ কালিমা লিখলে তার কোনো ওজন অনুভূত হবে না, কিন্তু যখন আপনি পড়বেন এবং আল্লাহর আযমত আপনার সামনে ভাস্বর হতে থাকবে তখন অন্তর শিহরিত হবে, কেঁপে উঠবে। এ হলো অর্থগত বোঝা। এখানে এই বোঝার কথাই বলা হয়েছে। আমল পরিমাপের মিযানে যখন এ কালিমাকে তোলা হবে তখন এর আযমতের বোঝায় মিযান ঝুঁকে যাবে।

রূহানী ওজন

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের দিন এক বান্দা গুনাহের এক বিশাল স্তুপ নিয়ে উপস্থিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে বান্দা! তুমি তোমার আমলকে ওজন করাও। উক্ত ব্যক্তি আরজ করবে– হে আল্লাহ! আমি কি ওজন করাবো? আমার সঞ্চয় তো কেবল গুনাহ আর গুনাহ। মাপানোর প্রয়োজন হয় তখন, যখন এক দিকে নেকী থাকে এবং অপর দিকে গুনাহ থাকে। আমার তো শুধুই গুনাহ রয়ছে। গুনাহ আর গুনাহ। আল্লাহ বলবেন– না, তোমার আমলকৃত একটি নেকীও আমার কাছে রক্ষিত রয়েছে। উক্ত ব্যক্তির আমলনামার নিরানব্বইটি খাতার মধ্য হতে একটি পৃষ্ঠা বের হবে যাতে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এই কালিমা তাইয়েবাহ পাঠের প্রমাণ মিলবে। ঐ ব্যক্তি বলবে, হে

আল্লাহ! এই নিরানব্বইটি খাতা ভর্তি গুনাহের বিপরীতে সামান্য এই পৃষ্ঠাটির কী-বা গুরুত্ব আছে? আমি তো জাহান্নামের উপযোগী, আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। জান্নাতের মতো সম্মানিত স্থানে পৌঁছার যোগ্য আমি নই। আল্লাহ তায়ালা বলবেন:

لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

আমার দরবারে কোনো প্রকার জুলুমের অবকাশ নেই। [মুমিন ৪০ : ১৭]

এখানে অণু পরিমাণ আমলেরও হিসাব হবে। তুমি তোমার আমল পরিমাপ করাও এবং নিজের তত্ত্বাবধানে পরিমাপ করাও। যাতে এ কথা বলার অবকাশ না থাকে যে, ফেরেশতাগণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিয়েছেন। ঐ নিরানব্বইটি খাতা এক পাল্লায় রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় কালিমাহ তাইয়েবাহর পৃষ্ঠাখানা রাখা হবে। দেখা যাবে, একটিমাত্র পৃষ্ঠা রাখার পাল্লাটি ঝুঁকে যাবে। এই বিষয়টিই জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে: وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ আল্লাহ তায়ালার নাম অপেক্ষা অধিক ওজনদার আর কী হতে পারে? যে নামের মধ্যে রয়েছে তাঁর আযমতের মহান ভার। আর অত্র কালিমা দুটিও সেই পবিত্র নামের কালিমা: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ আল্লাহ তায়ালার এই পবিত্র নামের আযমতের কারণে মিযানের পাল্লা ঝুঁকে যাবে। লক্ষ গুনাহ ও অপকর্ম সত্ত্বেও আযমত প্রাধান্য পাবে এবং পাল্লা ঝুঁকে যাবে। মোটকথা, ওজন দুই ধরনের হয়ে থাকে– একটি বস্তুগত, আরেকটি রূহানী ও ইলমী। এখানে রূহানী ও ইলমী ওজন উদ্দেশ্য।

দুরুদ শরীফের বরকত

হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, উম্মতে মুহাম্মাদীর এক ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের হুকুম দেওয়া হলে ফেরশতাগণ তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে থাকবে এবং ঐ ব্যক্তি হয়রান-পেরেশান হয়ে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকবে যে, আমার জন্য কোনো সাহায্যকারী আছে কিনা। এমতাবস্থায় হযরত আদম আ.-এর দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হবে। তিনি তখন আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাক দিবেন: يَا أَحْمَدُ، يَا أَحْمَدُ! (হে আহমদ) জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আরজ করবেন: لَبَّيْكَ يَا أَبَا الْبَشَرِ (হে মানব জাতির পিতা, আমি উপস্থিত), তিনি তখন বলবেন, আপনার উম্মতের এক ব্যক্তিকে ফেরেশতাগণ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা

শুনে জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ফেরেশতাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলবেন, তোমরা দাঁড়াও। তারা বলবেন, আমাদের নাম হলো যবানিয়া, আমরা জাহান্নামের ফেরেশতা, আমরা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনকারী, আপনার নির্দেশ আমরা মানতে পারি না। আল্লাহর নির্দেশ এসে গিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে স্বীয় দাড়ি মোবারকে হাত বুলাবেন। অতঃপর তিনি আরশের নীচে গিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং বলবেন, হে আল্লাহ! আমার একজন উম্মত রয়েছে, নিঃসন্দেহে সে গুনাহগার কিন্তু আপনার রহমত তো সুপ্রসারিত। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি আপনাকে নিরাশ করব না। তখন আওয়াজ দেওয়া হবে: لَا تَعْجَلُوْا তোমরা তাড়াহুড়ো করো না। ফেরেশতাগণ থেমে যাবেন। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ফেরেশতাগণের কাছে তাশরিফ আনবেন এবং স্বীয় পকেট হতে একখানা কাগজ বের করবেন (সে সময়ের পোশাক ও তার পকেটের স্বরূপ আল্লাহই ভাল জানেন)। সে কাগজখানাকে বিসমিল্লাহ বলে মিযানে রাখবেন। সাথে সাথে নেকীর পাল্লা ঝুঁকে যাবে এবং ঐ ব্যক্তির নাজাত হয়ে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির নিকট পরিচিত না থাকার কারণে সে এসে তাঁর কাছে আরজ করবে– হে মহাত্মন! আপনি কে? এই কঠিন মুহূর্তে আপনি এসে আমাকে সাহায্য করলেন এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচালেন! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন– 'আনা আহমাদ' আমি আহমাদ, তোমার নবী আমি। ঐ ব্যক্তি কৃতজ্ঞতায় অবনত হবে এবং বলবে, সুবহানাল্লাহ! আমার তো আমলের পাল্লা হালকা ছিল, আপনি কী করার দ্বারা সে পাল্লা ভারী হল? জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করবেন, একবার তুমি অত্যন্ত কামেল ইখলাসের সাথে দুরুদ প্রেরণ করেছিলে। সেই দুরুদের কাগজ আমার পকেটে রক্ষিত ছিল। সে দুরুদ এতই ইখলাসপূর্ণ ছিল যে, আমি যখন তা মিযানে তুললাম তখন সেই ইখলাসের বদৌলতে সকল গুনাহ হালকা সাব্যস্ত হয়ে গেল।

এ কথা স্পষ্ট যে, দুরুদ শরীফকে যদি কাগজে লিখে পকেটে রাখা হয় তবে কোনো ওজন অনুভূত হবে না, কিন্তু রূহ তার ওজন অনুভব করবে। তার মধ্যে ইখলাসের যে ওজন রয়েছে রূহ তা অনুভব করবে। যা হোক, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন আমলের পরিমাণ বা সংখ্যা দেখবেন না, তিনি দেখবেন যে, তাতে ইখলাস কতটা রয়েছে, আন্তরিকতা কতখানি রয়েছে এবং আল্লাহর মুহাব্বত কতটা রয়েছে। মূলত এগুলোরই ওজন হবে। হাদিস শরীফে এদিকেই

ইশারা করা হয়েছে যে, অত্র কালিমা দুটি মুখে উচ্চারণ করা সহজ কিন্তু অর্থের দিক বিবেচনায় অত্যন্ত ভারী। এ হলো কালিমা দুটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, যা ইন্দ্রেয়গ্রাহ্য নয় বরং রূহানী বিষয়। রূহ এবং কলব এটা অনুভব করবে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

অত্র হাদিস শরীফে কালিমা দুটির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছেঃ

حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ

অত্র কালিমা দুটি আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়।

এ কথা স্পষ্ট যে, কারো কাছে যখন তার পছন্দনীয় বস্তু হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাতে অধিক মনোযোগ আকর্ষিত হয়। আর এ জাতীয় জিনিস হাদিয়া নিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে অপ্রিয় কোনো জিনিস যদি হাদিয়া নিয়ে যাওয়া হয় তবে স্বাভাবিকভাবেই তা অপছন্দ করবে এবং গ্রহণও করবে না। আকর্ষণীয় ও কাম্য কোনো জিনিস নিয়ে গেলে শুকরিয়াও আদায় করবে এবং খুশিও হবে। যাই হোক, অত্র কালিমা দুটি আল্লাহ তায়ালার নিক প্রিয়। প্রিয় জিনিস যখন হাদিয়া পেশ করা হবে তখন আকর্ষিত হবে।

অত্র কালিমা দুটি প্রিয় কেন? তার কারণ এই যে, এ কালিমাগুলোর মধ্যে 'মাকামে উলুহিয়্যাত'-এর বর্ণনা রয়েছে।

মাকামে উলুহিয়্যাত

মাকামে উলুহিয়্যাত বা প্রভুত্বের স্তর চারটি। যা একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। এগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্বের কোনোই অবকাশ নেই।

প্রথম মাকাম

মাকামে উলুহিয়্যাতের প্রথম মাকাম হলো তানযিহ। তানযিহ'র অর্থ হলো আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা। সর্বপ্রকার ত্রুটি হতে পবিত্র, সর্বপ্রকার খারাবি হতে পবিত্র, সর্বপ্রকার অসম্পূর্ণতা হতে পবিত্র। তিনি এসবের বহু উর্ধ্বে। নগণ্যতম অসম্পূর্ণতা কিংবা দোষ-ত্রুটির নামগন্ধও অসম্ভব। কল্পনায়ও আসতে পারে না। 'তাসবীহ'-এর অর্থ প্রকৃতপক্ষে তানযিহ। অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকার

খারাবি হতে পবিত্র এবং সবকিছু হতে উন্নত। পবিত্র কুরআনে যা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে:

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। [বাকারা ২ : ২৫৫]

তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ না করার কারণ এই যে, এগুলো হলো ক্লান্তির আলামত। আর ক্লান্তি হলো দুর্বলতার আলামত। তিনি হলেন মহাশক্তিধর, দুর্বলতার সাথে তাঁর দূরবর্তী সংযোগ-সম্পর্কও নেই। কোথাও বর্ণিত হয়েছে:

لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسٰى

তিনি কখনো বিভ্রান্ত বা ভ্রষ্ট হন না এবং কখনো ভুলে যান না। [তহা ২০ : ৫২]

বিভ্রান্ত হওয়া ও ভুলে যাওয়া দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে, স্মৃতিশক্তি না থাকার কারণে হয়ে থাকে। তিনি তো মহাপরাক্রমশালী। ভুল-ত্রুটির কোনো অবকাশ তাঁর কাছে নেই।

সুতরাং এ আয়াতগুলো তানযিহ তথা পবিত্রতা ঘোষণার নিমিত্তে এসেছে–

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ــ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسٰى

তথা তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। বিভ্রান্তি ও ভুলের অবকাশ তাঁর কাছে নেই। এসব কিছু হতে তিনি পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাঁর ইলম অতি সুদৃঢ় ও সর্বব্যাপী। যাতে কোনো প্রকারের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। সুতরাং এগুলোর সবকিছুই 'সুবহানাল্লাহ'-এর অধীনে এসে যায়। অর্থাৎ তিনি নিদ্রা, তন্দ্রা, ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি হতে পবিত্র। সুতরাং 'সুবহানাল্লাহ'কে তানযিহ তথা পবিত্রতা ঘোষণার নিমিত্তে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে তার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে:

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ○

তোমরা সকাল ও সন্ধ্যার আবর্তনে আবর্তিত হও, আর আল্লাহ হলেন পবিত্র। [রূম ৩০ : ১৭]

সকাল ও সন্ধ্যা তথা সময়ের আবর্তনে আবর্তিত হওয়া দুর্বলতার নিদর্শন। আর তিনি হলেন এসব কিছুর বহু উর্ধ্বে। সর্বপ্রকার আবর্তন ও পরিবর্তন তোমাদের মাঝে বিদ্যমান।

খারাবি হতে পবিত্র এবং সবকিছু হতে উন্নত। পবিত্র কুরআনে যা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে:

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। [বাকারা ২ : ২৫৫]

তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ না করার কারণ এই যে, এগুলো হলো ক্লান্তির আলামত। আর ক্লান্তি হলো দুর্বলতার আলামত। তিনি হলেন মহাশক্তিধর, দুর্বলতার সাথে তাঁর দূরবর্তী সংযোগ-সম্পর্কও নেই। কোথাও বর্ণিত হয়েছে:

لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسٰى

তিনি কখনো বিভ্রান্ত বা ভ্রষ্ট হন না এবং কখনো ভুলে যান না। [তহা ২০ : ৫২]

বিভ্রান্ত হওয়া ও ভুলে যাওয়া দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে, স্মৃতিশক্তি না থাকার কারণে হয়ে থাকে। তিনি তো মহাপরাক্রমশালী। ভুল-ত্রুটির কোনো অবকাশ তাঁর কাছে নেই।

সুতরাং এ আয়াতগুলো তানযিহ তথা পবিত্রতা ঘোষণার নিমিত্তে এসেছে–

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ــ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسٰى

তথা তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। বিভ্রান্তি ও ভুলের অবকাশ তাঁর কাছে নেই। এসব কিছু হতে তিনি পবিত্র ও উর্ধ্বে। তাঁর ইলম অতি সুদৃঢ় ও সর্বব্যাপী। যাতে কোনো প্রকারের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। সুতরাং এগুলোর সবকিছুই 'সুবহানাল্লাহ'-এর অধীনে এসে যায়। অর্থাৎ তিনি নিদ্রা, তন্দ্রা, ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি হতে পবিত্র। সুতরাং 'সুবহানাল্লাহ'কে তানযিহ তথা পবিত্রতা ঘোষণার নিমিত্তে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে তার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে:

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ○

তোমরা সকাল ও সন্ধ্যার আবর্তনে আবর্তিত হও, আর আল্লাহ হলেন পবিত্র। [রূম ৩০ : ১৭]

সকাল ও সন্ধ্যা তথা সময়ের আবর্তনে আবর্তিত হওয়া দুর্বলতার নিদর্শন। আর তিনি হলেন এসব কিছুর বহু উর্ধ্বে। সর্বপ্রকার আবর্তন ও পরিবর্তন তোমাদের মাঝে বিদ্যমান।

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের সংক্ষিপ্ত এক অংশে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন এবং মসজিদে আকসা হতে আসমানসমূহে ভ্রমণ করিয়েছেন। [বনি ইসরাইল ১৭ : ১]

অন্যত্র বলেছেন:

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَی

আপনার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করুন। [আলা ৮৭ : ১]

আবার কোথাও বর্ণিত হয়েছে:

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে 'তাসবীহ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তানযিহ তথা পবিত্রতা বর্ণনা। অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে। যাই হোক, আল্লাহ তায়ালার সত্তার প্রথম স্তর হলো তানযিহ। অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকার দোষ হতে পবিত্র, সমুন্নত।

দ্বিতীয় মাকাম

উলুহিয়্যাতের দ্বিতীয় মাকাম হলো 'আযমতে শান'। অর্থাৎ তাঁর শান সর্বমহান ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অসীম আযমত ও শ্রেষ্ঠত্বের মালিক তিনি। শরীয়ত তাঁর জন্য হামদের নির্দেশ দিয়েছে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

হামদের অর্থ এই যে, সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য। প্রশংসা কখনো খারাপের জন্য হয় না, কামালিয়াত ও পূর্ণতার জন্য প্রশংসা হয়ে থাকে। তাই সমস্ত প্রশংসা যখন তাঁর জন্য সুতরাং এর অর্থ এই যে, সকল পূর্ণতা কেবল তাঁরই জন্য এবং তিনি সকল পূর্ণতার আধার। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও বরকত তাঁর পক্ষ হতে আগত। সকল পূর্ণতা তাঁর। সর্বপ্রকার পূর্ণতার উৎস তিনি। পূর্ণতার উৎস হওয়ায় সকল প্রশংসা তাঁর জন্য সাব্যস্ত হয়ে গেল। আর সকল প্রশংসা যেহেতু তাঁর জন্য সেহেতু সকল পূর্ণতাও তাঁরই জন্য। কারণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কোনো

কাজের জন্য প্রশংসা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো আমল বা কাজ যখন এমন হয় যে, তা সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে এবং তা এমন উন্নত যে, তার কর্তার প্রশংসা ও গুণগান করতে মন চায়। এই প্রশংসা বা হামদ প্রকাশের জন্য ইসলামী শরীয়ত প্রশংসা বাক্য রেখেছে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ــ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً اُولِىْ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ــ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ــ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ.

এভাবে বিভিন্ন স্থানে হামদের বাক্য ব্যবহৃদ হয়েছে। কিছু কিছু সূরা হামদের বাক্য দ্বারা শুরু হয়েছে। যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'তানযিহ' বা পবিত্রতা বর্ণনা করা, যার জন্য 'সুবহানা' শব্দটি প্রয়োগ হয়েছে। আরেকটি হলো 'তাহমিদ'। এই হলো উলুহিয়্যাতের দ্বিতীয় মাকাম।

তৃতীয় মাকাম

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, যেই সত্তা সর্বপ্রকার ত্রুটি হতে পবিত্র এবং সর্বপ্রকার কামাল ও পূর্ণতার উৎস তিনি ব্যতীত আর কে আযমত ও বড়ত্বের অধিকারী হতে পারে? সকল বরকত তাঁর জন্য, সকল আযমত তাঁর জন্য। এ জন্যই বর্ণিত হয়েছে:

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তিনি হলেন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সর্বময় বড়ত্ব ও অহংকারের অধিকারী। [জাসিয়া ৪৫ : ৩৭]

তাঁর এই বড়ত্ব, এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য ইসলামে তাকবিরের হুকুম রয়েছে। اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহ বড়, মহান। অর্থাৎ সবকিছুর চেয়ে আল্লাহ বড়, উন্নত।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ

দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বিষয় সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত। তিনি বড়, শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত। [রাআদ ১৩ : ৯]

তাঁর জন্য তাকবিরের হুকুম দেওয়া হয়েছে– اَللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর চেয়ে বড়, শ্রেষ্ঠ। সকল বড়ত্ব তাঁর সামনে তুচ্ছ, নগণ্য। তাঁর আযমতের সামনে অন্যসব আযমত অতি ছোট, অতি হীন। বৈদ্যুতিক বাতি কিংবা হ্যাজাক লাইটের সামনে যদি চেরাগ জ্বালানো হয় তবে সে চেরাগের অবস্থা কেমন হবে? আবার সূর্যের সামনে যদি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয় তবে সে বাতির অবস্থা কেমন হবে? তার সকল আলো সূর্যের আলোর মধ্যে হারিয়ে যাবে। অদ্রূপ আল্লাহ তায়ালার নূরের সামনে কোনো নূর দ্যুতি ছড়াতে পারে না, নিস্তেজ হয়ে যায়। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার নূরের সামনে সকল অস্তিত্ব নিঃশেষ হয়ে যায়।

সুতরাং তাকবীরের অর্থ এই যে, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সমৃদ্ধি– সবকিছুই একমাত্র তাঁর জন্য। যাকে কুরআন মাজিদে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আসমান ও জমিনের সকল শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁর জন্য। [জাসিয়া ৪৫ : ৩৭]

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى فِيهِمَا قَصَمْتُهُ

(আল্লাহ বলেন) গর্ব ও অহংকার আমার চাদর, আযমত ও মর্যাদা আমার লুঙ্গি। এগুলো নিয়ে যে ব্যক্তি টানা-হেঁচড়া করবে আমি তার ঘাড় মটকে দেব এবং তাকে পর্যুদস্ত করব।

এ কারণেই কোনো মজলিসে যখন কেউ অহংকার বশত বড় বড় কথা বলে তখন সে মজলিসে তাকে অপদস্থ করার জন্য অবশ্যই কেউ একজন থাকে। সকল গুণাহের জন্যই কিছু না কিছু ক্ষমার ব্যবস্থা আছে কিন্তু গর্ব ও অহংকার যখন করা হবে তখন তার ফলাফল হাতে হাতে পাওয়া যাবে। এর জন্য কোনো ক্ষমা নেই, এগুলো কখনো বরদাশত করা হবে না। কেননা গুনাহ হলো বান্দার ব্যক্তিগত কাজ ও নিজস্ব বিশেষণ আর তাকাব্বুর ও অহংকার হলো আল্লাহ তায়ালার গুণ। যে ব্যক্তি তাঁর এই বড়ত্বের অংশীদার হতে চাইবে সে টিকে থাকতে পারবে না। তাকে নীচ করা হবে, লাঞ্ছিত-অপদস্ত করা হবে। যাই হোক, আযমত, বড়ত্ব ও অহংকার হলো মাকামে উলুহিয়্যাতের তৃতীয় স্তর।

চতুর্থ মাকাম

আল্লাহ তায়ালার তামাজিদ তথা আযমত, বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ইসলামী শরীয়তে তাকবিরের কালিমা রাখা হয়েছে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তু হতে বড় ও মহান।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, যিনি সর্বপ্রকার ত্রুটি হতে পবিত্র এবং কল্যাণের উৎস, উপরন্তু বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বও একমাত্র তাঁরই জন্য; তিনি ব্যতীত একচ্ছত্র আধিপত্যের অধিকারী আর কে হতে পারে? এর দ্বারা তাওহীদ পয়দা হয় বিধায় তাহলিল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা)-এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তাঁর সামনে মাথানত করবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবে, তাঁর কাছে সাহায্য চাইবে এবং তাঁরই দিকে রুজু হবে ও মুখাপেক্ষী থাকবে। সর্বপ্রকার রোগ-শোক হতে একমাত্র মুক্তিদাতা তিনি। সকল ইবাদত হবে কেবল তাঁরই জন্য। যা হোক, তাওহীদের এই দাবি হলো মাকামে উলুহিয়্যাতের চতুর্থ মাকাম।

তাওহীদের পূর্ণতা

উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনটি মাকাম অর্জিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাওহীদের দাবি পূর্ণতা পেতে পারে না। যথা তানযিহ-এর পূর্ণতা, অর্থাৎ তিনি সকল দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। তানবিহ-এর পূর্ণতা, অর্থাৎ সকল গুণ, সকল সৌন্দর্য ও কল্যাণময়তার মালিক তিনি। তাকবির-এর পূর্ণতা, অর্থাৎ সকল আযমত, সকল শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁর। এই তিনটি বিষয় প্রমাণিত হবার পরই কেবল তাওহীদ অস্তিত্ব লাভ করবে। কেউ যদি আল্লাহ তায়ালার কামেল তানযিহ মেনে না নেয়, তাঁর সাথে মাখলুকের সিফাত জুড়ে দেয় অথবা মাখলুকের মাঝে খালেকের সিফাতের স্বীকৃতি দেয় তাহলে সে কখনো তাওহীদের দাবি করতে পারবে না। দাবি যদি করেও তবে তা হবে মিথ্যা দাবি। তাওহীদের প্রথম পদক্ষেপ হলো তানযিহ। অর্থাৎ সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হতে তাঁর পবিত্রতার স্বীকৃতি দাও। لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ অর্থাৎ তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি, তাঁর কোনো মূল নেই, তিনি নিজেই মূল। তিনিও কাউকে জন্ম দিবেন না, তাঁর কোনো স্ত্রী-সন্তান থাকবে না, অথবা তাঁর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সমকক্ষ কেউ নেই। এইসব বিষয় হতে মানুষ যখন তাঁর

পবিত্রতার ঘোষণা করবে তখন সে তাওহীদের মাকামে পৌঁছবে। কেউ যদি আল্লাহর পিতা হওয়া বা স্ত্রী থাকার প্রবক্তা হয় কিংবা তাঁর সমকক্ষ ও শরিক থাকার প্রবক্তা হয় তাহলে সে কখনো তাওহীদের দাবিদার সাব্যস্ত হতে পারে না। যদি দাবি করেও তবে তা হবে মিথ্যা দাবি। কেননা তাওহীদের প্রথম পদক্ষেপ হলো তানযিহ। সুতরাং খ্রিস্টানরা যদি তাওহীদের দাবি করে কিংবা মুশরিকরা যদি তওহীদের দাবি করে তবে সে দাবি হবে শুধুই মৌখিক দাবি, এর কোনো যথার্থতা নেই। কারণ তাদের তানযিহ নেই।

তেমনিভাবে পূর্ণ তানবিহ-এর স্বীকৃতিও দিতে হবে। অর্থাৎ সকল বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁর। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বে অণু পরিমাণও কমতি নেই। কেউ যদি আল্লাহ তায়ালার সত্তার ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটির স্বীকৃতি দেয় তবে তা তানবিহ-এর বিপরীত হবে এবং সে তাওহীদের মাকামে পৌঁছতে পারবে না। যেমন ইহুদীগণ আল্লাহর ক্ষেত্রেও বান্দার অনুরূপ ত্রুটিপূর্ণ সিফাতের প্রবক্তা। তারা বলে, হযরত নূহ আ.-এর সময়ে যখন তুফান শুরু হলো তখন আল্লাহ তায়ালা বসে বসে কাঁদতে লাগলেন– হায়, আমার মাখলুক ডুবে যাচ্ছে! নাউজুবিল্লাহ। তো তাঁর এতটুকু শক্তি ছিল না যে, তাদেরকে রক্ষা করবে, তাই কাঁদতে শুরু করেছেন। আর এত বেশি কেঁদেছেন যে, চোখে ব্যথা হয়ে গিয়েছে এবং ফেরেশতারা খোঁজ-খবর নিতে এসেছে– হযরত আপনার চোখ এখন কেমন? নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। তো ইহুদীরা খালেকের জন্য মাখলুকের ত্রুটিপূর্ণ সিফাতকে মেনে নিয়েছে এবং খ্রিস্টানরা খালেকের খাস সিফাতকে মাখলুকের জন্য মেনে নিয়েছে। হযরত ঈসা আ.কে তারা আল্লাহর পুত্র ও তিন মাবুদের এক মাবুদ বলে মান্য করছে।

খ্রিস্টানদের সর্বপ্রথম দাবি ছিল যে, হযরত ঈসা আ. সার্বিকভাবে ইলমে গায়েবের অধিকারী ছিলেন, সবকিছুকে বেষ্টনকারী সর্বাধিক শক্তিময় ছিলেন, কাউকে জীবন দেওয়া বা কারো জীবন হরণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। এই যে বিষয়গুলো, যা একান্তই আল্লাহর বৈশিষ্ট্য, তা তারা বান্দার জন্য স্বীকার করে নিয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অপর দিকে যে অসম্পূর্ণ ও সংকীর্ণ গুণাবলি কেবল বান্দার জন্য প্রযোজ্য ইহুদীরা তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে রেখেছে। এরা উভয়ে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে যে সীমারেখা ও বিভাজন ছিল তা অতিক্রম করেছে, খালেক ও মাখলুকের পার্থক্য মুছে ফেলেছে। যাই হোক, তানযিহ ও তানবিহ ব্যতীত ব্যক্তির মাঝে তাওহীদ অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না।

উলূহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য

উপরোক্ত তানযিহ ও তানবিহ-এর পরে উলূহিয়্যাতের তৃতীয় বিষয় হলো তাকবীর। অর্থাৎ সকল আযমত, সকল শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁর। অন্য কারো মধ্যে আযমত পরিলক্ষিত হলে তা তাঁরই আযমতের প্রতিচ্ছবি। কারো সত্তার মধ্যে আযমত নেই, সত্তাগতভাবে একমাত্র তিনিই কেবল আযমতের অধিকারী। তিনি যদি কাউকে আযমত দান করেন তবেই কেবল সে আযমতের অধিকারী হতে পারে। তিনি যদি কারো থেকে আযমত ছিনে নেন তবে সে আযমতহীন হয়ে পড়ে। তিনি কাউকে আধিপত্য দান করলে সে অধিপতি হয়, আবার আধিপত্য ছিনে নিলে সে আর কিছুই থাকে না। তিনি কাউকে বাদশাহী দিলে সে বাদশা বলে সাব্যস্ত হয়, বাদশাহী ছিনে নিলে সে আর বাদশা থাকে না। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার বাদশাহ হওয়া অনাদি হতে অনন্তকাল পর্যন্ত। তাঁর হুকুমত অন্য কারো প্রদত্ত হুকুমত নয়। সত্তাগতভাবেই তিনি মালিক, তিনি বাদশা। তাঁর বাদশাহী আরোপিত নয়, সত্তাগত। তাঁর থেকে এ বাদশাহী ছিনে নেবার কেউ নেই। প্রত্যেক বাদশার বাদশাহীই হরণ হতে পারে, রাজত্ব চলে যেতে পারে, ক্ষমতা চলে যেতে পারে। কারণ এগুলো সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। কখনো আসে, কখনো চলে যায়। কিন্তু অনাদিকাল হতে অনন্তকাল পর্যন্ত যাঁর ক্ষমতা বিস্তৃত, যাঁর শক্তি-সামর্থ্য সর্বব্যাপী, যাঁর রাজ্য ও রাজত্ব অনাদিকাল হতে অনন্তকালের– তিনি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা। এ কারণেই সকল আযমতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর এ জন্যই নামাজের মধ্যে সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম পড়া হয়, যেন তাঁর আযমত প্রদর্শিত হয়। এই হলো তাওহীদের চারটি মাকাম। চতুর্থ মাকামটি তাওহীদের সর্বোচ্চ পর্যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে তানযিহ, অতঃপর তানবিহ, অতঃপর তাকবীর। এ তিনটি স্তরের পরবর্তী স্তর হলো তাওহীদের স্তর। এ স্তর তিনটিকে পাশ কাটিয়ে কারো পক্ষে তাওহীদ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। কেউ যদি দাবি করে তবে সে দাবি হবে মিথ্যা দাবি।

আলোচ্য হাদিস

আলোচ্য হাদিসটিতে উপরোক্ত চারটি মাকামের কথাই বর্ণিত হয়েছে। 'সুবহানাল্লাহ'-এর মধ্যে তানযিহ রয়েছে। সকল কামাল ও পূর্ণতার একমাত্র তিনিই মালিক। তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। 'সুবহানাল্লাহিল আযিম' দ্বারা তাঁর আযমত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যখন সকল বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর জন্য তখন সকল কামালাতও কেবল তাঁরই জন্য। এ কারণে তিনি সর্বপ্রকার ত্রুটি-

বিচ্যুতি হতে পবিত্র, এসবের বহু উর্ধ্বে। সুতরাং অবশ্যিকভাবেই একত্ববাদও কেবল তাঁরই জন্য প্রযোজ্য। এখান থেকেই لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -এর উৎপত্তি।

এক হাদিসে তো এই চারটি বিষয়কে ইবাদত বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছেঃ

أَحَبُّ الْكَلَمَاتِ إِلَى اللّٰهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ.

> আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয় কালিমা চারটিঃ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার।

এই চারটি কালিমাকে প্রিয় বলা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য হাদিসের বাক্যে এই চারটি কালিমাই বিদ্যমান রয়েছে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার শাব্দিকভাবেই বিদ্যমান রয়েছে আর অপরটি বাক্যের দাবি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এভাবে যে, 'সুবহানাল্লাহ'-এর মধ্যে তাসবীহ এসে গেল, 'ওয়াবি হামদিহী'-এর মধ্যে হামদ এল, 'আল আজিম'-এর মধ্যে আযমত এসে গেল। আর এই তিনটির সমন্বয়ে আবশ্যকীয়ভাবে এ কথাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করল যে, এমন গুণাবলির অধিকারী যে সত্তা তিনি অবশ্যই একক ও অদ্বিতীয়। এর দ্বারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' প্রতিষ্ঠিত হল। 'আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয় কালিমা চারটি'-এ হাদিসে ইবারতের মধ্যেই মাকামাতে উলুহিয়্যাতের চারটি স্তরই উল্লেখ রয়েছে আর বক্ষমান হাদিসে উক্ত চারটি মাকামের তিনটি মাকাম 'ইবারাতুন্‌নস' (হাদিসের শব্দাবলি)-এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে আর অপরটি 'ইকতেযাউন্‌নস' (হাদিসের দাবি) দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ চারটি বাক্যই আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয়। কেন প্রিয়? কারণ এ কালিমাগুলো তাঁর মাকাম, তার মর্যাদার প্রকাশক। আর স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতা এই যে, কারো প্রকৃত অবস্থা যার দ্বারা প্রকাশ পায় তা তার কাছে পছন্দনীয় হয়ে থাকে। আপনি যদি কারো প্রশংসা করেন তবে সে খুব মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং অত্যন্ত খুশি হবে। আর যদি দুর্নাম করেন তবে কষ্ট পাবে। সুনাম করলে খুশি হবে, কেন খুশি হবে? এ কারণে যে, উক্ত সৎগুণ তার ভেতরে বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই সে খুশি হয়ে যাবে যে, তার সৎগুণাবলি অন্যকে জানানোর, প্রচার করার লোক রয়েছে।

সুতরাং স্বভাবজাত প্রবৃত্তি এই যে, কারো গুণাবলি বর্ণনা করা হলে স্বাভাবিকভাবেই সে খুশি হয়। এ বিষয়টি প্রমাণের জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়ে না। কোনো বান্দা যখন মহান আল্লাহ তায়ালার বিশেষত্ব বর্ণনা করবে তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি তা পছন্দ করবেন, বান্দার উচ্চারিত সে বাক্য তাঁর কাছে মাহবুব হয়ে যাবে। উলুহিয়্যাতের বিশেষত্ব সম্বলিত বাক্যাবলি উচ্চারণ করা হলে সে বাক্যাবলি যেমন আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে যায়, বান্দাও তদ্রূপ তাঁর মাহবুব হয়ে যায়।

হাদিসে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যত্রয় ও ইলমের প্রাধান্য

ইতোপূর্বে আমি আলোচনা করেছি যে, হাদিসে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার একটি ইন্দ্রেয় দ্বারা অনুভবযোগ্য, একটি অর্থগত এবং অপরটি গায়েবি বা অদৃশ্য। ইদ্রেয় দ্বারা অনুভবযোগ্য বিষয় এই যে, মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, যে কেউ এটা অনুভব করতে পারে। অর্থগত বৈশিষ্ট্যটি এই যে, আমল পরিমাপক মিযানে অত্র কালিমাদ্বয় অত্যন্ত ভারী হবে, এর আযমতের বোঝা অতি ব্যাপক হবে। আর গায়েবি বৈশিষ্ট্য এই যে, حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

যাই হোক, ইমাম বুখারী রহ.-এর সংকলন পদ্ধতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সর্বাগ্রে তিনি ওহীর আলোচনা উপস্থাপন করেছেন, কেননা ওহী হলো অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি বিষয়। কারণ ওহীর নির্যাস হলো ইলম। আর ইলম হলো সর্বপ্রকার সিফাত হতে উন্নততর সিফাত। কারণ সর্বপ্রকার সিফাতের কার্যকারিতা ইলমের উপর নির্ভরশীল, পক্ষান্তরে ইলম অন্য কোনো সিফাতের মুখাপেক্ষী নয়, সম্পূর্ণ পর-নির্ভরশীলতামুক্ত।

কোনো কাজ করার ব্যাপারে সর্বপ্রথম বিষয় হলো ইচ্ছাগ্রহণ। আর ইচ্ছা কেবল আপনি তখনই গ্রহণ করবেন যখন উদ্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে আপনার ইলম অর্জিত হবে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি অবগত থাকবেন। উদ্দেশ্যই যদি আপনার জানা না থাকে তবে আপনি কী করার ইচ্ছা করবেন? এমনিভাবে শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগ। শক্তি আপনি তখনই প্রয়োগ করবেন যখন আপনি অবগত হতে পারবেন যে, আমি কিসের পেছনে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করছি। লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত না হয়ে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা হবে পণ্ডশ্রম। সুতরাং শক্তি-সামর্থ্যের কার্যকারিতার জন্য ইলমের আবশ্যকতা রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছাগ্রহণের ব্যাপারে ইলমের আবশ্যকতা রয়েছে। শক্তি-সামর্থ্য ব্যয়ের ব্যাপারে ইলমের

আবশ্যকতা রয়েছে। এমনিভাবে শাসনক্ষমতা বা রাজত্বের ব্যাপারেও ইলমের মুখাপেক্ষিতা রয়েছে। আপনি যে বিষয়ের উপর শাসনক্ষমতা লাভ করবেন তার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আপনার জন্য আবশ্যক। কোনো একটি দেশ বা এলাকার উপর আপনি যখন শাসনক্ষমতা লাভ করবেন তখন ঐ এলাকার বিষয়ে আপনার ইলম থাকা আবশ্যক যে, তা কোথায় রয়েছে, তবেই না সেখানে গিয়ে স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। সুতরাং জনগণ ও ভূখণ্ড সম্পর্কে অবগত না হয়ে কর্তৃত্ব ও শাসনক্ষমতা লাভ করা সম্ভব নয়। অতএব, ইচ্ছাগ্রহণও ইলম নির্ভর। শক্তিপ্রয়োগও ইলম নির্ভর, শাসনক্ষমতাও ইলম নির্ভর। এমনিভাবে আপনি যখন কোনো জিনিসের হেফাযত করতে যাবেন তখন সর্বাগ্রে ঐ জিনিস সম্পর্কে আপনার ইলম থাকতে হবে। জিনিসটি সম্পর্কে অবগত না হয়ে আপনি কিভাবে তা হেফাযত করবেন? সুতরাং হাফিজ (হেফাযতকারী, সংরক্ষক) গুণ ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আলিম (জ্ঞানী) গুণের অধিকারী না হবে। সুতরাং সর্বপ্রকার গুণের কার্যকারিতা ইলমের উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে ইলম কারো মুখাপেক্ষী নয়। না ইচ্ছার উপর, না শক্তির উপর, না ক্ষমতার উপর।

আপনি ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছেন, সামনে তাকিয়ে একটি নদী বা পুকুর দেখতে পেলেন, আপনার জানা হয়ে যাবে যে এটি একটি নদী বা পুকুর। এর জন্য আপনার ইচ্ছা গ্রহণের আবশ্যকতা নেই। এমন নয় যে, আপনি যদি ইচ্ছা গ্রহণ করেন তবেই কেবল জানতে পারবেন যে, এটি একটি পুকুর আর ইচ্ছা গ্রহণ না করলে কিছুই জানতে পারবেন না। সুতরাং ইলমের জন্য ইচ্ছা গ্রহণের কোনো আবশ্যকতা নেই। বস্তু যখন সামনে এসে যাবে তখন আপনার তা সম্পর্কে ইলম হয়ে যাবে। আপনি শহর দেখলেন, আপনার জানা হয়ে গেল যে এটি শহর। ইলমের এমন মুখাপেক্ষিতা নেই যে আপনি প্রথমে শহর দেখে তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর বুঝে আসবে যে এটি একটি শহর। সুতরাং শহরের উপর আপনার কর্তৃত্ব থাকুক বা না থাকুক, যখন শহর সামনে আসবে তখন আপনার জানা হয়ে যাবে যে, এটা অমুক শহর। কাজেই ইলম না ইচ্ছার কাছে মুখাপেক্ষী, না শক্তির প্রতি মুখাপেক্ষী, না শাসনক্ষমতার উপর মুখাপেক্ষী; বরং অন্যান্য সকল সিফাত ও গুণাবলি ইলমের প্রতি মুখাপেক্ষী। সুতরাং ইলম হলো সকল সিফাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সিফাত, সকল সিফাতের মা এবং সবার চেয়ে উচ্চে তার অবস্থান। প্রমাণিত হলো, ইলম সবচেয়ে উঁচু ও উন্নত সিফাত, অন্যসব সিফাত তার প্রতি মুখাপেক্ষী। ওহীও তো ইলমেরই হাকিকত। আল্লাহ তায়লা তাঁর পয়গম্বরগণের উপর ওহী অবতরণ করেছেন– এর মানে কী? এর অর্থ এই যে, তিনি স্বীয় ইলম তাঁদের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়েছেন। সুতরাং ওহীর

অপর অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালার মহান ইলম। ইলম হলো মানুষের অতি প্রিয় একটি জিনিস, সুতরাং ওহীও তাদের অত্যন্ত প্রিয় একটি জিনিস। ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় কিতাব শুরু করতে গিয়ে মানুষের অতি প্রিয় একটি জিনিস দ্বারা শুরু করেছেন। অর্থাৎ بَابُ بَدْءِ الْوَحِيْ (ওহীর সূচনা পর্ব) আর এ কিতাবের সমাপ্তি টেনেছেন আরেকটি প্রিয় বিষয় দ্বারা–

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

আর এ কথা অতি স্পষ্ট যে, যে কিতাব প্রিয় জিনিস দ্বারা শুরু হয়েছে এবং প্রিয় জিনিসে এসে সমাপ্ত হয়েছে তার মর্ধবর্তীতে যা কিছু রয়েছে তাও মাহবুব বা প্রিয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ফার্সিতে একটি কথা আছেঃ

اول باآخر نسبت دارد

সকল সূচনার সাথে তার সমাপ্তির সংযোগ-সম্পর্ক থাকে।

আর মধ্যবর্তী বিষয়াবলি সূচনা বা সমাপ্তির অনুগামী হয়ে থাকে। কিতাবের সূচনা হয়েছে একটি মাহবুব বা প্রিয় বিষয় দ্বারা, তা হলো আল্লাহর ইলম, আর সমাপ্তিও হয়েছে এমন একটি আমল দ্বারা যা মহান আল্লাহ তায়ালার অতি প্রিয়। অর্থাৎ সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আজিম পড়া (এ আমলটি আল্লাহর নিকট প্রিয়)। যাই হোক, ইমাম বুখারী রহ.-এর সংকলন পদ্ধতি বাস্তবিকই অতি স্বতন্ত্র ও অভিনব। তাঁর অন্তর ও কলব যে স্তরে উপনীত হয়েছে অন্যরা সেথায় পৌঁছতে সক্ষম হননি। ইমাম বুখারী রহ.-এর জালালী শান ও কামালাতের দাবিই ছিল এই যে, তাঁর কিতাবও তদ্রূপ কামালাত দ্বারা পরিপূর্ণ হবে, আর হয়েছেও তাই।

বুখারী শরীফের বিশুদ্ধতা

হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী রহ. সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যর পরিচয় দিয়েছেন। সহি বুখারী শরীফে যে হাদিসগুলো রয়েছে তার সবগুলো ইমাম বুখারী রহ.-এর কঠিন শর্তে উৎরে যাওয়া। বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে এগুলো অত্যন্ত উচ্চস্তরের হাদিস। এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোনো হাদিসের কিতাবে সহি হাদিস নেই। মুসলিম শরীফেও সহি হাদিস রয়েছে, তিরমিযি শরীফেও সহি হাদিস রয়েছে, নাসায়ী শরীফেও সহি হাদিস রয়েছে। যা হোক, অন্যান্য হাদিস গ্রন্থেও সহি হাদিস রয়েছে কিন্তু যেই শর্তাবলি ও সতর্ক পর্যবেক্ষণ দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. হাদিস সংকলন করেছেন তার অবস্থান অন্যসব হাদিস গ্রন্থের

উর্ধ্বে। অত্যন্ত মজবুত শর্তাবলির আলোকে তিনি হাদিস চয়ন করেছেন। যাতে কোনো প্রকারের ওজর-আপত্তি তোলার অবকাশ নেই। ইমাম বুখারী রহ. যে কঠিন শর্তের আলোকে রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন তা অন্যসব সহি হাদিসের উর্ধ্ব-সীমার সহি। এ কারণেই বুখারী শরীফের ব্যাপারে উম্মত ঐকমত্যে পৌঁছেছে যে, أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব হলো বুখারী শরীফ। আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন মাজিদের পর বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সর্বোচ্চ অবস্থান বুখারী শরীফের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আর স্বাভাবিকভাবে এমনটি হওয়াই যথার্থ। কেননা কিতাবুল্লাহর মধ্যে তো মহান আল্লাহ তায়ালার ইলমের সমাহার। কিতাবুল্লাহ বলা হয় ঐ কিতাবকে যার মধ্যে আল্লাহর ইলম বিদ্যমান। আর এই বুখারী শরীফ প্রকৃতপক্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিতাব। এ কথা স্পষ্ট যে, আল্লাহর পরেই তো রাসূলের মর্যাদা। এ জন্যই রাসূলের কিতাবের মর্যাদাও আল্লাহর কিতাবের পরেই নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশুদ্ধতম কিতাব হলো আল্লাহ তায়ালার কিতাব। এই পৃথিবীতে এমন বিশুদ্ধতা, এমন ফযিলত ও সনদ অন্য কোনো আসমানী কিতাবের নসিব হয়নি। বরং বলা উচিত যে, একমাত্র কুরআনই হলো প্রকৃত কালামুল্লাহ।

অন্যান্য আসমানী কিতাবের স্বরূপ

তাওরাতও প্রকৃত অর্থে কালামুল্লাহ নয়, ইঞ্জিলও প্রকৃত অর্থের বিচারে কালামুল্লাহ নয়। কেননা কালাম বলা হয়– مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ অর্থাৎ কালাম হলো কথকের কথা। কারো পক্ষ হতে উচ্চারিত বাণীকেই প্রকৃত অর্থে কালাম বলা হয়। লিখে পাঠানো হলে তাকে রূপক অর্থে কালাম বলা যেতে পারে, প্রকৃত অর্থে তা কালাম নয়; বরং চিঠি। একে আপনি রূপক অর্থে কালাম বলবেন।

কোনো পদ্ধতিতে যদি আপনি আপনার মনের ভাব অন্যের মনে সঞ্চারিত করে দেন তবে তাকে আপনার কালাম বা কথা বলবেন না। কেননা আপনি মুখ দ্বারা তো বলেননি। মুসা আ.কে তাওরাত দেওয়া হয়েছে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা পাঠ করে শুনাননি; কাষ্ঠখণ্ডে তাওরাত লিখে তা মুসা আ.কে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাওরাত আল্লাহর কিতাব ঠিক আছে কিন্তু তা আল্লাহর কালাম নয়। রূপক অর্থে তাকে আল্লাহর কালাম বললে বলতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা কালাম নয়।

এমনিভাবে ইঞ্জিলের বিষয়বস্তুকে আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা আ.-এর অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন এবং তিনি তা নিজের ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। ইঞ্জিল হলো আমাদের হাদিসের মতো। হাদিসও ওহী। এর বিষয়বস্তু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে আগত কিন্তু ভাষা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর। ওহী দুই ধরনের– মাতলু ও গাইরে মাতলু। যার বিষয়বস্তু ও শব্দাবলি আল্লাহর তরফ হতে আগত তাকে 'ওহীয়ে মাতলু' এবং যার বিষয়বস্তু আল্লাহর পক্ষ হতে আগত কিন্তু শব্দাবলি রাসূলের, তাকে 'ওহীয়ে গাইরে মাতলু' বলা হয়। এ জন্যই ইঞ্জিলকে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত মাযমুন বা বিষয়বস্তু বলা হবে, আল্লাহর কালাম বলা হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা পাঠ করেননি বা উচ্চারণ করেননি। রূপক অর্থে আপনি বলবেন যে, এটা আল্লাহর কালাম কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাকে কালাম বলা যায় না। পক্ষান্তরে কুরআন মাজিদ প্রকৃত অর্থে আল্লাহর কালাম। ইহা লাওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে বিধায় তা আল্লাহর কিতাব, এবং জিবরাঈল আ.কে পাঠ করে শুনিয়েছেন বিধায় তা আল্লাহর কালাম।

পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে যে, যখন হযরত জিবরাঈল আ.-এর উপর ওহী নাযিল হতো তখন ওহীর আযমতে ফেরেশতাগণ বেহুঁশ হয়ে যেতেন। যখন তাদের হুঁশ ফিরে আসতো তখন জানতে চাইতেন–

قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

আমাদের পরোয়ারদেগার কী বলেছেন? তখন জিবরাঈল আ. বলতেন, তিনি সত্য বলেছেন, তিনি সমুন্নত, মহান। [সাবা ৩৪ : ২৩]

যাই হোক, আল্লাহ তায়ালা হযরত জিবরাঈল আ.কে পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন এবং হযরত জিবরাইল আ. তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনিয়েছেন।

একমাত্র কুরআনই হলো আল্লাহর কালাম

পবিত্র কুরআন মাজিদ একদিকে যেমন আল্লাহ তায়ালার কিতাব, অপর দিকে আল্লাহর কালাম। কিতাব হওয়া এভাবে যে, সর্বাগ্রে আল্লাহ তায়ালা একে লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন, অতঃপর তা হযরত ইসরাফিল আ.-এর কপালে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইসরাফিল আ.-এর কপালে লিখিত কুরআনের হরফ

সূক্ষ্ম ও ছোট এবং লাওহে মাহফুজে লিখিত কুরআনের হরফ অতি বড় বড় আকৃতির। কোনো কোনো হাদিসে রয়েছে যে, এক একটি হরফ কোহেকাফ (বিখ্যাত পর্বত) সমতুল্য। যেমন মহান লেখক তেমনই তার কলম, তেমনই তার হরফ এবং তেমনই বিশাল তার লেখার ফলক (লাওহে মাহফুজ)। লেখক যেমন অসীম ও মহান এক সত্তা, তার কলমের লিখনপদ্ধতিও তো তেমনই হবে! পক্ষান্তরে হযরত ইসরাফিল আ.-এর কপালে একই কালাম লিখিত হয়েছে ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম বর্ণে। এখান থেকেই হামায়েলের (অতি ক্ষুদ্র আকৃতির কুরআন) উৎপত্তি। মুসলমানগণ অতি বড় বড় ফলকেও কুরআন মাজিদ লিপিবদ্ধ করে আবার অতি ক্ষুদ্র হামায়েল শরীফও গলায় ঝুলায়। যা হোক, আল্লাহ তায়ালা হামায়েলও লিখেছেন আবার লাওহে মাহফুজে বিশাল আকৃতির হরফেও কুরআন মাজিদ লিখেছেন এবং তার স্বরূপও পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। যাই হোক, এই কুরআন একদিকে যেমন আল্লাহ তায়ালার কিতাব (লিখিত গ্রন্থ) অপর দিকে তেমন তাঁর কালাম। কালামের প্রকৃত অর্থ হলো তিলাওয়াতকৃত বা উচ্চারণকৃত বাণী। সর্বাগ্রে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এ কুরআন তিলাওয়াত করেছেন, অতঃপর হযরত জিবরাঈল আ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে তিলাওয়াত করেছেন। হাদিস শরীফে রয়েছে, হযরত জিবরাঈল আ. প্রত্যেক রমযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কুরআনের দাওর করতেন। অর্থাৎ প্রথমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন এবং জিবরাঈল আ. শুনতেন, অতঃপর জিবরাঈল আ. পড়তেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের বছর, যেটা ছিল তাঁর শেষ রমযান, সেই রমযানে দুইবার দাওর করেছেন। সুতরাং নান্যাভাবে কুরআনের তিলাওয়াত প্রমাণিত হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখেও তিলাওয়াত হয়েছে, ফেরেশতার যবানেও তিলাওয়াত হয়েছে এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও তিলাওয়াত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত কালাম একমাত্র এই কুরআন মাজিদ। অন্যান্য আসমানী কিতাবকে রূপক অর্থে আল্লাহর কালাম বলা হয়েছে, প্রকৃত অর্থে নয়। প্রকৃত অর্থে সেগুলো হয়তো আল্লাহর কিতাব, না হয় আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত বিষয়বস্তু। কালাম একমাত্র তাকে বলা হবে যা তাকাল্লুম হয়েছে বা কথক থেকে কথারূপে প্রকাশ লাভ করেছে।

কুরআন ও হাদীসের স্বতন্ত্র্যতা

হাদিস সম্পর্কে বলা যায় যে, তার বিষয়বস্তু আল্লাহর পক্ষ হতেই আগত কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শব্দ ও ভাষায় তা প্রকাশ পেয়েছে। আর কুরআন হলো আল্লাহর কালাম। যার শব্দ ও বিষয়বস্তু উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে আগত। এ কারণেই একে ওহীয়ে মাতলু বলা হয়। অর্থাৎ এমন ওহী যা তিলাওয়াতের দাবি রাখে। পক্ষান্তরে হাদিসকে বলা হয় ওহীয়ে গাইরে মাতলু। অর্থাৎ কুরআনের মতো করে তিলাওয়াতের দাবি রাখে না; কিন্তু ভালবাসা ও উপকার সাধনের মানসিকতার দাবি হলো হাদিসের তিলাওয়াতও বজায় রাখা।

কোনো কোনো ওলামায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল যে, তারা যখন দু'চার পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন তারা বুখারী শরীফ থেকেও এক পারা বা আধা পারা কিংবা এক পারার এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ তিলাওয়াত করতেন। এখনও এমন ওলামায়ে কেরাম রয়েছেন যারা বুখারী শরীফ নিয়মিত তিলাওয়াত করেন এবং দুই/তিন বছরে খতম করেন। হাদিস তিলাওয়াত করার দ্বারা একদিকে যেমন বরকত লাভ হয় অপর দিকে তেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নিসবত বা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যার বাণী যত বেশি পড়া হয় তার সাথে তত সমপর্ক স্থাপিত হয়। অর্থাৎ অন্তরের বন্ধন ও সংযোগ স্থাপিত হয়। আর কোনো ব্যক্তি যখন অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করে তখন তার সামনে হাকিকত উন্মোচিত হয়ে যায়। মুরাকাবার সাথে পাঠ করলে কাইফিয়াতের জগৎ (রহস্য উন্মোচন) উন্মুক্ত হতে থাকে।

শাহ রফিউদ্দিন রহ. লেখেন, যখন তিলাওয়াত করতে বস তখন এভাবে কল্পনা কর যে, প্রকৃত তিলাওয়াতকারী হলেন মহান আল্লাহ তায়ালার সত্তা। আমি তিলাওয়াত করছি না, আল্লাহ তিলাওয়াত করছেন। মুখ আমার, কালাম তাঁর। তাঁরই কালাম আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى ○

তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মনগড়া কিছুই বলেন না, তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়। [নাজম ৫৩ : ২-৩]

অর্থাৎ আল্লাহ বলছেন, আমার নবী তোমাদের সামনে যে কালাম উপস্থাপন করছেন তা আমারই কালাম। নবীর যবানকে মাধ্যম করে আমার কালাম প্রকাশিত হচ্ছে।

যা হোক, শাহ রফিউদ্দিন রহ. লেখেন, তিলাওয়াত করতে বসলে এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিলাওয়াত কর যে, এটা আল্লাহরই কালাম। তিনিই পাঠ করছেন। আমার কেবল জিহ্বা নড়ছে। আমার কণ্ঠকে মাধ্যম করে আল্লাহর কালাম প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি আরো লেখেন, এই মোরাকাবা যখন সুদৃঢ় হয়ে যাবে তখন গায়েব থেকে স্পষ্টভাবে কাশফের মাধ্যমে নিজের ভেতরে আওয়াজও আসতে থাকবে যে, প্রকৃতপক্ষেই তুমি তিলাওয়াত করছ না, আল্লাহ তায়ালাই তিলাওয়াত করছেন। আর তিনি যখন তিলাওয়াতকারী হবেন তখন সমসগ্র বিশ্বজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সরব হয়ে উঠবে। গাছের প্রতিটি পাতা থেকে আওয়াজ আসবে যে, তিলাওয়াত করা হচ্ছে।

মোটকথা, আল্লাহর কালামের এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে, আপনি যতই পাঠ করতে থাকবেন ততই এর স্বাদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে। আর যদি ঐভাবে মোরাকাবার সাথে তিলাওয়াত করেন তাহলে উক্ত আয়াতের মধ্যে যে কাইফিয়াত নিহিত রয়েছে তার প্রভাব কলবের মধ্যে ভাস্বর হয়ে উঠবে এবং কলব ও রূহ তা অনুভব করবে। আর কেয়ামতে গিয়ে চোখ তা প্রত্যক্ষ করবে।

কুরআনের মাহাত্ম্য এবং পয়গম্বরের মহিমান্বিত শান

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন লাওহে মাহফুজকে সম্বোধন করে বলবেন, কুরআন নিয়ে এসো। লাওহে মাহফুজ আরজ করবে, কুরআন তো জিবরাঈল আমীন নিয়ে গিয়েছিলেন। জিবরাঈল আ.কে ডাকা হবে। তিনি যখন আসবেন তখন তার হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকবে। না জানি কী হয়– এ ভাবনায় তিনি ভীত, কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসবেন। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, লাওহে মাহফুজ থেকে তুমি কি কুরআন নিয়ে এসেছ? তিনি আরজ করবেন, হ্যাঁ, আমি নিয়ে এসেছি। কোথায় নিয়ে গিয়েছ? আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলব মোবারকে নাযিল করেছি। এরপর জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তলব করা হবে। আল্লাহ তায়ালা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবেন, জিবরাঈল কি আমার কুরআন আপনার কাছে পৌঁছে দিয়েছে? তিনি বলবেন, নিঃসন্দেহে তিনি আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা পুনরায় বলবেন, আপনি কী করেছেন? আমি আমার উম্মতের সামনে তিলাওয়াত

করেছি, তাদেরকে শিখিয়েছি এবং তালিমও দিয়েছি। কুরআনের কাইফিয়াতও আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের তালিম দেন এবং তাদের আত্মশুদ্ধি করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন, ঠিক আছে, এবার আপনি আমার সামনে এবং এই উম্মতগণের সামনেও তিলাওয়াত করুন। হাদিসে রয়েছে, সেই স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বর স্থাপন করা হবে। আজ যেখানে তাঁর মিম্বর রয়েছে, অর্থাৎ মসজিদে নববীতে; সেখানেই সেদিন তাঁর মিম্বর স্থাপন করা হবে। তার উপর বসে তিনি পূর্ণ তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করবেন.। শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ কুরআন সেদিন তিনি তিলাওয়াত করবেন। পৃথিবীর সকল মানুষ তখন তা শুনবে। তো সেদিন সাহাবায়ে কেরাম বলবেন, আজ আমরা যে কুরআন শুনছি তাতো পূর্বে কখনোই শুনিনি। কেননা, কুরআনের যে কাইফিয়াত কেবল রূহ অনুভব করত সেদিন তা চোখের সামনে দৃশ্যমান হবে। কুরআন অপরূপ এক উদ্যান ও বাগিচায় রূপ নেবে। তাতে অনিন্দ্য সুন্দর ও অপূর্ব সব ফুলেরা প্রস্ফুটিত হয়ে থাকবে। অপূর্ব ও বিস্ময়কর সব সুগন্ধিতে চারদিক মাতোয়ার হয়ে উঠবে। তো পূর্ণ কুরআনকে সেদিন আকার-আকৃতি মণ্ডিত করা হবে। পৃথিবীতে যে কাইফিয়াত কেবল রূহ অনুভব করতে পারে কেয়ামতে তা চোখ অবলোকন করতে পারবে।

এ কথা স্পষ্ট যে, যখন আল্লাহ তায়ালা সামনে উপস্থিত থাকবেন, সকল নবী-রাসূল ও ফেরেশতাগণের সম্মিলন হবে এবং সাইয়েদুল আউয়ালিন ওয়াল আখেরিন তিলাওয়াত করতে থাকবেন– তখন কলবের উপর ভাস্বর হয়ে ওঠা কুরআনের কাইফিয়াত কেমন হতে পারে! সেখান থেকে আরো অগ্রসর হয়ে তা যখন চোখের সামনে উপস্থাপিত হবে– কেমন হবে তখনকার অবস্থা! (সুবহানাল্লাহ)।

যাই হোক, কুরআনের প্রথম বিষয় হলো শব্দ। দ্বিতীয় বিষয় হলো অর্থ। তৃতীয় বিষয় হাকিকত এবং চতুর্থ বিষয় হলো তার কাইফিয়াত, যা রূহের উপর ভাস্বর হয়ে থাকে। কখনো ভয়ের প্রাধান্য, কখনো আনন্দের প্রাধান্য, কখনো সন্তুষ্টির, কখনো আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য। কখনো রহমত এসে সামনে দাঁড়ায়, কখনো গজব। এসবকিছু এখানে বসে কেবল রূহ অনুভব করতে পারে আর ওখানে চোখও তা দেখতে শুরু করবে।

এ জন্যই আমি আরজ করেছিলাম যে, কুরআনুল কারীমে তো উলুহিয়্যাতের কাইফিয়াত সংরক্ষিত রয়েছে, পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালামে রয়েছে নবুওয়াতের কাইফিয়াত। যদি কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন তবে কাইফিয়াতে এলাহী আপনার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করবে, আর যদি নবীজির কালাম তিলাওয়াত করেন তবে নবুওয়াতের কাইফিয়াত (গুণের স্বরূপ) আপনার অন্তরে প্রভাব ফেলবে। তখনই আপনি অনুভব করবেন যে, এ কেমন অপার বিস্ময়কর দুর্লভ এক কালাম। এতে লুকিয়ে রয়েছে কত সমুদ্রের গভীরতা!

যাই হোক, সে এক দীর্ঘ উপাখ্যান, আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আজকের আলোচনায় দুটি বিষয় আরজ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। একটি হলো বুখারী শরীফের সংকলন ও রচনা শৈলীর উপর দৃষ্টিপাত করা, আরেকটি হলো হাদিসের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের জন্য শুভ পরিণতি নসীব করুন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد والـــه واصحابـــه

اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.

বয়ান : ৭

ইফাদাতে বুখারী– দুই

ইমাম বুখারী রহ.-এর রচনা ও সংকলন পদ্ধতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ। এমনকি এই শুরু ও শেষ হাদিসের মাঝেও সে পূর্ণতা ভাস্বর হয়ে আছে। সূচনায় বান্দাকে বন্দেগি সম্পর্কে বুঝিয়েছেন এবং সমাপ্তিতে এসে উলুহিয়্যাতের মাকামাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর এ দু'য়ের মধ্যবর্তীতে অন্যান্য অধ্যায়সমূহের সন্নিবেশ ঘটেছে। তার মধ্যে ইবাদতও রয়েছে, লেনদেন ও আচার-আচরণও রয়েছে, শাসনব্যবস্থা ও বিচারপদ্ধতিও রয়েছে। এভাবে দীনের সকল বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে এই দুই হাদিসের মধ্যবর্তী অংশে। সূচনা ও সমাপ্তিকে নিয়ত ও মিযান দ্বারা বেষ্টনী দিয়েছেন। এর অর্থ হলো এই যে, যদি এই দুই প্রান্ত সঠিক থাকে তাহলে ইবাদত, মুয়াশারাত– সবকিছুই কবুল হয়ে যাবে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মাধ্যমে পরিণত হবে। এ কারণেই আমি শুরু ও শেষ– উভয় হাদিসই তিলাওয়াত করেছি।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



প্রসঙ্গ কথা

দারুল ইলুম দেওবন্দের মুহতামিম, হাকিমুল ইসলাম কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব রহ. দারুল উলুম হক্কানিয়া (পাকিস্তান) মাদরাসায় তাশরিফ নিয়ে গেলে সেখানকার তোলাবা ও আসাতাজায়ে কেরামের আগ্রহে মাদরাসার দারুল হাদিসে বুখারী শরীফের শুরু ও শেষ হাদিসের উপর অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করেন। ২০ রজব ১৩৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৩ অক্টোবর ১৯৬৮ সালে রোজ রবিবার এ দরস উপস্থাপন করেন। তখন দারুল হাদিস ও এর আশপাশের জায়গা আহলে ইলমের সমাগমে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। অপূর্ব এক নূরানী ফায়েজ সে স্থানটিকে আচ্ছাদিত করে নিয়েছিল। ইলম ও কাসেমী মারেফাতের এ ফায়েজ আসরের নামাজ পর্যন্ত জারি ছিল। এ অনুষ্ঠান এক অর্থে দারুল উলুম দেওবন্দকে দারুল উলুম হক্কানিয়ার পক্ষ হতে সাদরে বরণ করার অনুষ্ঠানও ছিল। সে কারণে হযরত শায়খুল হাদিস মুদ্দাযিলুহুর পক্ষ হতে দারুল উলুমের শিক্ষক মাওলনা শের আলী শাহ আরবী ভাষায় অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ও চমৎকার রচনা-শৈলীর একটি প্রশংসাপত্র উপস্থাপন করেন। হযরত কাসেম নানুতুবী রহ.-এর ফায়েজের ধারক-বাহক হযরত হাকীমুল ইলাম রহ. নিজ আলোচনার প্রারম্ভে উক্ত প্রশংসাপত্র বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবির হযরতদের বিনয়, বিনম্রতা, নিজেকে হীন ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মানসিকতার কথা আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেয়। সেদিন হযরতের তাকরীর টেপ রেকর্ডারে ধারণ করা হয়েছিল। আজ তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকদের খেদমতে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

ইদারাতুল হক
দারুল উলুম হক্কানিয়া
আকরাখাটক, পাকিস্তান।



اَلْحَمْدُ للهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، اَرْسَلَهُ اللهُ اِلٰى كَافَّةِ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَيْهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا. صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِه وَصَحْبِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ (اِلٰى قَوْلِه) سَمِعْتُ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رض عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُه اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا، اَوْ اِلٰى اِمْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُه اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهَا.

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَرض قَالَ، قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:
كَلِمَتَانِ خَفِیْفَتَانِ عَلَی اللِّسَانِ، ثَقِیْلَتَانِ فِی الْمِیْزَانِ، حَبِیْبَتَانِ
إِلَی الرَّحْمَانِ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ.

প্রশংসাপত্রের প্রতিউত্তর

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আজকের এ মজলিস কোনো ওয়াজ-নসিহত বা সাধারণ জনসভা নয়। এটি একটি দরসের মজলিস। এ কারণে আমি সহি বুখারী শরীফের দুটি হাদিস তিলাওয়াত করেছি। যার একটি বুখারী শরীফের একেবারে সূচনা হাদিস আর অপরটি একেবারে সমাপ্তির হাদিস। শুরু ও সমাপ্তির মাঝখানে থাকে 'মধ্যবর্তী অংশ'। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি যেন হুকমীভাবে পূর্ণ বুখারী শরীফই আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করলাম।

যে প্রশংসাপত্র পেশ করা হলো তা আমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের নাজাতপত্র। কেননা উপস্থাপনকারী হিসেবে যাঁর নাম মোবারক উল্লেখ করা হয়েছে, সেই হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেব মুদ্দাযিল্লুহুকে আমি আমার উস্তাদদের কাতারে গণ্য করি। সে জন্য তাঁর প্রশংসাপত্র মূলত অনুরাগপত্র। প্রশংসাপত্র তো ছোটদের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। বড়দের পক্ষ হতে এলে তা অনুরাগ, উৎসাহ প্রদান ও বরকতের জন্য হয়ে থাকে। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِی الْأَرْضِ

পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর সাক্ষী।

সত্য সাক্ষীদাতা যখন কারো ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ভাল তখন সে আল্লাহর কাছে ভাল বলে সাব্যস্ত হয়। এই হযরতদের প্রশংসাপত্র যদিও সম্মান প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের মানসিকতা নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি আল্লাহর অলির যবান থেকে যা উচ্চারিত হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ হতে আগত। আমি যতই নালায়েক হই না কেন, যখন এমন পবিত্র ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন তখন আল্লাহর কাছে এমন কি কঠিন যে, তিনি কোনো অযোগ্যকে যোগ্য করে দেবেন। উক্ত প্রশংসাপত্র দোয়াপত্র বা অনুরাগপত্র হওয়ারই যোগ্য। কেননা দরস প্রশংসাপত্রের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। তা ছাড়া এই দারুল উলুম হক্কানিয়াকে

আমি আমার নিজেরই ঘর মনে করি। মনে হচ্ছে দারুল উলুম দেওবন্দে বসে আছি। নিজের ঘরেরই একটি অংশে বসে আছি। কাউকে কি তার নিজ ঘর থেকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়? ইহা তো অন্যত্র থেকে আগতদেরকে দেওয়া হয়।

অনেক সময় ভাই-বেরাদারগণ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, কিন্তু ব্যক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার দ্বারা খান্দান ভিন্ন হয়ে যায় না। আমাদের ইলমী খান্দান সকলেরই এক, এর শাখা বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃত। কিছু দেওবন্দে, কিছু পাকিস্তানে, কিছু বার্মায় এবং কিছু আফ্রিকায়। সবাই একই সূত্রে গাঁথা, তবে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন স্থানে। আমাদের সকলেরই মূল এক, যাকে দারুল উলুম দেওবন্দ বলা হয়। এ কারণেই আপনারা যেমন তার শাখা, আমিও তেমন তার একটি শাখা। আমি আমার জ্ঞাতির কাছে এসেছি, ভাইদের কাছে এসেছি। সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি ভিন্ন; ভাইদের মধ্যে প্রশংসাপত্র একটি রুসুমী ব্যাপার। তবে যেহেতু আহলে হক এটা পেশ করছেন সেহেতু আমি একে রুসুমও মনে করি না। আমি মনে করি এতে একটি হাকিকত নিহিত রয়েছে। যা-কিছু বর্ণিত হয়েছে তা অন্তরের গভীরতা হতে উৎসারিত। বর্ণিত হয়েছে– এটা মুখ ও কলমের কোনো পদক্ষেপ নয় বরং দিলের পদক্ষেপ। আর দিল থেকে যখন এক ক্ষুদ্র ও অযোগ্যকে ভাল বলা হয়েছে তখন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর দরবারেও সে ভাল বলে সাব্যস্ত হবে।

আজ আমি সাধারণ কোনো ওয়াজ-নসিহতের পরিবর্তে অদ্যকার সভার সাথে সংগতিপূর্ণ সহি বুখারী শরীফের দুটি হাদিস তিলাওয়াত করেছি। তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে এ হাদিস দুটি প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করব। হযরত আসাতাজায়ে কেরাম আমার লক্ষ্য নন। এঁরা আমার উস্তাদ পর্যায়ের। আমার কথাবার্তা হবে ছাত্রদের সাথে, যারা আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় ভাই।

ইলমের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে আপনারা আমার চেয়ে উত্তম। আপনাদের ইলম এখন তাজা। আমি পড়েছি চল্লিশ বছর পূর্বে। কী পড়েছিলাম তাও ভুলেটুলে গেছি। মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্বে জড়িয়ে পূর্বেকার সেই অবস্থাও এখন আর নেই। এ জন্যই আমি আপনার ভাই তো বটে, কিন্তু এক মূর্খ কিসিমের ভাই। আনারা আলহামদুলিল্লাহ সবাই ওলামা, আপনাদের ইলম তাজা, তবুও যেহেতু আপনারা আমাকে এ স্থানে বসিয়েছেন, সে কারণে অবস্থার সাথে সামাঞ্জস্য রেখে এই রেওয়ায়াত দুটি তিলাওয়াত করেছি।

ইমাম বুখারী রহ. ও তাঁর কিতাবের উচ্চ মর্যাদা

ইমাম বুখারী রহ.-এর শান ও মর্যাদা বিষয়ে কোন্ মুসলমান অবগত নয়? আলেম ওলামাদের মধ্যে এ বিষয়ে অবগত নন এমন কেউ আছেন? তাঁর রচিত বা সংকলিত সহি বুখারী শরীফের আযমত ও মর্যাদা সকল উম্মতের কাছেই সুস্পষ্ট। সকল উম্মত সম্মিলিতভাবে স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, اَصَحُّ الْكِتَابِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ 'আল্লাহর কিতাবের পরে সবচেয়ে সহি কিতাব হলো বুখারী শরীফ।' এ জন্যই এ কিতাবের সংকলকও অতি সম্মানিত, কিতাবও অতি সম্মানিত আর আলোচ্য-বিষয়ও তাই। এর আলোচ্য-বিষয় হলো হাদিস। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালাম, কাজ, বক্তব্য ও বর্ণনা। কাজেই এর আলোচ্য বিষয়ও মোবরক, লেখকও মোবারক এবং সংকলনও মোবারকময়। এই মোবারক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও মোবারক বানিয়ে দিন।

মুহাদ্দিসিনে কেরামের কাছে ইমাম বুখারী রহ.-এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সুবিদিত। ইমাম নাসায়ী রহ. সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি ইমাম বুখারী রহ.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিন্তু মূল আর শাখা সবসময়ই ভিন্নতার দাবি রাখে। বুখারী রহ.-এর সংকলনপদ্ধতি অতি উঁচু মানের। বুখারীর তারাজিম তো প্রকৃতপক্ষে ফিকাহ্'র একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। ফিকহুল বুখারী ফি তারাজিমিহী– ইমাম বুখারীর ফিকাহ তার তারাজিমের মধ্যে। সে মতে ইমাম বুখারী রহ. একাধারে মুহাদ্দিস এবং ফকীহ। এমন ফকীহ যিনি ইজতেহাদের মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন। এ কারণেই বরকতের উদ্দেশ্যে আমি বুখারী শরীফের প্রথম হাদিসও তিলাওয়াত করেছি এবং শেষ হাদিসও তিলাওয়াত করেছি।

আমলী জগতের দুটি বিষয়

আমার তিলাওয়াতকৃত উভয় হাদিস প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই। না সময় আছে, না তেমন শক্তি-সামর্থ্য আছে। তবে সামগ্রিকভাবে এতটুকু বলছি যে, মানুষের আমলী জগতের দুটি মাত্র বিষয় রয়েছে। একটি হলো মাসদারে আমল (আমলের উৎসমূল), আরেকটি হলো মাজহারে আমল (আমলের স্বরূপ)। মাসদারে আমল হলো ঐ বিষয় যার দ্বারা আমল প্রকাশ ও স্থিতি লাভ করে। আর মাজহারে আমল হলো ঐ আকৃতি ও স্বরূপ যার দ্বারা আপনি-আমি আমল আঞ্জাম দেই। বস্তুত মাসদারে আমল হলো মানুষের নিয়ত। যার দ্বারা আমল নিরুপিত হয়। আমল কবুল হওয়া না হওয়া এই

নিয়তের উপরই নির্ভর করে। আমল যত উত্তমই হোক না কেন, নিয়ত খারাপ হওয়ার দ্বারা তা খারাপ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অতি নিকৃষ্ট কাজও নিয়তের শুদ্ধতা দ্বারা কবুল হয়ে যায়। এ কারণেই সবচেয়ে বড় বিষয় হলো নিয়ত, যা আমলের উৎসমূল। আর এমন পাক আমলের পরিণাম হলো এই– এ আমল মিযানে অতি ভারী হয়ে যাবে। নেক আমলের দ্বারাই মিযানে ভার সৃষ্টি হবে। খারাপ আমলের কোনো ওজন নেই। এমনকি খারাপ আমল মাপে আনারও প্রয়োজন নেই। যখন ভাল-মন্দ একত্র হবে তখনই মাপার প্রয়োজন পড়বে। এতে করে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই আমলী জগতে মাত্র দুটি বিষয় রয়েছে। একটি মাসদারে আমল বা আমলের উৎসমূল, আরেকটি মাজহারে আমল বা আমলের ফল। সুতরাং ইমাম বুখারী রহ. কিতাবের শুরুতে إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (সমস্ত কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল)। হাদিসটি সংকলন করে যেন বলতে চাচ্ছেন, নিয়ত হলো আমলের বুনিয়াদ। আমল মূলত এই নিয়ত দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। আমল কবুল হওয়াও এই নিয়তের উপর নির্ভর করে। এ কথা ভিন্ন বিষয় যে, কিছু কিছু আমল নিয়ত ছাড়াও সহি হয়ে যায় এবং শরীয়তও তার গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু পরকালের প্রতিদান ও সাওয়াব নিয়ত ছাড়া গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। অজু যদি আপনি নিয়ত ছাড়াও করেন তবু তা মিফতাহুস সালাত (নামাজের চাবি) বলে সাব্যস্ত হবে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ত না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য সাওয়াব নির্ধারণ হবে না।* সুতরাং আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার মাপকাঠি মূলত নিয়ত। সহি হওয়ার মাপকাঠিতে ফতোয়া হয়ে থাকে। এ কারণেই কিছু কিছু আমল নিয়ত ছাড়া সহি হয় না, কিছু কিছু আমল সহি হলেও তাতে সাওয়াব পাওয়া যায় না।

আমলের ভিত্তি হলো নিয়ত

নিয়ত হলো এমন একটি মৌলিক জিনিস যার দ্বারা আমল গৃহীত হওয়া না-হওয়া নির্ধারণ হয়। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

نِيَّةُ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ.

---

* অযুতে নিয়ত করা মুস্তাহাব। নিয়ত না করলেও অযু হয়ে যাবে এবং তার দ্বারা নামাজও শুদ্ধ হবে, কিন্তু অযুর সাওয়াব হতে বঞ্চিত হবে। –অনুবাদক।

মানুষের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, কেয়ামতের দিন এমন কিছু মানুষ উপস্থিত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন যে, লিখে দাও এরা জীবনভর তাহাজ্জুদ পড়েছে। ফেরেশতাগণ আরজ করবেন, এরা একদিনও তো তাহাজ্জুদ পড়েনি। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, প্রতিদিন এরা ঘুমবার সময় নিয়ত করত যে, আজ তাহাজ্জুদ পড়ব, কিন্তু ঘুম থেকে উঠতে পারত না। সুতরাং লিখে দাও যে, তারা সারা জীবন তাহাজ্জুদ পড়েছে। দেখা যাচ্ছে, মানুষের নিয়ত তার আমলের বুনিয়াদ।

বাবসমূহের মধ্যে সম্পর্ক

নিয়ত ও আমলের বিষয়টিকে অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, মানুষ প্রথমে অন্তর দিয়ে আমল করে, অতঃপর হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গ দিয়ে। সেই অন্তরের আমলই হলো বুনিয়াদ, যার দ্বারা হাত-পায়ের আমল প্রকাশ লাভ করে। সুতরাং কলব দ্বারা আমল করার পদ্ধতি হলো নিয়ত, আর শরীয়ত কর্তৃক আদিষ্ট আমলের স্বরূপ অঙ্গ দ্বারা প্রকাশ পায়। মোটকথা, প্রতিটি আমল প্রথমে কলব দ্বারা হয়, অতঃপর তা অঙ্গ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। আর এই অঙ্গের আমল কলবের আমলের সাথে সমতা বিধান করে (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে সমতাবিধান বা সমন্বয় না হলে আমলটি গ্রহণযোগ্য হয় না)। যাই হোক, প্রতিটি আমলের রূপ দুটি কিন্তু আমল মূলত একটি। অভ্যন্তরীণ রূপ হলো নিয়ত আর বাহ্যিক রূপ হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কৃত আমলের অবয়ব।

ইমাম হুমাম (বুখারী) রহ. সর্বাগ্রে এমন একটি বুনিয়াদি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, এমন কোনো আমল নেই যার মধ্যে নিয়তের প্রভাব নেই এবং তার সাওয়াব ও প্রতিদানের সাথে নিয়তের সম্পর্ক নেই। প্রতিটি আমলই নিয়তের প্রভাবে প্রভাবিত এবং তার সাওয়াব ও প্রতিদান নিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তারতীব বা ধারাক্রম এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রথমে নিয়তকে শুদ্ধ করে দেওয়া হোক, এরপর ঈমান, ইলম যাকাত ও অন্যান্য বাব বর্ণনা করেছেন। নিয়তকেই অন্যান্য সকল বাবের মাসদার বা উৎসমূল সাব্যস্ত করেছেন। এভাবেই সবগুলো বাব হুকমীভাবে নিয়তের আওতাভুক্ত হয়ে গেছে।

আমলের প্রতিদান ব্যবস্থা

সর্বশেষে যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য ছিল তা হলো আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া এবং তার উপর প্রতিদান কার্যকর হওয়া। এ জন্যই তিনি সর্বশেষে এসে এই হাদিসটি বর্ণনা করেন:

كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

দুটি কালিমা এমন রয়েছে যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, এগুলো পাঠ করতে সময়ও লাগে না এবং কষ্টও হয় না। একটি কালিমা হলো 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' আরেকটি হলো 'সুবহানাল্লাহিল আজিম'।

এই যে সহজ-সরল দুটি বাক্য– যা মুখে উচ্চারণ অতিশয় সহজ ও সুমিষ্ট, কিন্তু প্রতিদানের দিক দিয়ে অত্যন্ত ভারী। মিযানে এর যে ওজন হবে তা অন্যান্য আমলের হবে না। কিসের কারণে এর এত ওজন?

কালিমা দুটি ওজনে ভারী হওয়ার কারণ

অত্র কালিমা দুটি মিযানে এত ভারী হওয়ার হাকিকত হলো এই যে, এতে আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাতের স্তর ও মাকাম বর্ণিত হয়েছে। আর এ কথা স্পষ্ট যে, তা এমনই মহান, এমনই মর্যাদাবান যে, সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই তার আশেপাশে যাওয়া সম্ভব নয়। সারকথা এই যে, মাকামাতে উলুহিয়্যাতকে (প্রভূত্বের স্তর ও মর্যাদা) এই বাক্য দুটি দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। অত্র কালিমা দুটি দ্বারা এ কথা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা অংশীদারিত্ব হতে মুক্ত, না মিশ্রিত– না অবিমিশ্রিত, সবকিছু হতে পরম আড়াল। অথচ স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়্যাতের মাকাম অসীম ও অবর্ণনীয়। এ বাক্যদ্বয় দ্বারা আল্লাহর পরিচয় সর্বোত্তমভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

পবিত্রতার মাকাম

আল্লাহ তায়ালার মাকামাত তথা মর্যাদাগত স্তরের মধ্যে সর্বপ্রথম মাকাম হলো তানযিহ বা পবিত্রতা। অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হতে পবিত। সর্বপ্রকার অসম্পূর্ণতার উর্ধ্বে এবং সর্বপ্রকার দোষ মুক্ত। তানযিহ ও পবিত্রতার কথা

প্রকাশ করায় স্পষ্ট হলো যে, তা মাকামাতে উলুহিয়্যাতের একটি মাকাম। কেননা খোদা বলা হয় ঐ সত্তাকে যিনি সর্বপ্রকার খারাবি হতে পবিত্র।

اَلْخَيْرُ كُلُّه مِنْكَ وَ اِلَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ

সর্বপ্রকার কল্যাণের আধার আপনি, আপনিই উৎস।
অকল্যাণ আপনার জন্য নয়।

সর্বপ্রকার কল্যাণের উসৎ তিনি, তাঁর দ্বারাই কল্যাণ পরিচালিত হয়। তিনি সর্বপ্রকার অকল্যাণ হতে পবিত্র, উর্ধ্বে। তাঁর সত্তাও অকল্যাণমুক্ত এবং বাইরের অকল্যাণও তাঁর কাছে পৌছতে পারে না। কাজেই সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পবিত্র। সুতরাং উলুহিয়্যাতের প্রথম স্তর হলো এই যে, তিনি হলেন সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত পবিত্র এক সত্তা। মাকামাতে উলুহিয়্যাতের প্রথম বিষয় হলো পবিত্রতা। সুবহানাল্লাহ বলা এ দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, আমরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। যেই বরকতময় সত্তা সকল দোষ-ত্রুটিমুক্ত, উলুহিয়্যাত কেবল তাঁরই শান হতে পারে। এই হলো উলুহিয়্যাতের একটি মাকাম।

এরপর থাকে গুণাবলি ও সৌন্দর্য প্রসঙ্গ। যেখানে যত রকমের গুণাবলি ও সৌন্দর্য রয়েছে তা তাঁরই সত্তা হতে উৎসারিত। আপনি যদি ইলমের দিকে লক্ষ করেন, দেখবেন আসল ইলম আল্লাহ তায়ালার। তাঁর ইলমের জ্যোতি যখন অন্যদের উপর পড়ে তখন তাকে আলেম বলা হয়। কুদরত বা শক্তি-সামর্থ্যের প্রকৃত অধিকারী তিনি। তাঁর কুদরতের ঝলক যখন ফেরেশতাদের উপর পতিত হয় তখন তারা শক্তিশালী বলে আখ্যায়িত হন। পলকের মধ্যে আসমান হতে জমিন এবং জমিন হতে আসমানে যাতায়াত করেন। তাঁর ইলম সত্তাগত ও প্রকৃত। তাঁর ইলমের বিচ্ছুরিত আলো আমাদের উপর পড়ায় আপনি আমি আলেম নামে সম্বোধিত হচ্ছি। মানুষকে তিনি ইলম প্রকাশের আধার করেছেন। সমুন্নত মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁরই শান। তাঁর এ শানের আলো আসমানের উপর পতিত হয়েছে বিধায় সে উর্ধ্ব ও উন্নত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর সত্তাই হলো যাবতীয় কামালাত ও পূর্ণতার উৎস। এ কথা স্পষ্ট যে, কামালিয়াতের ভিত্তিতেই প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা হয়। দোষ ও ত্রুটির ভিত্তিতে কেউ কারো প্রশংসা ও গুণগান করে না। সুতরাং অন্তর্নিহিত গুণের বিচারে প্রশংসা ও তারিফ করা হয়।

মাকামে তামহিদ

যেহেতু মহান আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় কামালাতের উৎস এবং সকল বরকতের আধার সেহেতু সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য হওয়া কর্তব্য। সকল হামদ ও সানার অধিকারী হবেন তিনি। যারই প্রশংসা করা হোক না কেন, আপ্তামদাতা হিসেবে মূলত তা আল্লাহ তায়ালারই কামালাত– যা অন্যের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং হামদ ও সানা প্রকাশ করার পদ্ধতি মূলত তামহিদ বা আলহামদুলিল্লাহর মাধ্যমে তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসার ঘোষণা দেওয়া। এ জন্যই আলহামদুলিল্লাহ শব্দের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

যাই হোক, প্রথম মাকাম তানযিহ তথা পবিত্রতা ঘোষণার জন্য সুবহানাল্লাহ শব্দ রাখা হয়েছে এবং দ্বিতীয় মাকাম তামহিদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ শব্দ রাখা হয়েছে। এ কারণেই কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে বর্ণিত হয়েছেঃ

سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا – فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ – وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ. وغير ذالك

এভাবেই বিভিন্ন জায়গায় তাসবীহ, তামহিদ ও সানার কথা বর্ণিত হয়েছে। সুবহানাল্লাহ শব্দ 'মাকামে তানযিহ'-এর প্রকাশক এবং আলহামদুলিল্লাহ শব্দ 'মাকামে তানবিহ'-এর প্রকাশক।

এ কথা সুবিদিত যে, সেই পবিত্র সত্তা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটিমুক্ত এবং সর্বময় কামালিয়াতের উৎস। বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তো কেবল তাঁরই হবে। শ্রেষ্ঠত্বের উৎস হবেন তিনি আর বড়ত্ব থাকবে অন্য কারো– তা কী-করে সম্ভব? মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তারই– যিনি প্রকৃতই কামাল বা পূর্ণতার উৎসমূল। তিনিই হামদ ও আযমতের উপযুক্ত। অর্থাৎ তাঁরই মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হবে। এ জন্যই ইসলাম 'তাকবীর'-এর ব্যবস্থা রেখেছে এবং 'আল্লাহু আকবার'-এর প্রচলন করেছে। যাতে করে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা যায়। এ মর্মে যে,

اَللهُ اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সবকিছু অপেক্ষা মহান।

তিনি শুধু আপেক্ষিক বা তুলনামূলকভাবে বড় নন বরং প্রকৃতপক্ষেই তিনি বড়। অর্থাৎ বড়ত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য। কারো মধ্যে বড়ত্বের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া

গেলে বুঝতে হবে তা তাঁরই নামের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে এসেছে। তার নাম থেকে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তার বড়ত্বও শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য মূলত একমাত্র তাঁরই। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى فِيهِمَا قَصَمْتُهُ

গর্ব ও অহংকার আমার চাদর, আযমত ও মর্যাদ আমার লুঙ্গি। এ দুটো নিয়ে যে ব্যক্তি টানা-হেঁচড়া করবে আমি তার ঘাড় মটকে দেব, তাকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করব। [হাদিসে কুদসী]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বড়ত্বের অহমিকা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কারো শরিক হওয়া বরদাশতযোগ্য নয়। তা একমাত্র وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه (তিনি এক, লা-শারীক)-এর জন্য। সুতরাং لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান-জমিনে শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁর।

একটি সন্দেহের নিরসন

এখানে তালিবে ইলম-সুলভ একটি প্রশ্ন আসতে পারে, অথবা কারো মনে হয়তো প্রশ্নটি এসেও থাকবে যে, হাদিস শরীফে নির্দেশ রয়েছে–

تَخَلَّقُوْا بِأَخْلَاقِ اللهِ

তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবাণ হও।

তিনি দয়ালু, তোমরাও দয়ালু হও, তিনি কোমল-দিল, তোমরাও কোমল-দিল হও, তিনি হেফাযতকারী, সংরক্ষক, তোমরাও নিজেদেরকে হেফাযত কর, তিনি প্রকৃত দাতা, তোমরাও দাতার গুণ ধারণ কর, দরিদ্রদেরকে দান কর, মোটকথা আল্লাহ তায়ালার পূর্ণতা দ্বারা নিজেরাও পূর্ণতা লাভ কর এবং তাঁর রঙে রঞ্জিত হও। তো সংশয় এই তৈরি হতে পারে যে, তাকাব্বুর বা অহংকারও তাঁর শান, এ চরিত্রেও তো চরিত্রবান হওয়া উচিত। প্রত্যেকের অহংকারী হওয়া আবশ্যক, অন্যতায় খোদার রঙে তো রঞ্জিত হওয়া যাচ্ছে না। তথাপি আমরা অহংকার করলে কেন তার জন্য তিরস্কার করা হয়?

এ প্রশ্নের জওয়াব হলো, (আল্লাহ মাফ করুন) অহংকার করা খারাপ বিষয় নয়, অহংকারও কোনো খারাপ জিনিস নয়। অহংকার তো আল্লাহর গুণ, অহংকার করা খারাপ নয়। তবে খারাপ হলো মিথ্যা কথা বলা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোনো ব্যক্তি যখন বলবে– আমি বড়, তখন তা মিথ্যা হবে। সে মিথ্যাবাদী

বলে প্রমাণিত হবে। সুতরাং অহংকার করতে নিষেধ করার দ্বারা মূলত মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। কেবল একই সত্তার জন্য অহংকার অলঙ্কার স্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাই শুধু বলতে পারেন–

اَنَا الْكَبِيْرُ، اَنَا الْمُتَعَالُ، لِيْ الْكِبْرِيَاءُ.

বড়ত্ব আমার জন্য, আযমত ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আমার। তিনি ব্যতীত যে ব্যক্তি দাবি করবে যে, لِيْ الْكِبْرِيَاءُ، لِيْ الْعَظْمَةُ (বড়ত্ব আমার, শ্রেষ্ঠত্ব আমার) সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং মিথ্যা বলা খারাপ ও অন্যায়, অহংকার করা অন্যায় নয়। কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত যে ব্যক্তি গর্ব-অহংকার করবে সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে। এ কারণেই গর্ব-অহংকার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত (মূলত এটাই প্রকৃত জওয়াব) অহংকার হলো আল্লাহ তায়ালার একটি সত্তাগত গুণ। আল্লাহর গুণাবলি দুই ধরনের– সত্তাগত, কর্মগত। কর্মগত গুণের অনুকরণ করা ভিন্ন কথা; হাদিসে এটাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্তাগত গুণ যথা স্রষ্টা হওয়া কিংবা অহংকারী হওয়া– এগুলোর অনুকরণ করতে যাওয়ার অর্থ হলো তাঁর সত্তার সাথে সাযুজ্যতার দাবি করা। এমনটি করার অনুমতি দেওয়া অসম্ভব। এ কারণেই নিষেধ করা হয়েছে যে, অহংকার করা যাবে না। অহংকারের অনুমতি দেওয়া হবে না। অহংকারী সর্বদা বঞ্চিত থাকে। কেননা সে মিথ্যাবাদী। গর্ব-অহংকার করার অনুমতি কারো নেই।

তাওহীদের হাকিকত

যে সত্তা সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত, পবিত্রতার ঘোষণা কেবল তাঁরই স্বপক্ষে হবে; যে সত্তা সর্বপ্রকার সৌন্দর্য ও কল্যাণের উৎস, সর্বপ্রকার প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য; যে সত্তা সর্বপ্রকার পূর্ণতা ও সফলতার মালিক, সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাঁরই জন্য। এ কথা স্পষ্ট যে, যেই সত্তাকে সর্বপ্রকার ত্রুটি হতে মুক্ত, সকল পূর্ণতার আধার ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী বলে মেনে নেওয়া হল– একত্ববাদের ঘোষণাও তাঁর স্বপক্ষে যাবে। অন্য কোনো সত্তা যখন এমন নেই তখন ঐ সত্তাকেই এক ও অদ্বিতীয় বলা হবে। যাঁর কোনো শরিক নেই, অংশীদার নেই। কোনো সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর কোনো মালিক নেই। শুধুই একা এক বরকতময় সত্তা। যিনি এক ও একক। না তাঁর সত্তার অনুরূপ কোনো সত্তা আছে, না তাঁর কর্মকাণ্ডের অনুরূপ কারো কর্মকাণ্ড আছে, না তাঁর শানের অনুরূপ কারো শান আছে। সুতরাং সকল বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র। শরীয়তের

পরিভাষায় একেই বলা হয় 'তাওহীদ'। তাওহীদের অর্থ শুধু একক হওয়া নয়। সত্তাগতভাবে আমরা প্রত্যেকেই তো একক সত্তা। তাওহীদের অর্থ হলো এমন একক ও স্বতন্ত্র সত্তা, যার কোনো দৃষ্টান্ত নেই, সমতুল্যতা নেই।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

তাঁর অনুরূপ কোনো কিছুই নেই, তিনি মহাশ্রোতা, মহাদ্রষ্টা।
[শুরা ৪২ : ১১]

সুতরাং তাওহীদ মূলত তিনটি বিষয়ের সমষ্টি, তিনটি বুনিয়াদের উপর ভিত্তিশীল– নিরঙ্কুশ পবিত্রতা, নিরঙ্কুশ প্রশংসা ও নিরঙ্কুষ শ্রেষ্ঠত্ব। পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা একমাত্র তাঁরই সত্তার মহান শান। সুতরাং যে সত্তা পবিত্রতার অধিকারী, সৌন্দর্যের আধার ও শ্রেষ্ঠত্বের একক অধিপতি– মাবুদ হওয়ার যোগ্যতাও কেবলই তাঁর। একত্ববাদও কেবল তাঁর জন্য প্রযোজ্য হবে। ইবাদতও কেবল তাঁরই করা হবে; অন্য কারো নয়। এটাই হলো তাওহীদের স্বরূপ। অর্থাৎ সত্তাগত দিক থেকে, গুণাবলির দিক থেকে এবং কর্মকাণ্ডের দিক থেকে তাঁর কোনো শরিক থাকবে না এবং শানও তাঁর অতুলনীয় ও বেনজির হবে।

সুতরাং উলুহিয়্যাত বা প্রভুত্বের মাকাম (স্তর) দাঁড়ালো চারটি– এক. তানযিহ বা পবিত্রতা ঘোষণা, যা 'সুবহানাল্লাহ' দ্বারা অর্জিত হয়। দুই. তানবিহ বা প্রশংসা ঘোষণা, যা 'আলহামদুলিল্লাহ' দ্বারা আদায় হয়। তিন. আযমত বা শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, যা 'আলিয়্যুল আজিম' দ্বারা অর্জিত হয়। চার. উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের সমন্বিত দাবির চাহিদা এই যে, তিনি হবেন একক ও অদ্বিতীয় এক সত্তা। এর দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়।

দেখা যাচ্ছে, এই সংক্ষিপ্ত হাদিসখানায় উলুহিয়্যাতের মাকাম বর্ণিত হয়েছে। 'সুবহানাল্লাহ' দ্বারা তাসবীহ, 'ওয়াবিহামদিহী' দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ এবং 'সুবহানাল্লাহিল আযিম' দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই তিনটির সমন্বিত দাবি হলো এই যে, তিনি হলেন একক এক সত্তা। সুতরাং ফলাফল বিচারে তাওহীদ এরই মধ্যে সন্নিবেশিত। যেমনিভাবে অত্র হাদিসে ইমাম বুখারী রহ. 'মাকামাতে উলুহিয়্যাত' বর্ণনা করেছেন তেমনিভাবে নিয়ত সংক্রান্ত প্রথম হাদিসটি দ্বারা 'মাকামাতে আবদিয়াত' বর্ণনা করেছিলেন। বান্দার মাকাম এই হওয়া চাই যে, নিয়তের দ্বারাও তাঁর প্রতি রুজু হবে এবং আমলের দ্বারাও তাঁর প্রতি রুজু হবে। অন্তর দ্বারা তাঁর দিকে রুজু হলে তাকে বলা হবে নিয়ত আর দেহ দ্বারা রুজু হওয়ার নাম ইবাদত বা আমল।

নিয়তের শুদ্ধতা ও হাকিকত

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে।

উপরের হাদিসটিতে মূলত মাকামাতে আবদিয়াত তথা 'বান্দার স্তর' বর্ণিত হয়েছে। বান্দার কাজ হলো নিয়ত শুদ্ধ করে নেওয়া। বিয়ে-শাদী করতে গেলে নিয়ত শুদ্ধ করে নেবে, হিজরত যদি করে তাতেও নিয়ত শুদ্ধ করে নেবে, সম্পদ উপার্জন করলে তাতেও নিয়ত শুদ্ধ হতে হবে। নিয়ত শুদ্ধ করার অর্থ হলো সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া। (বুঝা যাচ্ছে, নিয়ত সংক্রান্ত এ হাদিসে মাকামাতে আবদিয়াত বর্ণিত হয়েছে; মাকামাতে রুবুবিয়্যাত নয়। কেননা) আল্লাহ তায়ালার জন্য নিয়তের বাধ্যবাধকতা নেই। নিয়তের সাথে তাঁর কী সম্পর্ক? বরং তিনি সবকিছু হতে পবিত্র, সবকিছুর উর্ধ্বে। নিয়ত মূলত একটি ইবাদত, আর তিনি ইবাদত হতে পবিত্র। তিনি তো মাবুদ। আর এটা কিভাবে সম্ভব যে, মাবুদ নিজেই নিজের ইবাদত করা শুরু করবে? এ কারণেই প্রথম হাদিস إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -এ মাকামাতে আবদিয়াত বর্ণনা করা হয়েছে এবং সর্বশেষ হাদিসে মাকামাতে উলুহিয়্যাত বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ দুয়ের মাঝখানে রয়েছে ইলম, আমল, ইতেকাদ প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যায়সমূহ। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, এই আমল ও ইতিকাদসমূহে নিয়তকে শুদ্ধ করে নাও, তাহলেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে। আর যখন নৈকট্য অর্জিত হবে তখন তোমাদের জন্য পুরস্কার নির্ধারণ হয়ে যাবে, আমলের মিযান ঝুঁকে যাবে।

ইমাম বুখারী রহ.-এর রচনা ও সংকলন পদ্ধতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ। এমনকি এই শুরু ও শেষ হাদিসের মাঝেও সে পূর্ণতা ভাস্বর হয়ে আছে। সূচনায় বান্দাকে বন্দেগি সম্পর্কে বুঝিয়েছেন এবং সমাপ্তিতে এসে উলুহিয়্যাতের মাকামাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর এ দু'য়ের মধ্যবর্তীতে অন্যান্য অধ্যায়সমূহের সন্নিবেশ ঘটেছে। তার মধ্যে ইবাদতও রয়েছে, লেনদেন ও আচার-আচরণও রয়েছে, শাসনব্যবস্থা ও বিচারপদ্ধতিও রয়েছে। এভাবে দীনের সকল বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে এই দুই হাদিসের মধ্যবর্তী অংশে। সূচনা ও সমাপ্তিকে নিয়ত ও মিযান দ্বারা বেষ্টনী দিয়েছেন। এর অর্থ হলো এই যে, যদি এই দুই প্রান্ত সঠিক থাকে তাহলে ইবাদত, মুয়াশারাত– সবকিছুই কবুল হয়ে

যাবে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মাধ্যমে পরিণত হবে। এ কারণেই আমি শুরু ও শেষ– উভয় হাদিসই তিলাওয়াত করেছি।

ع۔اول باآخر نسبتے دارد

সূচনার সাথে সমাপ্তির সংযোগ থাকে।

উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ-সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তা এই যে, সূচনার হাদিসের উপর ভিত্তি করে বান্দা তার কর্মকাণ্ডের পরিচালনা শুরু করে সমাপ্তির হাদিসে বর্ণিত স্তরে গিয়ে উপনীত হবে। মধ্যবর্তীতে উল্লেখিত ইলম, আমল ও ইবাদতসমূহ আঞ্জাম দিয়ে উম্মত তার শেষ মঞ্জিল 'মিযান' পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে। আপনার এই আমলসমূহই সেদিন ওজন করা হবে।

আমল কিভাবে ওজন হবে?

নিয়তের মাধ্যমে আমলে ওজন হবে, আমল ভারী হবে। নিয়ত যদি সহি হয়, ইখলাস যদি সহি হয় তাহলে সে আমল ওজনদার হবে। আল্লাহ মাফ করুন– নিয়ত যদি সহি না হয় তাহলে সে আমল যতই বড় হোক না কেন কবুল হবে না। আল্লাহর কাছে আমলের বাহ্যিকতা লক্ষণীয় নয়। দেখা হয় না যে, আমলটি কতটা প্রচার পেল, কতটা ধুমধামের সাথে করা হলো কিংবা কতটা বড় হলো ও ব্যাপক হলো বরং আমলের ওজনের প্রতি লক্ষ করা হবে। দেখা হবে যে, আমলটির মধ্যে ইখলাস কতটা রয়েছে, নিয়ত কতটা পবিত্র এবং অন্তরের আন্তকিতা কতখানি।

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلىٰ صُوَرِكُمْ وَ اَمْوَالِكُمْ، وَلٰكِنَّ يَنْظُرُ إِلىٰ قُلُوْبِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمْ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখেন না এবং তোমাদের আমলেরও বাহ্যিকতা দেখেন না, কিন্তু তিনি তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন, তোমাদের অন্তরে কী আছে তা দেখেন। আর তিনি তোমাদের আমল দেখেন (নিয়তের বিশুদ্ধতা দেখেন)।

কখনো কখনো এমন হয় যে, ছোট্ট একটি আমল পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে আঞ্জাম দেবার দ্বারা তা নাজাতের মাধ্যম হয়ে যায়। আবার কখনো এমনও হয় যে, বাহ্যিকভাবে আমলটি অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও নিয়তের অশুদ্ধতার কারণে

তা বরবাদ হয়ে যায়। এমনিভাবে খুব ছোট কোনো আমলও পরিপূর্ণ ইখলাসের কারণে মাগফিরাতের উছিলা হয়ে যায়।

ইখলাসের শক্তি

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু দাউদ রহ., যার কিতাব 'আবু দাউদ শরীফ' মাদরাসাসমূহে পাঠ্য রয়েছে, তার জীবনীতে আছে যে, একদিন তিনি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আনুমানিক এক দেড়শ গজ দূরে নদীতে একটি জাহাজ নোঙর করা ছিল। তখনকার যুগে বর্তমান সময়ের মতো প্লাটফর্মে এসে জাহাজ ভেড়ার পোতাশ্রয় ছিল না। যাই হোক, জাহাজ ছিল দূরে নদীতে এবং ইমাম আবু দাউদ রহ. ছিলেন নদীর কিনারে। জাহাজে থাকা কোনো এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে অনেক জোরে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। সে আওয়াজ ইমাম সাহেবের কানে এসে পৌঁছল। মাসয়ালা আপনারাও জানেন, হাঁচি দিয়ে কেউ আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জওয়াবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা ওয়াজিব। তবে এ ক্ষেত্রে উভয়ে একই স্থানে থাকা শর্ত। এমন নয় যে, কেউ বাজারে বসে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললো আর আপনি তার জবাব দেবার জন্য সফর করে সেখানে যাবেন। ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর উপরও ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা ওয়াজিব ছিল না। তিনি নদীর কিনারে ছিলেন আর জাহাজ শতাধিক গজ দূরে নদীতে ছিল। কিন্তু এ হযরতগণ আমলের ব্যাপারে অধিক লোলুপ ছিলেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমলও তারা ছাড়তে চাইতেন না। যেমনিভাবে দুনিয়াদাররা এক এক পয়সার প্রতি লোভী থাকে। এক হাজার থাকলে দশ হাজারের প্রত্যাশা করে, দশ হাজারের মালিক হলে এক লক্ষের মালিক হতে চায়। কাউকে যদি স্বর্ণের একটি পাহাড়ও দেওয়া হয় তবু সে এমন আরো একটি পাহাড়ের প্রত্যাশা করবে। আর এই আল্লাহওয়ালাগণের থাকে সৎকর্মের লোভ। যতটা সম্ভব তারা কামাই করে নিতে চায়। সমগ্র জান্নাত যেন নিজের জন্য করায়ত্ব করতে চায়। কিন্তু এর অর্থ কার্পণ্য নয় (অন্য কেউ কিছু না পাক এমন নয়) বরং এঁরা চান যে, সমস্ত জান্নাত আয়ত্বে আসুক এবং নিজেদের সাথে যারা সম্পৃক্ত আছেন তাদেরকে সাথে নিয়ে সেখানে যান। আল্লাহ মাফ করুন, স্বার্থপরতার কোনো বিষয় তাঁদের মধ্যে থাকে না যে, শুধু একা সেখানে যাবেন বরং আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের সাথে সম্পৃক্ত সকলকেই সেখানে পৌঁছাবেন। যাই হোক, ইমাম আবু দাউদ রহ. ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আমল হতেও বঞ্চিত হতে চাইতেন না। সুতরাং তিন দিরহাম দিয়ে একটি নৌকা ভাড়া করে তিনি ঐ জাহাজের কাছে চলে গেলেন এবং হাঁচিদাতাকে গিয়ে ইয়ারহামুকাল্লাহ বললেন।

ইমাম আবু দাউদ রহ. এর জীবনীকারগণ লেখেন, তখন গায়েব হতে একটি আওয়াজ এল– 'হে আবু দাউদ! আজ তুমি তিন দিরহামের বিনিময়ে জান্নাত কিনে নিলে।'

দেখুন, ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর মতো ব্যক্তি কতই তো তাহাজ্জুদ পড়ে থাকবেন, কতই তো হাদিস রেওয়ায়াত করে থাকবেন, কতই তো জিহাদ করে থাকবেন, আমলে সালেহ করে থাকবেন– আর জান্নাত ক্রয়ে মাত্র তিন দিরহাম লাগলো। জানা গেল, এই সামান্য আমলটুকু কামেল ইখলাসের কারণে এমনই ওজনদার হয়ে গেল যে, এটা নাজাতের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো।

সুতরাং প্রকৃপক্ষে আমলকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার বিষয় হলো ইখলাসের শক্তি। আমল হলো একটি দেহের ন্যায় এবং বিশুদ্ধ নিয়ত হলো তার রূহ। এই রূহ যদি না থাকে তাহলে আমল নামক দেহটি যেন একটি লাশ। আর লাশের পরিণতি হলো ফুলে-ফেঁপে ওঠা, ফেটে-গলে যাওয়া। আমলও অদ্রূপ। ইখলাস হলো রূহ। যা আখেরাত পর্যন্ত পৌঁছবে এবং তার উপর ভিত্তি করে ফলাফল প্রাপ্তি ঘটবে। ইমাম আবু দাউদ রহ. তিন দিরহাম দিয়ে জান্নাত কামাই করে নিলেন। তেমনিভাবে আপনারা যারা হাদিস পড়লেন, তারা একে কম মর্যাদার মনে করবেন না। একটি মাত্র হাদিস পড়ার তাওফিক হলো তো দুনিয়া ও তাতে যা-কিছু রয়েছে তা আমাদের হস্তগত হল। জান্নাতে যদি সামান্য একটু জায়গা, জুতার ফিতার পরিমাণ স্থানও যদি লাভ করার সৌভাগ্য হয়ে যায় তবে তা পৃথিবী ও তার যাবতীয় কিছু হতে উত্তম।

জান্নাত ও আমলের হাকিকত

এই কুরআন ও হাদিসই তো জান্নাত। এমনকি কোনো কোনো বর্ণনায় তো রয়েছে যে, কুরআন মাজিদে যতগুলো আয়াত রয়েছে জান্নাতেরও ঠিক ততটি স্তর। কিছু রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং এই আয়াতগুলোই জান্নাতের এক একটি স্তর। পরকালে গিয়ে এ আয়াতগুলো স্থায়ী নিয়ামতের রূপ লাভ করবে। এখানে যা আমরা আমলরূপে দেখতে পাচ্ছি সেখানে গিয়ে তা নিয়ামতের আকৃতিতে প্রকাশ পাবে। জিনিস মূলত একই, স্থানের পরিবর্তনে তা পরিবর্তিত হবে। পার্থিব জগতে যা আমলের পোশাকে আচ্ছাদিত, পরকালে গিয়ে তা পুরস্কার ও প্রতিদানের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হবে। এ জগতের হুবহু এই আমলই ওখানে গিয়ে ফুলফল ও বাগবাগিচার আকৃতি ধারণ করবে।

আমলের আকৃতির পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত

আমাদের শৈশবে ইউরোপ থেকে এক ধরনের খেলনা আসতো। একটি প্যাকেটের মধ্যে ছোট ছোট বল আকৃতির বারোটি জিনিস থাকত। এক প্যাকেট দুই আনায় পাওয়া যেত। শিশুরা একটি পাত্রে পানি ও বল নিয়ে খেলতে বসতো। পাত্রের পানিতে একটি একটি বল ছাড়তো আর মিনিট খানেক পর সে বল ফেটে গিয়ে কোনোটা ফুল, কোনোটা ইঞ্জিন, কোনোটা রেলগাড়ির ডাব্বা প্রভৃতি আকৃতি ধারণ করত। শিশুরা দেখে খুব আনন্দ পেতো। আসলে এখানে কী ঘটতো? কারিগর সে বলগুলোকে এমন পদ্ধতিতে তৈরি করত যে, যখনই তা খুলে যাবে তখনই তা কোনো না কোনো আকৃতি লাভ করবে।

কুরআনের আয়াত নিয়ামতের আকৃতিতে প্রকাশ পাওয়ার দৃষ্টান্ত

আপনারা হয়তো আতশবাজি দেখে থাকবেন। আতশবাজিতে একটি বাঁশের চাকতি বা এ জাতীয় কিছু থাকে। তার অগ্রভাগে বিভিন্ন পদার্থ ও বারুদ থাকে। যখন তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তখন তা থেকে কখনো আগুনের তৈরি ঘোড়া, কখনো ঘোড়সওয়ার প্রভৃতি বেরিয়ে এসে শূন্যে ছুটতে থাকে। এ হলো কারিগরের নির্মাণ কৌশল। কারিগর এমনভাবে উপকরণাদির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে যে, যখন তা প্রকাশ পাবে তখন তা ঘোড়ার আকৃতি ধারণ করবে। এই যে বল ও আতশবাজি, এগুলোর মধ্যে একটি কারিগরি কৌশল রয়েছে। এ তো হলো বান্দার কারিগরি। আর আল্লাহ তায়ালা হলেন মহান এক কারিগর। এই আয়াতগুলোকে তিনি এমন এক পদ্ধতিতে তারতিব দিয়েছেন যে, যখন তা প্রকাশ পাবে তখন বাগবাগিচা হয়ে যাবে। এখানে তা আয়াতের আকৃতিতে রয়েছে, ওখানে তার আকৃতি হয়ে যাবে স্থায়ী এক নিয়ামত। জিনিস একই, স্থান ও জগতের পরিবর্তনে তা পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

উক্ত বিষয়টির হুবহু উদাহরণ হলো এই– যেমন কোনো ইঞ্জিনিয়ার যখন একটি বাড়ি নির্মাণ করতে যায় তখন সর্বাগ্রে ঐ বাড়িটি তার মস্তিষ্কে নির্মিত হয়। বাড়িটির দরোজা, জানালা, রঙ, রূপ– সব তার মনের আয়নায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। এরপর মনের মাঝে তৈরি হওয়া বাড়িটিকে সে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। কলম বা পেন্সিল দ্বারা সে তার নকশাটি কাগজে অংকন করে। এভাবে মনের মাঝে তৈরি হওয়া বাড়িটি কাগজে এসে যায়। অতঃপর সে ঐ নকশা অনুযায়ী ইট-পাথর দ্বারা ভূমির উপরে বাড়িটি নির্মাণ করে। দেখুন, ভবন কিন্তু

সেই একটিই– যা প্রথমে মস্তিষ্কে, অতঃপর কাগজে, তারপর ভূমির উপরে স্থিতি পেয়েছে। মস্তিষ্কে থাকাকালীন তার কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব ছিল না। কাগজে তার আকৃতি নির্মিত হয়েছিল কালি ও রেখা দ্বারা আর যখন ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করল তখন তার আকৃতি নির্মিত হলো ইট-পাথর দ্বারা। কিন্তু মূল যে নকশাটা ইঞ্জিনিয়ারের মস্তিষ্কে ছিল তা কিন্তু ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হুবহু এই ভবনটিই ছিল। পোশাক বা ধরন কেবল পরিবর্তিত হচ্ছিল। মস্তিষ্ক থেকে কাগজ, কাগজ থেকে ভূমি– এভাবে স্থান পরিবর্তনের দ্বারা মূল বস্তুতে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি; একই রয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার আয়াত ও আমলে সালেহও ঠিক এমনই। এ জগতে আমরা কেবল তার আমলের আকৃতি দেখছি। যখন স্থান বদলে যাবে তখন তা চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকৃতি ধারণ করবে।

হাকিকতে আমলের দৃষ্টান্ত

আপনি-আমি এ জগতে যে আমল করছি তা একদিকে যেমন কষ্টকর, অপরদিকে তেমন কঠিন। আমরা ধৈর্য ও সহ্যের সাথে আনুগত্যের মাধ্যমে তা আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি। আমল আজ আপনার ঘাড়ের উপর সাওয়ার হয়ে আছে, যা আপনার উপর বোঝা স্বরূপ। কিন্তু যখন আখেরাতে যাবেন তখন এ আমলই আপনার বোঝাবাহী হবে, আপনি তার উপর সাওয়ার হবেন। এর উদাহরণ ঠিক এমন– আপনি কোথাও সফরে যাচ্ছেন। একটি বিছানা ও একটি বাক্স সাথে করে নিলেন। বাক্সটি মাথায় ও বিছানাটি বগলের নীচে নিয়ে আপনি পথ চলছেন। বাক্স ও বিছানা আপনার উপর সাওয়ার হয়ে আছে আর আপনি হাঁপাতে হাঁপাতে কষ্ট সহ্য করে এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনি যখন সরাইখানায় গিয়ে পৌঁছলেন তখন বিছানা বিছালেন। এখন বিছানা আপনার নীচে এবং আপনি তার উপরে আরোহণ করলেন। বাক্সটি আপনার জন্য তাক হয়ে গেল, আপনার হেলান দেবার আশ্রয় হয়ে গেল।

যে আসবাবপত্র সফরকালে আপনার উপর বোঝা ছিল, গন্তব্যে পৌঁছে তা আপনার বোঝাবাহী, আপনার জন্য উপকারী হয়ে গেল। এ জগতের আমল পরকালের জন্য ঠিক এমনই। এখানে আমল করা কষ্টকর। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে আদায় করতে হয়। কিন্তু ওখানে গিয়ে এই আমল আমাদের জন্য সাওয়ারী হয়ে যাবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

سَمِّنُوْا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ.

তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুকে মোটাতাজা কর, কেননা পুলসিরাতে এগুলো তোমাদের বাহন হবে।

এ জগতে কুরবানী আমাদের উপর একটি বোঝা স্বরূপ, যেন আমাদের উপর সাওয়ার হয়ে আছে। যে পশুর পেছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করেছি, এত প্রিয় এই পশুটি জবাই করে দেব! নিজ হাতে তাকে কেটে ছিঁড়ে কুটি কুটি করব! এটা কতই না কষ্টকর একটি বিষয়। এই কষ্ট সহ্য করার পর পরকালে গিয়ে আমরা এই জন্তুর উপর আরোহণ করব। আমাদের বোঝা তখন তারা বহন করবে। এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ

দানশীলতা জান্নাতের মধ্যে বৃক্ষের আকৃতিতে প্রকাশ লাভ করবে।

আপনি যখন বদান্যতা অবলম্বন করবেন, কোনো দরিদ্রের খোঁজ-খবর নিবেন, কাউকে দু'চার পয়সা দান করবেন তখন সে আপনার ছায়ায় আশ্রিত হলো, প্রশান্তি ও স্বচ্ছন্দতা লাভ করল। আপনার এই আমলটি ওখানে গিয়ে বৃক্ষে রূপান্তরিত হবে, আপনি তার ফল-ফুল দ্বারা উপকৃত হবেন, লাভবান হবেন।

আমল কখন আকৃতিপ্রাপ্ত হবে?

আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন প্রতিটি আমলকেই কোনো না কোনো আকৃতি বিশিষ্ট করবেন। আমাদের আজকের আমলসমূহই সেদিন আকৃতি ও দৈহিক কাঠামো লাভ করবে। হাশরের দিন থেকেই এটা শুরু হবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে দুটি জিনিস থাকবে। একটি হলো জাহান্নাম থেকে নির্গত ভয়ঙ্কর আওয়াজ, আরেকটি হলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা তার আমলসমূহ। প্রতিটি আমলকে তার সাথে সংগতিপূর্ণ আকৃতি প্রদান করা হবে। পূর্ণ পার্থিব জীবনকেই যেন তার সম্মুখে আকৃতিবিশিষ্ট করে উপস্থাপন করা হবে। প্রত্যেকেই দেখতে পাবে যে, আমি ঐ খারাপ কাজটি করছি, সাতটার সময় এই করছি, নয়টার সময় এই করছি– এভাবে প্রতিটি মুহূর্তের কর্মকাণ্ড হুবহু একই সময়ে, একই আকৃতিতে দেখতে পাবে। পৃথিবীতে অবস্থানকালীন জীবনের আমলের স্থান ও সময়কে ওখানে স্থানান্তরিত করে নেওয়া হবে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে– আমি অমুক স্থানে বসে অমুক সময়ে অমুক কাজে লিপ্ত রয়েছি। মোটকথা এই পৃথিবীতে

বসে সম্পাদিত আমলসমূহের স্থান, সময় ও তার স্বরূপকে ওখানে স্থানান্তরিত করা হবে।

আমলের স্বরূপ উপস্থাপনের বৈজ্ঞানিক সত্যায়ন

পার্থিব জীবনের আমলকে তার স্ব-আকৃতিতে পরকালে উপস্থাপন করাটা আশ্চর্য কোনো বিষয় নয়। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তো বিষয়টি বোঝা অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে। একবার দিল্লিতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সেখানে নিজেদের স্টল দিল। প্রতিটি দেশ নিজ নিজ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পণ্য দিয়ে স্টল সাজালো। রাশিয়ার পক্ষ হতে টেলিভিশন নিয়ে আসা হয়েছিল। এ প্রদর্শনী দেখতে আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। আমরা রাশিয়ার স্টলে গিয়ে বললাম, আপনাদের আশ্চর্যজনক কী আছে আমাদেরকে দেখান। রাশিয়ার প্রতিনিধি আমাদেরকে টেলিভিশন দেখালেন। তারপর তিনি আরো একটি মেশিন দিয়ে কিছু একটা করলেন [এ আলোচনা ১৯৬৮ সালের। ভিডিও প্লেয়ার ও ভিসিআর-এর সূচনা যুগ সম্ভবত এটাই] টেলিভিশনের পর্দায় আমাদের চোখের সামনে চীনের একটি ফসলী মাঠের ছবি ভেসে উঠল। দেখলাম মহিলারা মাঠে ধান বুনছে। চীনের নারীদের অভ্যাস হলো, ধান বুনতে বুনতে তারা নানা প্রকার গীত গাইতে থাকে। টেলিভিশনে আমরা চীনের মেয়েদের ধান বপণ করার দৃশ্যও দেখলাম আবার চীনা ভাষায় গাওয়া তাদের গানের আওয়াজও শুনতে পেলাম। বাস্তবিকই এই আশ্চর্য জিনিসটি আমরা সেদিন দেখেছিলাম। সূক্ষ্ম যে বিষয়টি এখানে ছিল তা হলো এই, আমরা দেখছিলাম রাতের বেলায় আর ধান বোনার দৃশ্যটি ছিল দুপুর বেলার। সম্ভবত বারোটা বা একটা বেজে থাকবে। সেই দুপুরের দৃশ্যই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সারা মাঠে রোদ ছড়ানো ছিল। হুবহু একই সময় দেখা যাচ্ছিল।

টেলিভিশন ওয়ালাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এ ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তারা একটি সময়কে ধারণ করে তা অন্য সময়ে প্রদর্শন করতে পারে, এশার সময়ে যোহরের সময়কে দেখাতে পারে, চীনের মাঠকে ভারতে দেখাতে পারে, চীনের নড়াচড়া করা আমাদের চোখে পড়ে, তাদের গানের আওয়াজ আমরা শুনতে পাই, একটি স্থান ও সময়কে অন্য একটি স্থান ও সময়ে প্রদর্শন করতে পারে– এই ক্ষমতা ও বুদ্ধি যখন আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে দিয়েছেন, সেই আল্লাহ তায়ালা কি এমন করতে পারবেন না যে, দুনিয়ার সকল আমল, সকল সময়কাল ও সকল স্থানকে

পরকালে সবার সামনে উপস্থাপন করবেন? পার্থিব ভিডিও ব্যবস্থা যারা মেনে নিতে পারছেন, পরকালীন ব্যবস্থাকে তারা কেন মেনে নিতে পারবেন না?

পার্থিব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনসমূহ যারা মেনে নিতে পারছেন, তারা পরকালীন বিষয়াবলিও মানবেন। কেননা এখানকার উদ্ভাবনও তো মানুষের সত্তাগত বিষয় নয়। আল্লাহ তায়ালাই তো মানুষকে এ কাজ করার ক্ষমতা ও বুদ্ধি দিয়েছন। যেই আল্লাহ তায়ালার দেওয়া বুদ্ধি দ্বারা আমরা এসব উদ্ভাবন করছি, সেই আল্লাহ তায়ালা– যিনি সকল পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের উৎস, তিনি যদি এর চেয়ে অধিক কিছু করেন তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

যাই হোক, কুরআনের এই আয়াতাবলি, আমাদের এই আমলসমূহ এই জগতে যে আকৃতিতে রয়েছে ওখানে গিয়ে তেমন থাকবে না। ওখানে গিয়ে স্থায়ী নিয়ামত ও বাগ-বাগিচার আকৃতি ধারণ করবে। আল্লাহ মাফ করুন, আজ যে ব্যক্তি এখানে বসে ব্যভিচার করছে, প্রকারান্তরে সে নিজের দেহে সাপ ও বিচ্ছু জড়িয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু সে আকৃতি এখানে প্রকাশমান নয়, কেয়ামতের দিন তা প্রকাশ পাবে। তখন দেখা যাবে যে, তা ব্যভিচার ছিল না, তা ছিল নিজের দেহে সাপ-বিচ্ছু জড়িয়ে নেওয়া। আজ যা চুরি, কাল তা আল্লাহর আজাব আকৃতিতে দেখা যাবে। যে আযাব পার্থিব জীবনে অদৃশ্য ছিল, পরকালে তা আকৃতি ধারণ করবে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই তা স্ব-আকৃতিতে সামনে আপস্থিত হবে (আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন)।

কিছু কিছু শিশু শীতের দিনে গুড় খাওয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে। বনেদি গৃহস্থের ঘর হলে সেখানে তো এ-সময়ে প্রচুর গুড় থাকে এবং বাচ্চারাও ইচ্ছামতো খেতে থাকে। মা-বাবা তাদেরকে বাধা দিলেও যেহেতু মিষ্টি লাগে, মজা লাগে তাই তারা নিবৃত হয় না। এভাবে তারা পুরো শীত মৌসুম গুড় খেল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে খেল। কিন্তু যখন গ্রীষ্মকাল এলো তখন তা ফোড়া-পাঁচড়া হিসেবে নির্গত হতে শুরু করল। ফোড়া থেকে রক্ত-পুঁজ নির্গত হতে লাগলো। এখন চিকিৎসা করাতে করাতে পিতা ক্লান্ত হয়ে উঠল। কখনো মলম লাগায়, কখনো লোশন লাগায়, কখনো ট্যাবলেট খাওয়ায়, সিরাপ খাওয়ায় আর বলে– বাবারে! এমন দিনের কথা চিন্তা করেই তো আমি তখন নিষেধ করেছিলাম। তো এই একই গুড় তখন ছিল মজাদার মিষ্টি আকৃতিতে আর এখন তা ফোড়া-পাঁচড়া আকৃতি ধারণ করেছে। সামান্য ঋতু পরিবর্তনের মাধ্যমেই তার প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে।

আজ যে বদ-আমল করা হচ্ছে, এখানে তা আমলের আকৃতিতে রয়েছে, কিন্তু দুদিন পর যখন মৃত্যু পেরিয়ে পরকালে গিয়ে পৌঁছবে তখন তা যন্ত্রণাদায়ক

শাস্তির আকৃতিতে শরীর ফুঁড়ে ফুঁড়ে নির্গত হবে। আজ যা এখানে অদৃশ্য, কাল তা ওখানে গিয়ে দৃশ্যমান হবে।

যেসব আমল আমরা করে থাকি তা সাময়িক হালকা কোনো বিষয় নয় বরং মানব দেহ একে নিজের ভেতর শুষে নেয় এবং তাকে শরীরের অংশ সাব্যস্ত করে নেয়। চাই ভাল আমল হোক বা খারাপ আমল হোক। শরীরের অংশে রূপান্তরিত হওয়া সে আমল ময়দানে মাহশারে গিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়বে। ব্যক্তির আমলকে আল্লাহ তায়ালা ব্যক্তির ভেতর থেকে নির্গত করবেন, আবার বাহির থেকেও আমলকে আকৃতি বিশিষ্ট করে আমাদের আমলের প্রমাণকে দৃঢ় ও পূর্ণতা দান করবেন।

সহি বুখারীর সূচনা ও সমাপ্তির সংযোগ

ইমাম বুখারী রহ. কিতাবের শুরুতে আমলের প্রথম অংশ বলে দিয়েছেন যে–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে।

নিয়ত শুদ্ধ করে নাও, আমল শুদ্ধ হয়ে যাবে। এটা যেন একটি মৌলিক বিধান যে, প্রতিটি জিনিস নিয়তের উপর ভিত্তি কর গ্রহণযোগ্যতা পাবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যতা ও সাওয়াব প্রদান নিয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। এ মূলনীতির আলোকে কিভাবে আমরা কার্যকর ফল লাভ করব তা ব্যাখ্যা করণার্থে দ্বিতীয় বাক্যটি এসেছে–

وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى

মানুষ যে নিয়ত করবে সে নিয়ত অনুযায়ী ফল লাভ করবে।

শুধু নীতিমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং আমলের ক্ষেত্রে হয়তো সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, না হয় উপকৃত হবে। সুতরাং এটি দ্বিতীয় একটি মূলনীতি। প্রথম মূলনীতিটি একটি জ্ঞানগত মৌলিক বিধান। কোনো ব্যক্তি আমল করুক বা না করুক, বিধান স্ব-স্থানে বলবৎ থাকবে। আর যখন আমল করবে তখন وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى এ মূলনীতি কার্যকর হবে, মানুষ উপকৃত হওয়ার যোগ্য হবে। তো এই দ্বিতীয় মূলনীতিই মূলত আমল। আর প্রথমটি একটি জ্ঞানগত বিধান। অতঃপর তৃতীয় পর্যায়ে একটি শাখাগত উদাহরণ পেশ করা হয়েছে–

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُـهُ إِلَىٰ دُنْيَـا يُصِيْبُهَـا، أَوْ إِلَىٰ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَـا فَهِجْرَتُـهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهَـا.

যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত সেভাবেই ধর্তব্য হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, সে হিজরত তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিবেচ্য হবে।

সুতরাং এই একটি হাদিস উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রহ. তিনটি বিষয়কে সামনে নিয়ে এসেছেন– একটি জ্ঞানগত বিধান, একটি আমলী মূলনীতি, একটি শাখাগত উদাহরণ। এই তিনটি বিষয়ই অত্র হাদিসে একত্র করা হয়েছে এবং এ তিনটির সমন্বয়ে এ কথা বেরিয়ে এসেছে যে, নিয়ত ব্যতীত আমল হয় না। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। এমনকি দুনিয়াতেও যখন নিয়ত ব্যতীত কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায় তখন সরকারী আইন এবং উকিল এ কথা বলবে যে, তার নিয়ত খারাপ ছিল না– সে পরিস্থিতির শিকার। আল্লাহর হুকুমাতে অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও নিয়ত বিবেচ্য হয়ে থাকে। যাই হোক, এই প্রথম হাদিসটিতে তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং আমলের ভিত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আর কিতাবের শেষে গিয়ে যে হাদিসটি নিয়ে আসা হয়েছে তা ফলাফলের সাথে সম্পৃক্ত। এমন একটি প্রশ্ন হতে পারত যে, এর ফলাফল কী হবে? এর উত্তর এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে–

خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ.

অত্র কালিমা দুটি মুখে উচ্চারণ করা অতিশয় সহজ ও মিযানে অত্যন্ত ভারী।

আমি হাসি-রসের মাধ্যমে এর উদাহরণ দিয়ে থাকি। আপনারা হয়তো মাঝে মধ্যে পাপড় খেয়ে থাকবেন। রুটির মতো আকৃতির পাতল, নরম ও মুড়মুড়ে একটি খাদ্য। কখনো আবার মোম বা অন্যান্য আকৃতিতেও তৈরি করা হয়। তো আমি বলে থাকি– خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ মুখে খুব হালক। কিন্তু পেটে যাওয়ার পর অত্যন্ত ভারী হয়ে যায়, পেটে গড়বড় শুরু হয়ে যায়। এ হলো খাদ্যদ্রব্যে সমানুপাতিকতা। যাই হোক, আল্লাহ তায়ালার নিকট শরয়ী আমলের মধ্যে এই কালিমা দুটি হলো এমন যা মুখে উচ্চারণ করা অতি সহজ, পড়তে কোনো কষ্টই হয় না এবং সময়ও ব্যয় হয় না; কিন্তু মিযানে কালিমা দুটি তোলার পর সাওয়াব ও প্রতিদানে মিযান ভরে যাবে।

ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় কিতাবের সূচনা ও সমাপ্তি, মূল ও ব্যাপ্তি– সবকিছুই বর্ণনা করে দিয়েছেন। এ কারণেই আমি অত্র হাদিস দুটি তিলাওয়াত করেছি। কেননা এটা কোনো ওয়াজের মজলিস নয়, তাকরির ও দরসের মজলিস ছিল। অত্র হাদিস দুটির কিছু তরজমা আমি আপনাদের সামনে বয়ান করলাম। এর মূল ইলম ও কামালাত যা রয়েছে তা আমাদের মাওলানা (হযরত শায়খুল হাদিস মাওলানা আব্দুল হক সাহেব) আপনাদের সামনে বয়ান করবেন। এ হক ওলামাগণেরই। আমি তো কেবল তালেবে ইলম হিসেবে কিছু কথা আরজ করলাম, কেননা নির্দেশ পালন না করে কোনো উপায় ছিল না।

দোয়া

আমি আশা করি আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, নিজেদের জন্যও করবেন এবং হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেবের জন্যও দোয়া করবেন, যার উছিলায় এই ফুলে-ফলে সুশোভিত ইলমের বাগান আপনাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে। আর দারুল উলুম দেওবন্দের জন্যও দোয়া করবেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য ইলমের কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। সেখান থেকেই এই ফুলবাগানগুলো তৈরি হচ্ছে এবং কলি ও ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে সামনে আসছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের পরিণতি কল্যাণকর করুন।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

